ফিকহুস সিরাত



মুহম্মদ আল গাযালী আল মিশরী
অনুবাদ মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

ফিকহুস সিরাত

মূল

মুহম্মদ আল গাযালী আল মিশরী

অনুবাদ

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

ঐতিহ্য

ফিকহুস সিরাত

মূল : মুহম্মদ আল গাযালী আল মিশরী

অনুবাদ : মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৫
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
ছয়শত টাকা

FIQH-US-SIRAT by Muhammad Al Ghazali Al Misri
Translated into Bengali by Muhammad Jalaluddin Biswas.
Published by Oitijjhya.
Date of Publication : February 2009

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Price: Taka 600.00 US$ 15.00
ISBN 984-70193-0056-8

অনুবাদকের উৎসর্গ

মুসলিম বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত, সাহিত্য ও
সাংবাদিকতা জগতের নক্ষত্র ও 'মোস্তফা চরিত'-এর অমর রচয়িতা
মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৯)-এর স্মরণে–

যাহাদের কীর্তিগাথা এ জগতে যুগে যুগে রবে অম্লান
তাহাদের অন্যতম জাতির দিশারি যিনি আকরম খান
নিজের জীবন দিয়ে এ জগতে রচে গেলে যে অমরগাথা
যুগে যুগে কালে কালে বিশ্ববাসী জেনে যাবে যেই কীর্তি-কথা
তাহাদের অন্যতম কালের সাক্ষী তুমি হে মহান কবি
তোমার রচনা মাঝে লিপিবদ্ধ করে গেলে যে যুগের ছবি–
যুগ-যুগান্তব্যাপী সচেতনে অচেতনে শয়নে স্বপনে,
যুগের মহান রবি, আলো দিয়ে গেলে তুমি জাতির জীবনে
শতবর্ষব্যাপী কবি ! নতুন যুগের সৃষ্টা, হে মহান ঋষি !
তোমার কীর্তিগাথা স্মরণে রাখবে জাতি নিত্য দিবানিশি ।
শতাব্দীর প্রান্ত হতে তোমারে স্মরণ করি আমি অতি দীন
সত্য ও দ্বীনের পথে, নবীর পদাঙ্ক স্মরি জালালউদ্দীন ।
নবী-নামে নামাঙ্কিত গ্রন্থরাজি শোভা পায় তাহাদের ভালে
সে পথে জীবন যারা উৎসর্গিত করে যায় মধ্যযুগে কালে ।

অনুবাদকের ভূমিকা

শোকর আলহামদুলিল্লাহ !

অবশেষে সম্পন্ন হলো 'এ যুগের গাযালি' নামে অভিহিত মিশরের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মুহাম্মদ আল গাযালির বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ফিকহুস সিরাত'-এর বঙ্গানুবাদ। এরকম বিশ্লেষণাত্মক বই বিশ্ব সিরাত সাহিত্যে ক'খানা লেখা হয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে এটি আমার কাছে অত্যন্ত অভিনব ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। এ গ্রন্থের রচনাশৈলীও অসাধারণ। এই বই পড়ে আমি এমনই মুগ্ধ হয়ে যাই যে, তৎক্ষণাৎ এর বাংলা অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিই। আর বিশ্ব সিরাত সাহিত্যের অবিস্মরণীয় এ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করলাম বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সার্বিকভাবে গৃহীত হলে আমার শ্রম ও সাধনা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

এ এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গ্রন্থ, যা শুরু হয়েছে আলোচনা, সমালোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। রসুলের জীবনের প্রতিটি ঘটনা, স্থান ও কালের ভিত্তিতে, অন্যদিকে তুলনামূলক, বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখক তার গ্রন্থের আলোচনার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। লেখক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকার প্রারম্ভেই লিখেছেন :

'মানব-ইতিহাসে এমন সব প্রতিষ্ঠিত মহান ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বর্ণনা পাওয়া যায়, যাঁদের জীবনের ঘটনাবলি ও কীর্তি অধ্যয়ন করে মানুষ তাঁদের প্রতিভা থেকে লাভবান হয় এবং কঠিন ও দুঃখজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের নীতি ও কার্যপদ্ধতির সাথে কেবল পরিচিতই হয় না ; বরং পথের দিশাও লাভ করে। কখনো কখনো অধ্যয়নের এই পদ্ধতি ঐ মহান ব্যক্তিদের সম্বন্ধের মাধ্যমও হয়ে যায় এবং যখন এই অধ্যয়নে মাহাত্ম্য ও দৃঢ়তা এসে যায় তখন এর সাথে মানবতার সম্পর্কও স্থির হয়ে যেতে থাকে। প্রারম্ভেই এই ভ্রান্তি দূর করে দেয়া আবশ্যক যে, রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনী বিষয়ে লেখার সময়ে আমার মনে সীমিত ধ্যান-ধারণা এবং উদ্দেশ্য কখনোই ছিল না।'

লেখক এখানে তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে এ কথার সত্যতা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকাও লিখেছেন। এর উপসংহারে লেখক যথার্থই লিখেছেন : 'রসুলুল্লাহর সিরাত বা পবিত্র জীবনী তখনই বোধগম্য হতে পারে, যখন তাঁর বার্তা ও সাধনাকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে এবং যে গ্রন্থ (কুরআন) তিনি নিয়ে এসেছেন তা প্রাণাধিক প্রিয় বলে জ্ঞান করা হবে।'

এই ভালোবাসা বা তাঁর মহব্বত শুধু মুখের কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না ; বরং নিজের জীবন ও কর্ম দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে।

লেখক এ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে পবিত্র রসুলের জীবন ও কর্মকে পাঠকের সমস্ত জীবন কর্ম ও অনুভূতির সাথে একাকার করে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। লেখকের ভাষায় : 'আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এ ক্ষেত্রে আমি এই প্রচেষ্টাই চালিয়েছি।'

লেখক তাঁর গ্রন্থে কতিপয় হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং কিছু কিছু হাদিসের ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তার মতামত অত্যন্ত সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক তার গ্রন্থে কোনো বিতর্ক স্থান দেননি। কিন্তু তার জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার আলোকে বিষয়গুলো অত্যন্ত চুলচেরাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক তাঁর সমকালীন হাদিসবেত্তা আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর উল্লেখ করেছেন, যিনি 'তখরিজ হাদিস' বা হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধতার মাপকাঠিতে তাঁর গ্রন্থে বর্ণিত হাদিসগুলোর সত্যাসত্য আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন, যা গ্রন্থটির গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। লেখক এ জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন– 'জনাব আলবানী এই পুস্তকে বর্ণিত সমস্ত হাদিস, রসুলুল্লাহর বৃত্তান্ত ও ঘটনাবলি শুদ্ধতার মাপকাঠিতে পরীক্ষা, তার সমীক্ষা ও সমালোচনার সফল প্রয়াস চালিয়েছেন।'

মুহাম্মদ গাযালি বিভিন্ন হাদিস বিষয়ে যে মতামত ও বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা মাওলানা আলবানীর মতো হাদিসবেত্তা পরীক্ষা করেছেন যে ক্ষেত্রে লেখক নিন্দিত বা সমালোচিত হননি। এখানে লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো, তিনি হাদিসের পর্যালোচনার যুগ ও কালের সাথে মানুষের মনোবৈজ্ঞানিক দিকটিও বিবেচনায় এনেছেন, যার ফলে মানুষের মন ও বিবেকের কাছে তা আবেদন রেখেছে।

তা সত্ত্বেও লেখক স্পষ্টতই বলেছেন– 'আমার মতে আমি এ পুস্তকে যে সমস্ত হাদিস উল্লেখ করেছি এ গ্রন্থের পাঠক তা কোনো কট্টর হাদিসবেত্তা বা মহান অন্বেষকের মতো অবশ্যই যাচাই করুন চাই আমার সাথে তিনি একমত হোন বা না হোন।'

এভাবে লেখক তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি ও গতিতে গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। মহান নবীর সিরাত বা পবিত্র জীবনীর প্রবেশ পথের কয়েকটি দ্বার অতিক্রম করতে গিয়ে প্রাচীন ইতিহাসের সেই অন্ধকার যুগের মধ্যেও প্রবেশ করেছেন, যে যুগটি মহানবীর আবির্ভাবের সবচেয়ে জোরালো পটভূমি তৈরি করেছিল। লেখক সেই যুগটির নাম দিয়েছেন 'প্রাচীন সভ্যতায় মূর্তিপূজোর কলঙ্ক' নাম দিয়ে। তিনি এ যুগটি সম্পর্কে প্রথমেই লিখেছেন : 'মানবসভ্যতার ইতিহাস বড়ই লজ্জাজনক।'

যে দিন থেকে আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে নেমে এসেছেন, সে দিন থেকে তাঁর সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং বিভিন্ন সভ্যতাও জন্ম নিল। এক প্রজন্ম শেষ হলো তো দ্বিতীয় প্রজন্ম এসে স্থান গ্রহণ করল। সেই যুগ থেকেই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ও চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে। যদি তাদের সততার পথ পাওয়াও গিয়ে থাকে তা সত্ত্বেও তা পুনরায় বিভিন্ন পথের প্রান্তে হারিয়ে যেত। আর যখন হক (সত্য)-এর আলো দেখা দিত তখনই বাতিল (অসত্য) এসে তাকে অন্ধকারের আঁচলের মধ্যে ঢেকে নিত। এ সংঘর্ষ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এই ধারায় যুগে যুগে নবীদের আবির্ভাব ছিল মানবজাতি ও মানব সভ্যতার ইতিহাসকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করার নিমিত্তে। তারা যুগ যুগ ধরে সুশৃঙ্খলভাবে একত্ববাদ প্রচার করে গিয়েছেন, মানুষের ইহ-পরকালের স্পষ্ট ধারণা দিয়ে গিয়েছেন, তা সত্ত্বেও এক এক

নবীর যুগ যখন শেষ হয়েছে তখন অন্যায়-অসত্য-অন্ধকার এসে সে সমাজ ও জীবন ব্যবস্থাকে পুনরায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তখন আবার একজন নবীকে পাঠানো হয়েছে। নবীদের এই ধারাবাহিকতায় শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনই এলেন, যখন তাঁর আগমনের প্রয়োজন জগতের আর সব যুগের চেয়ে অনেক বেশি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ আল গাযালি আল মিশরী প্রাচীন সভ্যতায় মূর্তিপুজোর ঘনঘটার যুগের পটভূমিকায় মুহাম্মদের আবির্ভাবের পর্যালোচনা করেছেন। তিনি কী সুন্দর না লিখেছেন :

'নূরে তৌহিদ (তৌহিদের আলো)-এর অনুপস্থিতিতে মন ও মস্তিষ্কের ওপরে যে অন্ধকার আচ্ছাদিত হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল শাসনব্যবস্থার নিকৃষ্টতা, বিকার এবং শাসিত জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত অনুসরণ। সে সময়ে সমগ্র পৃথিবী অন্যায় ও অত্যাচারে পীড়িত ছিল। দুর্বল ও অসহায় মানুষ শান্তি, সুরক্ষা, স্বস্তি ও সন্তুষ্টির জন্য হাহাকার করছিল।'

'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্ব থেকে পৃথিবী হাহাকার করছিল এবং বড়ই উদ্বেগাকুল অবস্থায় কোনো না কোনো নবীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল। অনন্তর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহপরবশ হয়ে দুনিয়ায় হেদায়েত বা সুপথ প্রদর্শনের জন্য হজরত' মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করলেন।'

অন্তিম নবুয়তের বৈশিষ্ট্য শিরোনামের সন্দর্ভে লেখক স্পষ্টতই বলেছেন : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেরণ হলো সমস্ত দেশ-কাল-যুগের নবীদের পূর্ণ প্রতিদানস্বরূপ ; বরং এ পৃথিবীতে মানবজীবন যতকাল অবশিষ্ট থাকবে এবং হেদায়েত ও মুক্তির পথ প্রদর্শনকারী কোনো দৃষ্টি অবশিষ্ট থাকবে সেই সময়কাল পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয়া হলো।'

এই হলো উম্মতে মুহাম্মদীর যুগের নবুয়ত সম্পর্কিত শেষ কথা। এই সত্য অন্তরে গেঁথে নিয়ে মহানবীর জীবনকর্ম সাধনাকে অনুভব ও উপলব্ধি করতে হবে।

মহানবী মুহাম্মদের রিসালাত যে পূর্ণাঙ্গ রিসালাত সে সম্পর্কে লেখকের ভাষ্য :

'আল্লাহ যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জগদ্বাসীর পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করলেন তখন তাঁর রিসালাতে সেই সিদ্ধান্তবলি সম্মিলিত করিয়ে দিলেন, যা বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের জন্য জ্ঞান ও পরিচয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।'

তাঁর অন্তরে যে কুরআন অবতরণ করা হলো তা আল্লাহ প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত পুস্তক, যা প্রতিটি জাগ্রতচিত্ত এবং আল্লাহভক্তি-সংলগ্ন হৃদয়কে আমন্ত্রিত করে, যাতে তাকে কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে আকৃষ্ট করে এবং তার হৃদয় ও মনে হেদায়েত এবং সত্য পথকে স্পষ্ট করে দেয়।'

আল্লাহ তাঁর রসুলের সম্মানে তাঁর পক্ষে যে সাক্ষ্য প্রেরণ করেছেন তা গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য : 'লোকসকল ! তোমাদের কাছে প্রভুর পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গিয়েছে, আর আমি তোমাদের প্রতি এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবতারণ করেছি। অনন্তর, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে তারা অনতিবিলম্বেই তাঁর দয়ালুতা ও অনুগ্রহের ছায়াতলে প্রবেশ করবে, আর তিনি তাদের নিজের কাছে পৌছানোর সোজা পথ দেখিয়ে দেবেন।'–নিসা : ১৭৫-১৭৬

পবিত্র রসুলের জীবনকর্ম ও সাধনা তাঁর উম্মতকে সেই মহান পথের প্রতি আকর্ষণ করে। মানুষ তার মধ্যে পরকালের সঠিক পথের দিশা পাবে।

আল্লাহর রসুল তাঁর উম্মতকে স্পষ্ট ভাষায় বলছেন :

'তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো। কেননা, তিনিই তোমাদের সুখসামগ্রী ও তাঁর অসীম কৃপা প্রদান করেছেন এবং আল্লাহকে ভালোবাসার কারণে আমাকেও ভালোবাসো।'–তিরিমিজি

উল্লেখ্য, লেখক এখানে পবিত্র কুরআন এবং হাদিস থেকে সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় বাণী উদ্ধৃত করেছেন, যা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে জানা এবং বোঝাই হলো ইসলামকে জানার ও বোঝার প্রথম ধাপ। তারপর পবিত্র কুরআনের আলোকে রসুলকে জানতে হবে আর রসুলের জীবন ও কর্মের মাধ্যমে কুরআন ও তাঁর বাণীকে জানতে ও বুঝতে হবে। কেননা, রসুলের জীবন ও কর্মই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ভাষ্য। আমি আমার এক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলাম, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআনের প্রতিবিম্ব ; কুরআন তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে আর তিনি কুরআনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছেন।' আমার এ পর্যালোচনা এখানে সার্থক যে আলোচ্য ফিকহুস সিরাত বা রসুল জীবনের ভাষ্য গ্রন্থে রসুলকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে আর কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

'অন্ধকার যুগের আরবের অবস্থা' শিরোনামের সন্দর্ভে লেখক আরবের অন্ধকার যুগের অবস্থা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন। এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই যুগ-কালটি অনুধাবন করতে পারলে ন্যায়-অন্যায়, সত্যাসত্য, হক-বাতিল, আলো-অন্ধকারের পার্থক্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রিয় রসুলের আবির্ভাবের এই পটভূমিটি অনুধাবন করতে পারলে আলো-অন্ধকারের প্রভাবে কালিমালিপ্ত হতে পারবে না, ইসলামের শত্রু-মিত্র চিনতে ভুল হবে না, ইসলাম ও মুসলমানের চিরশত্রুদের চিনতেও ভুল হবে না আর সেই শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার মতো হীন ও ঘৃণ্য মানসিকতা আর থাকবে না। এ গ্রন্থ ইসলামের বিগত চৌদ্দশো বছর আগেকার বন্ধুদেরও চিনিয়ে দেয় আবার তার চিরশত্রুদেরও চিনিয়ে দেয়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটি মুসলমানি চরিত্র গড়ে ওঠার অবকাশ পায়, যারা যুগের কুমন্ত্রণাতেও বিভ্রান্ত হয় না।

একত্ববাদ বিরোধিতা বা পৌত্তলিকতা যে মনুষ্যত্ব, মানবতা, সততা, সুকৃতি তথা যাবতীয় 'সু'-এর যে প্রধান শত্রু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনুষ্যত্বের চরম অবমাননাই মানুষকে তার হাতে গড়া বস্তুর প্রতি ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে অবনমিত করে। আরবের অন্ধকার যুগের যত কু-কৃতি যা আজও দুনিয়ায় পৌত্তলিক সমাজে প্রচলিত আছে তা মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে কখনোই সমুন্নত করে না ; বরং তাকে আরো হীনতা, নীচতা, শঠতা ও বর্বরতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর এই কারণেই পৌত্তলিকতা অভিশপ্ত। এ যুগে এই অভিশপ্ততার সবচেয়ে ঘৃণিত দৃষ্টান্ত হলো এই পৌত্তলিকদের দ্বারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা। বিষয়টি মোটেও হালকা দৃষ্টিতে দেখা চলে না। কারণ, পৌত্তলিকতাজনিত ও পাশবিকতা পৌত্তলিকদের চরিত্র ও সত্তার মধ্যে একীভূত হয়ে রয়েছে। পৌত্তলিকদের চরিত্রের অন্যতম ঘৃণিত দিক হলো, তারা মানুষের জীবনের চেয়ে গরুর জীবনকে

অধিকতর মূল্যবান মনে করে এবং গো-জীবন রক্ষার জন্য মানবজীবন ধ্বংসের ন্যায় ঘৃণ্য অপকর্মে মেতে ওঠে। মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে হত্যার এ পৌত্তলিকী প্রবণতাই অন্ধকার যুগের আরব দেশে নিষ্পাপ কন্যাশিশুদের জ্যান্ত কবর দিতে উদ্বুদ্ধ করত। সেই অভিশপ্ত পৌত্তলিকতাই ভারতে হিন্দু বিধবাদের চিতার আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ঘৃণ্য অপকর্মে ইন্ধন যোগাত, সেই পাপিষ্ঠ পৌত্তলিকরাই উনিশ শতকে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করেছিল, আর এই চিরঘৃণিত পৌত্তলিকতাই ভারতে মুসলিম নিধনে ইন্ধন যোগায়, গুজরাটে গর্ভবতী মুসলিম রমণীদের পেট চিরে সন্তান বের করে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারে। পৌত্তলিক ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষে এ সমস্ত অপকর্ম আর সম্ভব হতো না। পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিক চরিত্র না বুঝলে এ সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়।

এ গ্রন্থের লেখক প্রিয় রসুলের জীবন চরিত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা ধারাভাষ্য প্রসঙ্গে আরবের অন্ধকার যুগের সেই দুষ্প্রবেশ্য অবস্থাকে তুলে ধরেছেন, যা অনুধাবন করা প্রতিটি মুমিনেরই কর্তব্য। মনে রাখতে হবে সেই যুগেরই অবদান ছিল আবু জেহেল, আবু লাহাবের মতো নিকৃষ্ট চরিত্রের কাফির, আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মতো নিকৃষ্ট চরিত্রের মুনাফিক। আজ চৌদ্দশো বছর হয়ে গেছে কিন্তু পৌত্তলিক চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ যুগে আমরা আবু জেহেল ও আবু লাহাবের প্রেতাত্মারূপে দেখলাম বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারী কুখ্যাত লালকৃষ্ণ আদভানীকে, যোশীকে এবং তার দলের লোকজনদের। দীর্ঘ চৌদ্দশো বছর পরও পৌত্তলিক চরিত্রের কী অদ্ভুত মিল !

এ প্রসঙ্গে নিকৃষ্ট চরিত্রের মুনাফিকরূপে সে যুগের আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মতো লোকের নামও করা যায়। এ গ্রন্থের পাঠক সেই নিরিখে এ যুগে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের প্রেতাত্মা কারা হতে পারে, তা অনুমান করে নিন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এদের অবস্থান পাঠক নিঃসন্দেহে বুঝে নিতে পারবেন।

'শিক্ষকরূপে 'রসুল' শিরোনামের সন্দর্ভে শিক্ষকরূপে লেখক প্রিয় রসুলের যে অনুপম চরিত্র-মাধুরীর কথা লিখেছেন এক কথায় তা অভূতপূর্ব আর এ কারণেই তিনি জগতের সেরা শিক্ষক। তাঁরই শিক্ষার সুফল বিশ্বমানব আজ চৌদ্দশো বছর ধরে ভোগ করছে। এক কথায় তাঁর মতো প্রভাবশালী শিক্ষক পৃথিবীতে কোনো যুগে কোনো কালে কখনোই আসেননি। তাঁরই শিক্ষার প্রভাবে তাঁর অনুসারী কেবলমাত্র তাঁরই জন্য এক মুহূর্তের মধ্যে নিজের জীবন কুরবানি করে দিতে পারেন। একমাত্র তাঁরই শিক্ষার প্রভাবে তাঁরই একজন অনুসারী তাঁর চরিত্রহননকারীকে মুহূর্তের মধ্যে জাহান্নামে পাঠিয়ে নিজে শহীদ হয়ে যেতে পারেন। এরকম অগণিত উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়, যা কেবল তাঁরই শিক্ষার কারণে সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এতে সন্দেহ ও আশ্চর্যের কিছু নেই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জগতে তিনি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষকরূপে বিরাজিত থাকবেন। পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি কোনো শক্তি কোনো কালেও তাঁর সে স্থান অধিকার করতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর রসুল তো নিরক্ষর ছিলেন, তা সত্ত্বেও কীভাবে তাঁর পক্ষে জগৎ-শিক্ষক হওয়া সম্ভব হলো ? লেখক তাঁর গ্রন্থে এ প্রশ্নের উত্তর যথার্থই লিপিবদ্ধ করেছেন :

'আল্লাহ তাঁর রসুলকে কিতাব ও শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতএব, এই ইহসানের দাবি হিসেবে, তিনি নিজের ঈমান ও ইসলামকে কদর করলেন, এর সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ করলেন। শত্রুরা তার মধ্যে লালসা সৃষ্টি করতে চাইল কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব ছিল ?'

'কুরআনে সুন্নতের স্থান' শিরোনামের সন্দর্ভে লেখক কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে এক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। এখানে লেখক কুরআনের আলোকে সুন্নতের অত্যন্ত প্রজ্ঞাদীপ্ত পর্যালোচনা করেছেন। লেখক কী সুন্দর লিখেছেন :

'কুরআন ইসলামের আইন আর সুন্নত রসুলের তরিকা অর্থাৎ তাঁর ব্যবহারিক ও কার্যোন্নয়ন প্রচেষ্টা। একজন মুসলমানের উপর কুরআনের আইন-কানুন মেনে চলা বা তাঁকে সম্মান করা বা কাজে পরিণত করাও ফরজ। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাঁর নির্ধারিত আদেশ-নিষেধ মেনে চলাকে অনিবার্য করে দিয়েছেন। কেননা, নবী তাঁর নিজের ইচ্ছায় বা নিজের মন থেকে কোনো কথা বলেন না ; বরং তাঁর প্রভুর আদেশানুসারে কাজ করেন। অতএব, তাঁর আদেশ পালন আল্লাহরই আদেশ পালন ; তা কোনো মানুষের অন্ধ অনুসরণ নয়। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন :

যে রসুলের আদেশ মানল, বাস্তবে সে আল্লাহর আদেশ মানল, আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল, তো আমি এমন লোককে তোমার রক্ষক মনোনীত করে তো পাঠাইনি।– নিসা : ৮০

আর (হে মুহাম্মদ !) আমি তোমার উপর স্পষ্ট নিদর্শন অবতারণ করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দাও, যা কিছু তাদের প্রতি অবতারণ করা হয়েছে, আর যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।– আন নহল : ৪৪

আর রসুল তোমাদের যা কিছু দেন তা নিয়ে যাও। আর যা থেকে তোমাদের বিরত করেন তা থেকে বিরত হও।'–আল হাশর : ৭

আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নাহকে লেখক এরকমই একাধিক উদ্ধৃতি উপমা ও আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যা অত্যন্ত মনোরঞ্জক, যার আবেদন মানুষের মন, হৃদয় ও ঈমানের কাছে।

'রসুলুল্লাহর মুজিজা' নামক সন্দর্ভে লেখক রসুলুল্লাহর জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলো তুলে এনেছেন, যা মুজিজা' বা অলৌকিক ঘটনাবলি নামে পরিচিত। এ সন্দর্ভে লেখক যুক্তিতর্কতত্ত্বতথ্যের আলোকে মুজিজা বিষয়টি আলোচনা করেছেন এবং আলৌকিকত্বের প্রতি অত্যধিক ও অস্বাভাবিক রকমের গুরুত্ব প্রদানকারীদের নিরুৎসাহিত করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো :

'পরন্তু মুজিজার না আকিদার সাথে সম্বন্ধ আছে আর না ঈমানের সাথে, যে ব্যক্তি উপদ্রব ও অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায় তার এই ঈমান যে, আল্লাহর রসুলের উপর একখণ্ড মেঘ ছায়া দিত অথবা পাথর তার সাথে কথা বলেছিল তাকে অপরাধী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে না। এর বিপরীতে কোনো সুকর্মী মানুষের স্থান, সম্মান বা মর্যাদা মুজিজাকে অস্বীকার করার কারণে কমে যায় না।

এসব বিবাদের সম্পর্ক জ্ঞান সম্পর্কিত যুক্তি-তর্কের সাথে কেননা এ ধরনের ঘটনাবলিতে অনেক অর্থ নিহিত আছে, যার উচিত ও অনুচিতের সাথে ঈমানের কোনো সম্পর্ক নেই।'

এভাবে লেখক পবিত্র রসুলের জীবন কর্ম ও সাধনার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর আলোচনা করেছেন, যা গভীরভাবে পর্যালোচনাযোগ্য।

লেখক মুহাম্মদ আল গাযালী আল মিশরী তাঁর গ্রন্থকে আটটি ছোট-বড় অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের রয়েছে নির্দিষ্ট শিরোনাম। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'জন্ম থেকে নবুয়তের প্রারম্ভ', দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'দ্বীনের দাওয়াতের প্রারম্ভ', তৃতীয় অধ্যায় 'গণ হিজরত (ভূমিকা এবং পরিণাম)', চতুর্থ অধ্যায় 'নয়া সমাজের ভিত্তি', পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল', ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'নয়া যুগ', সপ্তম অধ্যায়ের নাম 'মুমিন জননীগণ' ও অষ্টম অধ্যায়ের নাম 'অন্তিম সময়'।

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের রয়েছে উপ-শিরোনাম, যা বিষয়বস্তু অনুধাবনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। যেমন– প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে বারোটি উপ-শিরোনাম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে পঁচিশটি, তৃতীয় অধ্যায়ে ন'টি, চতুর্থ অধ্যায়ে সাতটি, পঞ্চম অধ্যায়ে আঠারোটি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে চব্বিশটি, সপ্তম অধ্যায়ে চারটি ও অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে দুটি উপ-শিরোনাম। পুরো গ্রন্থটি আটটি অধ্যায় ও একশো একটি উপ-শিরোনামে বিস্তৃত।

পুরো গ্রন্থটিতে লেখকের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য মনীষা, মেধা ও প্রজ্ঞার ব্যাপক বিচ্ছুরণ ঘটেছে। এমন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ গ্রন্থ বিশ্বসিরাত সাহিত্যে আর ক'খানি রচিত হয়েছে আমার জানা নেই।

বর্তমান যুগের সিরাত সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে আমি প্রায়শই মুহাম্মদ আল গাযালীর 'ফিকহুস সিরাত' নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দেখতাম। যার ফলে এ গ্রন্থটি আমার মনে ব্যাপক কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগায়।

এর ফলে এ গ্রন্থটি কেনার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠি। দিল্লি বা কলকাতার কোথাও পাইনি এ গ্রন্থটি। তারপর কলকাতা থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান নামক স্থানে এক অন্ধ হাফিজের দোকান থেকে আমি এই বইটি কিনি ১৯৮৯ সালে।

তারপর দীর্ঘ তেরো বছর যাবৎ এই বইটি ছিল আমার সঙ্গীসাথি। জীবনের এই দীর্ঘ চলার পথে আমার কত বই আর কত পাণ্ডুলিপি যে হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু এই বইটি হারায়নি। আমি যেন তাকে আমার বুকের মধ্যে করে রক্ষা করে চলেছিলাম। তারপর দীর্ঘ তেরো বছর পরে আমি নিশ্চিত হলাম যে, বইটির কোনো বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি তখন আমি এটি অনুবাদের জন্য অস্থির হয়ে উঠি। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ না হলে এর অনুবাদে হাতও দিতে পারতাম না এবং তা সম্পন্নও করতে পারতাম না।

আমি এ গ্রন্থের অনুবাদে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ও বানানরীতি অনুসরণ করি। স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে আমি একটিও ইয়োরোপীয় শব্দ এ গ্রন্থে ব্যবহার করিনি। আরবি-ফার্সি-উর্দু-তুর্কি ইত্যাদি ভাষা আমার বিবেচনায় বিদেশি নয়। কেননা, তা ইসলাম ও মুসলমানি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং তা আলাদা করে গ্রহণ-বর্জনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন!

৩ নভেম্বর, ২০০২
বাংলাবাজার, ঢাকা

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

মূল গ্রন্থের লেখকের নিবেদন

মানবেতিহাসে এমন প্রতিষ্ঠিত, মহান তথা সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বর্ণনা পাওয়া যায় যাঁদের জীবনের ঘটনাবলি ও কীর্তিকর্ম অধ্যয়ন করে মানুষ তাদের প্রতিভা থেকে লাভবান হয় আর তাঁদের জীবনের কঠিন ও দুঃখদায়ক নীতি ও কার্য-পদ্ধতির সাথে শুধু পরিচিতই হয় না ; বরং পথের দিশাও লাভ করে। কখনো কখনো অধ্যয়নের এই পদ্ধতি ঐ মহান ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কের একটি মাধ্যমও বনে যায়। আর যখন এ অধ্যয়নে গুরুত্ব দৃঢ়তা এসে যায় তখন এর ফলে মানবিক মূল্যবোধও স্থিরতা লাভ করতে থাকে।

প্রারম্ভেই এই ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে দেয়া আবশ্যক যে, রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন ও কর্ম বিষয়ে লেখার সময়ে আমার মধ্যে কোনো সীমিত ধ্যান-ধারণা ও উদ্দেশ্য কখনোই ছিল না।

জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে আমি একজন মুসলমান। আমি জানি, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপর কেন ঈমান এনেছি। আর হজরত মুহাম্মদ[১]-এর পদাঙ্ক কেন অনুসরণ করেছি। কেনই বা তাঁর প্রচারিত সুসংবাদ তথা পবিত্র কুরআনের নীতি ও আদেশ গ্রহণ করেছি। তাছাড়া আমি এ কথাও জানি যে, আমি যে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি তার প্রতি অন্যকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ? আমি 'সিরাত' বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছি কিন্তু আমি কি আমার উদ্দেশ্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়েছি ? আকিদা (ধারণা), নৈতিকতা, ব্যবহার ও হুকুমতের বিষয়ে যত গ্রন্থ রচনা করেছি তার সমস্ত কর্মশৈলী ও বিষয়বস্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী থেকেই আহরণ করেছি। অতএব, আমি একথা নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারি যে, এ গ্রন্থ রসুলুল্লাহ সম্পর্কে কোনো নতুন বিষয় প্রকাশ করছে না, আর এতে না তার প্রচারিত বাণী বিষয়ে কোনো নতুন বিতর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে, আর না তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর প্রকাশমানতা লেখকের উপর প্রকট হয়েছে।

যদিও এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও আমি এ গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হয়েছি। কেননা, আমার সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, যে আকাঙ্ক্ষা আমি পোষণ করি, সে পর্যন্ত আমি অবশ্যই পৌঁছে যাব।

---

১. প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ-এর নাম-এর স্থলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করা প্রতিটি মুসলমান নরনারীর জন্য একান্তভাবে বিধেয়। গ্রন্থ মধ্যে দরুদ উল্লেখ করা হবে না। তা আলাদাভাবে পাঠ করে নিতে হবে। গ্রন্থ রচনার গতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এমনটি করা হয়েছে। —অনুবাদক

আজকের যুগের মুসলমানরা রসুলের পবিত্র জীবনী বিষয়ে কিছু ছোট-মোটা কথা জানে মাত্র যা থেকে হৃদয়ে না কোনো গতির সঞ্চার হয় আর না তার মনে কোনো প্রেরণা জন্মায় ; বরং এক মৌরুসি (বংশানুক্রমিক) অনুকরণ তথা অতি ন্যূনতম একটা তথ্য তারা জ্ঞাত হয়, যা তাদের আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবিদের সম্মান দানে উৎসাহিত করে। তাও আবার এ সম্মান মৌখিক কর্মের উপর পড়ের অন্তরে যার কোনো প্রভাব পড়ে না।

'সিরাত' (রসুলের পবিত্র জীবনী) বিষয়ে উপরোক্ত জানাকারি অজ্ঞানতার সমান। এ জন্য এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কী হতে পারে যে, সবচেয়ে বড় বাস্তবতাকে উপন্যাস বা মন্ত্র বানিয়ে দেয়া হচ্ছে আর শক্তি ও সামর্থ্য তথা জীবন ও গতিতে পরিপূর্ণ 'বার্তা'কে মুর্দার কাফনে মুড়ে দেয়া হচ্ছে। রসুলুল্লাহর পবিত্র জীবনী মুসলমানদের কাছে কোনো নিকৃষ্ট ব্যক্তির জন্য না কোনো মনোরঞ্জনের সাধন হতে পারে আর না কোনো নিন্দুক শত্রুর জন্য সমালোচনা নিন্দা ও অপমানের বিষয়বস্তু হতে পারে। এ 'জীবনী' তো জীবনের উত্তম আদর্শের স্রোত ও কেন্দ্রবিন্দু, যা তার পায়রাবি করার কথা। এ জীবনী সেই 'মহান শরিয়ত'-এর স্রোত, যাকে সে অবলম্বন করে। অতএব, এই 'সিরাত'-এর খাতিরে সাধারণ হতেও সাধারণতর কোনো ভ্রম ও ঘটনার উল্লেখে ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্রতর ত্রুটি এবং অসাবধানতা থেকে স্বতই ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে।

আমি পাঠকের সামনে রসুলুল্লাহর জীবনের সাচ্চা ও সঠিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং ঘটনা বৃত্তান্তের মধ্য থেকে তত্ত্বদর্শিতা, নসিহত ও উপদেশ বিবৃত করেছি, যা সততই পাঠকের হৃদয়-মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

আমি প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের পুস্তকাবলি হতে পূর্ণরূপে লাভান্বিত হওয়ার চেষ্টা করেছি। আধুনিক লেখকরা 'তালিল' (প্রামাণ্য দলিল পেশ করা), 'তজজিয়' (বিশ্লেষণ), ও 'মুআজনা' (তুলনা) পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এবং 'সিরাত'-এর বিভিন্ন ঘটনাবলিকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন যে শৈলী প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু প্রাচীন লেখকরা বৃত্তান্ত ও ঘটনাবলি সংগ্রহ করা, মূল রচনা বা তথ্যাবলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং ছোট-বড় সমস্ত ঘটনাকে একত্রিত করার পিছনে অধিক শ্রম ব্যয় করেছেন। এই সংরক্ষিত বিধি থেকে অনেক মূল্যবান রত্ন লাভ করা যেতে পারে, যদি বিচার-পদ্ধতি সঠিক হয় এবং তা যথাস্থানে প্রয়োগ করা যায়।

আমি উপরোক্ত দুটি পদ্ধতিই সম্পূর্ণ নতুনভাবে উপস্থাপন করেছি। এ দুই পদ্ধতির কল্যাণকর ও হিতজনক বস্তুগুলো প্রকাশ করে 'সিরাত'-এর সমস্ত ঘটনাকে একে অন্যের সাথে সম্বদ্ধ করে দিয়েছি, যাতে বিভিন্ন তত্ত্ব একই সূত্রে গেঁথে সুব্যবস্থিতি করা হয়েছে। তারপর আমি সুস্পষ্ট আদেশ (নসুস), রেওয়ায়েত ও বৃত্তান্তগুলোকে এমনভাবে বিভাজন করেছি, যা বিষয়ের সাথে সমরূপ হতে পারে এবং একটি উত্তম এবং পূর্ণ বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে।

এ সমস্ত প্রচেষ্টার পিছনে আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, রসুলের 'সিরাত' মানব জীবনে এক ঈমানি শক্তি জাগিয়ে দিক, তাঁর নৈতিকতাকে পবিত্র করে দিক, 'হক' ও

'বাতিল' (সত্য অসত্য)-এর বোধকে শক্তিশালী করে তুলুক। জনসাধারণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে 'সত্য'কে স্বীকার করে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করুক এবং তাকে জীবনের চলার পথের পাথেয় করে নিক।

রসুলের সিরাত রচনার সময়ে আমার পদ্ধতি ইতিহাসকারদের ন্যায় ছিল না, যাঁরা ঐ ব্যক্তি এবং নায়কের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না ; আমি বরং মূল নায়কের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখার পূর্ণ প্রয়াস চালিয়েছি এবং এভাবে লিখেছি যেমন কোনো সৈনিক তার প্রধান সেনাধ্যক্ষের বিষয়ে এবং কোনো অনুসারী তাঁর নায়কের বিষয়ে তথা কোনো শিষ্য তার গুরুর বিষয়ে লেখেন।

গ্রন্থ রচনার সময়ে মুসলমানদের চিন্তনাত্মক, মানবিক তথা বুদ্ধিহীনতা এবং চিন্তাশক্তি হ্রাসের উদ্বেগজনক দৃশ্যও আমার সামনে বিরাজ করছিল। অতএব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, সিরাত লেখার সময় আমি এমন শৈলী গ্রহণ করেছি, যা কোনো না কোনোভাবে আমাদের উদ্বেগজনক অবস্থা এবং দশার প্রতি ইঙ্গিত করে। যখনই কোনো ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে তখনই তার প্রতিটি স্তবকে সাচ্চা ভাবুকতা, সঠিক চিন্তন, উচিত কর্ম এবং ব্যবহার বিদ্যমান থেকেছে যাতে এই হীনতা, অবনমনতা ও অসহায়ত্বের অবসান হতে পারে।

রসুলুল্লাহর পবিত্র জীবনী কোনো উপন্যাস নয়, যা তাঁর জন্মদিনে পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া যেতে পারে, যেমনটি বর্তমান যুগের লোকেরা করে চলেছেন, এর উদ্দেশ্য না এটা যে, সুন্দর শব্দচয়ন ও স্বরচিত প্রশস্তির ছাঁচে ঢেলে তার পুনরাবৃত্তি করা চলে, আর না শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এরকম কিছু ধরাবাঁধা গতের ন্যায় এরকম করা উচিত যে, কিছু প্রশংসনীয় কবিতা ও 'নাত'[১] যা দিনরাত পাঠ করা যায়। এমনটি কখনোই নয়। একজন মুসলমানের সাথে তার রসুলের সম্পর্ক এর চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠ এবং এ সমস্ত স্বরচিত ও মিথ্যা বন্ধনের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় এবং মজবুত।

নিজেদের নবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিমুগ্ধতা প্রদর্শনের এই মনগড়া তরিকা মুসলমানরা সেই সময় থেকে গ্রহণ করে, যখন থেকে তারা বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এবং অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে ফেঁসে গিয়েছিল, রুহ ছেড়ে তার বাহ্যিক রূপ নিয়ে মরতে বসেছিল। কেননা, ইসলামে বাহ্যিক রূপের স্থান খুবই সীমিত। অতএব, তারা নতুন নতুন ফিতনা সৃষ্টিতে মশগুল হয়ে পড়ল। এর পরিণামে তারা পরিশ্রম ও কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে গেল। অথচ সেখানে প্রয়োজন ছিল বাস্তবতাকে মূল কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করা এবং অনাবশ্যক কূটকাচারী থেকে দূরে থাকা এবং দ্বীনের 'রুহ' এবং সারবস্তুকে গ্রহণ করা। রসুলুল্লাহর পবিত্র জীবনীকে উত্তম স্বর ও মধুরতর ধ্বনিতে শোনার প্রবণতা ত্যাগ করে নিজের মন ও আত্মাকে পবিত্র করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাতাবরণকে অনুকূল করে দেয়া, যাতে তারা দুনিয়াও আখিরাতে, যুদ্ধ ও সন্ধিতে, জ্ঞানে ও কর্মে ব্যবহারিক জীবনে ও ইবাদতে হজরত মুহাম্মদের পথ ও পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।

---

১. প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় লেখা প্রশস্তিমূলক কবিতাকে 'নাত' বলা হয়।– অনুবাদক

যে মুসলমানের মন ও অন্তরাত্মায় রসুলের প্রতি প্রেম নেই এবং কর্ম ও চিন্তার জগতে এ প্রেম তাকে ব্যস্ত, সচেষ্ট ও প্রযত্নশীল না করে, তা সে দিন রাত হাজার হাজার দরুদ-সালাম নিবেদন করুক না কেন, তাতে কোনো লাভই হবে না। খেলাধুলা বা খেলকুদের জন্য একটি সময় নিশ্চিত করে নেয়াটা ক্ষতিকর কিছু নয়। তবে পরিশ্রম ও কর্মের জন্যেও একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিতে কোনো ত্রুটি করলে চলবে না।

যদি কোনো ব্যক্তি গীত-সংগীত থেকে আনন্দ পেতে চায় তাহলে এ অধিকার তার আছে। কিন্তু সে যদি মনে করে ইসলামকে রাগ এবং সংগীতের সাথে তাল-লয়ে মিলিয়ে 'কুরআন'কে মধুর তাল-লয়ে পরিণত করবে এবং 'সিরাত'-কে কাহিনী ও উপন্যাসের রঙে পরিবেশন করবে, তাহলে সে অনুমতি তাকে কখনোই দেয়া যেতে পারে না। এটা একমাত্র সেই মেনে নিতে পারে, যে একাধারে অজ্ঞানি, মূর্খ এবং জাহিল। এ যুগে ইসলাম বিষয়ে এরকমই একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং দ্বীন (ধর্ম) কর্ম ও ব্যবহার থেকে বেরিয়ে খেল-তামাশার পর্যায়ে চলে গেছে। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর আদেশ কী তাৎপর্যপূর্ণ–

'ঐ সমস্ত লোকদের পরিত্যাগ করো, যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে, আর যারা তাদের সাংসারিক জীবন ধোঁকায় পতিত করেছে। আর এর (কুরআন) দ্বারা তাদের সচেতন করতে থাক।– আনআম : ৭০

আজ কুরআন 'তিলাওয়াত'কে অযথা মধুর স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যা ঐ সমস্ত সংগীত-প্রেমী লোকেরা শুনে থাকে এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তা এই বিশ্বাসের সাথে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, মৃত আত্মায় তা যেন উত্তাপ সৃষ্টি করতে না পারে। হজরত মুহাম্মদ-এর সিরাত কাহিনীও মনমনোহর কিসসায় পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে, দরুদ, সালাম ও প্রশস্তিমূলক কবিতার অতিরিক্ত এতে আর কিছুই নেই। আমার বিচারে এ সমস্ত 'নাত' (হজরত মুহাম্মদের উদ্দেশে নিবেদিত প্রশস্তিমূলক কবিতা) শোনা ও শোনানো সমাজ-মানসে বিকার ও অবজ্ঞা সৃষ্টির একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

এ সমস্ত কপটচারী ও বাহানাবাজদের উচিত রাগ-রং ও গান-বাজনাকে অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করা। আর 'যখন' তাদের হুঁশ ফিরে আসবে এবং শ্রম ও কর্মের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করার আকাঙ্ক্ষা জাগবে তখন তারা সুকর্মের আদেশদানকারী ও কুকর্ম রোধকারী 'কুরআন'-এর দিকে আগমন করবে এবং তার ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণের জন্য তারা রসুলের 'সুন্নত' (তরিকা)-এর সহায়তা নেবে, যাতে হেদায়েতের পথ গতিশীল ও তত্ত্বদর্শিতার সাথে পরিচিত হতে পারে এবং উচ্চতর নৈতিকতা, দৃঢ় সিদ্ধান্ত এবং রাজনীতির সাথে একীভূত হতে পারে।

'এটাই ইসলাম ?'

আমি এই পঙক্তিগুলো পবিত্র নগর 'মদিনা মুনাওয়ারা'য় বসে লিখতে শুরু করি, যেখানে আল্লাহর অনুকম্পা (রহমত) ও প্রাচুর্যের (বরকত) বর্ষণ হয়। অতএব, আমি পবিত্র সিরাত ও সুন্নতের পূর্ণ ও গভীর অধ্যয়নের অবসর লাভ করি।

প্রশংসা, প্রশস্তি ও কৃতজ্ঞতাসূচক সমস্ত বাক্য এক আল্লাহর জন্যই শোভনীয়, আর তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে রসুল-প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। যেহেতু তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্মকে আমি স্পষ্টতই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করি। অতএব, এই বাস্তবিকতার প্রতি ইঙ্গিত করাটা আবশ্যিক বলে মনে করি যে, মুসলমান ও তাঁদের রসুলের জীবন ও ব্যবহারের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, তা সে তাঁর প্রতি যতই ভালোবাসা প্রদর্শন করুক বা যত দরুদ-সালাম প্রেরণ করুক না কেন। আমি স্বয়ং দেখেছি যে, মুসলমানরা কতটা শ্রদ্ধাবনতবস্থায় রসুলের 'রওজা' (সমাধি) দর্শন করে। কিন্তু তাঁরা নিজ মাতৃভূমি বা বাড়ি-ঘরে থেকে দুনিয়াবি জীবন ও আয় উপার্জন ও নানা ধান্ধায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রসুলুল্লাহর প্রতি প্রেম অনিবার্য। কোনো মুসলমানই এর বিরোধিতা করতে পারেন না। কিন্তু যার হৃদয়ই পাপী ও কঠিন হয়ে গেছে আর নিফাক তথা পথভ্রষ্টতায় পূর্ণ হয়ে গেছে, তার কথা বাদ দিন।

আমার নিবেদন এই যে, এই শ্রদ্ধা ও বিমুগ্ধতা রসুলের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের হোক এবং এতে স্পষ্টীকরণ ও শিষ্টতার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হোক।

আজ মদিনায় দেশ-দেশান্তরের লোকেরা এসে আশ্রয় নিচ্ছেন, যাতে তাঁরা কর্ম ও শ্রমপ্রচেষ্টা থেকে বাঁচতে পারেন। এরা একে 'হিজরত' বলেও অভিহিত করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটাই আল্লাহর রসুল ও ইসলাম-প্রেমিকের প্রতি কি ইসলামের দাবি ? পাশ্চাত্যের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় এসে আমার সাথে মিলিত হন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, 'দ্বীন'কে ফিতনার কবল থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁরা মদিনার 'হিজরত' করেছেন। কিন্তু আমি তাদের বুঝিয়েছিলাম যে, আপনারা সংঘর্ষস্থল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেননা, আপনাদের ভাইয়েরাই ফরাসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের একলা ছেড়ে এখানে এসে আপনারা অপরাধ করেছেন।

রসুলুল্লাহর প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এই ঢং আমার বোধগম্য হয়নি আর তাঁদের মদিনায় হিজরতের দাবিও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। আল্লাহর নবীর সাথে তাঁর বান্দাদের সম্পর্ক উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক দৃঢ় ও মজবুত হওয়া উচিত।

ইসলামের শত্রুরা ইসলামের ইমারতকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে আর ইসলামের অনুসারীরা গাফিলতির ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এই উদ্বেগজনক অবস্থাকে কীভাবে সহ্য করা সম্ভব যে, শত্রুরা রসুলুল্লাহর মর্যাদাই ধ্বংস করে দিচ্ছে। একি নীরবে মুখ বুজে সহ্য করা যেতে পারে ? এটা কি রসুলের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধার সূচক হতে পারে ? কত না ভালো হতো যদি মুসলমানরা তাঁদের মহান রসুলের 'সিরাত' বুঝতেন ?

রসুলুল্লাহর 'সিরাত' তখনই বোধগম্য হতে পারে, যখন তাঁর প্রচারিত বাণী ও শিক্ষাকে অনুধাবন করা যাবে, আর যে মহান গ্রন্থ (কুরআন) তিনি নিয়ে এসেছেন তাকে নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় বলে মনে করা হবে।

সেই প্রেম কতই না সস্তা, যা কেবল মুখের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে !

আমি এ কথা অনুভব করি যে, আমি 'সিরাত' বিষয়ের হক আদায় করতে সমর্থ হইনি। কেননা, রসুলুল্লাহর বিষয়টি বড়ই মহান এবং তাঁর 'সিরাত'কে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য অন্য এক ভাষার প্রয়োজন হয়।

আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমি যথাযথভাবে এ প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

অবশেষে, তাঁর প্রতি প্রেরণ করি দরুদ ও সালাম।

'হে আল্লাহ ! শান্তি বর্ষণ করো মুহাম্মদের উপর ও মুহাম্মদের পরিবারের উপর, যেমন শান্তি তুমি বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের পরিবারের উপর। অবশ্যই তুমি স্তুতিযোগ্য ও মহান। এবং প্রাচুর্য বর্ষণ করো মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের উপর, যেমন প্রাচুর্য তুমি বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের বংশের উপর। অবশ্যই তুমি স্তুতিযোগ্য ও মহান।

– মুহাম্মদ গাযালী

এ গ্রন্থের কিছু হাদিস প্রসঙ্গে

বড়ই আনন্দের কথা যে, এই সংস্করণে সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস (হাদিসবেত্তা) আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর 'তখরিজ-আহাদিস'[১]ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আলবানী সাহেব এ গ্রন্থে বর্ণিত সমস্ত হাদিস, রসুলুল্লাহর বৃত্তান্ত ও ঘটনাবলি শুদ্ধতার নিরিখে যাচাই, সমীক্ষা ও সমালোচনা করার সফল প্রয়াস চালিয়েছেন।

আশা যে, এভাবে ইলমি হকিকত প্রকট করতে ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে ক্রমানুসারে সাজাতে সাহায্য পাওয়া যাবে। রসুলুল্লাহর 'সিরাত' অথবা অন্য মানব ঘটনাবলির ইতিহাসের সংকলনকর্তা শুদ্ধতা, প্রমাণ, তর্ক-বিতর্ক, সমালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কঠিন পথ খুবই কম মাড়িয়েছেন। আমি যখন রসুলুল্লাহর পবিত্র 'সিরাত' (জীবনী) সংকলিত করার কাজ শুরু করি তখন আমার প্রয়াস থাকে, আমি উপযুক্ত এবং সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করব এবং বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য বই-পুস্তক হতে সহায়তা নেব।

আমার বিচারে এ ক্ষেত্রে আমি সফল হয়েছি। কেননা, আমি কেবল ঐসব ঘটনা ও বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছি, যে বিষয়ে উচ্চস্তরের পণ্ডিতেরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি এখানে তা স্পষ্ট করে বলে দেয়া আবশ্যক–

হাদিসবেত্তাদের মধ্যে কোনো 'হাদিস' শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। আল্লামা সাহেব তথ্য-প্রমাণ ও অনুসন্ধান সাপেক্ষে কোনো হাদিসকে যদি অশুদ্ধ বলে অভিহিত করেন তাহলে এ ক্ষেত্রে যেহেতু দক্ষতার কারণে তাঁর এ বিষয়ে অধিকার রয়েছে, অথবা হতে পারে যে, ঐ হাদিস সমস্ত হাদিসবেত্তার কাছে অশুদ্ধ প্রতীত হয়, পরন্তু তা যদি মূল বিষয়ে কুরআনের কোনো 'আয়াত' বা কোনো শুদ্ধ হাদিসের অনুকূল হয় তাহলে আমি সেক্ষেত্রে ঐ হাদিসের 'রেওয়ায়েত'কে স্বীকার করে নিয়েছি এবং নির্ভয়ে তার উল্লেখ করে দিয়েছি। কেননা, ঐ হাদিস কোনো নতুন আদেশ শোনায়নি ; বরং আগে থেকেই নির্ধারিত সিদ্ধান্তগুলোকে পূর্ণতা ও সেই সাথে ব্যাখ্যা দিয়েছে। উদাহরণত আলবানী সাহেব নিম্নলিখিত হাদিসকে অশুদ্ধ বলে মনে করেন–

'আল্লাহর প্রতি মুহব্বত রাখো, কেননা তিনি তোমাদের কৃপা ও সুখসামগ্রী দান করেন এবং আল্লাহর প্রতি মুহব্বত রাখার কারণে আমার প্রতি মুহব্বত রাখো।' উস্তাদ আলবানী এই হাদিসকে অশুদ্ধ বলে গণ্য করেন। অথচ ইমাম তিরমিজি ও হাকিম একে শুদ্ধ বলে মান্য করেন।

এ হলো উস্তাদের নিজের মত।

---

১. হাদিসের সেই জ্ঞান যার দ্বারা জানা যায় হাদিসের উৎস কী ?– অনুবাদক

আমাদের বিচারে আল্লাহ ও তাঁর প্রতি মুহব্বত রাখার বিষয়ে এই হাদিস নিয়ে বিতর্ক তোলাটা ভুল নয়। অতএব আমি এ হাদিস বর্ণনা করেছি এবং আমি এতে সন্তুষ্ট। পরন্তু এই হাদিস নিয়ে বিতর্ক উত্থাপন করার সময় এবং আমি এর অর্থোদ্ধার করার সময় 'বুখারী ও মুসলিম'-এর ঐ রেওয়ায়েত উপেক্ষা করেছি, যা অনুযায়ী 'বনি মুস্তালিক'[২]-এর সাথে যুদ্ধ হয়েছিল।

বুখারী মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুসারে রসুলুল্লাহ বনি মুস্তালিক-এর উপর আক্রমণ করেন। যখন তারা গাফিলতির মধ্যে পড়েছিল, তাদের সামনে না ইসলামের বার্তা পেশ করা হয়েছিল, আর না তাদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরোধিতা করা হয়েছিল, আর শত্রুতা ও মিত্রতার কোনো অনুমান করা গিয়েছিল।

এই পদ্ধতিতে বাধানো যে কোনো যুদ্ধই ইসলামের নীতিবিরোধী আর রসুলুল্লাহর সমগ্র জীবনকালে এ ধরনের কোনো যুদ্ধের নামনিশানাও পাওয়া যায় না। অতএব, এই পদ্ধতিতে বাধানো যুদ্ধকে আমি স্বীকার করিনি।

আমি ঐ হাদিসের সহায়তা নিয়েছি, যা ইবনে জরির রেওয়ায়েত করেছেন। এ হাদিস অশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের সিদ্ধান্তের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে যে, কেবল অত্যাচারী ও জালিমদের উপর আক্রমণ চালানো জায়েজ। কিন্তু যারা সম্পূর্ণ গাফিল এবং বাস্তব অবস্থা থেকে পুরোপুরি অনভিজ্ঞ, তাদের উপর কোনো রকমের আক্রমণ চালানো উচিত নয়।

বনি মুস্তালিকের সাথে সম্পর্কিত হাদিস যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। এভাবে বনি মুস্তালিক ও মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেক পক্ষ একে অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুসলমানরা অকস্মাৎ আক্রমণ করে থাকবে এজন্য যে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতের সেই ভূমিকা অনিবার্য ইবনে জরির যার উল্লেখ করেছেন যদিও উস্তাদ সাহেব একে অশুদ্ধ বলে মনে করেন। আমি 'তাখরিজ আহাদিস'-এর ক্ষেত্রে কোনো নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করিনি ; বরং অধিকাংশ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রেওয়ায়েতের তুলনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি এবং তাঁদের ফায়সালা হলো যে, সাধারণ সিদ্ধান্ত ও নিশ্চিত নিয়মের অনুকূল তথা একরূপ হলেই তবে অশুদ্ধ হাদিসের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

এই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এবং নিয়ম কুরআন ও সুন্নত থেকে নেয়া হয়েছে।

এই বিধিবদ্ধ দৃষ্টিকোণে 'বদর' যুদ্ধের অবসরে রসুলুল্লাহর তাঁর সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও হাদিসশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা এর সনদ (প্রমাণ) দুর্বল (অশুদ্ধ) বলে অভিহিত করেছেন। এই অশুদ্ধতা সত্ত্বেও আমি এই ঘটনার বর্ণনা এ জন্য করেছি যে, তার মধ্যে ঐ সমস্ত নৈতিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শামিল রয়েছে, যা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ তাঁর রসুলকে আদেশ দিয়েছিলেন। অতএব, ঐ বর্ণনা দিতে আমি কোনো অসুবিধাবোধ করিনি।

---

২. আরবের এক প্রসিদ্ধ গোত্র।– অনুবাদক

উপরোক্ত বিষয়টি ছিল অশুদ্ধ (জইফ) হাদিস সম্পর্কিত। এখন আমরা শুদ্ধ হাদিস বিষয়ে আলোচনা করব।

যে হাদিস 'সহিহ' (শুদ্ধ তথা প্রমাণিত) বলে প্রচারিত তা স্বীকার কিংবা অস্বীকার করার পূর্ণ অধিকার যে রয়েছে তা সমস্ত হাদিসবেত্তাই স্বীকার করেন। এমন কোনো 'ফকিহ' বা 'ইমাম' নেই, যিনি অতি শুদ্ধ হাদিসকে স্বীকার করে অশুদ্ধ হাদিসকে অস্বীকার না করেছেন। আমরা যে কোনো 'ফিতনা' থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। কেননা, কুরআনের পরে হাদিস হলো ইসলামের প্রধান স্রোত বা উৎস।

পরন্তু হাদিস অধ্যয়ন থেকে অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত হাদিস কুরআনের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, যুদ্ধ ঐ সময়ে জায়েজ, যখন ইসলামের দাওয়াত (ইসলামের শুভবার্তা) তথা পরলোক বিষয়ে শুভ সূচনা ও ভয়ের খবরটি পুরোপুরি পৌছে দেয়া হয়ে যায়। কোনো প্রকারের আশঙ্কা ও সন্দেহের অবকাশ সেখানে আর না থাকে। যদি এ বিষয়ে বিপরীত কোনো কথা আসে তাহলে তা স্বীকার করা যেতে পারে। আল্লাহতাআলা পবিত্র কুরআনে তাঁর নবীকে আদেশ দেন :

'(হে নবী !) বল, আমার কাছে অহি (ফিরিশতার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ) আসে যে, তোমাদের 'ইলাহ' (উপাস্য) একমাত্র আল্লাহ। তাহলে তোমরা কি মুসলিম হবে ?

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলে দাও আমি তোমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি, আর আমি এ কথা জানি না যে, যার ভয় তোমাদের দেখানো হয়েছে তা দূরে না নিকটে ? –আম্বিয়া ১০৮, ১০৯

এই প্রকাশ্য ঘোষণার পর যেখানে আহ্বায়ক ও আমন্ত্রিত দুজনের প্রতিই সম্বোধন রয়েছে, সেখানে এই রেওয়ায়েত স্বীকার করা যেতে বাধ্য করতে পারে না। কেননা, 'রসুলুল্লাহ,' ও 'খুলাফায়ে রাশেদিন' সমস্ত যুদ্ধে এই পদ্ধতি অবলম্বন করছিলেন যে, প্রথমে স্পষ্ট ভাষায় দাওয়াত পেশ করা হোক এবং লোকদের তা গ্রহণ করার বা প্রত্যাখ্যান করার পুরো সুযোগ দেয়া হোক। এ হাদিস আবদুল্লাহ বিন আউফ থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধের আগে দাওয়াত দেয়ার বিষয়ে হজরত নাফে রাজিয়াল্লাহু আনহুকে লিখিতভাবে প্রশ্ন করি, তখন তিনি আমাদের উত্তর দেন যে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এমনটি হয়েছিল। রসুলুল্লাহ 'বনি মুস্তালিকদের' উপর তাদের অজান্তে আক্রমণ চালিয়েছিলেন, তাদের মধ্যেকার যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়, তাদের নারী-শিশুদের বন্দি করা হয়, এবং ঐদিন 'জাবেরিয়া (রাজিয়াল্লাহু আনহা)-কে লাভ করেন।

তিনি বলেন, এ তথ্য আমাকে আবদুল্লাহ বিন উমর (রাজিয়াল্লাহু আনহু) জানিয়েছিলেন, যিনি ঐ সেনাদলে শরিক ছিলেন।

আমি এ ধরনের হাদিসকে উপেক্ষা করেছি। এরকম ঐ হাদিসকেও স্বীকার করিনি যা আল্লাহর রসুল তাঁর সাথিদের কিয়ামত পর্যন্ত ঘটতে থাকা ফিতনা ও তার জন্য দায়ী লোকদের বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

কুরআন ও হাদিস থেকে এ কথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে, আল্লাহর রসুল বিস্তারিতভাবে পরোক্ষ জবাবের সাথে পরিচিত ছিলেন না।

আমি সিরাত লেখার সময় এই পদ্ধতি (তরিকা) অবলম্বন করেছি। অতএব, আমি এ হাদিসকে স্বীকার করেছি, যার মূল প্রতিলিপি সঠিক নিয়ম ও আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা সে 'সনদ' যতই দুর্বল বা অশুদ্ধ হোক না কেন। অন্যদিকে আমি আরো অনেক সহিহ হাদিস অস্বীকার করেছি। কেননা, সে সমস্ত হাদিস আল্লাহর দ্বীন তথা 'দাওয়াত'-এর সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এখানে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমি ঐ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পেশ করব যে বিষয়ে উস্তাদ আলবানী ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। পরন্তু তাঁর গবেষণাকর্মকে সংবিধিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য আমি উদার মত প্রকাশ করছি। কেননা, আমি আলবানী সাহেবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি এবং তাঁর আমি গুণগ্রাহী। তিনি 'দ্বীন' সম্পর্কিত বিষয়ে গভীর দৃষ্টি রাখেন।

আমি মনে করি, এ পুস্তকে আমি যত হাদিস উল্লেখ করেছি, সে বিষয়ে বিশিষ্ট হাদিসবেত্তার কাছ থেকে সে সবের শুদ্ধাশুদ্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত গ্রহণের অধিকার পাঠকের রয়েছে। রসুলুল্লাহর উত্তরাধিকার রক্ষার ; বরং ঐ উস্তাদের পরিশ্রম ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি আল্লাহর শোকর আদায় করছি। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

আমি এ গ্রন্থে যত হাদিস সন্নিবেশ করেছি, আমার মতে, এ গ্রন্থের পাঠকদের এ অধিকার রয়েছে যে এ বিষয়ে তারা কোনো কট্টর হাদিসবেত্তার মত অবশ্যই যাচাই করুন, তা তাঁরা আমার সাথে সহমত পোষণ করুন বা না করুন।

রসুলুল্লাহর শিক্ষাকে সংরক্ষণের জন্য ; বরং উক্ত মহান হাদিসবেত্তার পরিশ্রম ও মতামতের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার তৌফিক (সামর্থ্য) দান করুন। – আমিন !!

প্রাচীন সভ্যতায় মূর্তিপূজার কলঙ্ক

'মানব সভ্যতার ইতিহাস বড়ই লজ্জাজনক !'

আদম আলাইহিস সালামের পৃথিবীতে আগমনের পর তাঁর সন্তানের মধ্যে অনেক বড় বড় সভ্যতার জন্ম নিয়েছে। এক প্রজন্ম শেষ হয় তো অন্য প্রজন্ম এসে সে স্থান গ্রহণ করে। সেই সময় থেকেই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ও বিচারধারা পরিলক্ষিত হয়। যদি তারা ন্যায় ও সত্যের পথ প্রাপ্ত হয়, পরে তারা সে পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপকর্মের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। যখনই তারা 'হক' (সত্য) পথের দিশা পায়, পরে তারা সে পথ ভুলে গিয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খায়। এ সংঘর্ষ এভাবেই চলতে থাকে।

যদি আমরা ঈমান বা 'পরলোক'-এর ধারণার আলোকে মানবেতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, পুরো বিশ্বজগৎ সেই মদ্যপের মতোই অবস্থান করছে যে সচেতন অবস্থায় থাকে আবার পীড়িতাবস্থাতেও সে নিশ্চয় কষ্ট অনুভব করতে পারে না। কিন্তু জীবনানুভূতির মধ্যে এমনই একটি 'অন্তরাত্মা'র অস্তিত্ব রয়েছে সে

সততই মানুষকে মন্দ হতে বিমুখ করে এবং মঙ্গলের প্রতি আকর্ষণ করে। কিন্তু যখন তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যায় তখন তার আর অন্যদিকে খেয়াল থাকে না।

রসুলুল্লাহর (সা) সময়কাল পর্যন্ত দুনিয়ায় এক সুদীর্ঘ কাল (সময়) অতিক্রান্ত হয়ে যায়। যাতে তারা অনেক কলাকৌশল ও জ্ঞানবিজ্ঞান থেকে সুফল লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল, নিত্যনতুন অনুভব, শিষ্টতা ও যৌক্তিকতার আলোকে নিজের জীবনকে আলোকিত করেও তুলেছিল এবং দর্শন, চিন্তাধারায় জগতে বিপ্লব আনয়ন করেছিল।

তা সত্ত্বেও বিশ্ব জগতে অশান্তি-হানাহানি-মারামারি-কাটাকাটি চলতেই থাকে। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়।

মিশর, গ্রিস, ভারত, চীন, রোম ও পারস্যের সভ্যতাবলির কী পরিণাম হয়েছিল ? এ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত কোনো প্রশ্ন নয় ; বরং বুদ্ধি ও চিন্তাধারা থেকেই এই প্রশ্ন তুলছি।

মূর্তিপুজো ছিল এসব সভ্যতার প্রাণ এবং এটাই তাদের পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছিল। মানুষ, আল্লাহ যাকে প্রাণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তথা নিজের 'খলিফা' (প্রতিনিধি) করে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই মানুষই তার চেয়ে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বস্তুরাজির দাস এবং গোলাম হয়ে গেল। এই হীনতা এমন একটা পর্যায়ে পৌছে গেল যে, তারা শিলা ও পাথরকেও পুজো করতে লাগল। গাছ, পাথর এমনকি জীবজন্তুকেও পর্যন্ত তারা তাদের উপাস্য বানিয়ে নিল এবং সমস্ত জাতি তাদের অনুগত হয়ে গেল।

যেহেতু মূর্তিপুজো মানুষের ভেতর হতে উৎপন্ন হলো, বাইরে থেকে নয়। যে রকম শোকার্ত মানুষের কাছে সমস্ত বাতাবরণটাই দুঃখ-সন্তাপে পূর্ণ বলে মনে হয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি ছায়া দেখেও ভয় পায়, সেরকমই নিজে নিজের চোখে হীন প্রতিপন্ন ব্যক্তি নিজের বাতাবরণে প্রবাহিত ও ভয়ে ভীত হয়ে গাছ, পাথর এবং জীবজন্তুদের প্রভু বা উপাস্য বানিয়ে নেয়।

যখনই অন্তরের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায় নির্বাপিত চিন্তাধারা আলোকমান হয়ে জেগে ওঠে এবং মানুষ তার নিজের মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে, তখনই মূর্তিপুজোর এ ছাই-ভস্মের সত্তা হাওয়ায় খড় কুটোর ন্যায় ভেসে যায়।

এ জন্য দ্বীন, কর্ম তথা ক্রিয়া মানুষের অভ্যন্তর হতে শুরু হয়। যদি পবিত্র গরুদের বধ করে ফেলা হয়, মনগড়া তথা কাটছাঁট করে তৈরি করা মূর্তিরাজিকে ভেঙে ফেলা হয় এবং মানব মনকে পুরাতন অন্ধকারের মধ্যে থাকতে দেয়া হয় তাহলে মূর্তিপুজোর বিরোধিতায় এ সংঘর্ষ থেকে কী লাভ হবে ? লোক অন্য প্রকারের নানাবিধ উপাস্য (মাবুদ) খুঁজে নেবে। আজ পৃথিবীতে মূর্তিপূজকদের সংখ্যা কত না অধিক এবং লোক কত দ্রুত আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে নতুন নতুন ভ্রম ও শঙ্কাকে স্বীকার করার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

'বাতিল' (অসত্য) কখনো জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি তা মিথ্যা বলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে যায় এবং তার ব্যর্থতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই কারণে সে 'হক' (সত্য) এর সত্য বস্ত্র পরিধান করে সামনে আসে ; বরং তার কিছু ভূমিকা ও

পরিণামকেও স্বীকার করে নেয় এবং প্রতারিত ও বিভ্রান্ত মানুষকে সহজেই তার জালে আবদ্ধ করে ফেলে।

মূর্তিপুজো এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে। এ সত্য দ্বীন (সত্যধর্ম)-এর উপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং তার বাস্তবিকতাকে বদলে দিয়েছে কিন্তু এ আক্রমণ মৌমাছিদের আক্রমণের মতো ছিল না যারা বসন্ত ঋতুর ফুলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মধু চুষে নেয়; বরং এ আক্রমণ ছিল পঙ্গপালের আক্রমণের মতো, যা সবুজ সুন্দর পত্ররাজির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ভুসি বানিয়ে ছাড়ে। এ কীট পতঙ্গ যখন আক্রমণ করে তখন কোনো সবুজ পাতার অস্তিত্ব আর রাখে না। যদি কোনো পাতায় সবুজ সজীবতা অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা কেটে গিয়ে বিষে পরিণত হয়ে যায়।

মূর্তিপূজকরা আল্লাহ-বিরোধী হওয়ার সাথে সাথে আবার ঈশ্বরত্বের দাবি করার পিছনে এই রহস্যই নিহিত রয়েছে। তারা 'বুত' (মূর্তিরাজি)-এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য দাবি এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভে সাফল্য পায়। এ ধরনের অসত্যের (বাতিল) সঙ্গে সত্যের অংশ মিলিয়ে দেয়া হয়, যাতে লোকদের আল্লাহ থেকে দূরে রাখা যেতে পারে এবং তার বিরোধী করেও তোলা যেতে পারে।

মূর্তিপুজোর অতিরিক্ত ধর্মের উপর সবচেয়ে বড় যে মুসিবতটা নেমে আসে তা হলো হজরত' ঈসা ইবনে মরিয়ম (আলাইহিস সালাম)-এর শরিয়তের বিকৃত রূপ, যাতে দিনকে রাতে এবং রাতকে দিনে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে। 'তৌহিদ' (একেশ্বরবাদ)-কে 'শিরক' (অনেকেশ্বরবাদ)'-এ এবং ঈশ্বরত্বকে 'তসলিস' এবং (Trinity) বা ত্রি-ঈশ্বরবাদ-এ পরিণত করে দেয়া হয়েছে। মানুষের বুদ্ধিভ্রষ্ট হলো, সে তার সমস্ত প্রচেষ্টা, প্রয়াস, ত্যাগ ও কুরবানিকে ঈসা মসিহ'কে শূলে চড়িয়ে মুক্তি দিয়ে দেয়া হলো।

আধুনিক খ্রিস্টত্ব (ঈসাইয়াত)-এ মূর্তিপুজো তো সম্মিলিত ছিলই 'কাফফারা' (কোনো পাপ থেকে মুক্তির জন্য অনুশোচিত হওয়া) তথা 'তসলিস' (ত্রি-ঈশ্বর)-এ বিশ্বাস সোনায় সোহাগা বানিয়ে দিল। এভাবে মূর্তিপুজো দ্বিতীয়বারের মতো সাফল্য লাভ করল, একবার তার স্বরূপে এবং পরে তসলিস-এর পোশাকে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে 'হিদায়ত'-এর দীপ নিভে গিয়েছিল। শয়তান চৈতন্য-নৃত্য করছিল। কেননা, তার বপন করা বীজ ততদিন ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ইরানে 'মজুসিয়াত' (অগ্নিপুজো), ভারত ও চীনসহ সমগ্র আরব দেশ জাহিলিয়াতের পঙ্কে ডুবে গিয়ে 'শিরক'-এর পথ প্রশস্ত করে তুলেছিল।

ঈসায়ীরা (খ্রিস্টানরা) হিঁদু তথা প্রাচীন মিশরের সমস্ত ব্যর্থতা গ্রহণ করেছিল, যা 'মরিয়ম'-কে ঈশ্বরের পত্নী এবং 'ঈসা' (যিশু)-কে তাঁর পুত্র (আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন) প্রতিপন্ন করে তুলেছিল এবং রোম, মিশর ও কনস্টান্টিনোপল 'শিরক'-কে প্রগতিশীল রূপ দান করতে নিজের অনুসারীদের প্রেরণ করছিল। এই 'শিরক'-এর এমনই তেলেসমাতি রূপ ছিল যে, তার মধ্যে আবার 'তৌহিদ' (একত্ববাদ)-কেও শামিল করে নেয়া হয়েছিল।

কিন্তু ঈসাইয়াতের (খ্রিস্টত্বের) দ্বারা একত্রিত এ সমস্ত পরস্পরবিরোধী বস্তুর কি আসলে কোনো গুরুত্ব ছিল ? কুরআন বলেন :

লোকে বলে : আল্লাহ এক সন্তান পয়দা করেছেন– 'কী মহিমান্বিত তিনি ! তিনি তুলনাহীন ! ধরিত্রী ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তোমাদের কাছে এর কোনো প্রমাণ নেই। তুমি কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বল, যা তুমি জানো না।

বলে দাও : যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা সফল হবে না ।

দুনিয়ার সুখ (যা আছে, ভোগ করে নাও) তারপর তাদের ফিরে আসতে হবে। তারপর যারা কুফরি করে, তার প্রতিদানে আমি তাদের যন্ত্রণার মজা দেখিয়ে দেব।'– ইউনুস : ৬৮, ৬৯, ৭০

এ থেকে বোঝা যায় যে, মজুসিয়াত তথা অন্যান্য ধর্মের উপর এই শিরকের গভীর অভাব পড়েছিল, যা সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়কে মুসলমানদের চিরশত্রুতে পরিণত করে দিয়েছিল। কেননা, মুসলমানরা কেবলমাত্র এক আল্লাহর উপাসনায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দাঁড়িয়েছিল এবং আল্লাহ প্রথমেই এই উম্মতকে সচেতন করে দিয়েছিলেন যে, তাদের অনেকেশ্বরবাদী ও ঐশীগ্রন্থধারীদের পক্ষ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং উপদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে তার মোকাবিলা করে। কুরআন বলেন :

'তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ঋণের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা হতে থাকবে ঐ লোকদের পক্ষ থেকে, যাদের তোমাদের পূর্বেই কিতাব দেয়া হয়েছিল, আর ঐ লোকদের পক্ষ থেকে যারা 'শিরক' করেছে, তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের অনেক দুঃখদায়ক কথা শুনতে হবে। আর যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে কাজ করো এবং আল্লাহর প্রতি ভয় রাখো তাহলে নিঃসন্দেহে তা মহৎ কর্মশক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।– আল ইমরান : ১৮৬

'নূরে তৌহিদ' (একত্ববাদের আলো)-এর অনুপস্থিতিতে মন ও মস্তিষ্কের উপর যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল তার অন্যতম কারণ ছিল শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি, বিকার এবং শাসিত গোত্রগুলোর ঐতিহ্যগত অনুসরণ। সে সময়ে সমগ্র পৃথিবী অন্যায়-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দুর্বল এবং অসহায় মানুষ শান্তি, সুরক্ষা, আরাম-আয়েশ ও সন্তুষ্টি থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

যে মূর্তিপুজো বুদ্ধিকে অস্বীকার করেছিল তার ছায়াতলে আর কী আশা করা যেতে পারে, যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দিয়ে তাকে ধূর্ত ও কপটদের খেলনা বানিয়ে দিয়েছিল।

সম্ভবত আল্লাহ ঐ সমাজকে উপেক্ষা করেছেন, যেমনটি হাদিসে আছে–

'আল্লাহ দুনিয়াবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি আরব অনারব সবার দিক থেকে ঘৃণাভরে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, কিছু আহলে কিতাব (গ্রন্থধারী) ব্যতীত।'

এই অল্পসংখ্যক গ্রন্থধারী ছিল তারাই, যারা শিরক থেকে আত্মরক্ষা করেছিল, যদিও শিরক যেমন উঁচু নিচু সকল ক্ষেত্রকেই প্লাবিত করে ফেলেছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের পূর্ব থেকে দুনিয়া অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল এবং দিশেহারা অবস্থায় কোনো নবীর আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনছিল। তখন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দুনিয়াবাসীকে হেদায়েত তথা সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য মুহাম্মদকে প্রেরণ করলেন।

অন্তিম নবুয়তের প্রকৃতি

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত এই অবস্থায় সমস্ত নবুয়তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয় এবং তা সমগ্র পৃথিবীর জন্য এবং তা মহাপ্রলয়কালাবধি প্রলম্বিত।

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি যুগে নবী পাঠাতে পারতেন। প্রশ্ন ওঠে যে, কোনো গ্রাম বা লোকালয় আল্লাহর নবী থেকে শূন্য থাকতে পারে না এবং সমস্ত যুগই ধর্মগুরুর উপর আশ্রিত থাকবে তাহলে আল্লাহ সেখানে কেন সবার পরিবর্তে একজন মাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে চয়ন করলেন ? একথা তো সত্য যে, এই পর্যাপ্ততা ঐ সাহিত্যিক সারাংশের সমার্থক যা অল্পকিছু শব্দের মাধ্যমে অর্থের সাগর পূর্ণ করে তোলে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সকল দেশের, সকল যুগের, সকল কালের নবীদের পূর্ণ প্রতিদান। বরং বলা উচিত, এ পৃথিবীতে যতদিন জীবনের অস্তিত্ব থাকবে এবং মুক্তি পথের পথিকদের দৃষ্টিশক্তি অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত নবী আগমনের এই ধারা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু কেন এমনটি হলো ?

বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করার জন্য আপনার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী বা হিতৈষী ব্যক্তি আপনাকে বলতে পারে যে, দৃষ্টি অবনত করে আমাকে অনুসরণ করে চলে এসো অথবা আমাকে এমন কোনো প্রশ্ন কোরো না, যা তোমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কখনো কখনো তাঁর আদেশ পালনের মধ্যেই শান্তি লাভ করা যায়। অতএব, আপনি তার অনুসরণ করেন এমনকি আপনি সুরক্ষিত সন্ধানে পৌঁছে যেতে পারেন। এই অবসরে ঐ ব্যক্তি আপনার সহযোগী এবং সহায়ক পথ প্রদর্শক বলে প্রতীত যে, যিনি আপনার জন্য চিন্তিত থাকেন, পথের চড়াই-উৎরাইয়ের প্রতি নজর রাখেন এবং প্রয়োজনে আপনার হাত ধরে রাখেন, (যাতে পদস্খলন হয়ে আপনি পড়ে না যান), যদি ঐ ব্যক্তি নিহত হয় তাহলে আপনিও নিহত হবেন।

পরন্তু যদি কোনো সদাচারী ব্যক্তি আপনার যাত্রার প্রারম্ভে আপনার সহযোগী হয়ে যান যিনি পথরেখা স্পষ্ট করে দেন, তার চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে অবগত করে দেন, পথের কাঠিন্য ও কষ্ট যন্ত্রণার সাথে পরিচিত করে দেন এবং আপনার সাথেই কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হন, যাতে আপনার মধ্যে পথ চলার অভ্যাস গড়ে ওঠে তাহলে এই অবস্থায় আপনি আপনার নিজের পথের দিশা নিজেই পাবেন এবং আপনার বোধ-বুদ্ধির দ্বারা অন্যের দিক থেকে নিশ্চিত হয়ে যাবেন।

প্রথমাবস্থাটি শিশু ও সাদাসিধে ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, পরবর্তী বিধি-নিয়মটি বুদ্ধিমান মানুষদের জন্য শোভনীয়।

আল্লাহ যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্ববাসীকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য মনোনীত করেন তখন তিনি তাঁর 'রিসালতে' সেই সিদ্ধান্ত মিলিয়ে দেন, যা বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের জন্য জ্ঞান-রাজ্যের দুয়ার খুলে দেয়।

তাঁর হৃদয়ের উপর তিনি যে কুরআন অবতারণ করেন তা আল্লাহ সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ, যা প্রত্যেক জাগ্রতচিত্ত ও আল্লাহ ভক্তিতে সংলগ্ন

হৃদয়কে আমন্ত্রিত করে, যা তাকে কল্যাণ বিষয়ে অবগত করে এবং তার মনে হেদায়েত এবং সুপথকে স্পষ্ট করে দেয়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লোকদের পথপ্রদর্শক এবং প্রশস্তিকার ছিলেন না, যিনি তার সদ্ব্যবহার ও সংযম থেকে প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন তথা তিনি এই ভৌতিক জগৎ থেকে বিদায় নেয়ার পরও অতীতের কাহিনী হয়ে গিয়েছেন, না ; বরং তিনি ছিলেন এক কল্যাণকর শক্তি, আক্ষরিক অর্থে ঐ প্রভাবই ফেলল, যা তাপ ও বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে ভৌতিক জগতে সংঘটিত হলো। তাঁর আগমনের পূর্বে মানব-অস্তিত্ব ছিল একটি শিশুর সমান, তারপর তা প্রাপ্তবয়স্কাবস্থায় পৌছাল এবং তাঁর নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল, তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বারা আল্লাহর আদেশ (ইলহামি পয়গাম) এল যে, সে কী প্রকারে জীবনযাপন করবে এবং কীভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। এখন যদি মুহাম্মদ জীবিত থাকেন বা না থাকেন, তাহলে এর পরিণামে সে পয়গামের কোনো দোষ যা ক্ষতিই সাধিত হবে না তাঁর পয়গাম চোখ, কান, হৃদয়, মন, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক জাগ্রতকারী পয়গাম এবং এ 'কিতাব' (কুরআন) ও 'সুন্নত' (রসুলের তরিকা) অর্থাৎ হাদিসের বা তাঁর জীবনাচরণের মধ্যে সুরক্ষিত রয়েছে।

তাঁর প্রেরণ এ জন্য হয়নি যে, তিনি তাঁর চারদিকে কিছু লোককে ঐক্যবদ্ধ করবেন ; বরং এ 'আগমন' ছিল মানবজাতি ও তার অধিকারের মধ্যে সম্পর্কেরই একটি সংযোগ, যার দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব কায়েম ছিল এবং তা ছিল ঐ আলোরই প্রকাশ, যার দ্বারা তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থলকে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। অতএব, যিনি তাঁর জীবনে 'হক' (সত্য) ও তার আলোকে চিনতে পেরেছেন তিনি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনে নিয়েছেন, বাস্তবিক তিনি তাঁর পতাকাতলে এসে গিয়েছেন।

'হে লোকসকল ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, আর আমি তোমাদের প্রতি এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবতারণ করেছি। অতএব, যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁর প্রতি লীন হয়েছে তাদের প্রতি অনতিবিলম্বেই তিনি তাঁর দয়ালুতা ও অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটাবেন এবং তাদের তাঁর নিকট পৌছানোর সহজ পথ দেখিয়ে দেবেন।'–নিসা- ১৭৫, ১৭৬

এমন কিছু লোককে যদি আপনি দেখেন যে, তারা তাদের গুরুর শিক্ষাকে ভুলে গেছে কিন্তু তার স্মৃতিকে মাত্র চুম্বন করছে অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তার হাড্ডিগুলোকে চুম্বন করছে তাহলে জেনে নিন যে এরা মূর্খ অজ্ঞ ও অপাত্র, যাদের রিসালতের শিক্ষার এরা অযোগ্য উত্তরাধিকারী। কেননা, রিসালতের শিক্ষা ও কার্যপদ্ধতি অনুধাবন করার মতো শক্তি সামর্থ্য তাদের নেই।

নবীর (সা) মসজিদে (মদিনায়) আমি এরকম বহুসংখ্যক লোককে দেখেছি যারা মসজিদের চতুঃসীমার মধ্যে দিনাতিপাত করে তাদের মূল্যবান জীবন অতিবাহিত করতে ইচ্ছুক।

আল্লাহর রসুল যদি জীবিত হতেন এবং এসব লোকদের এই অবস্থায় দেখতেন, আমি নিশ্চিত যে, এদের জন্য তিনি চিন্তিত হয়ে পড়তেন এবং এদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন। এই বুদ্ধিহীনতা, অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতা নবী (সা)র সাথে তাদের যোগসূত্রকে মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল করে দিয়েছে।

আমি তাদের প্রশ্ন করি, তোমরা রসুলল্লাহর এই সামীপ্য থেকে কি লাভবান হতে পারবে ! অথবা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সা) তোমাদের কাছেও যদি আগমন হয় তাহলে কী ফায়দা হবে তোমাদের ? যারা রসুলুল্লাহর শিক্ষাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে গিয়ে তাকে জীবিত করেছে, রসুলুল্লাহর বাস্তব প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে তারাই তোমাদের চেয়ে বেশি সক্ষম। আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যই একমাত্র সম্পর্ক যা রসুলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর অনুসারীদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে।

এ সকল পীড়িত আত্মাসম্পন্ন ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা তাদের জীবনে কি সুফল ভোগ করতে পারে যারা তাদের বুদ্ধি ও চৈতন্য দ্বারা সেই শিক্ষাকে অনুধাবন করতে অক্ষম ?

এই নৈকট্য কি প্রেমভাব, ক্ষমাপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভের সাধন হতে পারে ?

তুমি আল্লাহর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমানুভব করতে পারবে না যতক্ষণ না তাঁর জ্ঞান পরিচয় লাভে সমর্থ না হবে। প্রাকৃতিক ধারাক্রমের নিয়মে আগে এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমার 'প্রভু' কে ? তোমার 'দ্বীন' (ধর্ম) কী ? যখন তুমি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা এই বাস্তব জ্ঞানটি লাভ করতে সক্ষম হবে তখন তোমার অন্তরে তার অস্তিত্বের সাথে তোমার প্রেমভাব উৎপন্ন হবে যিনি আল্লাহর পয়গাম (স্বর্গীয় বার্তা) তোমার নিকট পৌছে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে গিয়েছেন। এই হাদিসের এটাই মর্মবাণী।

'আল্লাহকে ভালোবাস, কেননা, তিনিই তোমাদের মুখমণ্ডলী ও তাঁর অসীম অনুগ্রহ দান করেছেন ও আল্লাহকে ভালোবাসার কারণে আমাকেও ভালোবাস।' তিরমিজি

একই মর্মবাণী এই আয়াতে বিধৃত হয়েছে :

'বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসতে থাকবেন এবং তোমাদের পাপরাশিকে মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'– আলে-ইমরান ৩১

রসুলুল্লাহ (সা) সম্পন্নতা ও মোক্ষ প্রদানের কোনো দ্বার খুলে দেননি, কেননা, ছলনা ও কপটতার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। পবিত্র কুরআন তাঁকে এই রকমের দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন :

'আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করো, তাঁদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করছ। তাঁদের পথ নয়, যাদের প্রতি তুমি রুষ্ট, আর তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট।'– ফাতিহা ৫, ৬, ৭

যদি আপনার অন্তরে এই নবীর (সা) প্রতি ভালোবাসা উৎপন্ন হয়ে যায় তাহলে তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আর যদি আপনার মনে তাঁর আচরণ ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যমান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে তাঁকে অনুভব করুন এবং তাঁর আত্মীয়তার ধারাক্রমের অংশীদার হয়ে যান।

পবিত্র কুরআনে তাঁর মহান বিরূপ ও দোয়া স্বরূপ উক্ত হয়েছে–

তাঁর মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত এবং তাদের পুণ্যফল বৃদ্ধির দুআ করেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতা নবী'র উপর রহমত প্রেরণ করেন। হে লোকসকল ! যারা ঈমান এনেছেন ! তোমরাও তাঁর উপর রহমত প্রেরণ করো এবং বেশি বেশি সালাম পাঠাও।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের এটাই কাজ নয় যে, তিনি আপনাকে নিয়ে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন ; বরং আপনার অন্তরাত্মা, প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তাকে জানিয়ে দেয়াই তাঁর কাজ, যার মাধ্যমে আপনি 'হক' (সত্য)কে দেখে নিতে পারেন। এর সাধন হলো সেই কিতাব (কুরআন) যা সমস্ত প্রকারের বিপথগামিতা, পরিবর্তন ও সংশোধন থেকে পবিত্র এবং এটাই তাঁর রিসালতের সর্বকালীন হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

এবার আমরা সেই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করব যা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রিসালতের চিরন্তন এবং নিশ্চিত স্বভাব ও প্রকৃতির আলো দিয়ে সেই বাতায়নকে কীভাবে সুসংস্কৃত করে তুলেছিলেন, যা করার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। আসুন, সেই সময়, কাল ও পরিস্থিতির আলোকে তা পর্যালোচনা করি।

অন্ধকার যুগের আরবের অবস্থা

মক্কার অধিবাসীরা চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল কিন্তু কাম-বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। যদিও চিন্তা এবং কাম-বাসনার মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই। অতএব, যে জাতি চিন্তাভাবনা বা চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে সুদৃঢ়, সে জাতি কখনো কাম-বাসনার পিছনে ছুটতে পারে না।

আজ 'প্যারিস' তথা 'হলিউড'-এর যে সমস্ত কাহিনী আমরা শুনে চলেছি, তা আদিমকালের নগ্নতা, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা এবং ঘৃণিত অপকর্মের চেয়ে বেশি কিছু নয়। সভ্যতার উন্নতি সাধনে এ সমস্ত ঘটনার তেমন প্রভাব পড়েনি ; বরং বিলাসিতা ও সুখসামগ্রী বা সুখসাধনটা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি পাওয়া হয়ে গেছে।

সমস্ত ব্যর্থ কামনাবাসনা, স্বার্থ, লোভ, নিজের পেট সামলানো, পয়গাম্বরের প্রতি ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ এবং একে অন্যকে পিছনে ঠেলে দেয়ার চিন্তাধারা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে, যদিও যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে এর রূপও বদলে যাচ্ছে।

সাধারণ ও পিছিয়ে পড়া মানুষেরা যেমন, প্রগতিশীল সমাজের মানুষেরাও তেমনি ধন-সম্পদে সদা সর্বদাই একে অন্যকে টেক্কা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অগণিত মানুষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যথেষ্ট সম্পন্ন ও কুশলী হওয়া সত্ত্বেও সেসবের দ্বারা লাভবান হতে পারছে না। কিন্তু ধোঁকা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, চতুরতা ও চালাকির দ্বারা রীতিমত কামিয়ে নিচ্ছে। আপনি একথা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, একজন লোক তো তার জ্ঞানশক্তি ও বোধশক্তি সম্পর্কে সামান্য ধারণাটুকুও রাখে না, অথচ সে সদা সর্বদা চেষ্টা করে যে, তার চেয়েও বুদ্ধিমান ও দক্ষ ব্যক্তিটি যেন তাকে ছাড়িয়ে যেতে না পারে।

হজরত নূহ আলাইহিস সালামের আমল থেকেই মানব জীবন এ ধরনের হীন বুদ্ধি ও অজ্ঞতার অসংখ্য উদাহরণ একত্রিত হয়ে আসছে। হজরত' নূহ যখন তাঁর কওমকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য আমন্ত্রণ জানান, তখন তাঁর কওমের উত্তরটি আমন্ত্রণ (দাওয়াত)-এর সাথে সম্পর্কিত না হয়ে বরং তা আমন্ত্রণকর্তার সাথে সম্পর্কিত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ বলল :

'একথা শুনে ঐ জাতির নেতা, যে কুফরি করেছিল, সে বলতে লাগল, ইনি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, ইনি চান তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে 'ফিরিশতা' পাঠাতেন। এ (সব কথা) তো আমরা (আমাদের) পূর্ব পুরুষদের কাছে শুনিনি।'– মুমিনুন : ২৪

আচরণ তথা আদেশের মধ্যে কামনা এবং স্বভাব কতটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ! এর বিপরীতে নৈতিকতা এবং কর্ম, ভাবনা ও চিন্তাধারা, আল্লাহর প্রতি অনুসন্ধিৎসা এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে এদের রুচি ও মনমানসিকতা কি দুঃখজনক নয় ?

অন্ধকার যুগে কাম-বাসনা ও অশ্লীলতার ঝড় বয়ে চলেছিল। সেই বাতাবরণে যে কোনো মানুষই অতি নিকৃষ্ট ও হীন কামনা-বাসনা, বিকৃত ধ্যান-ধারণা, অশ্লীলতা ও দুরাচারের উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করেছিল।

আল্লাহ ও আখিরাত (পরকাল)-কে অস্বীকার, দুনিয়ার সুখ-সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া এবং অধিক হতেও অধিকতররূপে লাভান্বিত হওয়া, নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য এবং প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ এবং সন্ধি করা আবার সুবিধা মতো ভেঙে দেয়া, ঐতিহ্যগত এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ ইত্যাদি সমস্ত বস্তুই বিদ্যমান ছিল, যা ব্যক্তির বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ উভয় জীবনের উপরই প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল।

বড়ই ভুল হবে আমরা যদি মনে করি যে, মক্কা নগর সে যুগে অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মরুভূমির একটি গ্রামমাত্র ছিল এবং অবশিষ্ট বিশ্বের সাথে তার কেবলমাত্র জীবিকার সম্পর্ক ছিল। এমনটি ছিল না ; বরং মক্কা ধনদৌলত, সহায়-সম্পদ ও ক্ষমতা এবং প্রভুত্বের জগতে বড়ই উন্নতি সাধন করেছিল। এমনকি, এতে তারা বড়ই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট ছিল। লোকদের মনে অধর্ম ও ধর্মবিমুখতার জীবাণুময় পাহাড় জমে উঠেছিল। তারা সত্য, যথার্থ ও সুন্দরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল নতুবা তাকে অস্বীকার করেছিল। ঐ সমাজে যেখানে কোনো উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধিক সভ্যতার উদয় হওয়া সম্ভব ছিল না সেখানে ব্যক্তিগত অহংকার, ঈর্ষা ও নির্লজ্জতা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং ঐ সমাজে এমন সব অন্যায়কারী ও অত্যাচারী ব্যক্তিও মজুদ ছিল তাদের কাছে 'ফেরাউন'-এর অত্যাচারও হার মেনে লজ্জায় মুখ লুকিয়েছিল।

আমর বিন হিসাম তাঁর কুফরির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'বনু আবদে মানাফ' (একটি গোত্রের নাম) সম্মান এবং মর্যাদার প্রশ্নে সর্বদাই আমাদের বিরোধিতা করে এসেছে, এমনকি, যখন আমরা প্রভুত্ব কায়েম করতে সমর্থ হলাম, তখন তারা বলতে লাগল আমাদের মধ্যে এমন নবী এসেছেন, যাঁর উপর 'প্রত্যাদেশ' (অহি) আসে, আল্লাহর কসম, আমরা ঐ সময় পর্যন্ত ঈমান আনতে পারি না এবং তাঁর অনুসরণ করতে পারি না, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের কাছেও ঐ ধরনের প্রত্যাদেশ না আসবে, যেমনটি ঐ ব্যক্তির কাছে আসে।'

একবার ওয়ালিদ বিন মুগিরা রসুলুল্লাহকে বলেন : বাস্তবিকই যদি নবুয়ত আসত, তাহলে তো আপনার চেয়েও যোগ্য ব্যক্তি আমি ছিলাম। কেননা, আমি আপনার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ এবং সম্পদশালী !

এরকম চূড়ান্ত স্তরের মূর্খ এবং জঘন্য প্রকারের কুবুদ্ধি উত্থাপনকারী ব্যক্তি শুধু মক্কাতেই নয় ; বরং মদিনায় আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মতো ব্যক্তিও ছিল, যার যুক্তি ছিল ঐ রকমেরই।

বদরের যুদ্ধের আগে সা'দ বিন উবাইদ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হিজরতের পর মদিনায় রসুলুল্লাহ তাঁকে দেখতে গেলেন, তিনি তাঁর খচ্চরের পিছনে উসামা বিন জায়েদকে বসিয়ে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে কিছু লোককে বসে থাকতে দেখা গেল, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উবাইও উপস্থিত ছিল। এদের মধ্যে মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজক ও ইহুদিরাও ছিল। মুসলমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন রুআ'ও উপস্থিত ছিলেন। যখন এই বাহকের পদধূলি উড়ে তাদের দিকে গেল তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তার নাকে চাদর দিল এবং বলল, 'ধুলো উড়িয়ো না।'

রসুলুল্লাহ সেখানে গিয়ে সালাম করলেন, বাহন থেকে নামলেন, তারপর তাদের আল্লাহর প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন এবং কুরআনের একটি অংশ পাঠ করে শোনালেন। তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তাঁকে বলল :

'ওহে আমন্ত্রক ! আপনি যা কিছু বলছেন, তা আমি ঠিকমত বুঝতে পারছি না, আমাদের বৈঠকে আমাদের যন্ত্রণা না দিয়ে নিজের খচ্চরের কাছে ফিরে যান, তারপর আপনার কাছে যারা আসবে, এসব কথা তাদের শোনাবেন।'

আবদুল্লাহ বিন রুআ বললেন, 'হে আল্লাহর রসুল ! আমাদের শোনান। আমরা একে বড়ই পছন্দ করি।'

তারপর তাদের পরস্পরের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হলো এবং পরস্পরে হাত-পা ছুড়তে শুরু করল। রসুলুল্লাহ এদের শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে ঝগড়া থেমে গেল। তারপর তিনি বাহনে চড়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং সা'দ বিন উবাইদের কাছে পৌঁছালেন। তারপর তিনি তাঁকে বললেন :

'তুমি কি ইবনে উবাইয়ের কথাবার্তা শুনেছ ?'

সা'দ জিজ্ঞাসা করলেন, সে কী বলেছে ?

তিনি বললেন, 'সে এ ধরনের কথাবার্তা বলেছিল, তারপর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন।'

তখন সা'দ নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রসুল ! ওকে ক্ষমা করে দিন, সেই সত্তার কসম (আল্লাহ), যিনি আপনার উপরই এই কুরআন অবতারণ করেছেন এবং আপনাকে 'হক' (সত্য) প্রদান করেছেন, যা কেবল আপনার উপরই হয়েছে। মদিনাবাসীরা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে তাদের নেতা বলে ভেবে এসেছিল। তাকে রাজমুকুট পরানোর কথা ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ আপনাকে এই সত্যের দ্বারা সম্মানিত করে দিয়েছেন সে তখন আপনা-আপনিই অপদস্থ হয়ে গেছে। অতএব, তারই প্রতিক্রিয়ায় সে আপনার সাথে এই দুর্ব্যবহার করেছে।'– বুখারী, মুসলিম, আহমদ

আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ইসলামের সাথে শত্রুতার এটাই কারণ ছিল যে, সে তাঁকে তার নেতৃত্ব ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করত। মক্কার আবু জেহেলের বিরোধিতারও এটাই কারণ ছিল। সে জেনে-শুনেই সত্যের (হক) বিরোধিতা

করে, সে নিজে না কোনো চিন্তাধারার অনুসারী হয়, আর না পারে তার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ বা প্রমাণ উপস্থিত করতে। এরাও ঐ ধরনেরই লোক ছিল, অতএব, এরা ইসলামের বিরোধিতাও করল আবার যুদ্ধও করল।

এই সম্মিলিত জাহিলিয়াতের মধ্যে এবং জুলুম-অত্যাচার ও শত্রুদের বিরোধিতার এই বাতাবরণের মধ্যেও এবং গুমরাহি ও গাফিলতির এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে ইসলাম ধীরে ধীরে তার আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছে এবং সমগ্র জাতি (উম্মত)-কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোয় নিয়ে এসেছে এবং তাদের আলোকস্তম্ভে পরিণত করেছে, যারা হেদায়েত ও প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলল। সেই চিন্তা ও ভাবধারা, যার দ্বারা জগৎ-সভায় এক বিশাল ইনকিলাব এল এবং অবদমিত মানবতাকে নীচতা ও হীনতার পঙ্কিলতা থেকে টেনে তুলে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দিল, সমসাময়িক তথা তৎকালীন পরিস্থিতিকে ; বরং বলা উচিত মানুষের স্বভাব এবং তার প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে দিয়ে গেল ; যতদিন মানুষ জীবিত থাকবে এবং মানবজাতির অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই ফরমান (প্রত্যাদেশ) মানুষকে সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে থাকবে এবং তার জীবনে ইনকিলাব উৎপন্ন করতে থাকবে।

একজন শিক্ষকরূপে আল্লাহর রসুল (সা)

কিতাবধারী (আহলে কিতাব বা ইহুদি ও খ্রিস্টান)-দের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, একজন 'নবী' আগমনের সময় খুবই নিকটবর্তী। এবং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত মতামতও প্রচলিত ছিল, সেজন্য লোকেরা মনে করত নতুন নবীর আগমন খুব বেশিদিন বিলম্বিত হতে পারে না। এর আগে এমনও হয়েছে যে, একই সময়ে বিভিন্ন এলাকায় একাধিক নবী এসেছেন ; কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের পরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছিল এবং ছ'টি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখনো কোনো নবী প্রকাশমান হননি।

পৃথিবী-পৃষ্ঠে যতই উপদ্রব, উৎপাত এবং বিপথগামিতা বাড়তে থাকল ততই নতুন নবী আগমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকল। যদিও সেই বাতাবরণে এমন দু-একজন ব্যক্তিও ছিলেন যাঁরা অজ্ঞানতা ও বিপথগামিতার বিরোধীও ছিলেন আবার সেই 'শ্রেষ্ঠ পদটি' পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও করতেন। তাঁরা চাইতেন, আল্লাহ তাঁদের চয়ন করে নিন। এই সমস্ত লোকের মধ্যে, 'উমাইয়া বিন সালাত' নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর কাব্য 'তৌহিদি' (একত্ববাদ) ভাবরসে পূর্ণ ছিল এবং 'আখিরাত' চর্চায় ভরে ছিল। এমনকি, রসুলুল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন–

'সম্ভবত উমাইয়া মুসলমান হয়ে যাবে।' – মুসলিম, ইবনে মাজা

'আমর বিন শুরাইব বলেন, একদিন আমি রসুলুল্লাহর পিছনে সওয়ারিতে বসে ছিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, উমাইয়া বিন সালাতের কোনো কবিতা তোমার মনে আছে ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন– শোনাও। আমি একটি কবিতা

শোনালাম। তখন তিনি পুনরায় বললেন, আরো শোনাও। এমনকি আমি একশোটি শের (দুই ছত্রে একটি শের বা পদ হয়) শুনেয়েছিলাম।' – মুসলিম, ইবনে মাজা

কিন্তু ভাগ্য এই সমস্ত কবি ও বিচারককে উপেক্ষা করেছে এবং এই মহান কাজের জন্য এমন ব্যক্তিকে চয়ন করেছে, যিনি এ বিষয়ে না কোনো ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন আর না এ বিষয়ে কিছু ভেবে রেখেছিলেন। কুরআন বলেন :

'(হে নবী !) তুমি এ আশা রাখতে না যে, তোমার উপর কিতাব অবতারণ করা হবে, এ তো শুধু তোমার রব (প্রভু)-এর অনুগ্রহ। অতএব, তুমি কাফিরদের পৃষ্ঠাপোষক হয়ো না।'– কাসাস : ৮৬

এই চয়ন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয় না ; বরং শক্তি এবং যোগ্যতার কারণে করা হয়। এমন অনেক অসফল ব্যক্তি থাকেন, যাঁরা নীরব থাকেন কিন্তু তাঁদের উপর যখন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তখন তিনি তার কাজের আশ্চর্যরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

হৃদয় এবং আত্মার গুরুত্ব তাঁর স্রষ্টাই সবচেয়ে ভালো জানতে পারেন এবং যে শক্তি (আল্লাহ) সমগ্র বিশ্বের হেদায়েত চাচ্ছিলেন তিনি মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহান ব্যক্তিকে চয়ন করল। আরববাসীরা অজ্ঞানতার যুগে মুহাম্মদকে বড়ই সম্মান করত। তারা তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রে 'পূর্ণ ব্যক্তিত্বে'র লক্ষণ দেখে আসছিল। কিন্তু তারা এ কথা জানত না যে, তাদের ভবিষ্যৎ এই মহাপুরুষের সাথে সম্বদ্ধ হবে এবং তত্ত্বদর্শিতার স্রোত এই পবিত্র মুখ থেকেই ফুটে উঠবে, যা প্রতিটি ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করবে।

তাদের অবস্থা এমন এক শিশুর মতো ছিল, যে সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে শান্ত-সমুদ্রতলকে অবলোকন করছিল আর তার অভ্যন্তর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে আল্লাহ মহান কাজ সম্পন্ন করার জন্য চয়ন করেছিলেন। ২৩ বছর যাবৎ 'অহি' (প্রত্যাদেশ) আগমনের ধারাবাহিকতা জারি রইল, পরিস্থিতি তথা প্রয়োজনানুসারে আয়াত (সমূহ) 'নাজিল' (অবতীর্ণ) হতে থাকল এবং এই দীর্ঘ সময়টি শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত করা হলো।

'আল্লাহ তায়ালা' তাঁর রসুলকে শিক্ষা দিতেন, তিনি এই জীবিত তথা জ্যোতির্ময় জ্ঞানকে গ্রহণ করতেন, তাকে হৃদয় ও মন-মস্তিষ্কে সংরক্ষিত করে নিতেন এমনকি এ সমস্ত শিক্ষা তাঁর অস্তিত্বের অংশ হয়ে যেত। তারপর তিনি লোকদের শিক্ষা দিতেন এবং তাদের অনুসারী বানিয়ে নিতেন।

কুরআন অবতারণের এই প্রলম্বিত সময়ই ছিল আল্লাহর অভিপ্রেত, কেননা, মনের উপচার, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং আদেশকে ছড়িয়ে দিতে এবং সংরক্ষিত করার পিছনে যুগের বিশেষ অবদান থাকে।

দীর্ঘকাল ধরে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর অভিপ্রায় ও অর্থের পারস্পরিক সামঞ্জস্যতাকেও কুরআনের একটি বিশেষত্ব বলে মান্য করা হয়, এ জন্য এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার আদি (আরম্ভ) ও অন্তের মধ্যে অনুরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণতা লক্ষ করা যায় ; পরস্পরের মধ্যে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে একে

এমনভাবে অবতারণ ক হয়েছে, যা পড়লে মনে হবে, সব একসাথে অবতীর্ণ (নাজিল) হয়েছে।

আরবরা প্রশ্ন করত যে, কুরআন এভাবে 'নাজিল' (অবতীর্ণ) হলো কৈন ? কুরআন নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন–

'আর যারা কুফরি করেছে তারা বলে : সমগ্র কুরআন একই সাথে অবতারণ করা হলো না কেন ? এমনটি এ জন্য করা হয়েছে, যাতে তা তোমাদের হৃদয়ে একীভূত করা যায়, আর আমি সঠিকভাবে এর ক্রম বজায় রেখেছি। আর (এ এমনই লাভজনক যে) তোমার কাছে কেউ একান্ত কোনো বাক্য (অথবা অদ্ভুত প্রশ্ন) নিয়ে উপস্থিত হলে, (তখন) আমরা সঠিক কথাটি তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকি এবং রহস্যোদ্ঘাটন করে দিই।'– আল ফুরকান : ৩২, ৩৩

কুরআন দ্বীনের বাস্তবিকতা তথা এই বাস্তবিকতার ইতিহাস ব্যাখ্যা করে, তার সার্বজনীন বার্তার (প্রত্যাদেশ) সমস্ত সন্দেহ ও আশঙ্কার বর্ণনা করে আর তা খণ্ডনও করে। বিরোধীদের বিতর্কের উল্লেখ করে তাদের পিছু ধাওয়া করে। কুরআনের কার্যকারিতা সেই জাতির মধ্যে শুরু হয়েছিল, যাদের মন-মস্তিষ্ক কুফরিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। তারা তাদের বর্ণনায় সর্বদাই কুফরি-মন্ত্র উচ্চারণ করত। অর্থাৎ, তকদির এই সমাজকে অন্য সমস্ত সমাজের প্রতিনিধিরূপে চয়ন করেছিল যে, যদি ইসলাম এই সমাজে সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে দূর করতে সফল হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য সমাজে তা নিশ্চিতরূপে সাফল্য লাভ করবে।

যে প্রশ্ন নবীজির সামনে উপস্থিত ছিল অথবা যা ধারণায় বিশ্বাস ও আদেশের দুনিয়ায় পেশ হতে পারত, সে সবের পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক জবাব কুরআনে মজুদ রয়েছে, এ ধরনের প্রশ্নে কেবল প্রশ্নকারীর প্রতিনিধিত্ব করে না ; বরং যুগ-পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকদের নিত্য-নতুন প্রয়োজনীয়তারও প্রতিনিধিত্ব করে।

নানা প্রশ্ন এবং আপত্তির বাতাবরণে রসুলুল্লাহর মধ্যে 'ইসলাম' বা ঐশী-প্রেরণা আসত যে, এভাবে জবাব দিন এবং প্রশ্নকারীর প্রবৃত্তি বা মনোভাব লক্ষ করে তাকে বোঝান। এ ধরনের আয়াতের মর্মবাণী অনন্ত, যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত প্রকারের প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকে।

আপনি যখন এ সমস্ত উত্তর পাঠ করবেন তখন আপনার মনে হবে যে, আপনার হৃদয়ে বিশ্বাসের পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে এবং এর দ্বারা শঙ্কা, ভ্রম ও সন্দেহ ধুলো-মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে।

কুরআন হলো জীবিত রসুলের সমান, এর কাছে প্রশ্ন করুন এবং কুরআনই এর যে জবাব দেবে তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আপনি চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

একটি উদাহরণ নিন– কুরআন কীভাবে একটি প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও কর্মফলের ধারণা অন্তরে গেঁথে দেয় এবং সংকল্প ও আকাঙ্ক্ষাকে কীভাবে বসিয়ে দেয়। এবং সংকল্প ও সামর্থ্যকে কীভাবে উত্তেজিত করে ? কীভাবে স্বীকার এবং খণ্ডন করে আপত্তি ও তার নিবারণের দ্বারা নিজের মতকে অন্তরে গেঁথে দেয় ? অর্থাৎ এ এমন একটি সাক্ষাৎকার, যা 'কিয়ামত'– মহাপ্রলয় পর্যন্ত সময়কালের সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে নেয়–

'মানুষ কি দেখো না যে, আমি তাকে (এক বিন্দু) বীর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছি ? তারপর কি দেখে না যে, সে প্রত্যক্ষরূপে ঝগড়াটে (অথবা বাদ-বিবাদ সৃষ্টিকারী) হয়ে যায়।

আর সে আমাদের জন্য উদাহরণস্বরূপ, আর সে তার সৃষ্টিকে ভুলে যায়, বলতে থাকে, এই অস্থিসমূহে কে প্রাণ সঞ্চার করবে, যা গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ?

বল : এতে তিনিই প্রাণ সঞ্চার করবেন, যিনি তা প্রথমবারেই সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি সৃষ্টির সমস্ত কৌশলই জানেন।

তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন, এখন তোমরা তাই দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছ।

যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি এ সমস্ত আগের মতো সৃষ্টির সামর্থ্য রাখেন না ? কেন নয়, তিনি যেখানে কুশল স্রষ্টা ও জ্ঞাতা, তিনি যখন কোনো ইচ্ছা (প্রকাশ) করেন, তখন তিনি কেবল এতটুকু বলেন, হয়ে যাও। আর তা হয়ে যায়। মহিমাবান তিনিই, যাঁর হাতে সমস্ত বস্তুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আর তাঁর প্রতিই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে।'– সুরা ইয়াসিন : ৭৭-৮৩

এ হলো সঠিক চিন্তা-ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তি (বা তর্ক)-র এক উদাহরণ, যার সম্পর্ক বিশেষ স্থান, কাল বা পাত্রবিশেষের সাথে নয় ; বরং এখানে সমস্ত মানবতার সাধারণ বুদ্ধির সাথে তা সম্পর্কিত। কুরআনের দফায় দফায় অবতারণের এটাই হলো মূল রহস্য। রসুলকে হেদায়েত করা হয়েছে যে, দ্বীন ও দাওয়াতের মধ্যে যে প্রশ্নই সামনে এসে যায় তার এই উত্তর দিন, তারপর, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত এ থেকে লাভান্বিত হতে পারে।

এখানে 'কুল' (বল) শব্দটি বিশেষভাবে বিচরণীয়। এ বিষয়ে 'আলিমদের' অভিমত যে, এ শব্দের দ্বারা আল্লাহ রসুলকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং রসুল এর দ্বারা জনগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই আদেশের পর আল্লাহ অন্য বিষয়ও, যা তিনি চেয়েছেন, বর্ণনা করেছেন, যেমন শিক্ষা, আদেশ, উপদেশ ইত্যাদি।

অতএব, যখন মুশরিকরা তাদের অভ্যাস অনুসারে 'দ্বীন'-এর বাস্তবিকতা সম্পর্কে বিমুখ হয়ে রাসুলের ব্যক্তিত্ব তথা অনুসারীদের জীবন বিষিয়ে দিতে চাইল তখন এই আয়াতরাজি অবতীর্ণ হলো :

'বলে দাও : তুমি কি মনে করেছ আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করছেন এবং তাদেরও, যারা আমার সাথে রয়েছে অথবা আমাদের উপর দয়া করেন। যাই হোক না কেন, কাফিরদের মর্মবেদনাদায়ক দুঃখযন্ত্রণা থেকে কে রক্ষা করবে ? বলে দাও : তিনি রহমান (কৃপাবান) আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি আর তাঁর উপর নির্ভর করেছি। তখন অনতিবিলম্বেই তোমরা অজ্ঞাত হয়ে যাবে যে, কারা প্রকাশ্য বিপথগামিতার মধ্যে পড়ে রয়েছে।' – সুরা আল মুলক : ২৮, ২৯

দেখুন, তর্ক-বিতর্কের মধ্য কীভাবে সারবস্তুটি রেখে দেয়া হলো ? তোমরা রসুল ও তাঁর সাহাবিদের (অনুচর বা সাথিদের) নিন্দা ও অপমান করে কী ফল লাভ করবে, প্রথমে নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করে দেখ যে, কুফরি (অবাধ্যতা) ও গুমরাহি (বিপথগামিতা) তোমাদের কীভাবে ধ্বংস ও বিনাশের মধ্যে ঘিরে রেখেছে এবং তাঁর সাথিরা নিজের অস্তিত্বের বিষয়ে কখনো চিন্তা করেন না, 'তাঁরা 'রহমান' এর প্রতি আমন্ত্রণ জানান।

কেননা, তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁর উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যদি তোমরা চাও, তাহলে জেনে রাখ, 'রহমান' এর পথ সবার জন্য উন্মুক্ত।

আল্লাহর পক্ষ থেকে 'কুল' (বল বা বলে দাও) শব্দের দ্বারা বার্তা পৌছানোর জন্য কোনো প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন নেই ; বরং অধিকাংশ সময় 'দাওয়াত'-এর বিধি-নিয়মের কথা বলতে গিয়ে কেবলমাত্র প্রারম্ভিকরূপে 'কুল' শব্দটি দ্বারা বাক্য শুরু করা হয়, যার উদ্দেশ্য ইসলাম, রসুল ও তাঁর শিক্ষার সাথে পূর্ণরূপে পরিচিত করানো, অর্থাৎ সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের জন্ম নেয়ার আগেই তার দ্বার বন্ধ করাটাই হলো অভিপ্রেত। যেমন : 'বলে দাও, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার বাঁচা, আমার মরা আল্লাহর জন্য (ই), যিনি সমস্ত জগতের প্রভু।

তাঁর কোনো শরিক (অংশীদার) নেই। আমি এরই আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি এবং সবার আগে আমিই আত্মসমর্পণকারী। বল : আমি আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু (রব)-এর সন্ধান করব, যদিও তিনি সমস্ত কিছুরই প্রভু (রব) ? আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু কামাই করে, তার জন্য দায়ী সে নিজে, কারো বোঝা কেউ বহন করবে না।'– (আল আন-আম : ১৬২-১৬৫)

এখানে রসুলকে সম্বোধন প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন, যার বিবেক জাগ্রত এবং যে বুদ্ধি-জ্ঞান রাখে, যাতে যে শিক্ষা তার সামনে পেশ করা হচ্ছে, সে যেন তা গভীরভাবে চিন্তা করে এবং সে বিষয়ে সে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়।

যদি তার হৃদয়ে ঈমান জাগ্রত হয় তাহলে সে সমস্ত জগতের প্রভুর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং এখানে এসে রসুলের কাজ শেষ হয়ে যায়। কেননা, তা তার মন এবং বুদ্ধি-বিবেকের কাছে পৌছে গিয়েছে, এরপর, ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি গ্রহণ করার পূর্ণ দায়িত্ব মানুষের উপর এসে যায়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থান কোনো সাধন বা মাধ্যমের নয়, অর্থাৎ, তাঁর কর্মফলের প্রভাব উম্মতের কর্মফলের উপর পড়বে না। কেননা, কুরআনের সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে, অর্থাৎ যে কুকাজ করবে সে কুফল ভুগবে আর সে সুকাজ করবে সে সুফল ভোগ করবে এবং কারো কাজের বোঝা কেউ বহন করবে না। এখানে এসে খ্রিস্ট ও ইসলামের মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

ইসলাম মানুষের মহত্ত্বের গুরুত্ব খুব ভালো মতোই বোঝে এবং তার সুফল ও কুফলের ফলও তাকে পূর্ণরূপে দিয়ে থাকে, কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মে মানুষকে এতটাই হীন (বলে ভাবা হয় অথবা হীনম্মন্য) যে, সে প্রত্যক্ষভাবে জগৎ-সংসারের 'প্রভুর' সাথে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। এমতাবস্থায়, এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি তার কুরবানি ও ইবাদতকে তার 'রব' (প্রভু) পর্যন্ত পৌছে দেন এবং তার তওবা-অনুশোচনাকে আল্লাহর দরবারে 'কবুল' করিয়ে দেন, কিন্তু এমন ব্যক্তি কে হবেন ? কোনো তথাকথিত ব্যক্তি ? এমন কেউ, এ ধরনের পাপ বা অপরাধ করলে 'কিসাস' (প্রতিফল) দেবে না, কেননা, এ পাপের বদলে সে আগেই কুরবানি দিয়ে দিয়েছে। এখন যদি সে মুক্তি চায় তাহলে সে 'সদকা' (দান) দেবে।

এ ধরনের অর্থহীন ও বুদ্ধি-বিবেচনাহীন কথাবার্তা জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্বীকার করা খুবই কঠিন। কেননা, এ ধরনের কথাবার্তা বুদ্ধি-বিবেচনার বিপরীত এবং শুদ্ধতা ও সততা থেকে অনেক দূরে এর স্থান।

কিন্তু ইসলামের মামলাটি একেবারেই স্বাভাবিক। আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীকে স্পষ্টভাবে যা বলে দিয়েছেন তাতে মানুষের মন ও হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে :

'এদের বল : ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের 'রব' (প্রভু) কে ? বল ; আল্লাহ ! বল, তোমরা কি তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে নিজেদের সংরক্ষক বানিয়ে রেখেছ, যে নিজের জন্যও কোনো লাভ বা ক্ষতির অধিকার রাখে না ? বল, চক্ষুহীন ও চক্ষুষ্মান কী সমান হয় এবং পার্থক্য করতে পারে আলো ও অন্ধকারের ? অথবা, এরা যাকে আল্লাহর শরিক (অংশী) রূপে দেখে, তারাও আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে, যার কারণে সৃষ্টির বিষয়টি এদের জন্য কত বড় হয়ে গেছে ? বল, প্রতিটি বস্তুরই স্রষ্টা আল্লাহ আর তিনি একক ও প্রভুত্বশীল।'– সুরা রা'দ : ১৬

এই প্রকারের নিরন্তর প্রশ্ন 'বাতিল' (অসত্য)-কে নস্যাৎ করে দেয়। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন মানুষকে জাগিয়ে দেয় এবং তার অন্তর্নিহিত সত্যকে স্বীকার করতে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার জন্য অন্তর্নিহিত ভাবনাকে জাগিয়ে দেয়।

ইসলামের রসুল এ সমস্ত কথারই আম–ঘোষণা দিয়েছেন এবং নিজে তার জন্য দৌড়ঝাঁপ করেছেন।

ইসলামকে প্রচলিত মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে ঘোর মোকাবিলা করে চলতে হয়েছে। পূর্তিপুজো দু-একটি যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়নি ; বরং ধরণীর বুকে ছোট-ছোট গোত্রগুলো প্রান্তির জন্য ভীষণ যুদ্ধ করেছে। সাধারণভাবে প্রচলিত মতে, মূর্তিপুজোর আহ্বায়ক শক্তিগুলো সেই সময় পর্যন্ত অভিলাষ পুরো করার সুযোগ লাভ করেছে যখন আল্লাহর রসুল তাঁর দায়িত্ব পুরো করার পর আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হন এবং আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের পিছনে লেগে পড়ল এবং মুসলমানরা পুনঃ ইসলাম ত্যাগ করে এমনই ফিতনা বা বাদ-বিবাদের জালে ফেঁসে যায় যে অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন পুনরায় জ্বলে ওঠে। অতএব, এই ফিতনা চিরতরে নির্মূলের জন্য এবং এদের মস্তক চূর্ণ করার জন্য তাঁকে যে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হলো স্বয়ং রসুলুল্লাহকেও যুদ্ধের সময়ে এত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যারা 'হক' (সত্য)-এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সঠিক অর্থে তারাই মুসলমান ছিলেন। কেননা, ইসলাম সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্ক স্থির রাখে, ব্যক্তির সাথে নয়। আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীকে তথা তাঁর মাধ্যমেই সমস্ত মুসলমানকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে বস্তুকে তারা 'সত্য' বা সঠিক বলে বুঝে নিয়েছেন, তাকে যেন তাঁরা আঁকড়ে ধরে রাখেন এবং তার সাথে যেন বিন্দুমাত্রও বিমুখ না হন, তা যত বিরোধিতাই তাকে সইতে হোক না কেন তথা ইসলামের শত্রুরা তার সামনে যত বাধাই হয়ে দাঁড়াক না কেন।

এ জগৎ-সংসার অন্ধকার ও গুমরাহির অসংখ্য সাধনে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এর প্রথম প্রচেষ্টা হলো এখানে ঈমান যেন কোনো রকমে স্থান পেতে না পারে। কিন্তু ঈমান যখন

অনেক কষ্টের মধ্যেও তার স্থানটি করে নেয় তখন তাকে নরম বা নমনীয় করে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয় যাতে কিছু বস্তুকে ত্যাগ করে কিছু বস্তুকে গ্রহণ করে নেয়া হয়। যদি সে এই নীতিতে সাফল্য লাভ করে তাহলে তার উন্মূলন তার জন্য সহজ হয়ে যায়। অতএব, আল্লাহর কিতাবে (কুরআন) স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে ঈমান একটি 'কুল' (পূর্ণ বস্তু), যাকে ভাঙা (অংশ করা) যায় না। এই বাস্তবতাকে ভিত্তি করে দৃঢ়তার প্রশ্নে কোনো রকমের উদারতা অবলম্বনও করা যায় না, আবার কোনো সমঝোতাও করা যায় না। এই শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে রাখা প্রয়োজন। আর এরই ভিত্তিতে শত্রু-মিত্র, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদি হওয়া উচিত। কেননা, 'আকিদা' (ধারণাগত বিশ্বাস বা বিশ্বাসগত ধারণা) সুরক্ষা চিন্তার একটি অংশ, বুদ্ধির চেয়ে তা কোনো অংশে কম নয়।

এ প্রসঙ্গে রসুলকে সম্বোধন করে সমস্ত মুসলমানকে আদেশ দেয়া হয়েছে–

'হে নবী ! আল্লাহর প্রতি ভয় রাখ এবং কাফির-মুনাফিকদের কথা শুনো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞাত এবং তত্ত্বদর্শী এবং চল তাঁর প্রতি, যার 'অহি' তোমার 'রব'–(প্রভু)-এর পক্ষ থেকে তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার খবর রাখেন তোমরা যা কর। আর আল্লাহর প্রতি ভরসা কর, আল্লাহ তোমাকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট।'– আল আহযাব : ১-৩

এখানে এ কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর রসুলের কাফির-মুনাফিকদের কথা মতো চলার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল, অতএব তাঁকে সচেতন করে দেয়া হয়েছে। কখনোই তা নয় বরং বাস্তবে রসুলকে সম্বোধন করে সমস্ত মুসলমানকে এ থেকে বিরত করা হয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো দাওয়াত (আমন্ত্রণ)-এর শুরু থেকেই শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। এখানে উম্মতকে সম্বোধন করাই হলো উদ্দেশ্য। এইভাবে নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতেও নবীর মাধ্যমে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে :

১. 'যা-কিছু সুখ-সামগ্রী আমি এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লোকদের প্রদান করেছি, তুমি সেদিকে চোখ তুলে দেখো না, আর তাদের অবস্থা দেখে আত্মগ্লানি কোরো না এবং নিজের বাহু ঈমানদারদের জন্য বাড়িয়ে দাও।'– (আল হিজর- ৮৮)

২. 'আর এমন ব্যক্তির কথা শুনো না যার হৃদয়কে আমার স্মরণ থেকে গাফিল করেছি, আর যে নিজের ইচ্ছাপূর্তির কাজে নিয়োজিত রয়েছে আর যার বিষয়টি সীমার বাইরে চলে গেছে। আর বলে দাও ; এ সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে (আগত)।'

৩. 'যদি তোমার মধ্যে ঐ সমস্ত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয়, যা আমি তোমার উপর অবতারণ করেছি, তাহলে ঐ লোকদের কাছ থেকে (তা) জেনে নাও, যারা তোমার আগে থেকে 'কিতাব' পড়ে আসছে। বাস্তবে তোমার কাছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে 'হক' এসেছে আর তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর সেই সমস্ত লোকদের দলে মিশে যেয়ো না যারা আল্লাহর 'আয়াতরাজিকে মিথ্যা অভিহিত করেছে, আর তুমি সেই মন্দকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' –ইউনুস : ৯৪, ৯৫

কুরআনের কিছু 'মুফাসসির' (তাফসিরকার বা টীকাকার)-এর মতে, এ হলো আসলে রসুলের মাধ্যমে এ উম্মতকে সম্বোধন যেভাবে সরকারি আদেশ অধিকর্তা পর্যন্ত পৌছায় তারপর তা সৈনিকদের উপর কার্যকর হয়।

অন্য মতে, এ সম্বোধন রসুলকেই করা হয়েছে, যাতে সাহস ও সংকল্পকে জাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন, কোনো কুশলী ব্যক্তিকে বলা হয় 'আলস্য কোরো না' অথবা কোনো মেধাবী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বলা হয়– 'গাফিলতি কোরো না।' এর অর্থ এই নয় যে, এ দুয়ের বিষয়ে কোনো দুর্বলতা ও পর্যালোচনার আশঙ্কা রয়েছে ; বরং এর বাস্তব অভিপ্রেত হলো শক্তি, বীরত্ব, প্রতিভা এবং বুদ্ধিকে উত্তেজিত ও প্রোৎসাহিত করা। কোনো বীরপুরুষকে বলে দাও যে, কাপুরুষতা দেখিয়ো না তাহলে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

যে অর্থই করা হোক, সর্বাবস্থাতেই রসুলের ব্যক্তিত্ব হলো 'সদাচারের আদর্শ' যা অনুসরণ করেই মানুষ মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ লাভ করতে পারে। রসুলকেও এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদেরও আদেশ দেয়া হয়েছে যে, বিভ্রান্ত ও বিপথগামী লোকদের কাছ থেকে দূরে থাক। তাদের নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি থেকে দূরে থাক। তাদের সাজসজ্জা, সাধন, উপকরণ সামগ্রী ইত্যাদিকে হীন বলে মনে কোরো। কেননা, এমন সময়ও আসে, যখন 'হক' (সত্য) দুর্বল হয়ে যায়, যা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিক বাতিল, (মিশ্র বা অসত্য) শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আর তার সাথে বন্ধুত্ব করা বা তার প্রতি উদার হয়ে যাওয়ার পথ সুগম হয়ে যায়।

এই আকিদা বা ধারণার অনুসারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাদের বিশ্বাসের ভিতকে শক্ত করে তোলা এবং সামনের সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে যাওয়া।

এ সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও অনুভবের উচ্চতর স্থানে অবস্থান করার আদেশ অতি স্পষ্ট। অতএব, আল্লাহর আদেশের পিছনে সন্দেহ ও দুর্বলতার কী সন্দেহ থাকতে পারে ?

'(হে নবী !) যদি তুমি অংশী (শিরক) করো তাহলে তোমার সকল কর্ম ধুলোয় মিশে যাবে আর নিশ্চয় তুমি কুকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। না, বরং আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।'– জুমার : ৬৫, ৬৬

এই সম্বোধন শৈলীতে বড়ই প্রভাব রয়েছে। এ হেদায়েত থেকে মুসলমান কেবল শিরক থেকে দূরে থাকবে না ; বরং হাজার হাজার বার আত্মরক্ষা করবে।

মুফাসসিরদের যে মত ওপরে বর্ণিত হয়েছে, তা নিম্নলিখিত আয়াতেরও অনুকূল :

'যদি ঐ বস্তু সম্পর্কে তোমার মধ্যে কোনো সন্দেহ জাগে যা আমি তোমার উপর অবতারণ করেছি, তাহলে ঐ লোকদের কাছ থেকে (তা) জেনে নাও, যারা তোমার আগে থেকে কিতাব পড়ছে।'– ইউনুস : ৯৪

এখানে এ সম্বোধন পাঠকের সাথে হোক, শ্রোতার সাথে হোক বা প্রেরণা দানের জন্য রসুলের সাথে হোক– যদিও রসুলের নিজের নবুয়ত সম্পর্কে সন্দেহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না সেহেতু যেমনটি অন্য সুরায় বলা হয়েছে :

'(হে নবী !) বল, যদি রহমান (কৃপাশীল)-এর কোনো সন্তান হতো তাহলে সবার আগে ইবাদতকারী হতাম আমি।' – আজ জুখরুফ : ৮১

পরন্তু, কিতাবধারীদের উদ্দেশে এ প্রশ্ন করার অর্থ কী ? মুফাসসিদের মত হলো, এখানে অভিপ্রায় ঐ কিতাবধারী (আহলে কিতাব)-দের সাথে, যারা সত্য এবং সরল পথে চলে, যারা প্রশ্ন করলে সত্যের সাক্ষ্য গোপন করে না।

আমার মতে, কিতাবধারীদের মধ্যে সত্যবাদী এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি অনেক কম ছিল, যাদের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের কোনো কথা বলা যেতে পারত আর আমি মনে করি যে, এই আয়াতের তাৎপর্যও নয়।

অবশ্য, এ কথা সত্য যে, মানুষের কাছে কল্যাণ ও তত্ত্বদর্শিতার যে বোধ রয়েছে তার মূল্য তার দৃষ্টিতে সেই সময়ে বেড়ে যায়, যখন সে বিরোধীদের ভ্রান্তিকে দেখতে পায়। যদি আপনার মনে সন্দেহ জাগে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কি না, আর তারপর যদি আপনি প্রাচীন, নবীন বা আধুনিক বই পুস্তকাদি পাঠ করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনি সন্তুষ্টি লাভ করবেন এবং আপনি আল্লাহকে শত শতবার ধন্যবাদ দেবেন এই ভেবে যে, তিনি আপনাকে হেদায়েতের সম্পদ দান করে সম্পন্ন ও সম্মানিত করে দিয়েছেন।

আমার মতে, আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদি ইসলামের যথার্থতা এবং বাতিল দ্বীনের (অসত্য ধর্মের) পরিবর্তন ও অসমতা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইসলামের উপর আপনার ঈমান তথা বিশ্বাস বুদ্ধিও সুদৃঢ় হয়ে যাবে, এ অর্থ আল্লাহর এই বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'আর যদি তুমি ঐ জ্ঞানের পরও যা তোমার কাছে এসেছে, ঐ লোকদের ইচ্ছানুসারে চলো তাহলে আল্লাহর মোকাবিলায় না তুমি কোনো রক্ষাকারী বন্ধু পাবে আর না পাবে কোনো সাহায্যকারী।' – আল বাকারাহ : ১২০

উপরোক্ত আয়াতের অর্থকে বুখারীর এই রেওয়ায়েত আরো সিদ্ধ ও স্পষ্ট করে দিচ্ছে, যা ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল বলেছেন :

'হে মুসলিম সম্প্রদায় ! তোমরা কিতাবধারীদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) কেন প্রশ্ন করছ ? যখন তোমাদের কিতাব, যা তোমাদের নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, (যা) নবীনতম পুস্তক, তোমরা তা পাঠ করছ, তা বিশুদ্ধ, তাতে কোনো মিশ্রণ নেই এবং আল্লাহ তোমাদের বলে দিয়েছেন যে, কিতাবধারীরা আল্লাহর কিতাব পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছে। তারা সমস্ত কিতাব লিখেছে এবং বলেছে 'এ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তারা তা থেকে স্বল্পমূল্য লাভ করে। যে জ্ঞান তোমাদের কাছে এসেছে, তারা কি সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবে ? যেখানে আমি তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তিকে পাইনি যে তোমাদের কাছে এই জ্ঞানের বিষয়ে প্রশ্ন করে, যা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে।'– বুখারী

ইসলাম সকল যৌক্তিক দৃষ্টিতে সততার পরিচয়ের নামান্তর এবং ভাবুকের দৃষ্টিতে এর প্রেমিক ; এর জন্য মরা বাঁচা এবং বাতিলকে ঘৃণা এবং তাকে কন্টকমুক্ত রাখার নাম।

কিছু লোক শীতল-স্বভাববিশিষ্ট হওয়ার কারণে অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় মতকে স্বীকার করে নেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি কিছু সাধারণ বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু ঈমান, সংযম, সতীত্ব, অবজ্ঞা এবং পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তা কখনোই মেনে নেয়া যেতে পারে না।

আল্লাহ তাঁর রসুলকে কিতাব ও ঈমানের শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, এই ইহসানের (কৃতজ্ঞতা) পরিচয়ের দাবি অনুসারে আল্লাহর রসুল নিজে ঈমান এবং ইসলামের কদর

করেছেন। সমঝোতা, সন্ধি এবং যুদ্ধ করেছেন। শত্রুরা অনেক চেয়েছিল যে এ প্রশ্নে তিনি একটু নমনীয় হোন, কিন্তু কীভাবে তা হওয়া সম্ভব ছিল ?

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কের অধিকার (হক) তো সেই উম্মত রাখতে পারে, যারা 'হক'- এর জন্য সংগ্রাম করতে পারে, এ প্রশ্নে কোনো রকমের আপস বা উদারতার কোনো স্থান না দেয়, আর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনো ভ্রান্তি আসতে না দেয়। এ উম্মতের গুণ হলো এই যে, এরা বুদ্ধি ও বিবেচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী উম্মত। এর ভৌতিক তথা নৈতিক অস্তিত্ব এই পথে করণীয় প্রচেষ্টা ও আত্মোৎসর্গের (কুরবানি) উপর প্রতিষ্ঠিত।

কুরআনে সুন্নতের স্থান

একজন মুসলমানের দায়িত্ব হলো তার দ্বীন গ্রহণের স্থান, উৎস ও স্রোতের ক্রমের উপর মনোযোগ রাখা। যা থেকে দ্বীনের সিদ্ধান্ত বা বিধি-নিয়ম লাভ করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 'অহি' সংগৃহীত ও সংরক্ষিত 'কিতাব' (কুরআন)-এর সাথে সাথে রসুলুল্লাহর সুরক্ষিত প্রবচন বা কথোপকথন, কর্ম ও ব্যবহার সম্পর্কেও উপযুক্ত জ্ঞান রাখে।

কুরআন ইসলামের আত্মা (রুহ) ও শরীরও। তার স্পষ্ট আয়াতরাজিতে ইসলামের বিধান ও তার দাওয়াতের কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং আল্লাহ তার সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং নিয়েছেন। অতএব, এর দ্বারা দ্বীনের বাস্তবিকতা সুরক্ষিত হয়ে গেল এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি (রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে আল্লাহ তাঁর আয়াতরাজি প্রচার করার এবং তাঁর প্রত্যাদেশ জনসাধারণের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তিনি স্বয়ং কুরআনের মুখনিঃসৃত চিত্র ছিলেন। অতএব, তাঁর বাণী ও কর্ম, নৈতিকতা ও গুণ তথা জীবনের সমস্ত বিষয়কে দ্বীনের স্তম্ভ (রুকন) এবং মুসলমানের জন্য তাকে শরিয়ত বলে মান্য না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

যেহেতু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিকট পর্যন্ত তাঁর প্রত্যাদেশ পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁকে চয়ন করেছিলেন, সেহেতু আল্লাহর বাণীকে তাঁর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) চেয়ে যোগ্য আর কে হতে পারে, যে তার বিধিবিধানকে নিশ্চিতভাবে নিজের জীবনের প্রতিফলিত করে কুরআনের আত্মারূপে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারত ?

আইনের প্রচলন, কার্যকর আইন প্রণয়নের চেয়ে কম গুরুত্ব রাখে না। আইনের 'নসুস' (স্পষ্টাদেশ) আলাদা জিনিস। আইনানুসারে বিভিন্ন মামলা নিষ্পত্তির জন্য 'ফতওয়া'-র সাহায্য নেয়া হয়, শিক্ষার প্রয়োগ করা হয় এবং অভিজ্ঞতা ও ঘটনার দৃষ্টান্ত থেকে লাভান্বিত হওয়া যায় এবং কিছু আদেশ 'নসুস' (স্পষ্টাদেশ) শব্দের নিকটবর্তী এবং কিছু তার রুহ-এর অনুরূপ।

'কুরআন' হলো ইসলামের আইন আর 'সুন্নত' হলো রসুলের তরিকা বা তার ব্যবহারিক কর্ম-প্রচেষ্টা, অর্থাৎ মুসলমানের সমস্ত কর্মকাণ্ডের আদেশগ্রন্থ। মুসলমান যেভাবে আইনের সম্মান করে তেমনি তার কার্যবিধিকেও সম্মান করবে। আল্লাহ 'আবামির' (আদেশাবলি) থেকে 'নবাহি' (নিষিদ্ধ বিষয়াবলি) পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে আজ্ঞা পালনকে নবীর উপর অনিবার্য করে দিয়েছেন। কেননা, নবী আপন ইচ্ছায়, নিজের মন থেকে কোনো কথা বলেন না ; বরং 'রব' (প্রভু)-এর আদেশানুযায়ী কাজ করেন। অতএব, তাঁর আজ্ঞাপালন আল্লাহর আজ্ঞাপালনের নামান্তর। এ কোনো মানুষের অন্ধ অনুকরণ নয়, আল্লাহতা'লা বলেন :

১. যে রসুলের আদেশ পালন করল বাস্তবিকই সে আল্লাহর আদেশ পালন করল, আর যে মুখ ফেরাল, তো আমি তোমাকে তার রক্ষাকারীরূপে পাঠাইনি।– সুরা : নিসা : ৮১

২. আর (হে মুহাম্মদ !) আমি তোমার উপর অনুস্মারক (চিরন্তন বাণী) অবতারণ করেছি, তুমি লোকদের সামনে তা প্রকাশ্যে বয়ান করে দাও, যা কিছু তাদের প্রতি অবতারণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। – আন নহল : ৪৪

৩. এবং রসুল তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা নিয়ে নাও। আর যে বস্তু থেকে তোমাকে বিরত করা হয়েছে, তা থেকে বিরত হও।– আল হাশর : ৭

এ এক বাস্তবিকতা যে, 'ইলহাম' (আল্লাহর সংকেত) প্রগতিশীল মানুষের যোগ্যতার পরিপন্থী হয় না। নবী তথা রসুল ফিরিশতাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন না যে, তাঁরা যখন ইচ্ছা কথা বলাতে পারত বা মৌন রাখতে পারত। এঁরা যদি প্রত্যাদিষ্ট না-ও হয়ে থাকতেন, তা সত্ত্বেও এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকতে পারতেন।

'অহি' কোনো মানুষের উপর অকস্মাৎ অবতীর্ণ হয় না ; বরং এর পাত্র সেই হন, যিনি মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক সত্যদর্শী ও সৎ–পথের অনুসারী, যার আচরণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যার চিন্তাচেতনা সবচেয়ে বেশি দৃঢ়। এ সমস্ত লোকের চরিত্র এমনিতেই বরবাদ করা যায় না, আর তাদের উপেক্ষাও করা যায় না। যেখানে তাঁর শিষ্টতার জামানত নিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তার স্বভাব-প্রকৃতি, প্রতিভা ও বিবেককে সঠিক দিক দিয়ে দেয়া হয়েছে !

পয়গাম্বরদের পুরো সিলসিলা হলো কল্যাণ ও হেদায়েতের ভাণ্ডার। এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরিকা আল্লাহর কিতাবের সাথে সাথেই তাঁর শরিয়তের স্রোত ছিল কিন্তু উদ্ধৃত সুন্নতকে সেখানেই স্বীকার করা হবে যা শরিয়ত থেকে নেয়ার বা গ্রহণ করার প্রেরণা ও গতি উৎপন্ন করে দেয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক বস্তুকে স্বীকার করা যায় না, আর এটা জরুরিও নয় যে, প্রতিটি সেই হাদিস, যার সম্পর্ক উচিত সম্মত, যাকে ঠিকমত অনুধাবনও করা হয়েছে অথবা সমুচিত স্থানে তাকে রাখাও হয়েছে।

মুসলমানরা সংকলিত হাদিসসমূহ অনুধাবন করতে কখনো কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়নি এবং তার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কেও অনিশ্চিত হননি। এমনকি শেষ দিকে এসব লোকও এসেছিল, যারা সুন্নতের স্থানকে সন্দেহ ও মিথ্যারোপণের দৃষ্টিতে দেখত এবং তারা মনে করত মুসলমানরা তার (হাদিসের) ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসুক, কিন্তু দুটি দিক দিয়ে এ ছিল চরম ভ্রান্তি।

প্রথমত, এ থেকে ঐতিহাসিক বাস্তবতা উপেক্ষিত হতো, এ জন্য যে, পৃথিবী এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান আজো জানে না, যার বাণী, প্রবচন তথা সম্পূর্ণ জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে একটা একটা করে গণনা করা হয়েছে, অতি সাবধানতার সাথে তা যাচাই করা হয়েছে এবং অবশেষে বাস্তবতা ও শুদ্ধতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টও নিশ্চিন্ত হয়ে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতএব তাঁর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী, জীবন ও কর্মকে কীভাবে জঞ্জালের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করা যেত ?

দ্বিতীয়ত, তত্ত্বদর্শিতা, উপদেশ ও নসিহতের এ ভাবসাগরে রয়েছে জীবন ও জগতের প্রয়োজনীয় সারবস্তু। সাধারণ কোনো ব্যক্তির সাথেও যদি তা সম্পর্কিত হতো তাহলে সে মহান সংস্কারকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। সেখানে এমন মহান ব্যক্তির জীবন ও সাধনাকে কীভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব হতো এবং তার মধ্যে নিহিত মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে মানুষকে কীভাবে বঞ্চিত করা সম্ভব হতো ?

আমরা এখানে নৈতিকতার বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রসুলুল্লাহর জীবন ও কর্মের অধ্যয়ন করছি এবং ঐ সমস্ত হাদিস সন্ধান করছি, যেখানে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে সহস্রাধিক হাদিস আমাদের বিশ্বাস যে, যদি দক্ষ আলেমদের বড় একটি দলকে এই শ্রেণীর সাহিত্য একত্রিত করার কাজে নিয়োজিত করা হতো তা সত্ত্বেও তারা এ কাজে বিবশ ও অসমর্থ হয়ে পড়ত। প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা হলো তাঁর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) রয়েছে, বিশাল কর্মকাণ্ডের একটি বিভাগমাত্র। পরন্তু এ ছাড়া ইসলাম ও মুসলমানদের হিতের জন্য যদি এ সমস্ত কাজকে ঐ নিয়োজিত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় তাহলে তাদের এ সমস্ত শর্ত পুরো করতে হবে।

অতএব, হাদিসের পিছনে সময় ব্যয় করা তাদের জন্য জায়েজ নয়, যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করেছে এবং তা থেকে পূর্ণরূপে লাভান্বিত না হয়েছে। কুরআনই ইসলামের মূল বিধান এবং তাই-ই পুরো সূক্ষ্মতা ও কুশলতার সাথে একজন মুসলমানের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অনিবার্য কার্যক্রম তথা অধিকার সুনিশ্চিত করে এবং তার জীবনের ইবাদতের নির্ধারণ এভাবে করে যে, এক ইবাদতের সাথে আরেক ইবাদত যেন সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং সে সমস্ত ইবাদত যেন জীবনের পরিশ্রম, তার কর্মকাণ্ড ও তার মহত্ত্বকে আচ্ছন্ন হতে না দেয়।

যে ব্যক্তি কুরআনের এ সমস্ত বাস্তবিকতাকে বুঝতে অসমর্থ হয় তার মধ্যে অন্য কিছুর সাথে এর পার্থক্য অনুধাবন করা সম্ভব নয় এবং তার মনে ইসলামের যে স্বরূপ সৃষ্টি হয় তা থেকে সে কুরআনে বর্ণিত ইসলামের স্বরূপও চিন্তাধারা থেকে বঞ্চিত হয়। তার মধ্যে গোত্র, বংশ, বর্ণ ও কর্মভেদও তাঁর কাজ করে যায়, যার সাথে ইসলামের বিরোধ বড় প্রবল।

সাহাবা কিরাম আদি হতে অন্ত পর্যন্ত কুরআনের আলোকে এমনভাবে জীবন গড়েছেন যে, তাঁদের হৃদয়ে কুরআন ও কুরআনের মর্মবাণীর বাইরের কোনো কিছুই স্থানলাভে সমর্থ হয়নি।

ইবনে আবদুল বররা' তাঁর 'জামে বয়ানুল ইলম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, জাবির ইবনুল আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার বলেন, 'আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (রা)

বলেছেন, আমি প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছি এই মর্মে যে যার কাছে কোনো কিতাব আছে সে তা ধ্বংস করবে। কেননা, অতীতের জাতিগুলো এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের সমাজের আলেমদের অনুসরণ করেছিল এবং নিজেদের প্রভুর কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) কে ত্যাগ করেছিল।

'জুহুরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে খাত্তাব হাদিস লিপিবদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলে তাঁদের অভিমত ছিল যে, লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। অতএব, হজরত উমর (রা) এক মাস যাবৎ ইস্তিখারা (আল্লাহর কাছ থেকে মঙ্গল কামনা করা) করতে থাকলেন। তারপর আল্লাহ তাঁর মনে দৃঢ় সংকল্প পয়দা করে দিলেন এবং তিনি বললেন, 'আমি হাদিস লিখতে চাই। আমি সেই জাতিগুলোর কথা জানি, যারা তোমাদের আগে গ্রন্থাবলি লিপিবদ্ধ করেছিল এবং তার উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহর কিতাবকে ত্যাগ করেছিল, আর আল্লাহর কসম, আমি কখনো এলোমেলো করতে পারি না।' অন্য এক বর্ণনায় এই বাক্যটি রয়েছে 'আমি আল্লাহর কিতাবকে কোনো কিছুর কারণে কখনোই বিস্মৃত হতে পারি না।'

ইবনে সিরীন বলেন, বনু ইসরাইলি (ইহুদি)দের মধ্যে বিপথগামিতা এ সমস্ত গ্রন্থরাজি হতে এসেছিল, যা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল।

'আলকামা ও আসওয়াদ' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে এক 'সহিফা' (ধর্মগ্রন্থ) নিয়ে এসেছিলেন, যাতে একটি মনোরঞ্জক কথা ছিল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর দাসীকে আদেশ দিলেন, পানি আনো এবং তিনি এক হাত দিয়ে তা মুছে দিতে লাগলেন এবং কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতে লাগলেন :

'এই কুরআন তোমাদের প্রতি অবতারণ করে আমি তোমাদের সামনে উত্তম শৈলীতে (ঘটনা এবং বৃত্তান্ত) বর্ণনা করছি।'– ইউসুফ : ৩

তাঁরা দুজনে বলেন : 'এতে এক মনোরঞ্জক কথা আছে' তিনি তা মুছতে মুছতে বললেন, এ হৃদয় শূন্য পাত্রের সমান, একে কুরআন দিয়ে পূর্ণ করো আর কোনো বস্তু এতে রেখো না। এ ধর্মগ্রন্থ কিতাবধারীদের মনোরঞ্জক ঘটনাবলিতে পূর্ণ ছিল।

আমির শো'বী কুর্জা ইবনে কা'ব হতে বর্ণনা করেছেন, আমরা ইরাক যাওয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলে হজরত উমর (রা) আমাদের সাথে হারির পর্যন্ত এলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমারা কি জানো আমি তোমাদের সাথে কেন এসেছি ? লোকেরা বলল, আমরা আল্লাহর রসুলের সাহাবি, আপনি আমাদের সাথে এসে আমাদের সম্মান ও উৎসাহ বাড়িতে দিতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তোমরা এমন একটা লোকালয়ে যাচ্ছ, যেখানে সর্বদাই মৌমাছিদের মতো গুনগুন করে কুরআন পাঠ করা হয়। তোমরা তাদের হাদিসের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ো না, সঠিক রীতিতে কুরআন পাঠ কর এবং রেওয়ায়েতের বর্ণনা কম কর। যাও, আমি তোমাদের সাক্ষী হয়ে থাকলাম। কুর্জা যখন এলেন তখন লোকেরা তাঁদের বললেন, উমর ইবনে খাত্তাব আমাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

হজরত উমর (রা), হজরত আলী (রা) প্রমুখ সাহাবি সুন্নতের বিরোধী ছিলেন না। পরন্তু তাঁরা কুরআনকে মনোযোগ এবং সম্মানের সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলে মনে করতেন এবং এটাই হলো স্বাভাবিক প্রশিক্ষণও। কিন্তু তত্ত্ব ও বিবরণ আংশিকভাবে পাঠ করার আগে পুরো আইনের উপর অধিকার সবার আগে লাভ করা অত্যাবশ্যক। কেননা, এ সমস্ত বিবরণ ও অংশবিশেষের প্রয়োজন প্রত্যেক ব্যক্তির হয় না ; তাতে ঐ অংশবিশেষ দ্বারা তার মন এতটাই পূর্ণ হয়ে যায় যে, সেখানে দুনিয়াবি সিদ্ধান্ত ও অনিবার্য নিয়মাবলির কোনো স্থান আর অবশিষ্ট থাকে না। এ সিদ্ধান্ত এ জন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে, হাদিসের রেওয়ায়েতের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা সমস্ত সুন্নত ও রসুলের বাণীসমূহকে একই স্থানে একত্রিত করে দেয়, যা স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।

উরওয়া ইবনে জুবাইর, আয়েশা (রাজিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তুমি কি আবু হুরাইরাহকে দেখে আশ্চর্য হও না যে, সে এসে আমার ঘরের কাছে বসে আর হাদিস বর্ণনা করে আমাকে শোনায়, যখন আমি তসবিহ পাঠে মশগুল থাকি ! সে আমার নামাজ শেষ হওয়ার আগেই চলে যায়। আমি যদি তাকে পেতাম তাহলে বলতাম আল্লাহর রসুল তোমার মতো হাদিস বয়ান করতেন না।'– বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ

২. কুরআন অনুধাবনের দক্ষতা লাভের পর হাদিস অনুধাবনের পর্যায় আসে। যে ব্যক্তি হাদিস অনুধাবনের ক্ষেত্রে দক্ষতা লাভে সমর্থ হয়েছে তার উচিত নিজের জবানের হিফাজত এবং হাদিসের অভিপ্রেত বা উদ্দেশ্য না জেনে বা বুঝে অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র অনুধাবন না করে যেন বর্ণনা না করে, তা যত স্পষ্টভাবেই তার মর্মবাণী সে উপলব্ধি করুক না কেন।

প্রাচীনকাল থেকেই এই সমস্ত লোকের কারণে 'সুন্নত' ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে, যারা অশিক্ষিত, হাদিস মুখস্থ করে অথচ খুব কম হাদিসই তারা অনুধাবন করতে পারে। হজরত আয়েশা (রা) হজরত আবু হুরাইরাহকে দেখে এ জন্যই আশ্চর্যান্বিত হননি যে, তিনি তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন ; বরং তাঁর রেওয়ায়েত করার শৈলী বা ঢংকে সেই যুগ কাল পরিবেশে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করা হতো, যাদের কাছে এই হাদিস বর্ণনা করা হয়েছিল। মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন যে, হজরত আবু হুরাইয়াহ (রা) যখন এই হাদিস বর্ণনা করেছিলেন– 'যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করবে, সে জান্নাতে যাবে।' তখন হজরত উমর (রা) তাঁকে প্রহার করেছিলেন। তা এজন্য যে, হজরত উমর (রা) যখন দেখেন আবু হুরাইরাহ (রা) এ হাদিস তাদের সামনে বের করছেন যারা কেবল এতটুকুই জানে যে, ইসলাম এক কালেমা মাত্র যা মুখেই আদায় হয়ে যায় তার আমল ছাড়াই। অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে হাদিস রেওয়ায়েত করার অনুমতি থেকে বিরত থাকা উচিত তা সে যতই সহিহ হাদিস হোক না কেন।

ইবনে আবদুল বররা হজরত আবু হুরাইয়াহ (রা) থেকেই রেওয়ায়েত করেছেন যে, (তিনি বলেন), আমি তোমার কাছে এমন হাদিস বয়ান করছি, তা যদি হজরত উমর বিন খাত্তাবের সময়ে বর্ণনা করতাম তাহলে তিনি আমাকে চাবুক মারতেন।

আমার বিবেচনা মতে, এই নিষেধের ক্ষেত্রে হজরত উমরের এই নীতিই কার্যকর ছিল যে, সর্বপ্রথম সমাজের গুণীদের কুরআনের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং তার উপরই চিন্তাধারা গড়ে ওঠা উচিত এবং তা যে কোনো সমস্যার সঠিক সমাধান বের করে আনা উচিত। এর পর যদি হাদিস রেওয়ায়েত করা যায় তাহলে প্রতিভাশালী ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে এবং তার অর্থ গ্রহণেও কোনো ত্রুটি থাকবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেহেতু আবু হুরাইরাহ্ হাদিসের শ্রেষ্ঠ হাফিজ ছিলেন, সেহেতু তিনি নামাজের বিষয়ে শত শত হাদিস বয়ান করতেন। হজরত উমর (রা) এটি অপছন্দ করতেন যে, পড়ার এবং পড়ানোর বিশেষ ক্ষেত্রেই মাত্র এ ধরনের হাদিস বয়ান করা হোক, কিন্তু তিনি জনসাধারণকে এ বিষয়ে বেশি উৎসাহ দেয়াটাকে পছন্দ করতেন না। যেখানে সামান্য একটু অংশমাত্রই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারত তারপর সে এমন কর্মের প্রতিই মনোযোগী হোক যা ইসলাম প্রেমীদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর হতে পারে।

হজরত উমরের অত্যধিক হাদিস বর্ণনার ব্যাপারে কঠোর আপত্তির এটাই ছিল মূল কারণ।

ইবনে হজম ওজু ও ইলম (জ্ঞান) সম্পর্কিত হাদিসগুলো একত্রিত করে প্রায় হাজার পৃষ্ঠার একটি বই সংকলন করেছেন। এ বিষয়ে মনোযোগীদের জন্যই তিনি করেছেন কিন্তু আম-মুসলমানদের এই বিষয়ে উৎসাহিত করাটা চরম মূর্খতা ব্যতীত কিছু নয়। কেননা, এর পরে স্বয়ং কুরআনের মধ্যে অবশিষ্ট আর কী থাকল ? বরং এই ঢঙে লোকদের কুরআনের প্রতি উৎসাহিত করাটাও অনুচিত। আল্লাহর রসুল বলেন : কুরআন পড়ো এবং অতিরঞ্জিত (অথবা সীমালংঘন) কোরো না, তার উপর জুলুম কোরো না, আর তার দ্বারা জীবিকার্জন কোরো না।– আহমদ

হাদিসের ও হাফিজদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণ এটাই যে, তাঁরা এমন ব্যক্তিদের নিকট পর্যন্ত এ জ্ঞান পৌঁছে দিয়েছেন, যারা তা থেকে ভালোমত লাভান্বিত হতে পারেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

'কেবলমাত্র ফিকাহের (ধর্মবিধান) জ্ঞানার্জনকারী ব্যক্তি ফকিহ (ধর্মশাস্ত্রবিদ) হয় না। যে ফিকাহকে এসব ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, সে তার চেয়ে অধিক ফকিহ।'– দারেমী, আহমদ

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, 'আ'মাশ' আমাকে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেন, যে বিষয়ে তাঁর আর আমার মধ্যে মতভেদ ছিল। আমি তার উত্তর দিলে তিনি বলেন : তুমি কিসের ভিত্তিতে একথা বলছ ইয়াকুব ? (অর্থাৎ, প্রমাণ কী ?) আমি বললাম, হাদিসের আলোকে তুমি আমার কাছে যা বয়ান করেছ আমি সেই হাদিসই বয়ান করছি। তখন তিনি বললেন, আমি এই হাদিস মুখস্থ করেছিলাম যে সময়ে তোমার অস্তিত্বও ছিল না। পরন্তু তার অর্থ আমি আজকে জানতে পারলাম।

ফকিহ আবু ইউসুফ সেই বস্তু লাভ করলেন, যা আ'মাশ-এর ন্যায় হাদিসের হাফিজের মধ্যে নিহিত ছিল।

আশঙ্কার কথা এই নয় যে, না বুঝে যেন হাদিস মুখস্থ (হিফজ) করা না হয় ; বরং এ বিষয়ে যাতে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা না হয়, সে জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

হাদিসের কলাত্মক ক্রম হলো এই যে, যেখানে 'ঈমান' এর অধ্যায় পৃথক সেখানে ন্যায় ও অন্যায়ের অধ্যায়ও পৃথক। এই ধরনের অধ্যায়সমূহ বিভাজিত আকারেই আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে।

যেহেতু ইসলাম এই সমস্ত বাস্তবিকতারই নাম। অতএব, সুন্নত বস্ত্র-ব্যবসা-কেন্দ্রের সমান হয়ে গেছে যেখানে সুন্নতসমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। কোথাও টুপি বিক্রি হয় তো কোথাও বিক্রি হয় পাজামা, কোথাও বিক্রি হয় জামা তো অন্য কোনো স্থানে বিক্রি হয় চাদর। সাধারণ নিয়ম হলো, যে কাপড় কিনতে চায় সে সমস্ত দিকেই নজর রাখে, যাতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটাই ঢাকা থাকতে পারে, কিন্তু প্রায়শ দেখা যায় যে, কেউ টুপি কেনে তো কেউ কেনে রুমাল, অথবা কেউ বা তোয়ালে কেনে, কিন্তু বাস্তবিকই সে নগ্ন থাকে।

এখানে ঐ শ্রেণীর লোকদের উদাহরণ হলো এরকম– যে সুন্নত প্রাপ্তির পিছনে লেগে থাকে, তারপর লম্বা একটা চাদর দেয়ার পর যখন লোকদের সামনে আসে তখন কারো হাতে থাকে মিসওয়াক আর কারো থাকে পাগড়ি। যাকে সে সুন্নত বলে মনে করেছিল এবং একেই ইসলামের নমুনা বলে অভিহিত করেছিল। এর কারণ হলো এই যে, সে যে বাজারে ঢুকেছিল, সেখানে সবকিছুই ছিল। দ্বীন (ধর্ম)-কে কোনো একটি হাদিস বা সীমিত সুন্নতের দ্বারা পরিবেষ্টিত মনে করে সে বাইরে বেরিয়ে এল এবং তার পরিণামস্বরূপ কুরআন সুন্নত উভয়কেই ভ্রান্ত বলে মনে করতে লাগল।

৩. সুন্নতের পিছনে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করা সত্ত্বেও তার অভীষ্ট বস্তুকে পেতে ব্যর্থ হওয়াটা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে সিদ্ধ হয়েছে। তার মধ্যে নিত্য-নতুন তরিকা এবং আদেশ সংকীর্ণ এবং সীমিত রীতি ও সংস্কারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল যার সাথে কুরআন ও সুন্নতের রুহ (আত্মা)-র কোনো সম্পর্ক ছিল না। যদি তারা হাদিস অধ্যয়ন করে তাহলে তাকে ভিত্তিহীন বলে ভাবতে থাকবে এবং ফিকাহের সন্ধানে ফিরলে তার মধ্যে কোনো দিশা খুঁজে পাবে না।

ইসলাম সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আদেশের এক সংকলন প্রস্তুত করে, যা কুরআন এবং হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। সে সমস্ত আদেশ সম্পূর্ণ, একে অন্যের সাথে সংঘবদ্ধ এবং পরস্পরের সমর্থকপুষ্ট। যদি কুরআন ও সুন্নতের কোনো প্রমাণের এমন কোনো কথা থাকে, যা অন্য কোনো প্রমাণের সাথে সাংঘর্ষিক তাহলে তার তাৎপর্য এটাই হবে যে, ঐ প্রমাণসমূহের অনুকূলতা লাভ করলে এবং যুক্তি ও প্রমাণের বিচারে তা প্রাধান্য লাভ করলে তাকেই স্বীকার করে নেয়া হবে এবং প্রামাণ্যটিকে বাতিল করা হবে।

এ জন্য যাচাইকারকদের অভিমত হলো 'আহাদ হাদিস' (সেই হাদিস, যার উল্লেখকর্তা সংখ্যায় নিরন্তর নন) গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা কুরআনের বা কারো সাথে সাংঘর্ষিক হয় বা স্পষ্টাদেশ (নসস)-এর বিরোধী হয় বা এমন 'কিয়াস' (অনুমান)-এর সাথে সাংঘর্ষিত হয়ে যায় যার ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন। তা যাচাইকর্তা, ফুকাহা (শাস্ত্রবেত্তাগণ) এবং হাদিসের হাফিজের রেওয়ায়েতকৃত হাদিসসমূহের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

আমরা একটি উদাহরণ পেশ করছি। একটি হাদিসকে ভুল বোঝার কারণে মুসলমানদের ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ মুসলমান বলেন, স্ত্রী যেন কোনো পুরুষকে না দেখে আর কোনো পুরুষ যেন তাকে না দেখে। অতএব, নগরে মহিলারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে চলে এবং উপরে দু'টুকরো কাপড় মুখের উপর দিয়ে রাখে, যাতে তাকে দেখার সম্ভাবনা না থাকে।

'এই প্রচলিত ধারণার ভিত্তি হলো সেই হাদিস, যা আমি ইমাম হরম (কাবার ইমাম)-কে জুমআর খুৎবায় বলতে শুনেছি। রসুলুল্লাহ তাঁর পত্নীদের জন্য এটা অপছন্দ করতেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (ইনি অন্ধ ছিলেন)-কেও দেখেন। অতএব, তাঁর পত্নীরা যুক্তি দিলেন যে, সে তো অন্ধ, সে তো আমাদের দেখতে পায় না। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তো তোমরা দুজনেও কি অন্ধ ?'[১]– আবু দাউদ, তিরমিজি

আমি ইমামের এই হাদিস বর্ণনা করতে দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে যাই। কেননা, হাদিসের আলিমরা এতে আপত্তি তুলেছেন। আর এ হলো সুন্নত সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার পরিণাম যে, মহিলাদের নিত্যকর্ম, তাদের জীবন শৈলী তথা সমাজের সাথে তাদের সম্পর্কের অথবা অবস্থার বিষয়ে তাদের সাথে তর্ক করা হোক। জানি না আমরা ঐ হাদিসসমূহকে কেন ভুলে যাই যেগুলোকে ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যেখানে এ সমস্ত হাদিস অধিক সহিহ প্রমাণিত তথা শুদ্ধ ?

'ইমাম বুখারী হজরত আনাস দ্বারা উল্লেখ করেছেন, যখন উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হলো এবং তারা নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সঙ্গ পরিত্যাগ করল তখন আমি আয়েশা বিনতে আবুবকর ও উম্মে মুনাইমকে দেখলাম যে, তাঁরা পাজামা (কিছুটা) গুটিয়ে রেখেছেন। আমি তাঁদের পায়ের গোছা দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা দুজনে তাঁদের পিঠে করে কলস ভরতি পানি এনে আহতদের মুখে ঢেলে দিচ্ছিলেন। তারপর আবারো আবারো পানি ভরে আনছিলেন, আর তাঁদের মুখে ঢেলে দিচ্ছিলেন।'– বুখারী

ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন, আমি হজরত আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর রসুল বিনতে সালমান-এর কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। তারপর তিনি হেসে ফেললেন। তিনি তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) এ হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমার উম্মতের কিছু লোক আল্লাহর পথে কাস্পিয়ান সমুদ্রে যাত্রা করবে। তারা সিংহাসনে বসা রাজাদের সমকক্ষতা লাভ করবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসুল ! আপনি দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে ঐ দলের মধ্যে শামিল করে নেন। অতএব, তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ ! তুমি এই মহিলাকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ো। তারপর তিনি আবারো হেসে ফেললেন। তখন তিনি এ হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহর রসুল আবারো ঐ উত্তর দিলেন। তিনি পুনরায় নিবেদন করলেন, আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমাকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া

---

১. এই সময়ে রসুলুল্লাহর অন্য পত্নী হজরত মাইমুন উম্মে সালমা ঘরে ছিলেন।– অনুবাদক

হয়। (তখন) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি অগ্রবর্তীদের মধ্যে থাকবে, পশ্চাদবর্তীদের নয়। হজরত আনাস (রা) বলেন, এই মহিলা হজরত উবাদা বিন সামিতের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং বিনতে কুরজার সাথে সমুদ্র যাত্রা করেন। ফেরার পথে তিনি জাহাজ থেকে পড়ে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন। 'যুদ্ধে মহিলাদের পুরুষদের নিকট পাত্র ভরে পানি পৌঁছে দেয়া' অধ্যায়ে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, হজরত উমর বিন খাত্তাব (রা) মদিনার মহিলাদের মধ্যে কানের দুল বিতরণ করার পর একটি অতি উত্তম কানের দুল অবশিষ্ট রয়ে গেল। তাঁর কয়েকজন সাথি বললেন, আমিরুল মুমিনীন ! রাসুলের যে নওয়াসি (দৌহিত্র) উম্মে কুলসুম' আপনার কাছে আছে, এটা তাঁকে দিয়ে দিন। তিনি তাতে আপত্তি করলেন এবং বললেন, উম্মে সুলাইত এর বেশি হকদার। সে উহুদের যুদ্ধে আমাদের কাছে পানি পৌঁছে দিত।

'যুদ্ধে মহিলাদের যুদ্ধাহতদের ক্ষতে মলম, পট্টি বেঁধে দেয়া' শীর্ষক অধ্যায়ে রবীআ বিনতে মুআত্তজা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম, আহতদের পানি খাওয়াতাম, তাঁদের চিকিৎসা করতাম এবং নিহত লোকদের মদিনায় পাঠিয়ে দিতাম।

'মনে করুন, ইমাম বুখারী এ সমস্ত সহিহ হাদিস বর্ণনা করেননি। তবে, কি আমরা দুই অন্ধ (অন্য প্রসঙ্গে বর্ণিত) ওয়ালা হাদিসকে সমাজের উপর আচ্ছাদিত করে দেব এবং মহিলাদের ঘরে বন্দি করে ফেলব যে, তারা এ কারা থেকে আর কখনো বাইরে বেরুতে না পারে ? এ ধরনের আদেশ কুরআনে কোথাও নেই ; বরং এই আদেশ ঐ মহিলাদের জন্য দণ্ড নির্দিষ্ট করে, যারা ব্যভিচারগ্রস্ত।'

'আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যে ব্যভিচারগ্রস্ত, সে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যেকার কয়েকজনের সাক্ষী নাও। তারপর তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের ঘরের মধ্যে বন্দি রাখো, যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু তাদের গ্রাস না করে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো পথ বের না করে।'—আন নিসা : ১৫

পরন্তু মুসলমানরা কুরআন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণ স্ত্রী ও পুরুষদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কারণের উপর খুঁজতে লাগল, তখন তারা কারাবাস তথা বন্দিত্বের সহায়তা নিল এবং তার যা পরিণামের কথা ছিল তাই হলো। মুসলমানরা কুরআন ছেড়ে হাদিসের অনুসরণ করল। তারপর হাদিস ছেড়ে ইমামদের মতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল।

তারপর ইমামদের (মত) থেকে নিরাশ হয়ে তারা মুকাল্লিদ (অনুকরণকারী)দের ঢঙে চলতে লাগল।

তারপর এই ঢং (বা শৈলী বা রীতি পদ্ধতি) ত্যাগ করে জাহিল (অজ্ঞানী) ও অজ্ঞানী (কুসংস্কারাচ্ছন্ন)-দের ঢং অবলম্বন করল। তারপর তারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে অগণিত ভ্রান্তির জালে আটকা পড়ে হাত-পা ছুড়তে লাগল। ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এই বিকার ও পরিবর্তন ইসলাম তথা ইসলামপ্রেমীদের জীবনক্ষেত্রে একটা জঞ্জাল এবং

---

১. ইনি হজরত আলী (রা)-র কাছে ছিলেন। ১৭ হিজরি সনে হজরত উমর (রা)-এর সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়া হয়। তাঁর মা ছিলেন হজরত ফাতিমা (রা)। অতএব, উম্মে কুলকুম রসুলের দৌহিত্রী হলেন। – অনুবাদক

বিপত্তি বলে সিদ্ধ হলো। ইবনে আবদুল বররা, জাহহাক ইবনে মজাহম থেকে বর্ণনা করেছেন, এমন একটা যুগ আসবে, (যে যুগ) কুরআনকে একটি উঁচু স্থানে টানিয়ে রাখা হবে এবং মাকড়সা তাতে জাল বুনতে থাকবে। তখন তা থেকে আর লাভান্বিত হওয়া মোটেও সহজ হবে না এবং তখন রেওয়ায়েত ও হাদিসের উপর ভিত্তি করে মানুষের ব্যবহারের ইমারত কায়েম হবে।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বাতাবরণে আমাদের কুরআনের প্রতি ফিরে যাওয়াটাই হবে হেদায়েতের আসল পথ এবং একেই আমাদের যৌক্তিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের স্তম্ভ বানিয়ে নেয়া উচিত। তারপর যখন আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাব তখন সুন্নতের প্রতি মনোযোগী হয়ে আল্লাহর রসুলের তত্ত্বদর্শিতা, জীবনী, ইবাদত, নৈতিকতা ও আদেশাবলি হতে আমাদের লাভান্বিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির সুন্নতের পায়রবি করার অধিকার তখনো পর্যন্ত জন্মাত পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরআনের সাথে তার পূর্ণ পরিচয় লাভ হয় অথবা হাদিসের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি না জন্মায় বা ঐ সমস্ত ঘটনা ও পরিস্থিতির বিষয়ে তার পূর্ণ পরিচয় না ঘটে।

রসুলুল্লাহ ও তাঁর মোজেজা

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ জীবন প্রাকৃতিক নিয়মে অতিবাহিত হতো। সম্পূর্ণ জীবন এই শাশ্বত নিয়ম থেকে সামান্য পরিমাণেও বিচ্যুত হয়নি।

মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর ক্ষুধা পেত, তারপর খাওয়ার পরে সন্তুষ্টিও লাভ করতেন। রোগেও আক্রান্ত হতেন আবার সুস্থও থাকতেন। আরামও করতেন আবার অবসন্নও হতেন। প্রসন্নতা, সম্পন্নতা, দুঃখ ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতিও তাঁকে অতিক্রম করতে হতো (এমনকি তাঁকে বিচ্ছুতেও দংশন করেছে এবং সে কষ্টও তিনি অনুভব করেছেন– অনুবাদক) কিছু ব্যক্তি আছে, যারা নিজেদের প্রয়োজন পুরো করতে করতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের যদি কোনো প্রয়োজন পুরো না হয় তাহলে তারা বুদ্ধি বিভ্রাটের শিকার হয়ে যায় এবং নিজেদের সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতাকে নষ্ট করে ফেলে। কিছু ব্যক্তি সহনশীল ও শক্তিশালী হয় যাদের কাছে জীবিকার সামান্য মাত্রাই পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়। এরা সর্বদাই শ্রেষ্ঠ এবং দৃঢ় সংকল্পের সাথে অগ্রবর্তী থাকে।

তেল দিয়ে চালানো মেশিন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কিছু তো অতি-মাত্রায় তেল খেয়েও ব্যবহারোপযোগী বলে সিদ্ধ হয় না, আবার কিছু মেশিন স্বল্প খরচে খুব ভালোই কাজ দেয়। মানুষের নিজের শরীর সম্পর্কেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য, তার অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা তার বিলাসের জন্য হয়ে থাকে।

রাসুলের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মের অধ্যয়নকারী দেখবেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাব তাঁর নিজের মধ্যে খুব দৃঢ়ভাবে কার্যকর। তাঁর শরীরের গঠন এরকমই ছিল যে, অনেক বড় বড় বুদ্ধিমানের বড় বড় বুদ্ধিও সেখানে হতচকিত হয়ে যেত। তিনি এতটাই সামর্থ্যবান ছিলেন যে, জীবনের পরিশ্রম, জিহাদের কষ্টকে তিনি হাসতে হাসতে সয়ে নিতে পারতেন এবং তাঁর সংকল্প, পরিশ্রম ও কর্মের মধ্যে চুল পরিমাণ পার্থক্যও চোখে পড়বে না।

এমন কিছু বিচিত্র ও 'অদ্বিতীয় মানুষ দেখা গেছে' যারা অন্ধ, রোগা ও অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে। পরন্তু, অলৌকিক হওয়া নবুয়ত থেকে অত্যধিক হীন বস্তু। আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির উপর অনুকম্পাবশত তাকে সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত রাখবেন, যাতে তার পূর্ণ স্বাস্থ্যের কারণে তার প্রয়োজনীয়তা পুরো হতে পারে, যা তার জৈবনিক চাহিদা পুরো করে তার চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রাকে সমুন্নত রাখতে পারে।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিচারে একজন 'পূর্ণ-মানব' ছিলেন, আর তাঁর জীবন আল্লাহর ঐ প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য রাখত যা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত ও কার্যকর থাকে।

পরন্তু, তাঁর জীবন এক রসুলের জীবনও ছিল, যা প্রচার ও আমন্ত্রণের কর্তব্য আনজাম দিত মুসলমানদের প্রশিক্ষণ দিত, কাফিরদের সাথে সংঘর্ষ বা যুদ্ধ চালাত এবং নিজের দাওয়াতে প্রচারকর্মে ব্যস্ত রাখত। এমনকি বিশ্বে তার পরিণাম এভাবেই প্রকট হয়ে ওঠে। এই জীবন নিঃসন্দেহে কুরআনের স্তম্ভের উপর সুস্থির ছিল।

যদিও কুরআন এক অলৌকিক গ্রন্থ, কিন্তু তা মানুষের শ্রেষ্ঠ যোগ্যতাবলিকে জাগিয়ে দেয়। তা ঐ ঘটনাবলি ও বৃত্তান্তসমূহের অনুরূপ যা তার সামনে আসে এবং তার চিন্তা ভাবনাকে জাগিয়ে দেয় ও অনুপ্রাণিত করে। এ দৃষ্টিতে তা এমনই এক পুস্তক, যা সাধারণ বিবেককে সমুচিত ও সুদৃঢ় করে তুলতে সহায়তা করে।

১। নিশ্চয়ই আমি একে আরবি ভাষায় অবতারণ করেছি, যাতে তুমি বুঝতে পার।– আজ জুখরুফ : ৩

২। এ এক কিতাব, যার আয়াতরাজি স্পষ্ট ভাষায় বয়ান করা হয়েছে, (তা) কুরআন, আরবিতে ঐ লোকদের জন্য, যে জ্ঞান রাখে। সুসংবাদ প্রদানকারী এবং সচেতনকারী।– হা-মিম আস-সিজদা : ৩,৪

আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, আরবদের কুরআন হেদায়েতের সেই আলো রয়েছে, যা বুদ্ধিমানের পথ দেখিয়ে দেয়। আর ইহুদিদের জন্য যাতনার সেই কষাঘাত, যা বুদ্ধিমান পশুকে এগিয়ে চলার জন্য তাদের পিঠে বর্ষণ করা হয়, যারা এক পা আগে বাড়ে তো কয়েক পা পিছিয়ে আসে।

আবদুল্লাহ বিন রুআহা এই কবিতা পাঠ করতেন– যার অনুবাদ :

'আর আমাদের মধ্যে আছেন খোদার রসুল মুহাম্মদ।
প্রভাত রেখা দিলে দেখা করেন তিনি কুরআন পাঠ।
বিপথগামী হয়ে মোরা করতেছিলাম জীবনপাত।
মোদের মাঝে তিনিই প্রথম জাগিয়ে দিলেন নয়া প্রভাত।
তিনিই মোদের পথ দেখালেন
সঠিক পথের দিশা দিলেন–
মোদের হৃদয় তুষ্ট আজি করব তাঁহার আদেশ পাঠ।
তিনি যখন রজনী কাটান শয্যা থেকে আলাদা হন।
পৌত্তলিকে জানি তখন পাশটি ফিরে করে শয়ন।'

কিছু বিচারক মনে করেন যে, আল্লাহর রসুলের 'মোজেজা' কেবল কুরআন, এরা এর অক্ষরিক অর্থ সামনে রাখেন। অর্থাৎ এমন বস্তু, যা স্বাভাবিক, তাঁরা এই বিষয়টিই তুলে ধরতে পারেন। এ ধরনের বস্তুর সন্ধান কেবল কুরআনই দিতে পারে।

এই মতের নিকটবর্তী অর্থের প্রতি আমাদের ঝোঁক রয়েছে, কিন্তু তা মোজেজার আক্ষরিক অর্থের কারণে নয় ; বরং ঐ সমস্ত শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যের মোকাবিলায়, ইসলাম যা নিয়ে এসেছে।

পরন্তু এ সমস্ত মোজেজার না আকিদার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে আর না কোনো কর্মের সাথে। যে ব্যক্তি উপদ্রব ও অশান্তি ছড়ায়, তার এই ঈমান যে আল্লাহর রসুলের উপর মেঘ ছায়া হয়ে বিরাজ করত বা পাথরের সাথে তিনি আলাপ করতেন, তা তাকে অপরাধী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে না, এর বিপরীতে কোনো সদাচারী পুরুষের স্থান তথা সম্মান মোজেজা অস্বীকারের কারণে কমে যায় না।

এই বিবাদের সম্পর্ক জ্ঞান সম্পর্কিত কোনো বিতর্কের মধ্যে রয়েছে। কেননা এ সমস্ত ঘটনাবলির বহু অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে, যার উচিত বা অনুচিতের সাথে ঈমানের কোনো সম্পর্ক নেই।

মুসলমানদের মধ্যে পুণ্যাত্মা ও শুদ্ধ চরিত্রের মহৎ মানুষদের ক্ষেত্রে 'মোজেজা' ও কারামতের (অলৌকিকত্ব) খুব ধুম রয়েছে। সাধারণত, লোক এমনিতেই দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এই নিয়মাবলিকে উল্টা পাল্টা করে ফেলছেন। এমনকি একত্ববাদী লেখকরা এ দাবিও করেছেন :

'আল্লাহ ভক্তদের জন্য কারামত প্রমাণিত হয়ে গেছে। অতএব, যারা এ মত অস্বীকার করে, তাদের কথা শুনো না।'

একত্ববাদী জ্ঞানের সাথে এই প্রমাণের সম্পর্ক কেবল এতটাই, যতটা রয়েছে ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে। অর্থাৎ দ্বীনের বাস্তবিকতা ও সমস্ত বিবাদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তা সে সদর্থক বা নঞর্থক যাই হোক না কেন।

আল্লাহ ভক্তদের মোজেজা ও কারামত, যার ফাঁদে জনসাধারণ ফেঁসে রয়েছে, বাস্তবে এগুলো মূর্খতা, অলসতা, শিথিলতা ও অবসন্নতা দোষের নিকৃষ্টতম রূপ, যা তাদের বুকের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন দেখে, যা তার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতারই রূপ, যা মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং স্নায়বিক বৈকল্য তাকে বিকল করে রাখে।

অমুক বুজুর্গ বিনা চাবিতে তালা খুলে দিয়েছেন, পাখনা ছাড়াই উড়ে গেছেন, কেউ পাথরের উপর পেশাব করে দেয়ার সাথে সাথে তা সোনা হয়ে গেছে, অমুক ব্যক্তি অলৌকিক রকমের জ্ঞানী এবং তিনি আল্লাহর সাথে সমঝোতা করে রেখেছেন।

এ ধরনের অনেক ব্যর্থতা যা দ্বীন দুনিয়ার অনেক বাস্তবিকতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞানী হওয়ার কথাই প্রকাশ করে এবং বলে দেয় যে, এসবের জনক ও প্রচলনকারীরা বুদ্ধিহীন ও অজ্ঞ, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা তথা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবিদের জীবন ও কর্মের সাথে এরা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কাল্পনিক দর্শনশাস্ত্রী ছিলেন না যে স্বপ্ন ও কল্পনার জগতেই তিনি বিচরণ করবেন এবং নিজের জীবন ও দাওয়াতকে তিনি ব্যর্থতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন ; বরং তিনি তথ্যপ্রিয় ও যথার্থবাদী ব্যক্তি ছিলেন। নিকট এবং দূরের সমস্ত রকমের বাস্তবিকতার উপর তিনি সমান দৃষ্টি রাখতেন। তিনি কিছু করতে চাইলে তার জন্য প্রয়োজনীয় সাধন সংগ্রহ করতেন এবং তিক্ত ঘটনাবলির প্রকাশে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। তিনি এবং তাঁর কোনো সাহাবি কখনো চিন্তা করেননি যে, তিনি বসে থাকবেন আর আকাশ তার জন্য প্রয়াস চালাবে, তিনি অবসন্নতা ও অলসতা প্রদর্শন করবেন আর আকাশ তার জন্য

সচেষ্ট থাকবে। মোজেজা, কারামত এবং সাধন ও কারণসমূহের বিরুদ্ধে পরিস্থিতি কোনো মহাপুরুষ বা বড় কোনো জাতির নির্মাণে কখনোই ভিত্তি হতে পারে না।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাঁর সাহাবিরা তাঁর পক্ষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন। যুদ্ধ করেছেন আবার সন্ধিও করেছেন, বিজয়ী হয়েছেন আবার পরাজিতও হয়েছেন এবং তাঁর দাওয়াতের কিরণমালা দুনিয়ার দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু প্রকৃতির কোনো নিয়ম-কানুনের সামান্যতম পরিবর্তনও তাঁর জন্য হয়নি। জীবনের কোনো নিয়মই তাঁর জন্য শিথিল হয়নি; বরং তাঁরা তাদের শত্রুদের চেয়ে অনেক বেশি অবসন্ন হয়েছেন এবং তাঁদের রব (প্রভু)-এর পথে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করেছেন। এবং অন্ততপক্ষে জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রভাব এবং প্রভুত্বের সবচেয়ে বেশি অধিকারী হয়েছেন।

আল্লাহতায়ালা তাঁকে এমন নিশ্চিত এবং সুদৃঢ় শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো অবস্থাতেই এক মুহূর্তেই জন্যও তিনি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকেননি। যদিও তিনি এ আশা করার সর্বাধিক অধিকারী ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর রসুলকে বলেন–

'এবং যখন তুমি ওদের (মুসলমানদের) মধ্যে অবস্থান কর এবং (যুদ্ধাবস্থায়) ওদের নামাজ পড়ানোর জন্য দাঁড়াও তখন উচিত হলো ওদের মধ্যেকার একটি দল সশস্ত্র অবস্থায় তোমার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া। তারপর যখন তাদের সিজদা হয়ে যাবে তখন তোমার কাছ থেকে সরে যাওয়া এবং অন্য দলটি, যারা তখনো নামাজ পড়েনি, তারা এসে যাবে, তারা তোমার সাথে নামাজ পড়বে এবং এরাও তাদের আত্মরক্ষার সরঞ্জাম নিজেদের কাছেই রাখবে। কাফিররা চায় যে, তুমি তোমার অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে অসাবধান হয়ে যাও, যাতে তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এবং যদি বর্ষার কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তুমি রোগগ্রস্ত হও, তখন অস্ত্র রাখাটা গুনাহ হবে না, কিন্তু আত্মরক্ষার সরঞ্জাম রেখে দেবে।' – আন নিসা : ২

গভীর মনোযোগের বিষয় যে, ঠিক নামাজে যখন যেখানে তাঁরা আল্লাহর সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে তাঁদের সতর্কতা এবং সাবধানতার কী শিক্ষাটাই না দেয়া হচ্ছে? আল্লাহতায়ালা এই আশা ও বিকারের কোনো সুযোগই দেননি যে, তাঁদের সাহায্যের জন্য ফিরিশতারা নেমে আসবে! সে স্বয়ং যদি নিজের খিদমত নিজে না করতে পারে তাহলে কেউ তার খিদমত করবে না। এই হলো আল্লাহর সম্বোধন তাঁর নবী ও তাঁর সাহাবিদের (সাথিদের) প্রতি!

'উহুদ-এর যুদ্ধে যখন মুসলমানরা এই শিক্ষা থেকে অসাবধান হয়ে গেলেন তখন তাঁদের উপর এক প্রবল কষাঘাত পড়ল, 'তাঁদের সত্তর বীর পুরুষ মারা পড়লেন এবং পরাজয়ের অপমান সহ্য করতে হলো। সে সময় কাফির দলপতি আবু সুফিয়ান গলা ছেড়ে জয়ধ্বনি দিল 'জয় হুবলের[১] জয়।'

আল্লাহর রসুলকে শক্ত পরীক্ষা ও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলো। তিনি যুদ্ধ করলেন, আহত হলেন ও আঘাত পেলেন।

হজরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রসুল উহুদের যুদ্ধের দিন বলেন :

---

১. হুবল, হজরত মুহাম্মদ (স)-এর পূর্ব যুগ থেকে সারা আরবদেশে পূজিত হয়ে আসা এক বড় দেবতার নাম, যার মূর্তি কাবাঘরে রাখা ছিল।– অনুবাদক

'আল্লাহর কঠিন ক্রোধ ঐ কওমের উপর যারা নিজেদের নবীর সাথে এই ব্যবহার করেছে এবং তিনি তাঁর সামনের দাঁতের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন, আল্লাহর ভয়ানক ক্রোধ নিপতিত তার উপর, যাকে আল্লাহর রসুল আল্লাহর পথে হত্যা করেন।' – বুখারী, মুসলিম

হজরত আনাস বলেন, উহুদের যুদ্ধে আল্লাহর রাসুলের সামনের দাঁত শহীদ হয় অর্থাৎ ভেঙে যায় এবং মাথায় আঘাত লাগে। তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন :

সেই কওম কীভাবে সফল হতে পারে, যারা তাদের নবীকে আহত করে এবং তাঁর দাঁত ভেঙে দেয়, যিনি তাদের আল্লাহর পথে আহ্বান করেন ?

তখন আল্লাহতায়ালা এই আয়াত অবতারণ করেন–

'তোমার এই ব্যাপারে কোনো অধিকার নেই– চাইলে তিনি তাদের ক্ষমাও করতে পারেন আবার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও দিতে পারেন। কেননা, তারা জালিম (অত্যাচারী)।'– আলে ইমরান : ১২৮

আপনি কি মনে করেন যে, বিজয় এবং সাহায্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির পরিণাম পরাজয় তথা অসফলতার অতিরিক্ত কিছু হতে পারে ? এই পরাজয় বরণকারী ব্যক্তি তৌহিদ তথা সত্যের আহ্বায়ক ও প্রতিনিধি ছিলেন না ? কিন্তু বিজেতারা মূর্তিপুজোর ঠিকাদারির অতিরিক্ত আর কী ছিল ?

আল্লাহর রসুল যখন 'গজওয়া'[১] (ধর্মযুদ্ধ)র ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন 'তৌরিয়া' (অর্থাৎ, গোপন করা, যা অন্তরে থাকে কিন্তু মুখে প্রকাশ না করা) অবলম্বন করতেন। তখন বাস্তবিকতাকে গোপন করতেন এবং বলতেন :

'যুদ্ধ চালবাজির নামান্তর।'

যদিও আল্লাহর রসুল ঐ সমস্ত সাধন জুগিয়ে নিতেন বা আল্লাহ অনিবার্য করেছেন এবং তার প্রকৃতি ও স্বাভাবিক নিয়মাবলি সর্বদা চাক্ষুষ রাখতেন, যা মানবজীবনকে সুব্যবস্থিত রাখে। তা সত্ত্বেও কিছু আরবগোত্র তাঁকে ধোঁকা দিতে সমর্থ হয় এবং সাহাবিদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ কুরআন অধ্যয়নকারীদের সাথে করে নিয়ে যায় এবং তারা প্রতারণা করে। 'বীরে মাউনা' (একটি কূপের নাম) নামক স্থানে তাঁদের হত্যা করে। এ ঘটনা কেবল ঐ পাখিদের মাধ্যমে জানা যায়, যারা ঐ লাশগুলোকে ঘিরে আকাশে চক্কর দিচ্ছিল।

এই সাহাবিরা, যাঁরা বিশ্বাসঘাতকদের কবলে পড়ে জীবনপাত করেছিলেন তাঁরা আল্লাহতা'লার অতি প্রিয় বান্দা ছিলেন কিন্তু আল্লাহ এঁদের বিনা পাখায় উড়ে যাওয়ার অনুমতি দেননি বা ভাগ্য বদলে দেননি, যেমনটি পরবর্তীকালে মুসলমানরা মনে করেন। সাবধানতা এবং অতীত-অভিজ্ঞতা বা দূরদর্শিতা যদি নবুয়তের অনিবার্য নীতি হয় তাহলে তাতে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালানো এবং তার প্রস্তুতি গ্রহণ করাই হলো সুন্নাতের দাবির মূল ভিত্তি। তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে বিজয়-লাভ করেছিলেন ?

তিনি (রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথিদের প্রশিক্ষণ ঈমানের মাধ্যমে সেভাবে দিয়েছিলেন, যেভাবে গরম ধীরে ধীরে ফল পাকায়। যখন তিনি তাঁদের

---

১. 'গজওয়া'– ঐ যুদ্ধকে বলা হয়, যাতে আল্লাহর রসুল স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন। নইলে 'সারিয়া' বলা হয়।– অনুবাদক

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন ঝড়ের বেগে তা সর্বত্রই অত্যন্ত পোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। ইসলামের প্রথম দিন থেকেই জিহাদ ছিল, যার নেতৃত্ব দেয়া হতো অহির মাধ্যমে। অতএব তিনি তাঁর প্রত্যাদেশকে ও তাঁর বাহককে বিদ্যুচ্চমক ও তার গতিকে চমৎকৃত আলোর গতির সাথে উপমিত করেছেন :

'অথবা (এর উদাহরণ) এমন যেমন আকাশে বর্ষা হতে থাকে, তাতে আঁধার ঘনিয়ে আসে, বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। এই বিদ্যুৎ চমকের কারণে মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের কানে আঙুল দিয়ে রাখে। যদিও আল্লাহ কাফিরদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।' –(আল-বাকারাহ)

আপনি কি এতে সিসা ঢালা প্রাচীরের দোহাই দিয়ে পুরো না করার বা অর্থ করার কোনো ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন ? আফসোস ! মুসলমান কত অজ্ঞান যে, মোজেজা বা অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতীক্ষায় হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন এবং বিশ্বের শত্রু শক্তিগুলো তার মূলোৎপাটনের জন্য জীবনপাত করে যাচ্ছে।

এ কথা আমরা অস্বীকার করি না যে, জগতে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে থাকে, কিন্তু এই অস্বাভাবিকতা মুমিন কাফির, সালেহ (আল্লাহর ভক্ত) ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের দ্বারা প্রকট হয়। যদি কোনো ব্যক্তি পানির উপর দিয়ে হেঁটে যায় এবং তার পা না ভেজে তাহলে তা তাকে সুচরিত্রবান বা মহাপুরুষ হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। কেননা, সদাচারিতার সম্পর্ক আল্লাহ কেবল ঈমান ও কর্মের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এ সমস্ত অপ্রাকৃতিক বস্তুরাজিকে স্বীকার করা তো কেবল কোনো বিশুদ্ধ ইতিহাসের ব্যাপার, যার সাথে ঈমান ও আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। পরন্তু পয়গাম্বরদের মোজেজার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সমস্ত তাঁদের নবুয়তের সততার দলিল, পরন্তু মোজেজা চমৎকারিত্ব ও অলৌকিকতার যুগ বা নবুয়তের যুগ অনেক কাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন এর উপর তর্ক-বিতর্ক করা অনর্থক, কেননা, এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়ে গেছে যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর মোজেজা উপরোক্ত অস্বাভাবিক বিষয়াবলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সে তো স্থায়ী, যৌক্তিক ও মানবীয় মোজেজা ছিল। আল্লাহ তাঁর জীবন ও প্রত্যাদেশকে কার্যকর নিয়মাবলির সাথে সুব্যবস্থিত করে দিয়েছেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরোক্ষ জ্ঞানের সাথে অপরিচিত (বা অনভিজ্ঞ) ছিলেন। অন্য সকল মানুষের মতো তিনিও জানতেন যে, আগামী কাল কী হতে যাচ্ছে ? তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়ে আমাদের এ আশা করাও উচিত নয় ; কেননা আল্লাহর স্পষ্ট আদেশ তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছিল :

'বল : আমি না ভালোর মালিক, আর না মন্দের, ব্যস, আল্লাহ যা চান তাই হয়। যদি আমি পরোক্ষ বিষয়ে বিজ্ঞ হতাম তাহলে অনেক ফায়দা তুলে নিতাম এবং আমার কোনো ক্ষতি হতো না। আমি তো ঈমান আনয়নকারীদের জন্য সতর্ককারী এবং আমি শুভ সংবাদ দানকারী মাত্র।'– আল আরাফ : ১৮৮

প্রায়শ এমন হতো যে, মুনাফিক তাঁর কাছে আসত। বাইরে মিত্রতার ভান করত কিন্তু ভিতরে শত্রুতা লুকিয়ে রাখত। আর তিনি তার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতেন না, এমনকি এরা ক্ষতির চূড়ান্ত করে দিত :

'আর মদিনার লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কপটতার (মুনাফেকির) চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদের চেনো না, কিন্তু আমি চিনি।'– আত তওবা : ১০১

কিয়ামতের দিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন লোকদেরও সাক্ষাৎ হবে, যাদের তিনি আজীবন মুমিন বলেই মনে করে এসেছিলেন। পরন্তু, তাঁর পিছনে বিভিন্ন ফিতনা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের দুষ্ট স্বভাব ও দুশ্চরিত্রও স্পষ্ট হয়েই প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল অতএব, তিনি তাদের সেই উত্তরই দেবেন। ইতিপূর্বে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে উত্তর দিয়েছেন :

'আমি যখন তাদের মধ্যে ছিলাম তখন তাদের খবর জানতাম, (কিন্তু) তুমি আমাকে যখন ডেকে নিলে তখন তাদের নিরীক্ষক তো তুমিই ছিলে।'– আল মায়েদা : ১৭৭

আল্লাহতায়ালা তাঁর বিশেষ তত্ত্বদর্শিতার অধীনে তাঁর পরীক্ষার কিছু কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন ? যেমন, কুরআনে রোমক ও পারসিকদের পরাজয়ের সংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং যা শুনে পৌত্তলিক-মালাউনরা উপহাস করেছিল।

সহিহ (শুদ্ধ বা প্রমাণিত) হাদিসমূহে এমন অনেক রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যার বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ আদী বিন হাতিম হতে উল্লিখিত হাদিসের কথাটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, আমি একদিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নিজের ক্ষুধার অভিযোগ জানাল। তারপর আরো একটি লোক এসে পথিমধ্যে নিজের সর্বস্ব লুটের অভিযোগ করল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আদী ! তুমি কী 'হীরা' দেখেছ ? আমি বললাম, না, দেখিনি, কিন্তু তার সম্পর্কে আরো অনেক কিছু শুনেছি। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি জীবিত থাক তাহলে দেখবে যে, হীরা (একটি জায়গার নাম) থেকে এক স্ত্রী-লোক একাকী যাত্রা করবে এবং কাবা শরিফে এসে তওয়াফ করবে, তখন আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ভয় তাকে ত্রস্ত করবে না। আমি তখন মনে মনে চিন্তা করলাম কবিলা 'তাঈ'-এর এলাকাটি কত দূর ? যারা ঐ সমস্ত দেশ ভ্রমণ করেছিলেন ! পরে তিনি বললেন, যদি বেঁচে থাক তাহলে তোমরা কিসরার কোষাগার জয় করবে। আমি বললাম, কে ? কিসরা বিন হরমুজ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিসরা বিন হরমুজ।'

আদী বিন হাতিম রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখেছি যে, এক স্ত্রীলোক 'হীরা' থেকে যাত্রা করে কাবা শরিফে এসে তাওয়াফ করে (অর্থাৎ, পরিক্রমা করে) এবং আল্লাহ ছাড়া তার মধ্যে আর কারো ভয় থাকে না। আর আমি নিজে কিসরা বিন হরমুজ-এর বিজয়ীদের অন্যতম ছিলাম।

এটাই বাস্তব যে, এই হাদিস বুখারী তথা এর সাথে সম্পর্কিত বা এই শ্রেণীর অন্যান্য হাদিস পরোক্ষ জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত কোনো পূর্ব সূচনার উপর আশ্রিত নয় ; বরং তা ছিল পরীক্ষার সূচনা, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দেন ; বরং এতে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিই সেখানে পূর্ণতা লাভ করেছে বা আল্লাহ তা পুরো করেছেন যে, ভবিষ্যৎ হবে ইসলামের ; এবং এই দ্বীন (ধর্ম) প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যকে শাসন করবে। এই হাদিসই নিম্নলিখিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা :

১। 'তিনিই যিনি তাঁর রসুলকে পথ-প্রদর্শন এবং সত্য-ধর্মের সাথে প্রেরণ করেছেন, যাতে তা তাকে পুরোপুরি দ্বীনের প্রভুত্ব প্রদান করবে।' – আল-ফতহ : ২৮

২। 'আল্লাহ ঐ লোকদের মধ্য থেকে, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে, তিনি তাঁদের এই পৃথিবীতে খলিফা (রাজত্ব দান করবেন) বানিয়ে দেবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের খলিফা বানিয়ে নেয়া হয়েছিল। এবং তাদের জন্য অবশ্য তাদের ঐ দ্বীন

(ধর্ম)-কে স্থায়িত্ব প্রদান করবেন যাকে তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, এবং (বর্তমান) ভয়ের পরে তদের নিশ্চিন্ত অবস্থার মধ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন।'– আন নূর : ৫৫

এর সাথে সম্পর্কিত অর্থ ফিতনা সম্পর্কিত হাদিসেও আছে।

যে ব্যক্তি বাজারের অভিজ্ঞতা রাখে, সে বাজারদরের ওঠানামা অনুমান করার পর সঠিক মূল্য নির্ধারণ করার পর্যায় পর্যন্ত পৌছাতে পারে এবং সঠিক পরিণামও নির্ধারণ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি অন্তরের কথা বুঝে নেয়, সে তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুও জেনে নিতে পারে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের গোত্র, বংশ, তাঁর পরিবার, সংসার ও তাঁর রীতি-নীতি, আচার, ব্যবহার, যুগ ও তার পরিবর্তন, বিগত ধর্মগুলোর উত্থান ও সে সবের অনুসারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা রাখতেন। সমস্ত নবী উত্তম বুদ্ধি ও যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকেন এবং তাঁদের স্বভাব শুদ্ধ, পবিত্র ও স্বচ্ছ হয়ে থাকে। তাঁরা ইলহামি (আল্লাহর-প্রদত্ত সংকেত) মন ও মস্তিষ্কের অধিকারী হয়ে থাকেন। সেখানে নবীদের নায়ক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে কি প্রশ্ন ওঠে যাঁর সুরক্ষা ও দীক্ষা স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর প্রত্যাদেশ ঐ শৈলীতে পেশ করতে পারেন আর ঐ শৈলীর বুনিয়াদ ও প্রাকৃতিক পীঠস্থান তাঁর বৌদ্ধিক স্বচ্ছতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই কারণেই তিনি সমস্ত পরিস্থিতির উপর সবচেয়ে গভীর দৃষ্টিপাতকারী ও ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী যাত্রা করার সময় একথা কি চিন্তা করতে পারে যে, সে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা প্রকোপে পড়বে না বা সে তা থেকে সুরক্ষিত থাকবে ? অথবা ভূ-মধ্যরেখা-বরাবর যাত্রাকারী কোনো ব্যক্তি কি গরম হাওয়া বা প্রচণ্ড ঝড়ের কবল থেকে সুরক্ষিত থাকার আশা করতে পারে ? তাহলে দ্বীনের এক মহান আহ্বায়কের পক্ষে কীভাবে অসম্ভব ছিল যে, তাঁর এই ধর্ম ও তাঁর শিক্ষাবলি অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ ফিতনা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখবে ?

এ জন্য ফিতনা বিষয়ক অনেক হাদিসের মর্মবাণী বা উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের কথা বলা নয় ; বরং তা থেকে সাবধান করে দেয়া। এ সমস্ত হাদিস ঐ সমস্ত ফিতনার খবর দেয় যা চিন্তাধারার মতভেদ এবং স্বভাবের পারস্পরিক ঘৃণার কারণে মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ সবের মধ্যে এমন ফিতনারও বর্ণনা রয়েছে, যা দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের রূপে মনের উপর আক্রমণ করে। সে সমস্ত ফিৎনা সম্পর্কেও সচেতন করে দেয়া হয়েছে, যা উম্মতের পরাজয়ের রূপে কুফরিতে ফিরে যাওয়ার কারণ উৎপন্ন করে। এভাবে তিনি সাহাবিদের বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে এ সমস্ত ফিতনা সম্পর্কে সচেতন তথা সাবধান করে দিয়েছেন।

সবচেয়ে বড় ফিতনা (উপদ্রব) হলো তাই, যা স্বয়ং ইসলামের শিক্ষাবলির রূপ ধারণা করে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ও পতনের দিকে নিয়ে যাবে। নামাজ তার রুহ তথা বিনয়কে হারিয়ে ফেলবে এবং তার বাহ্যিক রূপকেও শেষ করে দেবে এবং মুরগির ঠোঁটের ন্যায় অবশিষ্ট থাকবে। জিহাদ তার মর্মবাণী তথা বিশুদ্ধতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং মাল-এ গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ তথা স্বাধীন মানুষদের দাসে পরিণত করার মধ্যে সীমিত হয়ে যাবে।

'রোজা' অভাবের কালে সন্তুষ্টি তথা তৃপ্তির নামমাত্র রয়ে যাবে এবং তা উত্তম ইফতারের (সন্ধ্যায় রোজা ভাঙা) প্রাচুর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে যাবে।

শাসন জনগণের সেবা না হয়ে জুলুম-অত্যাচার ও দমন-পীড়নের দ্বারা ঐ মিথ্যা প্রভুর নামে মুদ্রা প্রচলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে যাবে। তারপর শাসক ও শাসিত উভয়েই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এমনকি, মুসলমানদের রসুল-প্রেম এ ছাড়া আর কিছুই রবে না যে, তারা কবরে বাজার বসাবে এবং কোলাহল ফরিয়াদ, শোকতাপ ও কান্নাকাটি দ্বারা শোরগোল করতে থাকবে।

যখন আমি মদিনায় যাই তখন রসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর মুবারক দর্শন করি। ঐ সময়ে অন্তরে জেগে ওঠা চিন্তাভাবনা আমার কানে গুঞ্জরণ তুলছিল। যখন আমি কবরের সামনে পৌঁছালাম তখন কম্পিত দৃষ্টি ও কম্পিত পায়ে আমি তা দর্শন করি। আমার অবস্থা ছিল ঐ বলের মতো, যার উপর একজন খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি সুন্নতানুসারে সালাম করলাম, তারপর একটি কবিতা পড়লাম, এরপর আমার আর মনে নেই যে, আমার কী হলো। কেননা, আমার ঠোঁট ভীষণ বিড়বিড় করছিল কিন্তু কান পর্যন্ত তার আওয়াজ পৌঁছাচ্ছিল না।

'হে মাটিতে দাফনকৃত মানবজাতির শ্রেষ্ঠ যে জন।
যাঁর পরনে পবিত্র ঐ পাহাড়-মাটি তামাম ভুবন।'

এবং আমি ফিরে গেলাম।

হ্যাঁ, আমি আরো হাঙ্গামা এবং কথাবার্তার আধিক্য দেখি। লম্বা লম্বা ইবারত (কুরআনের দীর্ঘ আয়াত) বারবার দোহরানো হচ্ছিল। কোথাও কিতাব পড়া হচ্ছিল, কোথাও বা হাফিজদের কণ্ঠ নিঃসৃত তিলাওয়াত শোনা যাচ্ছিল, যা ছিল একে অন্যের জন্য বড়ই কষ্টদায়ক ব্যাপার। নামাজিরা এর ফলে বড়ই কষ্ট ও অসুবিধা বোধ করছিল। এভাবে সবাই শোরগোল ও কোলাহলে ব্যস্ত ছিল।

আল্লাহর রসুল (সা) কি এটা পছন্দ করতেন ? যেখানে তিনি নিজেই বলেছেন, 'হে আমার প্রভু ! আমার পরে আমার কবরকে উপাসনাগৃহ বানিয়ো না।' – বুখারী

যখন মক্কা ও সেখানকার গ্রামবাসীদের এই দশা আর মসজিদে তাদের ব্যবহারের সাথে আমি পরিচিত হলাম তখন আমি ওখানে নামাজ পড়া ছেড়ে দিলাম। কেননা, 'বিদআত' (নয়া সংস্কার) গুমরাহি (বিপথগামিতা) অজ্ঞানতা ও অরাজকতাকে আমি কঠোরভাবে ঘৃণা করি।

উরওয়া বিন জুবাইর (রা)-এর একটি ঘটনা আমার মনে এল। তিনি আকিব উপত্যকায় তার গৃহ নির্মাণ করেন এবং মদিনা থেকে দূরে চলে গেলেন। লোকেরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি প্রিয় রসুল (সা)-এর মসজিদ ছেড়ে দূরে চলে গেলেন, আপনি তাঁকে একবেরেই ত্যাগ করলেন ? তিনি উত্তর দিলেন : 'আমি তোমাদের মসজিদগুলোতে খেল-তামাশা দেখি, তোমাদের বাজারগুলোতে মিথ্যার বেসাতি দেখি এবং তোমাদের গলিঘুচিগুলোতে অশ্লীলতার সয়লাব দেখি। এ স্থানটি এ সকল অপকর্ম থেকে মুক্ত।' উল্লেখ্য যে, যখন তাদের জিন্দা করা হলো, তখন তিনি বললেন, 'এ থেকে মুক্তই বা কে ? ওখানে তো তারাই মাত্র রয়ে গেছে যারা নিজের ভাইয়ের মুসিবত দেখে হাসে কিংবা তাকে সুখে শান্তিতে থাকতে দেখে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরে।

আল্লাহ আমাদের ক্ষমা ও হেফাজত করুন।'

প্রথম অধ্যায়

জন্ম থেকে নবুয়তের শুরু পর্যন্ত

শুভ জন্ম

সক্কে-সদর (বক্ষ বিদারণ)-এর ঘটনা

বহিরা পাদরির কিসসা

পরিশ্রমী জীবন

হর্বে ফিজার (ফিজারের যুদ্ধ)

হিলফুল ফুজুল

শক্তি এবং আনন্দের জমানা

হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহা

কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণ

সত্যের সন্ধানে

হেরা গুহায়

অরাকা ইবনে নওফেল

এক

শুভ জন্ম

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পবিত্র, শিষ্ট, শ্রেষ্ঠ বংশ এবং কুলশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে আরবের সমস্ত গুণাবলি ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব একীভূত হয়েছিল এবং সে পরিবার সব রকমের মন্দকর্ম, দোষ ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত ছিল। আল্লাহর রসুল (সা) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন :

'আল্লাহ ইসমাইলের[১] সন্তানদের মধ্যে কিনান (গোত্র)-কে চয়ন করেন আর কিনানার সন্তানদের মধ্যে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠ অভিহিত করেন আর কুরাইশদের মধ্যে হাশিমকে চয়ন করেন আর বনু হাশিমের মধ্যে আমাকে চয়ন করেন।' —মুসলিম

বংশগত পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব কোনো অসফল এবং নিরুদ্যম ব্যক্তিকে উচ্চতা ও প্রাধান্য প্রদান করতে পারে না। যেমন, লোহাকে ফেলে রাখলে বা ব্যবহার না করলে তাতে লৌহমল বা মরিচা ধরে তা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা কোনো কাজ করা বা তা থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই লোহা উপযুক্ত কোনো কারিগরের হাতে পড়লে তা থেকে বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে নেবে।

আল্লাহর রসুলকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কোন ব্যক্তি সম্মানিত ? তখন তিনি প্রশ্ন করেন, তোমরা কি আরবের কোনো বিশেষ বংশ সম্পর্কে জানতে চাও ? লোকেরা নিবেদন করল 'হ্যাঁ' তখন তিনি বললেন, 'যারা জাহিলিয়াতে (ইসলাম পূর্বে) শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামেও তারাই শ্রেষ্ঠ হবে যদি তারা জ্ঞান রাখে।' —বুখারী, মুসলিম

---

১. গ্রন্থ রচনার গতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রিয় রসুলের নামের সাথে পবিত্র দরুদটি বন্ধনীর মধ্যে লেখা হবে না, সেখানে পাঠককে মনে মনে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পাঠ করতে হবে। অন্যান্য নবী-রসুলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'আলাইহিস সালাম' পাঠ করতে হবে। পুরুষ সাহাবিদের ক্ষেত্রে 'রাজিয়াল্লাহু আনহু' এবং মহিলা সাহাবিদের ক্ষেত্রে 'রাজিয়াল্লাহু আনহা' পাঠ করতে হবে।—অনুবাদক

মুহাম্মদ এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যাদের এই সুসংবাদ এর সাফল্যে অংশ রয়েছে। কেননা, প্রাচীন যুগের আরব সমাজ হিংসা, হানাহানি ও পক্ষপাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যারা নিজের বংশের শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা ও শিষ্টতা রক্ষার জন্য আরবের অন্য সমস্ত গোত্রকে নিপাত করে দিতে পারত।

ইসলাম এক বিশেষ সময় পর্যন্ত এ সমস্ত প্রভাব বিস্তারী ঐতিহ্য এবং প্রচলিত শক্তিগুলোর সুরক্ষায় জীবিত থাকে, তারপর এক সময় সে তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, যেমন একটি বৃক্ষ মোটাতাজা হয়ে যাওয়ার পর তার আর কারো সহায়তার প্রয়োজন হয় না তেমনই।

হজরত লুত আলাইহিস সালাম যখন অতিথিদের ব্যাপারে কওমের পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা অনুভব করেন, তখন তিনি সেই শক্তি ও প্রচলিত সহায়গুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কিন্তু তিনি এমন কোনো পরিজনকে পেলেন না যিনি রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন কিংবা যিনি কওম ও আত্মীয়তার গৌরব ও মর্যাদা রক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি তাঁর কওমকে বললেন :

'অনন্তর, আল্লাহর প্রতি ভয় রাখ এবং আমার অতিথিদের অমর্যাদা কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই ?'

তারপর বললেন :

'কত না ভালো হতো যদি আমার মধ্যে তোমাদের বিরত রাখার শক্তি থাকত অথবা যদি কোনো শক্তিশালী আশ্রয়ের সাহায্য পেতাম।' —সূরা হুদ : ৭৯

পরন্তু মুহাম্মদ শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত সত্ত্বেও ধন-দৌলত তথা সহায় সম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অতএব, কুলশীলতা তথা বংশের সাথে ধনের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সেই বস্তু ছিল, যা তাঁর প্রারম্ভিক জীবনেই তাঁকে মানবশ্রেণীর উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। ধন-সম্পদ ধনী পরিবারের সন্তানকে ক্ষমতা লাভে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করে এবং যখন সে এই হাতিয়ারকে হারিয়ে বসে এবং তার কাছে শ্রেষ্ঠ বংশগত ঐতিহ্য থাকে তখন সে তার সম্মান ও পদ-মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে। অধিকাংশ লোকই নিজের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য তথা করুণ অবস্থাকে আড়াল করাটাকে দূষণীয় বলে বিবেচনা করে না।

কিন্তু এমন কিছু লোক আছে, যারা তাদের সংকল্প ও ইচ্ছাকে লুকিয়ে রাখে এবং অকস্মাৎ দুনিয়ার সামনে বড়ই গৌরব ও মর্যাদার সাথে আত্মপ্রকাশ করে। আব্দুল মুত্তালিব এই শ্রেণীর লোকেদের অন্যতম।

আব্দুল মুত্তালিব মক্কার সর্বময় কর্তা ছিলেন, কিন্তু এ কর্তৃত্ব তাঁর মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় এবং তাঁর শাখায় তাঁর পরে এ আর প্রচলিত থাকতে পারেনি। অতএব, মক্কায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই 'আরবে শামস' গোত্র প্রভুত্বশালী হয়ে উঠল।

তারপর কিছুকাল পর আবু সুফিয়ান মক্কার নেতৃত্বে উঠে এলেন। এভাবে বনু হাশিমের হাত থেকে এ নেতৃত্ব পরিবর্তিত হয়ে গেল।

আব্দুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। তিনি তাঁর পিতার খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহর বিয়ে দেন আমিনা বিনতে ওয়াহাবের সাথে। তারপর তিনি তাঁকে জীবন-সংগ্রামের পথে একা ছেড়ে দেন। আমিনার সাথে বিয়ের কয়েক মাস পর জীবিকা উপার্জনের জন্য গ্রীষ্ম ঋতুতে তিনি সিরিয়ায় গমন করেন কিন্তু আর ফিরতে পারেননি। কাফেলা ফিরে এসে তাঁর অসুস্থতার খবর দিল। কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু সংবাদও এসে পৌছাল।

আমিনা তাঁর প্রাণোচ্ছল ও প্রিয়তম স্বামীর জন্য বড় আশা নিয়ে প্রতীক্ষমাণ ছিলেন। তিনি যথাশীঘ্র তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে এই শুভ সংবাদ দিতে যাচ্ছিলেন যে, তাঁর গর্ভে তাঁর সন্তান প্রতিপালিত হচ্ছেন, যিনি অনতিবিলম্বেই পৃথিবীতে এসে তাঁদের চক্ষু শীতল করে দেবেন। কিন্তু সেই সর্বময় কর্তার অধীন ভাগ্য সেই সুখস্বপ্নকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই নববধূ বিধবা হয়ে গেলেন।

সময় থেমে থাকে না। সেই বিশ্ববিখ্যাত এবং জগৎশ্রেষ্ঠ অনাথ শিশু তাঁর মাতৃ-উদরে লালিত-পালিত হয়ে চললেন।

ইমাম জুহরী বলেন, আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্রকে মদিনায় প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর জন্য খেজুর সংগ্রহ করেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি ইন্তিকাল করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, মদিনা নয় ; বরং তিনি সিরিয়ায় গিয়েছিলেন এবং কুরাইশ গোত্রের একটি কাফেলার সাথে প্রত্যাবর্তনের সময়ে তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন এবং 'নবিগা' জা'দীর'র ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়। ঐ সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৫ বছর। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল রসুলুল্লাহর জন্মের কয়েক মাস পূর্বে।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মক্কায়' এক সাধারণ পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেন, কোনো আশ্চর্যজনক ও প্রভাবশালী ঘটনা সংঘটিত হয়নি। ঐতিহাসিকরা তাঁর জন্মদিন, মাস এবং বছর নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। সম্ভবত ৫৭০ ঈসায়ী সনে, আমুল ফীলের ১২ রবিউল আউয়ালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ হিজরতের ৫৩ বছর আগে।

জন্মতিথি নির্ধারণ ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এর সাথে মিলিয়ে যে সমস্ত সমারোহ বা উৎসব পালন করা হয় এ হলো বিশুদ্ধ জাগতিক রীতি, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

এরকম কিছু উল্লেখও পাওয়া যায় যে, তাঁর জন্মের সময় নবুয়তের চিহ্ন প্রকট হয়ে গিয়েছিল। অতএব, তাঁর জন্মের সময় 'কিসরা'র রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি কলস ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল, অগ্নি-উপাসকদের আগুন নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল

এবং কিছু গির্জা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছু কবি তাঁদের কবিতায় এরকম আরো অনেক অতিশয়োক্তি করে গিয়েছেন। এ ধরনের সাহিত্য তথা কবিতায় সঠিক ভাবধারার ভ্রান্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কথা সত্য যে, মুহাম্মদের জন্ম ছিল অন্যায়-অত্যাচারের পতনের ঘোষণা এবং 'কায়সার' (রোম-সম্রাট) ও 'কিসরা'র (পারস্য সম্রাট) রাজপ্রাসাদের ধ্বংসের স্পষ্ট চিহ্ন ছিল। একই অবস্থা ছিল মুসার জন্মের সময়েও। যখন আল্লাহ ফিরাউনের অত্যাচার ও তার দমনের ঘটনা বর্ণনা করেন তখন সাধারণ লোকদের দুঃখ-দুর্দশা ও পতনের সমীক্ষা করেন। তারপর জনসাধারণের স্বাধীনতা ও দুর্বলদের মুক্তির ঘোষণা করতে চাইলেন তখন সেই বীরের কাহিনী বর্ণনা করেন যিনি ঐ কাজের জন্য সংকল্পবদ্ধ, অতএব তিনি বলেন :

'আমি মুসার মাকে 'অহি' পাঠালাম যে, তাকে দুধ খাওয়াও।' —কাসাস : ৭

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর প্রত্যাদেশ যৌক্তিক ও মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য ঐ সমস্ত ইনকিলাবের চেয়ে অধিক ভয়ংকর, যার সাথে বিশ্বের লোকেরা আজও পর্যন্ত পরিচিত এবং কুরআনি সৈন্যরা এসব কিছুর থেকে অধিক ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়প্রিয় ছিলেন, যার সাথে ইতিহাসের পাঠকমাত্রই সুপরিচিত। যাঁর কীর্তি জালিম ও অত্যাচারীদের উৎপাটন এবং তাদের শক্তি-বৈভবকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য অক্ষয় হয়ে আছে।

অতএব অন্যায় ও অত্যাচারের ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসার পর লোকেরা এই বাস্তব চিত্রকে অক্ষয় করে রাখতে চাইল তখন তিনি অস্বাভাবিকতার সাহায্য নিলেন এবং তার জন্য ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত পড়ে নিলেন যদিও মুহাম্মদের ব্যক্তিত্ব ঐ সমস্ত বস্তু থেকে সবচেয়ে নিস্পৃহ, কেননা তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ যোগ্যতা সম্পর্কে এ সমস্ত রেওয়ায়েত আমাদের বিভ্রান্ত বা বিমুখ করে দেয়।

আব্দুল মুত্তালিব তাঁর পৌত্রকে অত্যন্ত আনন্দ ও উল্লাসের সাথে স্বাগত জানান। কেননা, এর মধ্যে তিনি তাঁর পরলোকগত পুত্রের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। অনন্তর, তিনি তাঁর লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ গভীর সহানুভূতি এবং কঠোর পরিশ্রমের সাথে করেন এবং তাঁর জীবন নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে তাঁকে লালন-পালন করেন।

এও এক অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার যে, আব্দুল মুত্তালিব তাঁর প্রিয় পৌত্রের নাম রাখলেন মুহাম্মদ।[১] এই নামকরণের ব্যাপারে ফিরিশতারা তাঁকে সাহায্য

---

১. 'মুহাম্মদ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ সমস্ত দিক দিয়েই প্রশংসা তথা স্তুতিযোগ্য। অর্থাৎ সবাই যাঁকে পছন্দ করে এবং সবাই যাঁকে ভালো বলে। জন্মের সপ্তম দিনে দাদা 'আকিকা' বা নামকরণ অনুষ্ঠান করেন। দাওয়াতে আগত লোকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই নাম বলেন।—অনুবাদক

করেছিলেন। কেননা, আরবরা এ ধরনের নামের সাথে পরিচিত ছিল না। অতএব, লোকেরা প্রশ্ন করল, 'আব্দুল মুত্তালিব ! নামকরণে ঐতিহ্যগত রীতি ত্যাগ করলেন কেন ?' তিনি উত্তর দিলেন : 'আমি চাই যে, পৃথিবী ও আকাশ জুড়ে সবাই তাঁর প্রশংসা করুন।' মনে হয়, এ সংকল্প ও আকাঙ্ক্ষা পরোক্ষ জ্ঞানের পরিচয়েরই পরিণাম ছিল। কেননা, ধরিত্রীর বুকে আজও প্রাণীকুলের মধ্যে এমন প্রশংসা স্তুতি ও ভালোবাসার পাত্র আর কেউ কখনো হতে পারেননি, যেমনটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়েছিলেন।

হজরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসুল (স) বলেন :

তোমরা কি এতে আশ্চর্য হও না যে, আল্লাহ কীভাবে আমার মাধ্যমে কুরাইশদের তিরস্কার এবং ধিক্কার দূর করে দিয়েছেন ? সেই সমস্ত লোক আমাকে 'মুজাম্মাম' (তিরস্কারযোগ্য) বলে যাচ্ছেতাই বলে, অথচ আমি 'মুহাম্মদ' (প্রশংসাযোগ্য)। –বুখারী

দাদার অত্যধিক স্নেহ-ভালোবাসা সত্ত্বেও অতি কঠোর ও কঠিনভাবে সত্য যে, তিনি ইয়াতিম[১] ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে সেই সময়ে প্রকাশ হলেন যখন তাঁর পিতা দুনিয়া ছেড়ে চির-অনন্তের পথে পাড়ি দিয়েছেন। মনে করুন, আব্দুল্লাহ জীবিত, তা সত্ত্বেও তাঁর জন্য তিনি কী করতে পারতেন ? তিনি পুত্রকে এভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন যে, পুত্র ভবিষ্যতে 'নবী' হবেন ? যদিও এ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল না। তিনি তো বিভিন্ন সাধনের মধ্যকার অন্যতম সাধন, যিনি সন্তানের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখতেন এবং জীবনের নিয়মানুসারে গতিশীল রাখতেন। নবুয়ত যদি স্বোপার্জিত হতো তা সত্ত্বেও পিতার জীবন সেখানে কোনো কাজে আসতে পারত না তথা নবুয়তপ্রাপ্তি ঐ অবস্থায় কীভাবে সম্ভব ছিল, যেখানে নবী হওয়াটা স্বয়ং আল্লাহর চয়ন বা মনোনয়নের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জীবিত ছিলেন, বৃদ্ধ ছিলেন, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, তত্ত্বদর্শিতাও ছিল, শুধু তাই নয়, নবুয়তের অমূল্য সম্পদও তাঁর ছিল। একদিন তিনি দেখলেন, ইউসুফ কাছে নেই। এই বয়সের ভার ও এ বিপজ্জনক অবস্থায় তিনি ভেঙে পড়লেন। বাতাবরণ ও পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত খারাপ ও চিন্তাদায়ক, কিন্তু ইউসুফের হৃদয় সংযম, শুদ্ধতা ও পবিত্রতায় তাকে পরিপক্ব হয়ে উঠছিল, যেমন প্রদীপ ঘনায়মান অন্ধকারেও দীপ্তিমান থাকে। তারপর দীর্ঘকাল পরে যখন পিতা ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফের সাক্ষাৎ হলো তখন তিনি ইউসুফকে সত্য-নবীরূপে পেলেন।[২]

আব্দুল্লাহ দুনিয়া থেকে প্রস্থান করলেন আর পুত্রকে ইয়াতিম করে গেলেন। কিন্তু এই ইয়াতিমকে প্রথম দিন থেকেই এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি

---

১. পিতৃহীন বা মাতৃহীন– এককথায় অনাথ। –অনুবাদক

২. আল্লাহর অপার কৃপা বর্ষিত হোক ইয়াকুব ও ইউসুফের প্রতি। –অনুবাদক

করা হচ্ছিল। তাঁর নবীদের সমস্ত সুকর্মের নায়ক হওয়ার কথা ছিল। তিনি বাপ, দাদা, আত্মীয়স্বজন, দুস্থ লোক, জমিন, আসমান সকলের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্তির জন্য এক ঘনীভূত সাধন।

আমিনা তাঁর পুত্রের উপর স্নেহ-ভালোবাসার পুষ্প বর্ষণ করে যেতে লাগলেন। আরবের গ্রাম্য-এলাকার দাই মহিলাদের আগমনের প্রতীক্ষায় রইলেন। যারা প্রতিষ্ঠিত পরিবারের শিশুদের দুধ পান করিয়ে, জীবিকা উপার্জনের পেশায় নিয়োজিত থাকে এবং সম্পন্ন পরিবারে তারা শিশুদের সন্ধানে আসে। মুহাম্মদের পিতা ছিলেন না, যিনি এর বিনিময়ে উপহার কিংবা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করতে পারতেন। অতএব, মহিলারা 'মুহাম্মদ'কে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করলে তাতে আশ্চর্যের কিছুই ছিল না।

বনি সা'দ গোত্রের হালিমা, আবু জুয়াইবের কন্যা সেই মহিলাদের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা মক্কায় শিশুদের নিতে এসেছিলেন। প্রথমে ইয়াতিমির কারণে তিনিও মুহাম্মদকে সাথে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু যখন কোনো শিশুকে না পাওয়া গেল তখন তিনি শূন্য হাতে ফিরে যাওয়াটা পছন্দ না করে আমিনার কাছে গেলেন তাঁর ইয়াতিম শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এই শিশুর শুভাগমনের সাথে সাথেই হালিমার গৃহে অনুগ্রহ আর প্রাচুর্যের বর্ষণ হতে লাগল। উটনীর বাঁট দুধে ভরে থাকতে লাগল, আর চারদিকে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য তাঁদের উপর ছায়া হয়ে বিরাজ করতে লাগল। অনন্তর হালিমা ও তাঁর পতি হারিস ইবনে আব্দুল উজ্জা বুঝতে পারলেন মক্কা থেকে তাঁদের প্রত্যাবর্তন হয়েছে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের সাথে, দারিদ্র্য ও দীনতার সাথে নয়। অতএব, শিশুর প্রতি তাঁদের স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা অনেক বেড়ে গেল এবং শিশুটিকে তাঁরা অনেক বেশি আদর ও সম্মান করতে লাগলেন।

গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলোতে শিশুদের পালন-পোষণের প্রধান কারণ ছিল তারা খোলা বায়ু ও আলো-বাতাসে এবং সহজ-সরল প্রাকৃতিক বাতাবরণে সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠতে পারত[১] এবং তাদের শিক্ষা ও যোগ্যতার বিকাশ হতো অত্যন্ত সুন্দরভাবে। প্রাকৃতিক শুদ্ধিকরণ, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অবয়ব তথা অনুভব ও সংবেদনার বিকাশ ও চিন্তাধারার উত্তম ও সার্থক লালন-পালনের এটাই ছিল উপযুক্ত পদ্ধতি।

শিশুদের সংকুচিত ও সংকীর্ণ পরিবেশে ক্ষুদ্রতম গণ্ডির মধ্যে লালন-পালন তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। এটা করার অর্থ হলো একটি পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে মুক্ত বাতাস ও স্বাধীন পরিবেশ থেকে বঞ্চিত করা।

---

১. এর অন্যতম উদ্দেশ্য এও ছিল যে, শিশু মূল আরবি সাহিত্যের আলোকায়িত শৈলী এবং সরল সুন্দর ও শুদ্ধ ভাষার সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠতে পারে আর তাতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। – অনুবাদক

আধুনিক সভ্যতার প্রদত্ত মানসিক ও স্নায়বিক অব্যবস্থার বাস্তবিক কারণ হলো প্রকৃতির কোল থেকে অনেক দূরে ঘেরাটোপের মধ্যে শিশুদের কৃত্রিমভাবে লালন-পালন। মক্কার সম্পন্ন অধিবাসীরা তাঁদের শিশুদের গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলোতে পাঠিয়ে দিতেন যাতে ঐ শিশুদের লালন-পালন পবিত্র এবং স্বচ্ছ বাতাবরণে হতে পারে। লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিতের মত হলো, শিশুদের প্রশিক্ষণ ও লালন-পালনের প্রথম পাঠ দেয়া উচিত শুদ্ধ-সরল প্রকৃতির কোলে যাতে তার মন-মনন বিবেক ও ধ্যান-ধারণা এই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সমন্বিত হতে পারে। এ যুগে এটা মনে হয় যে, এ কেবল এক স্বপ্ন, বাস্তবের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

দুই
সক্কে সদর (বক্ষ বিদারণ)-এর ঘটনা

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সাদের আশ্রয়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত অবস্থান করলেন। গ্রামীণ ক্ষেত্রে এই নিবাসের কারণে তাঁর শরীর খুব সুস্থ সবল হয়ে বেড়ে উঠল এবং স্বচ্ছ জলবায়ুর কারণে তাঁর শরীরের গঠন হলো মজবুত ও সুন্দর। তাঁর এই পাঁচ বছর বয়সের জীবনে কোনো উল্লেখনীয় ঘটনা প্রকট হওয়ার আশা না করা উচিত। কিন্তু হাদিসের ধারাবাহিক বর্ণনায় এমন এক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে যা 'সক্কে-সদর' বা বক্ষ বিদারণের ঘটনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

'আনাস বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিব্রাইল নেমে এলেন, তখন তিনি শিশুদের সাথে খেলা করছিলেন। জিব্রাইল অগ্রসর হয়ে তাঁকে ধরে চিৎ করে শুইয়ে ফেলে পেট চিরে হৃৎপিণ্ডকে বের করলেন এবং তা থেকে একটি মাংসখণ্ড বের করে বললেন : এটি শয়তানের অংশ। তারপর সুবর্ণ পাত্রে সেটি রেখে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেন এবং স্বস্থানে সেটি রেখে বুক সেলাই করে দিলেন। শিশুরা দৌড়ে গিয়ে তাঁর দুধ-মা হালিমার কাছে গিয়ে খবর দিল মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন। লোকেরা দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে দেখল তাঁর বদন মলিন হয়ে গেছে।' —মুসলিম

তিনি যখন হালিমা সাদিয়া ও তাঁর পতির ওখানে শৈশবাবস্থা অতিক্রম করছিলেন তখন এ ঘটনা তাঁদের দু'জনকে ভীত করে তোলে। পরন্তু ঐ ঘটনা আবারো সংঘটিত হয় যখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। মালিক ইবনে সামিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে একটি ঘটনা শোনান এবং বলেন :

'সে সময় আমি কাবা-গৃহের হাতিম-এ অবস্থান করছিলাম, কখনো বলেন, আমি 'হুজরা'য় ছিলাম– তখনও আমি অর্ধজাগ্রত বা তন্দ্রালু অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় আমার কাছে এক ব্যক্তি এল এবং আমার হৃদপিণ্ড বের করে নিল। তারপর আমার কাছে একটি সুবর্ণপাত্র আনা হলো যা ছিল 'ঈমান'-এ পূর্ণ। অনন্তর, তিনি আমার হৃৎপিণ্ড ধৌত করে সেটি আবার যথাস্থানে রেখে একে সেলাই করে দিলেন।' –বুখারী, নাসাঈ

যদি 'শর' বা মন্দ বা ক্ষতিকর বস্তু যার সম্পর্ক দুর্গন্ধে বা খারাপের সাথে, তা নিষ্কাশনের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় অথবা 'খৈর' বা মঙ্গল বা কল্যাণ এমন এক বস্তু যার দ্বারা হৃদয়কে শক্তিশালী করে তোলা যায়, যেমন উড়তে বায়ু যানে শক্তি সৃষ্টি করে দেয়া হয় আর সেই শক্তির জোরে সে অন্তরীক্ষে উড়তে থাকে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, বাহ্য অর্থই এ হাদিসের অভিপ্রেত। পরন্তু, এখানে বিষয়টি হলো 'খৈর' ও 'শর' এই ভৌতিকতা থেকে অনেক দূরের ; বরং বুনিয়াদি সত্য হলো এ দুই বস্তু মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। যেখানে এর বিয়ষটি রুহের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেছে, সেখানে রুহের আদেশ চলে, বা অন্য কথায়, বিতর্ক যখন এই পর্যায়ে এসে গেল, ঐ সমস্ত সাধনকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল, যার দ্বারা রুহ বা আত্মা রক্ত-মাংসের তৈরি অঙ্গ বা আবরণকে পরিচালিত করে তাহলে এ বিতর্ক নিরর্থক হয়ে যায়। কেননা, মানব-শক্তির কোনো দখল বা অধিকার এখানে থাকে না।

এ সমস্ত হাদিস থেকে কেবল একটাই মাত্র সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে, মুহাম্মদ এর মতো শ্রেষ্ঠ ও মহান ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহতা'লা ভ্রম শঙ্কা তথা মিথ্যা ধ্যান-ধারণা থেকে সুরক্ষিত করে দিয়েছেন। যদি 'শর' বা অমঙ্গল, অকল্যাণ বা কু-এর প্রবাহ সমগ্র দুনিয়াকে ছেয়ে ফেলে এবং তা দ্বারা লোকদের হৃদয় প্রভাবিত হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা ও দয়ায় নবীদের হৃদয় এ সমস্ত মন্দ, দূষিত ও হানিকারক প্রভাবের প্রতি কখনোই ঝুঁকে পড়ে না, তাঁরা ওসবের সাথে কোনো সম্পর্কও রাখেন না। অতএব, নবী-রসুলদের প্রচেষ্টা রক্ষার নয় ; বরং প্রয়াস ও কর্মের হয়ে থাকে। শুধু নিজেই পবিত্র থাকার প্রয়াস চালান না ; বরং আরো অগ্রসর হয়ে জনসাধারণকেও সুরক্ষিত রাখার প্রয়াস চালান, কেননা, আল্লাহ অবৈধতা ও অশ্লীলতা থেকে তাঁদের আগে থেকেই সুরক্ষিত রাখেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রসুল বলেন :

'তোমাদের মধ্যেকার প্রত্যেকের উপর 'জিন' ও 'ফিরিশতাদের' দ্বারা আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল : আপনার উপরেও কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমার উপরেও, কিন্তু আল্লাহ তাদের মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেছেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অতএব সে আমাকে 'খৈর' ও কল্যাণের পরামর্শই দিয়ে থাকে।' –মুসলিম

'হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদিসে উল্লেখ আছে, তাঁকে আল্লাহর রসুল (স.) বলেন :

'কী ব্যাপার ? দুষ্টুমি করছ কেন ? আয়েশা (রা) (রসুল পত্নী) নিবেদন করলেন, 'আপনার সাথে দুষ্টুমি করার কোনো হিম্মত কি আমার আছে ?' আল্লাহর রসুল বললেন, 'তোমার কাছে শয়তান এসে গেছে।' তিনি প্রশ্ন করলেন, আমার কাছে কি কোনো শয়তান রয়েছে ? তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে শয়তান লেগে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হলো : আপনার সাথেও !' হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং তারা মুসলমান হয়ে গেছে।' –মুসলিম

অর্থাৎ সে বাধ্য হয়ে গেছে এবং সে আমার হৃদয়ে অসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে দিতে পারে না।

কদাচিৎ, সক্কে-সদর বা বক্ষ বিদারণের ঘটনার সেই রক্ষণাত্মক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে যা আল্লাহ তাঁর রসুলের জন্য করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর বাল্যাবস্থার শুরু থেকেই মানব-স্বভাবের দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখেন এবং জাগতিক জীবনের ফিতনা ও ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে সুরক্ষিত করে দিয়েছিলেন। আল্লামা খাজিনই নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় শৈশবাবস্থার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন :

'আমি কী তোমার বক্ষ উন্মোচন করিনি ? আর তোমার উপর থেকে তোমার বোঝা নামিয়ে দিইনি, যা তোমায় কোমর ভেঙে দিচ্ছিল।' –আল ইনশিরাহ : ১-৩

এখানে যে সক্কে-সদর, বা বক্ষ উন্মোচনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কোনো ফিরিশতা বা কোনো শল্য-চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের পরিণাম নয় ; বরং এটাই উচিত ও যুক্তিসঙ্গত হবে, যদি সুন্নতে বর্ণিত যথার্থতা বা ভৌতিকতা[১] প্রয়োগের শৈলীটি ঠিকমত বুঝে নেয়া যায়। হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ আছে, তাঁর কয়েকজন পত্নী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন :

'হে আল্লাহর রসুল ! আমাদের মধ্য থেকে কে সবার আগে আপনার সাথে মিলিত হবেন ? (অর্থাৎ, মৃত্যু হবে ?) তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যার হাত সবার চেয়ে দীর্ঘ। অতএব, আমরা সবাই একে অন্যের হাত মাপতে শুরু করলাম, তখন হাওদার হাত সবার চেয়ে লম্বা প্রতীত হলো। পরে আমরা জানতে পারলাম যে, এ হাত লম্বার তাৎপর্য হলো যিনি সর্বাধিক দানকারিণী। তিনি দান করতে খুবই পছন্দ করতেন এবং তিনিই সবার আগে তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাথে গিয়ে মিলিত হন।' –বুখারী

গ্রামীণ ক্ষেত্রে কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর হজরত মুহাম্মদ মক্কায় ফিরে এলেন, যাতে মাতৃহে ছায়াতলে লালিত পালিত হতে পারেন। যিনি সন্তানকে আপন-

---

১. আল্লাহর অতিরিক্ত যা কিছু আছে উর্দুতে তাকে বলে 'মজাজ'। –অনুবাদক

কোলে তুলে নেয়ার আশায় প্রতীক্ষমাণ ছিলেন। দয়ালু এবং অনুগ্রহশীল দাদার ছত্রছায়ায় থাকতে পারেন– যিনি তাঁর পৌত্রের মধ্যে তাঁর যুবক পুত্রের ছায়া দেখতে পেতেন, যিনি যুবক বয়সেই আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন।

কাল তাঁকে এই দয়াবান ও মমতাময়ীর বক্ষে বেশিদিন থাকতে দিল না, এ দুয়ের একজনের থেকে আল্লাহ তাঁকে বঞ্চিত করে দিলেন।

আমিনা তাঁর পরলোকগত পতির বিয়োগ-ব্যথায় বিকল হয়ে ইয়াসরিব[১] যাওয়ার জন্য মনস্থ করলেন, যাতে তাঁর পতির সমাধি দর্শন করতে পারেন। অনন্তর পাঁচশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ইয়াসরিব পৌছালেন কিন্তু তাঁর মক্কায় ফেরার সৌভাগ্য আর হলো না। এই দীর্ঘ যাত্রায় বালক পুত্র মুহাম্মদ ও 'বরকা' দাসী, যিনি পরবর্তীকালে 'উম্মে আইমনা'[২] নামে পরিচিত হয়েছিলেন, সাথে ছিলেন। আব্দুল্লাহর মৃত্যু কোনো অজানা স্থানে নয় ; বরং তাঁর মামা বনু নজ্জারের বাড়িতে হয়েছিল। ইবনুল আসির বর্ণনা করেছেন :

'হাশিম' সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যাওয়ার মনস্থ করেন। অতএব, তিনি যখন মদিনায় আসেন তখন উমর ইবনে জায়েদ ইবনে শুবাইদ আল-খাজরাজীর ওখানে অতিথি হলেন। তাঁর কন্যা 'সালমা'-কে দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন এবং তিনি তাঁকে বিয়ে করলেন। কন্যার পিতা এই শর্ত আরোপ করলেন যে, মাতৃগর্ভে লালিত সন্তান তার মাতুলালয়েই জন্মগ্রহণ করবে। তারপর হাশিম তাঁর গন্তব্যে চলে গেলেন। যেখান থেকে ফেরার পর মদিনায় ঐ কন্যার সাথে রাত্রি যাপন করেন তারপর তাঁকে সাথে করে নিজের মাতৃভূমি মক্কায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। যখন গর্ভ স্পষ্ট হয়ে গেল তখন তাঁকে ইয়াসরিবে তাঁর মাতা-পিতার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। 'হাশিম' গাজায়[৩] মৃত্যুবরণ করেন আর সালমার গর্ভে আব্দুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর, আব্দুল মুত্তালিব (শওবা) মদিনায় সাত বছর অতিবাহিত করেন।'

জনাব মুহাম্মদ তাঁর মামার বাড়িতে তাঁর পিতার কবরের কাছে এক মাস পর্যন্ত থাকেন। তারপর মায়ের সাথে মক্কার উদ্দেশে রওনা হন। পথিমধ্যে তাঁর মা

---

১. মদিনার প্রাচীন বা আসল নাম ইয়াসরিব। রসুলুল্লাহর হিজরতের পরে তা মদিনাতুন্নবী বা নবীর শহর নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এখন কেবল মদিনা নামেই পরিচিত। এখানে রসুলুল্লাহর রওজা শরিফ রয়েছে। –অনুবাদক

২. আব্দুল্লাহ যে সম্পদ রেখে যান তাঁর মধ্যে দুটি উট ও একটি দাসী ছিল। যিনি এ যাত্রায় সাথি হয়েছিলেন। এর প্রথম বিয়ে উবাইদুল্লাহ হাবশির সাথে হয়েছিল। তাঁরই পুত্র আইমান। যে জন্য তাঁকে উম্মে আয়মানা বলা হতো। –অনুবাদক

৩. বর্তমান গাজা উপত্যকা, সিরিয়ার একটি শহরের নাম। –অনুবাদক

অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যাত্রার প্রারম্ভেই রোগ বেড়ে যায়। অনন্তর তিনি, 'আরবা' নামক স্থানে পরলোক গমন করেন। তখন শিশু মুহাম্মদ দাসী 'বরকা'র সাথে রয়ে যান।

কী দুঃসহ অবস্থা ছিল এ ! মাতৃগর্ভে থাকতে পিতা চলে গেলেন আর পাঁচ বছর বয়সে মাতা চলে গেলেন !

এই নতুন আপত্তিতে পুরাতন ক্ষত আরো দগদগিয়ে উঠল, সে জন্য আব্দুল মুত্তালিবের অন্তরের স্নেহ-ভালোবাসা অনুগ্রহ যেন উথলে উঠল এবং এবারে তিনি মুহাম্মদ-এর জন্য নিজের হৃদয়-মন-প্রাণ ও আত্মা উৎসর্গ করে দিলেন। অতএব, দাদা পৌত্রকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না, কখনো তাকে একলা ছেড়ে দিতেন না, সব সময়েই সাথে সাথে নিয়ে ফিরতে লাগলেন। যখন কাবাগৃহে নেতা ও উপনেতাদের নিয়ে বৈঠক করতেন, সে সময়ও তিনি মুহাম্মদ-কে নিজের কাছে বসিয়ে রাখতেন।

আব্দুল মুত্তলিব দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন। কথিত আছে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশো কুড়ি বছর। তাঁর মৃত্যুকালে মুহাম্মদের বয়স ছিল আট বছর। অনন্তর, নিজের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তাঁর চাচা আবু তালিবের উপর অর্পণ করে গেলেন।

আবু তালিব ভাইপোর দীক্ষা তথা অভিভাকত্বের হক আদায় করে গেলেন। তাঁকে সর্বদাই নিজের সন্তানদের সাথে রাখলেন। শুধু তাই নয় ; বরং তিনি তাঁকে তাঁদের উপর প্রাধান্য দিয়ে গেলেন। এবং চল্লিশ বছরেরও বেশি বয়স পর্যন্ত অভিভাবকত্ব করলেন। চিরকাল তাঁর পক্ষপাতী ও সংরক্ষক হয়ে রইলেন আর ভাইপোর কারণেই লোকদের শত্রু কিংবা মিত্র হয়ে রইলেন।

মুহাম্মদ আবু তালিবের গৃহে বেড়ে উঠতে লাগলেন। সময়ের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হতে লাগল। অনন্তর, তাঁর চাচার অভাবের কারণে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা, অধিক সন্তানের কারণে আবু তালিবের পরিবারে খুবই অভাব-অনটন ছিল। অতএব, চাচা যখন সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন ভাইপো তাঁকে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল তেরো বছরের কাছাকাছি।

তিন

বহিরা পাদরির কিসসা

এই ভ্রমণের উল্লেখ হাদিসের গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে পোক্ত করে তোলে এবং মানবজীবনেও তার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। মুহাম্মদের ন্যায় অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, পরিচ্ছন্ন মন তথা সচেতন মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে নিহিত শিক্ষা কীভাবে গোপন থাকতে পারত ? ভ্রমণকালে বিশ্রাম গ্রহণের স্থানগুলোতে তিনি যা কিছু দেখতেন তার বাস্তবিকতা থেকে কীভাবে অচেতন থাকতে পারতেন ? কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে সত্য যে, তিনি কোনো ধর্ম ও দর্শন শিক্ষার জন্য ভ্রমণে বের হননি। এ যাত্রায় এমন কোনো ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি, যিনি এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। রেওয়ায়েতের গ্রন্থাবলিতে এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা তথা মোজেজার উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলোর অন্যতম একটি ঘটনা হলো 'বহিরা পাদরির' সাথে সাক্ষাৎ। বহিরা তাঁর মধ্যে বৈভব, মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে এবং তাঁর চেহারায় নবুয়তের স্পষ্ট চিহ্ন (মোহর) দেখেছিলেন। যখন তিনি আবু তালিবকে জিজ্ঞাসা করেন 'ইনি কে ?' তখন তিনি বলেন, 'আমার পুত্র।' বহিরা একথা শুনে বলেন, 'এঁর পিতা জীবিত থাকতে পারেন না।' তখন আবু তালিব বলেন, 'ইনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি মাতৃগর্ভে থাকাকালে এঁর পিতা পরলোক গমন করেন।' বহিরা বলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন, এঁকে বাড়িতে নিয়ে যান এবং সদাসর্বদাই এঁকে ইহুদিদের থেকে রক্ষা করে চলবেন।'

সম্ভবত এ কাহিনী সত্য। কেননা, ঈসায়ীদের[১] কিতাবে এক নবীর শুভাগমনের কথা বলা হয়েছে এবং আজো পর্যন্ত এরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী বলে অস্বীকার করার কারণে সেই প্রতীক্ষিত নবীর পথ চেয়ে বসে আছে। যদিও তিনি আর কখনো আসতে পারেন না। কেননা, তিনি এসে গিয়েছেন।

বহিরা পাদরির এ কিসসা সঠিক বা ভ্রান্ত[২] যাই হোক না কেন, প্রকৃত বাস্তবিকতা হলো তাঁর উপরে এ ঘটনার কোনো প্রভাব ছিল না। কেননা, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ

---

১. মুসলমানরা তাঁকে ঈসা (আ) বলেন, এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যাঁকে ঈসা ইবনে মরিয়ম বলা হয়েছে। অমুসলমানরা বিশেষত, ঈসায়ীদের অনুসারীরা তাকে যেসাস বা যেসাস ক্রাইট বা যিশুখ্রিস্ট বলেন। আমরা এখানে যিশু বা তাঁর অনুসারীদের ঈসা ও ঈসায়ী বলে অভিহিত করব। –অনুবাদক

২. তিরমিজি ১৬/৪ অধ্যায়ে মুসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, যাতে এই কিসসাকে সঠিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। – লেখক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাদরির কথা শোনা সত্ত্বেও নবুয়তের বিষয়ে কখনো চিন্তা করেননি এবং সে ব্যাপারে প্রস্তুতিও নেননি এবং কাফেলার যাত্রীরা সে কথা প্রচারও করেননি ; এ কথা সেখানেই ঢাকা পড়ে যায়, মানে এ ঘটনা যেন ঘটেইনি, কেননা ব্যবহারিক রূপে তা সম্ভবই ছিল না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রোমের একটি অশ্বারোহী দল বহিরার কাছে কোনো একটা কিছুর সন্ধানে আসে, যখন তিনি তাদের কাছে এর কারণ জানতে চান তখন তারা বলেন : আমরা জানতে পেরেছি এই পথ দিয়ে এই মাসে একজন নবী আসবেন, অতএব, তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য চারদিকে লোক পাঠানো হয়েছে। বহিরা তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে তাদের সন্তুষ্ট করে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

কিছু বিচারকের মতে, এটি একটি মনগড়া বর্ণনা[১] আর এ হলো ঐ রেওয়ায়েতেরই সমান যা ইনজিল-এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিছু লোক মসিহর জন্মের পর তাঁকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল এবং এ ঈসায়ীদের কাছে ঐ ঘটনার অনুরূপ, যা মূর্তিপূজকদের ওখানে সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ মহাত্মা যিশুকে যখন তাঁর অবিবাহিত মাতা জন্ম দেন তখন তাঁকে হত্যা করার জন্য শত্রুরা তাঁকে খোজাখুঁজি করতে শুরু করে।

হাদিসবেত্তারা এ সমস্ত রেওয়ায়েতকে তাঁর মূল উল্লেখ তথা প্রামাণিকতার কষ্টি পাথরে যাচাই করেন, অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া না যাবে বা বিশ্বস্ত বলে গণ্য হবে ততক্ষণ তাকে গ্রহণযোগ্য বা বিচারযোগ্য বলে মনে করেন না। নবীদের জীবনীসমূহে আফসানা বা কাহিনীগুলোকে বাড়িয়ে-চড়িয়ে বর্ণনা করা হয়। যখন সেগুলোকে হাদিস-যাচাইয়ের কষ্টি-পাথরে রেখে বিচার করা হয় তখন তার মিথ্যাচারিতা তথা গুরুত্বহীনতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়ে যায়।

চার
পরিশ্রমী জীবন

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাণিজ্য-যাত্রা থেকে ফিরে এলেন এবং তিনি তাঁর চাচার সাথে পরিশ্রম করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পুরুষদের জন্য নিষ্কর্ম হয়ে বসে থাকা বা অন্যের বোঝা হয়ে থাকাটা একেবারেই শোভনীয় নয়। তাঁর পূর্বেকার নবীরা নিজেদের পিতা-মাতার উপার্জন খেতেন, বিভিন্ন রকমের কলাকৌশল শিখতেন, যার দ্বারা নিজেরা ধনোপার্জন করতে পারতেন। 'সহিহ'

---

১. নাসিরউদ্দিন আলবানী এ ঘটনাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু তিনি সমস্ত মতামত সম্পর্কে একমত নন। –অনুবাদক

হাদিস[১] হতে অবগত হওয়া যায় যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রারম্ভিক জীবনে ছাগল চরাতেন। তিনি বলেন :

'আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম। এ প্রমাণিত সত্য যে, অধিকাংশ নবী ছাগল চরিয়েছেন।'

আবু হুরাইরাহ থেকে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, তিনি বলেন : 'হ্যাঁ, আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি।' –বুখারী

আপনি কি মনে করেন যে, এ থেকে জনগণের সাথে ব্যবহার, দুর্বলদের সাথে নরম ব্যবহার ও তাদের সুরক্ষার জন্য রাতভর ইবাদত করার প্রশিক্ষণ অভিপ্রেত ছিল না ?

প্রশ্ন ওঠে যে, বিশ্ব-ভুবন ও পরলোক সম্পর্কিত জ্ঞান, বিবেক তথা পরিচয় ও সে সবের বাস্তবিকতা কি নবীদের হৃদয়ে সহসা উৎপন্ন হয়ে যায় বা তত্ত্বদর্শিতার দীক্ষার কোনো প্রয়োজন হয় না ? এর উত্তর 'কখনোই না।' কেননা, নবীদের এ সমস্ত পদ্ধতি ও নিয়মানুযায়ী জ্ঞান অর্জন করতে হতো না, যেমনটি আমাদের মতো মানুষেরা শেখেন। পরন্তু তাঁদের মধ্যে ভাবনা-চিন্তার সুরক্ষার পূর্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়তা লক্ষ করা যায়, যা তাঁদের শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানীদের চেয়ে অগ্রবর্তী করে দেয়, যদিও তাঁরা এ সমস্ত চিন্তা ও পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জন করেন না, যেমনটি আমরা করতে অভ্যস্ত।

এ কোন জ্ঞান যার দ্বারা হৃদয়, মন, প্রাণ ও আত্মা বিকাশোন্মুখ হয়ে ওঠে ? তাঁদের কি পাঠ মুখস্থ করে নেয়া বা সেসবের নিয়ম তথা সিদ্ধান্তের কথা জেনে নেয়াটা যথেষ্ট ?

তোতা পাখির উদাহরণ আমাদের সামনেই আছে, তারা মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর তার পুনরুচ্চারণ করে। ছোট বাচ্চাদের দেখুন, তারা অভ্যাস ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বড় বড় নেতা ও রাজনীতিকদের ভাষণ ঠিক তাদেরই ঢঙে বা তাদের মতো করেই পেশ করে দেয়।

কিন্তু বাচ্চারা নেতাদের ভাষণ মুখস্থ করে নেতা হয়ে যায় না, তেমনই তোতা পাখি মানুষের কথা পুনরুচ্চারণ করে মানুষ হয়ে যায় না।

এমন অনেক মানুষ পাওয়া যাবে, যারা মুখস্থ করতে, বুঝতে, তর্ক-বিতর্ক করতে এমনকি তার মাধ্যমে জয়লাভ করারও ক্ষমতা রাখে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয়ে তাদের উদাহরণ হলো ছাইগাদায় সোনার আংটি খোঁজার সমান।

কুরআনে ইহুদি আলেমদের গাধার সমান বলে অভিহিত করা হয়েছে, যারা 'তাওরাত'[২]-কে তুলে ধরে, অথচ তাদের জীবনে তার কোনো প্রভাব দেখা যায় না।

---

১. সহিহ অর্থাৎ সঠিক, নির্ভুল, প্রামাণ্য। –অনুবাদক

২. 'তাওরাত' –আসমানি কিতাবগুলোর অন্যতম, যা হজরত মুসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়। –অনুবাদক

'ঐ সমস্ত লোকদের উদাহরণ, যাদের উপর 'তাওরাত'-এর বোঝা অর্পণ করা হয়েছে, অথচ তারা তার বোঝা ওঠায়নি ; তা এমনই, যেমনটি কোনো গাধার পিঠে কিতাবের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।' –আল জুমুআ : ৫

যে ব্যক্তি জ্ঞান তো রাখে কিন্তু তা থেকে সে লাভবান হতে পারে না, সে কুপথে চলে যায় আর তার অর্জিত জ্ঞান বিফলে যায়। অতএব, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

'অযোগ্য ব্যক্তিদের জ্ঞান তথা বিদ্যা শিক্ষাদাতাদের উদাহরণ শূকরের গলায় সোনা বা মণি-মুক্তোর মালা পরিয়ে দেয়ার মতো।'[১] –ইবনে মাজা

এমন কিছু খুরাফাতি বা ব্যর্থতাপ্রিয় এবং অযোগ্য লোকও আছে, যারা নিজেরাই তথ্যাবলিকে ভুলভাবে তুলে ধরে, মানে তাদের বুদ্ধির যে মানদণ্ড আছে তার পাল্লা অকারণে একদিকে ঝুঁকে যায়। এমন মানদণ্ডে কখনো সঠিক ওজন হতে পারে না। এরা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বিষয়ের প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করে ও তাতে আনন্দ পায় ও তাকে স্বীকার করে নেয় এবং বাস্তবিকতা ও প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে কটু মনোভাব পোষণ করে এবং তাকে নিষ্ফল বলে প্রচার করে।

আমরা এ ধরনের লোকদেরও দেখেছি যে, কুড়ি বছর ধরে শিক্ষা লাভ করার পরও তাদের কাছে কোনো সমস্যা তুলে ধরলে আশকথা-পাশকথা বলে মূল বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কিন্তু যদি কোনো স্বচ্ছ বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে ঐ সমস্যা তুলে ধরা হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ সে ঐ সমস্যার সমাধান করে দেয়। এর অর্থ হলো এই যে, প্রথম ব্যক্তি নিজের বাঁকা বুদ্ধিকে সোজা করতে কুড়ি বছর লাগিয়ে দিয়েছে, তর্ক-বিতর্ক করেছে, পড়াশোনা করেছে তা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারল না, জন্ম থেকেই যার বুদ্ধির বিকাশ দৃঢ়তার সাথে হয়েছিল।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী অধ্যয়ন করার পর আমাদের এই ঈমান বা বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় হয়ে যায় যে, তিনি সঠিক চিন্তা ও পূর্ণ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন এবং ভেড়া চরানোর পূর্বে এবং পরেও গ্রামীণ জীবনের অন্ধকারে সচেতন মনও স্বচ্ছ রাখতেন। গাফিল ও মদোন্মত্ত লোকদের মধ্যেও নিজের মন ও হৃদয়কে সদা-জাগ্রত রাখতেন।

আরব উপদ্বীপের বাতাবরণে মদোন্মত্তদের মদোন্মত্ততা বৃদ্ধি পেতে পারত আবার সচেতন ও জাগ্রত ব্যক্তির উত্তাপও বৃদ্ধি পেতে পারত, যেভাবে সূর্যকিরণ কাঁটা ও ফুলকে সমভাবে বিকশিত করে। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. এ হাদিস অশুদ্ধ ও অপ্রমাণিত। অতএব এর উপর আপত্তি তোলা হয়েছে। –অনুবাদক

ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ নীরবতা থেকে সাহায্য নিতেন। তাঁর নীরবতা দিন ও রাতভর ব্যাপ্ত থাকত। তাঁর নীরবতা মরুস্থল তথা সমস্ত প্রকারের মরূদ্যানের উপর আচ্ছাদিত থাকত, অর্থাৎ তিনি এই দীর্ঘ ও পরিব্যাপ্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে চিন্তা করতেন এবং সত্যের নিরন্তর সন্ধান ও জিজ্ঞাসার সহায়তা নিতে চাইতেন এবং আত্মার বিকাশের স্থায়ী স্থান নিঃসন্দেহে ঐ হাফিজদের সাথে সম্পর্কিত যাদের মধ্যে বিবেক বোধ না আছে অথবা ঐ বিবেকের সাথে নৈতিকতা থাকবে, তাই-ই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য, তথা জীবন ও বিশ্ব-সম্মানের বিষয়ে এর উদাহরণ পেশ করা ঐ লোকদের মোকাবিলার অধিক উত্তম, যা ভ্রম ও ভ্রান্তিপ্রিয়তাকে নিজের গলহার বানিয়ে রেখেছে এবং এতেই তার জীবন ও এতেই তাদের জীবন মরণ নির্ধারিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এই বিচিত্র ও অনুপম প্রবৃত্তিকে রক্ষার জন্য আল্লাহতা'লা তাঁর দেখভাল তথা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। অতএব, যখনই দুনিয়ার মোহ ও সাজসজ্জার প্রতি তাঁর মন আকর্ষিত হয়েছে এবং তুচ্ছ ও সাধারণ কোনো বস্তু বিষয়ে অন্তর্ভাবনা জোরদার হয়েছে, তখনই ঐশ্বরীয় শক্তি তাঁর মধ্যে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে রক্ষা করেছে। ইবনে আসির-এর বর্ণনা মতে, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'ইসলাম-পূর্ব যুগের লোকেরা যে সমস্ত বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তার প্রতি আমি দু'-একবারের বেশি আকর্ষণ অনুভব করিনি, আর প্রতিবারই আল্লাহ আমার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যেতেন, তারপর আল্লাহ আমাকে নবী মনোনীত করার আগ পর্যন্ত আমার মনে সেই আকাঙ্ক্ষা আর কোনো দিন জাগেনি। যে বালকটি আমার সাথে ছাগল চরাত তাকে একদিন আমি বললাম, তুমি আমার ছাগলগুলোকে দেখভাল কর, আমি মক্কায় গিয়ে রাতের মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানটি দেখে আসি, যেখানে লোকেরা দলে দলে অংশগ্রহণ করছে। সে রাজি হয়ে গেল। অতএব, আমি নগরের দিকে চললাম এবং আমি প্রথম বাড়িটিতে গান-বাজনার একটি মনোহর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম– 'এখানে কী হচ্ছে ?' লোকেরা বলল যে, অমুক-অমুকের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে। আমি বসে পড়লাম আর সহসা আমার দু'নয়ন মুদে এল, ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। এমনকি, সকাল হয়ে গেল, সূর্য উঠল, তার তাপে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি ফিরে গেলাম, তখন আমার সাথি আমাকে রাতের অবস্থার কথা শুধালে আমি পুরো বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিলাম। পরদিন রাতে আমার সাথিকে একথা বললে সে রাজি হয়ে গেল। তারপর আমি মক্কায় প্রবেশ করলাম এবং আগের রাতের মতোই ঘটনা ঘটল। তারপর আমার মনে এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা আর কখনো জাগেনি।' –হাকিম

শিক্ষার বিভিন্ন শ্রেণী বাস্তবে 'জিহাদ'[১] এর সেই ধাপ যা বুদ্ধির সংস্কার করে বা শুধরে দেয় আর যোগ্যতাকে বিকশিত করে তোলে এবং মানুষ বিশ্ব তথা জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক রাখে। প্রতিটি শিক্ষা বা বিদ্যা যা এ ধরনের বিকাশ তথা পটভূমি প্রদান না করে, এ অনুধাবনযোগ্য নয়, তা সে শিক্ষা যত সনদই প্রদান করুক না কেন। সবচেয়ে বেশি সম্মানযোগ্য তথা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছানোর সঠিক পথ হলো উচ্চতম বোধ ও সঠিক চিন্তাধারা লাভ করা এবং সঠিক সাধন ও শুদ্ধ উদ্দেশ্য লাভ করা। কুরআন এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে, ইব্রাহিম ঐ সমস্ত বিশেষত্বের বড় একটা অংশ লাভ করেছিলেন। কুরআন বলেন :

'আর এর পূর্বে আমরা ইব্রাহিমকে ঐ চেতনা (বোধশক্তি) দান করেছিলাম। আর আমরা তাকে ভালোভাবে জানতাম। স্মরণ কর, যখন সে তার পিতা ও তার জাতির লোকদের বলেছিল, এই মূর্তিগুলো কেমন যাদের সাথে তোমরা সংলগ্ন রয়েছ।' –আল আম্বিয়া : ৫১-৫২

এ বিষয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাদা হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সমকক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর সমকালে কোনো রাহিব[২] কাহিন[৩] অথবা দর্শনশাস্ত্রীর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেননি ; বরং তাঁর পূর্ণ তথা শুদ্ধ বুদ্ধি ও সঠিক প্রকৃতির দ্বারা জীবনের তথ্য, মানুষের ব্যবহার, জাতি ও দেশের বিষয়ে পরিচয় লাভ করেছিলেন। অতএব, ব্যর্থতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। এবং বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে লোকের সাথে ব্যবহার করলেন। যে ব্যক্তির মধ্যে উত্তম কিছু দেখলেন তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখলেন, নইলে একান্ত বাস অবলম্বন করলেন এবং বিশ্ব-ভুবনের প্রভুত্ব বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা অব্যাহত রাখলেন। এই পদ্ধতি সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রাপ্তি থেকে যা মিশ্রিত অজ্ঞানতার সমান, অধিক ও লাভদায়ক সিদ্ধ হলো তথা এ সমাজ থেকে দূরত্ব ও পার্থক্য বজায় থাকল, যা শত শত শতাব্দীব্যাপী সত্য-পথের পথিকেরা সন্ধান করে ফিরেছেন। তথা যে সমাজ প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই বিগত গুমরাহির সাথে একটি করে নতুন গুমরাহি বাড়িয়ে দিত।

তিনি ভাবলেন, যে সমস্ত কারণে সমগ্র জাতিই উদ্বিগ্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত, সে সমস্ত সমস্যার সমাধান সামগ্রিক ও সার্বজনিকভাবে করা উচিত। তিনি এ সার্বজনিক কাজে অংশগ্রহণ করাটাকে দোষের বলে মনে করেননি। এ ধরনের কাজগুলোর মধ্যে 'হিলফুল ফুজুল' ও 'ফিজ্জার'-এর ঘটনা অন্যতম যা তাঁর জীবনেতিহাসে আলাদা একটি অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

---

১. ইসলাম তথা ইসলামী আদর্শের জন্য জীবন-পণ করে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে।
২. রাহিব – পাদরি।
৩. কাহিন – জ্যোতিষী।

পাঁচ

হর্বে ফিজার (ফিজারের যুদ্ধ)

পবিত্র মাস ও পবিত্র ভূমির মান-প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য কুরাইশরা যে যুদ্ধটি করেছিলেন ইতিহাসে তা ফিজারের যুদ্ধ নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ইব্রাহিমী দীনের[১] সম্মিলিত প্রতীককে আরবরা খুবই সম্মান করত এবং এতে তাদের বড় লাভও ছিল। এর দ্বারা পরের হিত বা মঙ্গল সংরক্ষিত হয়ে যেত এবং ব্যক্তির ওয়ারিস[২] হত্যাকারীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত এবং হরম[৩]-এর সম্মানে তারা প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থাকত। যখন ইসলাম এল তখন সে ইব্রাহিমী দ্বীনের এই রীতিনীতিকেও স্বীকার করে নিল :

'নিঃসন্দেহে মাসগুলোর গণনা– আল্লাহর কিতাবে ঐ দিন থেকে করা হয়েছে যেদিন তিনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে সৃষ্টি করেন। এগুলোর মধ্যে চারটি সম্মানের, এটিই সত্য ধর্ম। তোমরা এই মাসগুলোতে পরস্পরের উপর অত্যাচার[৪] কোরো না।' – আত তওবা : ৩৬

কিন্তু ইসলাম-পূর্ব আরব একে অতি-শিগগিরই বৈধ বলে ভাবতে লাগল এবং এই মাসগুলোতেও পরস্পরে জুলুম-অত্যাচার ও হানাহানি ও রক্তপাত করে যেতে লাগল। হর্বে-ফিজার ছিল এই জুলুম-অত্যাচারের বৈধতার পরিণাম। আমরা এর বিবরণ এখানে দিচ্ছি না। এই যুদ্ধ একটানা চার বছর পর্যন্ত চলেছিল। সে সময় মুহাম্মদের বয়স ছিল পনেরো থেকে উনিশ বছরের মধ্যে। বর্ণিত আছে, তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অন্যত্র কথিত আছে, তিনি এতে অংশগ্রহণ করেননি ; বরং যোদ্ধাদের সহায়তা করেছিলেন।

ছয়

হিলফুল ফুজুল

এ সন্ধি হলো এই কথার প্রতীক যে, জগৎসংসারে কত না অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম হয় এবং মন্দ ও অপকর্ম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু এমন লোকদের থেকেও পৃথিবী কখনো বঞ্চিত হয় না, যারা পবিত্র নৈতিকতার জন্য সচল বা গতিশীল হয়ে যান এবং উৎপীড়িতদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যান।

---

১. হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রচারিত ধর্ম, আমাদের প্রিয়নবী (সা) এ ধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী বা সংস্কারক। হজরত ইব্রাহিম (আ) বিশ্ব মুসলিমের আধ্যাত্মিক পিতা।

২. উত্তরাধিকারী।

৩. কাবা-কাবা শরিফের আশপাশের এলাকা।

৪. যুদ্ধ ও রক্তপাত। –অনুবাদক

জ্ঞানতার অন্ধকারময় বাতাবরণে কিছু পুণ্য-স্বভাব ব্যক্তি ওঠে দাঁড়িয়ে যান এবং তারা মনস্থির করেন, যে কোনো অবস্থাতেই তাঁরা ন্যায়ের উপর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে অত্যাচার ও হিংসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং হরম (বা মক্কার আশপাশের ক্ষেত্র যার অভ্যন্তরে কোনো প্রাণীকে হিংসা ও হত্যা করা মহাপাপ)-এর সঠিক নৈতিকতা বরবাদ হয়ে যাচ্ছিল, তাকে নবজীবন দান করা হোক।

ইবনে আসির বর্ণনা করেছেন, 'কুরাইশদের কিছু গোত্র এই সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করেন যাঁদের মধ্যে বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ, ইবনে আব্দুল উজ্জা, জুহরা ইবনে কিলাব, তামীম ইবনে উমুরা প্রমুখ ছিলেন। অনন্তর, তাঁরা পরস্পরে সমঝোতা করেন যে, মক্কা কিংবা অন্যান্য স্থানের যে সমস্ত লোকের উপর যখন অত্যাচার অথবা অন্যায় হতে দেখা যাবে তখন তাদের সাহায্য করবেন। সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন এবং উৎপীড়িতদের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়ে দেবেন। কুরাইশরা এই সমঝোতা বা সন্ধির নাম রাখেন 'হিলফুল ফুজুল'।[১] এই সন্ধিতে রসুলুল্লাহও অংশগ্রহণ করেন এবং নবুয়তের পর এক অবসরে তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে আমার চাচাদের সাথে এমন এক সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিলাম, যদি এর পরিবর্তে আমাকে লাল উটও দেয়া হতো তা সত্ত্বেও আমি তাকে ত্যাগ করে একেই স্বীকার করতাম, আর যদি এই ইসলামী যুগেও এরকম একটি সন্ধির প্রতি আমাকে আহ্বান করা হয়, তাহলে আমি আগে ওকেই স্বীকার করব।' —ইবনে ইসহাক।

এই সমঝোতা বা সন্ধির ফলে আল্লাহর রসুল যে কতটা খুশি হয়েছিলেন তা তাঁর উল্লিখিত বাক্যাবলি থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। কেননা, প্রত্যেক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এই অভিযান তা সে যত বড় অত্যাচারীই হোক না কেন এবং প্রত্যেক উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি তা সে যতই হীন হোক না কেন ব্যবস্থা গ্রহণই হলো ইসলামের রুহ[২] যা সুকর্মকে উৎসাহিত করে আর মন্দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং আল্লাহর বিধানের সীমাকে সুরক্ষিত রাখে। ইসলামের স্বভাবই হলো এই যে, সে রাষ্ট্রীয় রাজনীতি ও ব্যক্তির পারস্পরিক ব্যবহারে সমানরূপে জুলুম ও হিংসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

---

১. এই সন্ধি কয়েক বছর যুদ্ধের পর করা হয়েছিল, সে সময়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল ১৬ বছর এবং তিনি এতে শরিক ছিলেন। প্রথমে যারা এই সন্ধি লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যেকার প্রত্যেকের নাম ছিল 'ফজল'। অতএব এই সন্ধি 'হিলফুল ফুজুল' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। 'ফুজুল হলো 'ফজল' শব্দের বহুবচন।

২. অর্থাৎ ইসলামের আত্মা বা অন্তর্নিহিত মর্মবাণী। —অনুবাদক

কয়েকটি বর্ণনায় আছে, যে জুবাইদ নামক এক সওদাগর-ব্যবসায়ী মালপত্র নিয়ে মক্কায় আসে এবং আস ইবনে ওয়াইল নামে মক্কার এক দলপতি তার মালপত্র কিনে নেয়, কিন্তু তার মূল্য পরিশোধ করেনি। সে কুরাইশ গোত্রপতি ও সমর্থকদের কাছে ফরিয়াদ করে কিন্তু তার কথায় কেউ-ই কর্ণপাত করেনি। অবশেষে নিরাশ হয়ে সে কাবার কাছে[১] দাঁড়িয়ে এই বলে চিৎকার করতে থাকে—

'হে আল ফহর ! দৌড়ে এসো, সাহায্য কর, মক্কা উপত্যকায় ঐ ব্যক্তির মাল লুট করে নেয়া হয়েছে, যে তার পরিবার-পরিজন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে।

এক সর্বস্ব হারানো ব্যক্তি ইহরাম বেঁধে আছেন, যিনি এখনো তাঁর উমরা পুরো করতে পারেননি। ওহে লোক সকল ! এঁর ফরিয়াদ শোন ! হরমের মর্যাদা সেই ব্যক্তির জন্য, যে এর সম্মান করে। কোনো পাপী এবং দুরাচারী তথা ধোঁকাবাজ ব্যক্তির শরণ এখানে কীভাবে মিলতে পারে ?'

অনন্তর রসূলুল্লাহর চাচা জুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব উঠলেন— এই ব্যাপারটিকে সহজে ছেড়ে দেয়া যায় না। যাঁদের নাম উপরে উল্লিখিত হয়েছে তাদের সবাইকে তিনি একত্রিত করলেন। এবং এরা আস ইবনে ওয়াইলের কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছ থেকে মালপত্র (বা তার মূল্য) নিয়ে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং হিলফুল ফুজুল-এর ঐতিহাসিক সমাঝোতাও সেই সময়ে করা হয়েছিল।

এই আস ইবনে ওয়াইল বড়ই অপহারক ও ধোঁকাবাজ লোক ছিল। সে পরবর্তীতে এই ব্যবহারটি করেছিল খাব্বাব ইবনে আয়াতের সাথে। সে একজন কর্মকার[২] ছিল এবং আসের জন্য সে এক তরবারি বানিয়েছিল, সে যখন তার কাছে তার পাওনা অর্থ আনতে গেল সে তাকে বলে, যদি মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর তাহলে তোমার মূল্য পরিশোধ করে দেব। হজরত খাব্বাব (রা) বললেন, আমি কখনোই কুফরি করব না, এমনকি, আল্লাহ তোর মৃত্যু দিয়ে দিলে এবং কিয়ামতের দিন তোকে পুনরায় ওঠানো পর্যন্তও নয়। আস বলল, মৃত্যুর পরে কি আমাকে আবারো ওঠানো হবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বলল 'আচ্ছা' তাহলে থাক, যেদিন আমাকে ওঠানো হবে, সেদিন তোর মূল্য পরিশোধ করে দেব। অতঃপর, এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো –

---

১. ঐ ব্যক্তি আরবের ঐতিহ্যানুসারে আবু কায়েস পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে মাথায় মাটি ঢেলে দিয়ে নিজের পরনের বস্ত্র ফেড়ে ফেলল। –অনুবাদক

২. অর্থাৎ লোহার জিনিসপত্র তৈরি করতেন। তিনি খুব ভালো তরবারি বানাতে পারতেন। –অনুবাদক

'অনন্তর, তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আমার আয়াতের সাথে কুফরি করে এবং বলে : আমাকে তো অবশ্যই সম্পদ ও সন্ততি দেয়া হবে ? সে কি পরোক্ষকে উঁকি মেরে দেখে নিয়েছে অথবা রহমানের কাছ থেকে কি সে কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছে ? কক্ষনো নয়, সে যা কিছু বলে বা তা লিখে নিচ্ছি এবং তার জন্য যাতনা বৃদ্ধি হতে থাকবে আর সে বলে তার উত্তরাধিকারী আমরা হব এবং সে একাই আমাদের সামনে আসবে।' –মরিয়ম : ৭৭-৮০

ব্যবসা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আস ইবনে ওয়াইলের মতো অনেক অনেক লোক ছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই শত্রুদের অনেক নিকটবর্তী ছিলেন এবং তারাও মুহাম্মদের সমীপবর্তী ছিলেন যারা এই শত্রুদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন এবং যুদ্ধ করেছিলেন।

সাত
শক্তি এবং আনন্দের জমানা

যখন ফিজ্জারের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল এবং হিলফুল ফুজুল-এর সমঝোতাও হয়ে গেল তখন মুহাম্মদ তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করলেন। এর এবং এর আগের কালটি যুবা বয়সের আনন্দোচ্ছলতা ও আবেগপূর্ণ স্বভাব ও সাহসের কাল হয়ে থাকে। হজরত মুহাম্মদ শক্তিশালী শরীর, উৎসাহপূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এই শক্তিময় আনন্দোচ্ছলতা ৪০ বছর বয়সের পরও অটুট ছিল। আবু হুরাইরাহ বলেন :

'আমি আল্লাহর রসুলের চেয়ে অধিক সুন্দর মানুষ আর কখনো দেখিনি, মনে হতো, সূর্য তার মুখের উপর আলোক বিকিরণ করছে এবং তাঁর চেয়ে দ্রুতগতি আর কারো মধ্যে দেখিনি। মনে হতো যেন ধরিত্রী ক্রমে তাঁর সমীপবর্তী হয়ে উঠছে। আমরা তাঁর সাথে চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম কিন্তু ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করত না।' –তিরমিজি

এই ধরনের ব্যক্তি যদি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট না হন তাহলে স্বয়ং দুনিয়া তাঁর পিছু-পিছু দৌড়াবে। এরপর দুনিয়া কত না লোকের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছে ? তাদের প্রতি যারা কল্পনার স্বর্গরাজ্যে বাস করে আর তার কুফল ভোগ করে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সাধন সত্ত্বেও না কাম-বাসনার প্রতি আকৃষ্ট হলেন আর না তার শিকার হলেন। তিনি না পদলাভ ও সহায়-সম্পদ লাভের চেষ্টা করলেন ; বরং এর বিপরীতে মক্কা এবং তার চারদিকে তাঁর জীবন ছিল প্রকাশমান সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান এবং তিনি ছিলেন তাঁর সাথিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয় জন। কিছু দিনের মধ্যেই মধুর বিশেষত্ব, সচ্চরিত্র, সুদৃঢ়

চিন্তাধারা, সাচ্চা পৌরুষ তথা সত্যনিষ্ঠা এবং বিশ্বাসনীয় ব্যবহারের কারণে তিনি সমগ্র এলাকাটিতে প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়ে গেলেন।

কাম-বাসনা নষ্ট করে দেয়ার মধ্যে মনের শ্রেষ্ঠত্ব লুকিয়ে থাকে না, এমনকি কাম-বাসনা থাকলে তাতে সন্তুষ্টি বা লাভের মধ্যেও তা তার সাধন থাকে না ; বরং শ্রেষ্ঠত্ব এটাই যে, সতীত্ব এবং সংযমের শক্তি কাম-বাসনার উর্ধ্বে থাকতে হবে। অতএব, মনের প্রশান্তির জন্য সদর্থক ও নঞর্থক দুই শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। আমরা প্রায়শই হালকা-পাতলা দুর্বল এমন কিছু সাধারণ মানুষকে দেখি, যাদের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা গোপন থাকে না এবং তাদের কাম-বাসনা অপবিত্র হয়ে থাকে কিন্তু তার অস্থায়ী বাসনার তুলনা তখন কোনো ব্যক্তির সুদৃঢ় অভ্যাসের সাথে করা হলে তার শক্তির এক-দশমাংশও হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ব্যক্তি তার বুদ্ধির লাগাম তার হাতেই রাখেন, তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন এবং এর বিপরীতে প্রথম ব্যক্তি ঐ বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত যে তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। অতএব তার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা তথা কামনা সীমা লংঘন করে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৌরুষ উন্নতির চরম শিখরে ছিল কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও মনের পবিত্রতা এই পৌরুষকে নৈতিক গুণাবলি, দৃঢ়তা ও সন্তোষ প্রকাশের সাধন করে তুলেছিল। এর অতিরিক্ত তিনি সেই ঘৃণিত বন্ধন ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ছিলেন, যা পাখাণ্ড– লোকদেখানো ও নাম ছড়ানোর কৌশলগত পথ থেকে যুব বয়সকে মুক্ত রেখেছিলেন, যা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল অথবা সওদাবাজির মনোভাব থেকে যারা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে নিজেদের নেতৃত্বকে প্রতীক্ষিত রাখতে চায়, তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। যখন ঐ সমস্ত মূর্তির প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকট হয়ে যায়, পুরা কওম যাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত ছিল, তিনি সেই ত্রুটি বিচ্যুতিকে খণ্ডন করেন, যা সমগ্র আরব উপদ্বীপে আচ্ছাদিত হয়েছিল, যখন তাঁর বিবেক স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'হক' হলো এই ব্যর্থতার বিপক্ষে অন্য এক বস্তু, তখন আমাদের বোধে এই রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায় যে, তিনি পাহাড়-পর্বত ও অন্তরীক্ষের সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, তখন সুদূর ক্ষেত্রগুলোতে, সামান্য যা থেকে সামান্য জীবিকা আসত, যা তিনি পরিশ্রমের মাধ্যমে লাভ করতেন, সেই ছাগল ও ভেড়া চরানোর মধ্যে তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করতেন।

এ কি ধন তথা ভৌতিক জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না ? নিঃসন্দেহে ছিল ; বরং ঐ সমস্ত উচ্চতর বাস্তবিকতার মধ্যে ব্যস্ততা ছিল, যা থেকে জীবন সুসংস্কৃত হয়ে ওঠে। উচ্চকিত মানুষ যখন সত্যকে চিনে নেন তখন সোনা-রুপার ভাণ্ডারও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে না ; তিনি তাতে না কোনো লাভের কিছু দেখতে পান ; আর না তিনি স্বজাতির জন্য বাদশাহ হয়ে যাওয়ার মধ্যেও কিছু পান, তখন

তিনি দেখেন যে, তাঁর জাতির মধ্যে মনুষ্যত্ব ও মানবতায় অধঃপতন ঘটছে এবং সমগ্র বিশ্ব মানসিক মূল্যবোধ হারিয়ে কবর অথবা শ্মশান যাত্রা করছে।

এভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে পদার্পণ করেন। এ হলো সেই পর্যায়ে পদার্পণ, যেখানে তিনি তাঁর প্রথম পত্নী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের সাথে পরিচয় লাভ করেন।

আট
হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহা

হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহা হলেন সেই স্ত্রীর উত্তম উদাহরণ, যিনি কোনো মহাপুরুষের জীবনকে পূর্ণ করেছেন। পয়গাম্বরগণ খুবই ভাবুক হৃদয়ের অধিকারী হন এবং যে পরিস্থিতি ও বাতাবরণকে তাঁরা পরিবর্তন করতে চান সেই দিক থেকে তাঁদের বড়ই কাঠিন্য ও বিপদ-বাধার মোকাবিলা করতে হয়। তাঁরা যা প্রচার করতে চান সেই পথগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো জিহাদ, সেই পথ তাঁদের অবলম্বন করতে হয়। তাঁদের জীবনে এমন কিছু ব্যক্তিত্বেরও খুবই প্রয়োজন হয় যাঁরা নিজের রক্তরস পানি করেও তাঁকে সহযোগিতা করতে পারেন। হজরত খাদিজার মধ্যে এর সমস্ত গুণাবলিই অধিকাধিকভাবে পাওয়া যায়। অতএব, তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের উপর তাঁর ছায়া বিস্তারে সমর্থ হন।

ইবনে আসির বলেন, হজরত খাদিজা একজন ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। কোনো ব্যক্তির সাথে বাণিজ্যিক শর্তাবলি নির্দিষ্ট করে তিনি সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করতেন। বাণিজ্য কাফেলা ফিরে এলে ব্যবসায়ের সঠিক লভ্যাংশ তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হতো। যখন তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারিতা ও উচ্চ নৈতিকতার বিষয়ে অবগত হলেন তখন তিনি ব্যবসায়ী পণ্য তাঁর মাধ্যমে সিরিয়ায় পাঠানোর জন্য প্রস্তাব পাঠালেন এই বলে যে, আমি অন্য লোককে যা পারিশ্রমিক দিই তাঁকে তার চেয়ে অনেক বেশি দেব। অনন্তর, বাণিজ্য-যাত্রায় তিনি তাঁর দাস মাইসারাকেও পাঠিয়ে দিলেন।

তিনি ব্যবসায়িক শর্তাবলি নির্দিষ্ট করে খাদিজার পণ্য নিয়ে শাম দেশে চলে গেলেন। ব্যবসায়ে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেন এবং চাচার সাথে গত যাত্রার চেয়ে এ যাত্রায় অধিক লাভবান হলেন এবং অন্য লোকদের তুলনায় দ্বিগুণ লাভ করে খাদিজাকে দিলেন। তিনি এ লাভ পেয়ে বড়ই প্রসন্ন হলেন এবং যে ব্যক্তিকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর আমানত ও ঈমানদারি বা বিশ্বাস থেকে বড়ই প্রভাবিত হলেন।

খাদিজা উত্তম কুলশীলা ধনবতী মহিলা ছিলেন। তাঁর গোত্রে তাঁর প্রতিভা ও বুদ্ধি-বৃত্তির খুব সুনাম ছিল। কুরাইশদের অনেকানেক ধনাঢ্য দলপতি বা গোত্রপতি তাঁকে বিয়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা, তাঁরা ছিলেন ধনলোভী। কিন্তু মুহাম্মদের প্রতি যখন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো তখন তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তির সন্ধান পেলেন। তিনি তাঁকে বুঝে নিলেন যে, এই ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে লোভী নন, আর জীবন সামগ্রীর প্রতি তাঁর কোনো লালসা নেই। যখন অন্য লোকদের সাথে তুলনা করে ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব কিতাব করা হতো তখন তার মধ্যে আরবের অন্য লোকদের ধোঁকাবাজি ও লোভ-লালসার অসুস্থ মনোভাব নজরে পড়ত। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহার বলে দিত যে, তাঁর মধ্যে মধুর ব্যবহার, গাম্ভীর্য, বুদ্ধিমত্তা ও সত্যপ্রিয়তা রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। তিনি খাদিজার সহায়-সম্পদের প্রতি চোখ তুলেও তাকাননি আর না তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরো করলেন এবং সানন্দে ঘরে ফিরে এলেন।

খাদিজা তাঁর হারানো সম্পত্তি ফিরে পেলেন এবং তিনি তাঁর সখী নাফিসা বিনতে মুনিয়ার কাছে নিজের মনের কথা প্রকাশ করলেন এবং নাফিসা খাদিজার সাথে মুহাম্মদকে বিয়ের জন্য রাজি করাতে গেলেন। তিনি তাতে রাজি হতে বিলম্ব না করে আপন চাচার সাথে পরামর্শ করলেন এবং আবু তালিব, হামজা প্রমুখ ব্যক্তি খাদিজার চাচা আমর বিন আনাসের কাছে গেলেন, কেননা, তাঁর পিতা পরলোকগমন করেছিলেন। বিয়ে ঠিক হলো এবং দেন-মোহরে কুড়িটি উট নির্দিষ্ট হলো। আবু তালিব সে বিয়ের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে এই খুতবা[১] দিলেন :

'মুহাম্মদের তুলনা কুরাইশদের যে যুবকের সাথেই করা হোক না কেন, সে নিষ্ঠতা, বুদ্ধি, বিবেক, নৈতিকতা ও ব্যবহারে তার তুলনায় নিম্নবর্তীই হবে। যদিও সম্পদ তাঁর বড়ই কম কিন্তু সম্পদ তো অস্তায়মান ছায়া মাত্র, আর এ তো ধার করা বস্তু, তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে হয়। এর প্রতি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের সম্মতি রয়েছে এবং এঁর রয়েছে খাদিজার প্রতি।'

তারপর খাদিজার অভিভাবক উত্তরে বললেন : ইনি সেই পুরুষ, যিনি আত্মমর্যাদা বিনষ্ট হতে দেবেন না এবং আমি আমার ভাইঝির বিয়ে মুহাম্মদের সাথে দিলাম।

উল্লেখ্য, এ ধরনের ভাষা আবু সুফিয়ানও সেই সময়ে ব্যবহার করেছিলেন, যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা হাবিবাকে বিয়ে করেছিলেন। যদিও সে সময়ে তাঁদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। আবু সুফিয়ান এই ভাষায় তাঁর অসমর্থতা প্রকাশ করেছিলেন : মুহাম্মদের মধ্যে

---

১. খুতবা –ভাষণ।

যোগ্যতা আছে, তাঁর সাথে এ আত্মীয়তা প্রশংসাযোগ্য এবং আমাদের দুজনের মধ্যেকার এ বিবাদ মুহাম্মদের স্থান-মর্যাদাকে কখনো ক্ষুণ্ন করবে না। এবং তাঁর কন্যার বিয়ে আবু সুফিয়ানের জন্য লজ্জার কারণ হবে না, যদিও এ সময়ে আমাদের মধ্যে প্রবল শত্রুতা বিদ্যমান।

বিয়ের সময় রসুলুল্লাহর বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর খাদিজার চল্লিশ বছর। এ সম্পর্ক জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত স্থির ছিল। খাদিজা তেষট্টি বছর বয়সে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। পুত্র ইব্রাহিম ছাড়া সমস্ত সন্তান খাদিজার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

হজরত খাদিজার গর্ভে সর্বপ্রথম কাশিম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যে কারণে তিনি নবুয়তের পর থেকে আবুল কাশিম বা কাশিমের পিতা নামে উল্লিখিত হতেন। তারপর যথাক্রমে জয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা রাজিয়াল্লাহু আনহুমা এবং আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহকে তাইয়িব এবং তাহিরও বলা হতো। এক বছর বয়সে কাশিম ইন্তিকাল করেন। ফাতিমা[১] ব্যতীত রসুলুল্লাহর সকল সন্তানই তাঁর জীবৎকালে জান্নাতবাসী হন। প্রিয়তম রসুলের তিরোধানের ছ'মাস পরে তিনিও জান্নাতবাসী হন।

খাদিজার সাথে তাঁর বিবাহ উভয়ের জন্যই শুভ হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই নয়া পরিবার 'কাবার' প্রভুর রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল। জাহিলিয়াতের দুর্গন্ধ হতে পবিত্র এবং পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিল।

বিয়ের পর তিনি পুনরায় নির্জনতাকে বেছে নিলেন এবং গভীর চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন হয়ে গেলেন এবং সেই সমস্ত খেলাধুলো, অপ্রয়োজনীয় কাজ, জুয়া, মদিরা তথা অন্যান্য মনোরঞ্জনমূলক কাজ থেকে চির-পৃথক রইলেন, যাতে আরবের যুবকরা চুর হয়েছিল। যদিও বাণিজ্যিক প্রয়াস ও জীবিকা-নির্বাহের উপায়াবলির সাথে সম্পর্কহীন হলেন না এবং বাজারে যাওয়া ও কোথাও যাওয়া আসা ত্যাগ করলেন না। বুদ্ধিমান এবং বিবেকবান ব্যক্তির জীবন এক অশান্ত দলের মধ্যে অতিবাহিত হলেও সাবধানতা অবলম্বন করে তাকে চলতেই হয়। বিশেষত, ঐ সময়ে এবং ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি উচ্চ স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সচ্চরিত্র, তাঁর প্রতি দাবি যে, তিনি বিনম্র, কোমল, রূপবান, সুশীল এবং স্মিতমুখী হবেন।

এ অবধি কোনো উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু হজরত খাদিজা তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে বড়ই শোকাহত হলেন, কেননা, ঐ সমাজ ও ঐ জাতির জীবনে পুত্রের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে কন্যা-সন্তানদের জ্যান্ত কবর দেয়া হতো এবং

---

১. রাজিয়াল্লাহু আনহা। ইনি খাতুনে জান্নাত বা জান্নাতের নেত্রী নামে সুপরিচিত। হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর দুই পুত্র ইমাম হাসান ও হুসাইন জগদ্বিখ্যাত। তাঁর জীবৎকালে হজরত আলী (রা) দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। –অনুবাদক

কন্যা সন্তান জন্মলাভের কথা শুনলে পিতার মুখে কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে আসত।

আশ্চর্যের কথা যে, আরবরা নবী হওয়ার পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই বলে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিত যে, আমরা তোমার নির্বংশ হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছি। ইবনে আব্বাস হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, কুরাইশদের উদ্দণ্ডতা ও অবজ্ঞার বেসাতি হতে লাগল এবং তারা বলতে থাকল, যে ধর্মে আমরা প্রতিষ্ঠিত আছি তা এই প্রভুহীন ও নির্বংশ লোকের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ কথার অভিপ্রায় এই ছিল যে, মুহাম্মদ-এর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর উত্তরাধিকারী কেউ হবেন না এবং তাঁর ধর্মের আহ্বায়ক ও প্রচারকও কেউ থাকবে না। পবিত্র কুরআনে বলা হলো :

'এই লোকেরা কি বলে যে তুমি কবি, যার কালচক্রে পড়ার প্রতীক্ষা আমরা করছি। বলে দাও : প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।' –আত তুর : ৩০-৩১

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রত্যাদেশ এ সব তুচ্ছ কথাবার্তা থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। পরন্তু, পুত্রহারা শোকার্ত পিতার হৃদয়কে তা ক্ষত-বিক্ষত করত। ইয়াতিমীয় সন্তাপ তাঁর মধ্যে আবারো জেগে উঠল। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর এ বংশ আরো অগ্রসর হওয়ার আশা জেগে উঠেছিল কিন্তু সে শাখা সবুজ হতে পারল না। যেন মনে হয় আল্লাহ শোক ও সন্তাপকে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেননা, রাষ্ট্রের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি অত্যাচার ও হিংসার দিকে সেই সময়ে আকৃষ্ট হয় যখন কঠোরতা ও স্বার্থপরতা তার স্বভাবের একটি অংশ হয়ে যায় এবং প্রসন্নতা এবং বিলাসিতার বাতাবরণে তার লালন-পালন হয়, যেখানে শোক, সন্তাপ ও তিক্ততার লেশমাত্রও থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখ, শোক, সন্তাপ ইত্যাদির অনুভব রাখে সে অন্য লোকদের তুলনায় পীড়িত ব্যক্তিদের ক্ষতে শুধু মলমই লাগায় না ; বরং তাঁর চিকিৎসায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

নয়
কাবাগৃহের পুনর্নির্মাণ

হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রচারিত দ্বীনের অবশিষ্টগুলোর মধ্যে এক কাবাও ছিল, যার প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে ইসলাম-পূর্ব সমস্ত আরবই একমত ছিল। এ মজবুত পাথরে নির্মিত একটি চতুষ্কোণবিশিষ্ট ঘরের সমান ছিল, আর এর উপর স্থির ছিল একটি ছাদ। এটি নির্মিত হয়েছিল সবার

আগে আর নূহের তুফানের পরে। ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র ইসমাইল এই কাজটি সম্পন্ন করেন। এটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল এক আল্লাহর ইবাদত– অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদার কেন্দ্রস্থল, যাতে একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করা যায়। কেননা, ইব্রাহিম মূর্তি তথা মূর্তিপুজোর উৎপাটনে জীবনপাত করেছিলেন এবং মূর্তিস্থানগুলোকে ধ্বংস করতে বড় কষ্ট সহ্য করেছিলেন। অতএব, আল্লাহ তাঁর মনে এর পুনঃনির্মাণের প্রেরণা জাগিয়ে দিলেন, যাতে তৌহিদবাদের[১] ভিত্তিতে ও তার প্রতীক বা শান্তিগৃহের মর্যাদা পেতে পারে। স্পষ্ট যে, এতে উপদ্রবের কোনো আশঙ্কা ছিল না। অতএব, একে এবং এর আশপাশের ক্ষেত্রগুলোকে 'হরম'[২] বলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো। এর অর্থ হলো, স্বয়ং কাবা কেবলমাত্র পাথর-নির্মিত একটি ঘর, যা ক্ষতি বা লাভ কিছুই করতে পারে না। কিন্তু এর মর্যাদা ও সম্মান ঐ অর্থে অর্থাৎ স্মৃতির কারণ এবং যা এর সাথে সম্পর্কিত। এ জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাগ্রহে বলেছেন, জীবন সম্পদ, মর্যাদা ও সম্মান এই কাবার চেয়ে অধিক পবিত্র এবং আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। ইসলাম তার চূড়ান্তক্ষণ পর্যন্ত যে মূর্তিপুজোর বিরোধিতা করেছে, তার পরিণামে লোকে কাবা বা তার সাথে সম্পর্কিত তার কোনো অংশকে লাভ বা ক্ষতি করতে পারে বলে মনে করতে লাগল।

আপনি একথা ভালো মতোই জানেন যে, নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রনায়ক বা সৈন্যরা যখন তার রাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকে সালাম করে তখন তার সামনে ভক্তি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, কিন্তু এগুলোকে পুজো বা উপাসনা করে না ; বরং ঐ নিশ্চিত স্থানগুলোর চিহ্নসমূহের পবিত্রতা ও তাঁর সম্মানই সেখানে অভিপ্রেত হয়। অতএব, জগতের সবচেয়ে প্রাচীন এই মসজিদটির স্থান নির্ধারণ হওয়া উচিত আর পরবর্তীকালে নির্মিতব্য সমস্ত মসজিদেরই 'কিবলা'[৩] এটিই হওয়া উচিত।

পরন্তু, প্রত্যেক নামাজের উদ্দেশ্য তথা প্রত্যেক 'খুশু ও খুজু'[৪]-র অবসরে আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহই হবেন। হজরত আবুযর রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম : দুনিয়ায় সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয় ?

তিনি বললেন : 'মসজিদে হারাম'।

---

১. তৌহিদবাদ বা একত্ববাদ, যার মর্মবাণী হলো একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে সিজদাবনত হওয়া।–অনুবাদক

২. হরম– অর্থাৎ সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, যেখানে যে কোনো প্রকারের জীব হত্যা নিষিদ্ধ। –অনুবাদক

৩. কিবলা– যে দিকে মুখ করে এবং নিজের সমস্ত চেতনা ও অনুভূতিকে কেন্দ্রীভূত করে নামাজ পড়া হয়, তার দিশা বা কেন্দ্র। –অনুবাদক

৪. নম্রতা বা বিনয়। –অনুবাদক

আমি জিজ্ঞসা করলাম, তারপর কোনটি ?

তিনি বললেন, মসজিদে 'আকসা'।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ দুটি মসজিদ কত দিন অন্তর নির্মিত হয় ?

তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। এর পর সমগ্র ধরিত্রী তোমাদের জন্য মসজিদস্বরূপ, যে কোনো স্থানে নামাজের সময় হলে অনতিবিলম্বেই নামাজ আদায় করে নেবে। এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। –বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি

কাবা অতি প্রাচীন হওয়ার কারণে জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার দেয়াল ভেঙে যাচ্ছিল, আর তাঁর নবুয়তের কিছুকাল পূর্বে ভীষণ বর্ষার কারণে পাহাড়ি ঢলের পানিতে কাবা ভরে যায়।[১] যার ফলে, তার খুব ক্ষতি হয় এবং তার ভিতের মধ্যে পানি ঢুকে যায় এবং তার দেয়াল ধরাশায়ী হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। অতএব, কুরাইশরা তার পুনঃনির্মাণ ব্যতীত আর কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না।

কাবার[২] দেয়াল ভেঙে ফেলে তার পুনর্নির্মাণের কাজ কুরাইশদের সমস্ত গোত্রপতি মিলিতভাবে কাবার মূল নকশা অনুযায়ী করলেন।

শত শত বছর পূর্বে ইব্রাহিম ও ইসমাইল কর্তৃক নির্মিত এ কাবাগৃহের পুনর্নির্মাণ কোনো সাধারণ সমস্যা ছিল না যে, তার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের উপর ছেড়ে দেয়া যেত। অতএব বড় বড় শেখ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের, যাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ ও তাঁর চাচারাও সম্মিলিত ছিলেন, তাঁরা এ কাজের কৃতিত্ব সবাই নিতে চাইলেন।

'আমর ইবনে দিনার বর্ণনা করেছেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যখন কাবা গৃহের নির্মাণ কাজ শুরু হয় তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হজরত আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু পাথর বহন করার কাজে নেমে পড়লেন। আব্বাস রসুলুল্লাহকে বললেন, তুমি তোমার পাজামাটি খুলে মাথায় বেঁধে নাও তাহলে কষ্ট হবে না। তিনি যেই পাজামা খুলে ফেললেন, সাথে সাথেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং আশপাশে তাকিয়ে চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল। তারপর তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমার পাজামা কোথায় ? আমার পাজামা কোথায় ? অতএব, তাঁকে তা পরিয়ে দেয়া হলো। এরপর, জীবনে তাঁকে আর কখনো নগ্ন হতে দেখা যায়নি।' –বুখারী ও মুসলিম

সমস্ত গোত্র পাথর বহন ও নির্মাণ কাজে নেমে পড়লেন। যখন গাঁথতে গাঁথতে 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপন করার স্থানে পৌঁছে গেলেন তখন এক নয়া

---

১. কেননা, কাবা ছিল নিচু ভূমিতে অবস্থিত। –অনুবাদক

২. ইসলামী রেওয়ায়েত অনুসারে কাবা-গৃহ নির্মাণ করেছিলেন হজরত আদম আলাইহিস সালাম। কিন্তু নূহ আলাইহিস সালামের তুফানের পর নতুনভাবে নির্মাণ করেন হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম। –অনুবাদক

বিপত্তি উপস্থিত হলো। প্রত্যেকটি গোত্রই চাচ্ছিল এই কাজের কৃতিত্ব সেই লাভ করবে কিন্তু কেউ ছেড়ে কথা বলতে রাজি হলো না, পরিণামে যুদ্ধ ও রক্তপাতের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু উমাইয়া ইবনে মুগিরার পরামর্শ মতে, যে ব্যক্তি সবার আগে 'বাব-উস-সাফা'য়[১] প্রবেশ করবে, এর ফায়সালার দায়িত্ব তাকেই দেয়া হবে। এতে সবাই রাজি হয় এবং সেদিন সবার আগে সেখান দিয়ে প্রবেশকারী ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখামাত্রই লোকেরা বলল, ঐ দেখো আল-আমিন[২] আসছেন, ইনি মুহাম্মদ, আমরা তাঁর ফায়সালাতেই সন্তুষ্ট।

'হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চাদর বিছিয়ে 'হাজরে আসওয়াদ'টি সেখানেই রাখলেন এবং বিবাদকারী প্রতিটি গোত্রকে চাদরটি ধরতে বললেন, সবাই চারদিক থেকে চাদরটি যথাস্থান পর্যন্ত উঠালেন, তারপর, হজরত মুহাম্মদ সেটি স্বহস্তে তুলে তার স্থানে রেখে দিলেন।' —আহমদ

এ ছিল একটি ভয়ংকর বিপজ্জনক বিবাদের সর্বোত্তম সমাধান, যা পুরো জাতিই স্বীকার করেছে এবং তাঁকে আল-আমিন হওয়ার সাক্ষী শুধু দেয়নি ; বরং তাঁর বুদ্ধিমত্তাও দেখে নিয়েছে। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, রসুলুল্লাহ কতটা বিশ্বাস আর সম্মান অর্জন করেছিলেন।

কাবার নির্মাণ কাজে কুরাইশরা বড়ই মনোযোগ দেয়, তা সত্ত্বেও সামগ্রীর অভাবের কারণে তা হজরত ইব্রাহিমের নির্মাণ পর্যন্ত পৌছাতে পারল না। এরপর ইসলামী শাসনামলেও রসুলুল্লাহ এর নব-নির্মাণ বা এর কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি এবং তা পূর্বের নির্মাণ-কাজ পর্যন্ত রেখে দেন।

হজরত আয়েশা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন :

'তুমি কি দেখনি যে, তোমাদের কওম যখন কাবার নির্মাণ কাজ করেছিল, তখন হজরত ইব্রাহিমের নির্মাণ চিহ্ন পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল ! আপনি একে ইব্রাহিমের নির্মাণ পর্যন্ত কেন পৌছে দিলেন না ? তিনি বললেন : যদি তোমাদের কওমের কুফরি করার আশঙ্কা না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তা করতাম !'

ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন : 'যদি আয়েশা এ কথা রসুলুল্লাহর কাছ থেকে শোনেন তাহলে আমিও আল্লাহর রসুলকে কখনো দেখিনি আসওয়াদের নিকটবর্তী দুই স্তম্ভের চুম্বনকে উপেক্ষা করতে। অবশ্য কাবা-গৃহের পুনর্নির্মাণ ইব্রাহিমের নির্মাণ চিহ্ন পর্যন্ত পৌছায়নি।'

---

১. বাব-উস-সাফা – সাফার দরজা। –অনুবাদক

২. আল-আমিন –মহান সত্যবাদী বা মহা আমানতদার– অনুবাদক

আলিমরা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার তাৎপর্য হলো, এখন জাহিলিয়াত[১] সবেমাত্র উৎপাটিত হয়েছে, সে জন্য লোকদের ঈমান দুর্বল। অতএব, কাবা গৃহকে ভেঙে ফেলে তাতে পরিবর্তন করার ফলে তাদের মন মসীলিপ্ত এবং তারা ঘৃণিত হয়ে উঠতে পারত।

যদি ইব্রাহিম কর্তৃক নির্মিত নকশা অনুসারে কাবা-গৃহের পুনর্নির্মাণ ফরজ হতো তাহলে আল্লাহর রসুল আবশ্যই তা করাতেন। কিন্তু এটি এমনই একটি মামুলি বিষয় ছিল যে, এ জন্য এ রকম কাঠিন্যের মধ্যে পড়াটা ছিল অনর্থক।

দশ
সত্যের সন্ধানে

মূর্তিপুজো হক বা সত্যের পোশাক পরিধান করে জনসাধারণকে প্রতারণা করে ও তাদের মূর্খ করে তোলে। একদিকে বিশ্বভুবনের স্রষ্টার প্রতি ঈমানের দাবি করে অন্যদিকে অন্যান্য মিথ্যাকে পূজ্য করে তোলে, যা ওয়াসিলার[২] কাজ করে। সৃষ্টির স্রষ্টা মানব দৃষ্টির অগোচরে থাকেন। অতএব, মুশরিকরা[৩] তাদেরই পুজো করে, যাদের তারা চর্মচক্ষুতে সব সময়ই দেখতে পায়, মিথ্যা পূজ্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক এতই বেড়ে যায় যে, বাস্তবিকই তা আল্লাহর চেয়েও অধিক স্থায়ী ও দৃঢ় হয়ে যায়। এই ইষ্টপূজ্যের চর্চায় যে সাধনের সন্ধান করা হলো তা কেবল বিবশতা ও তর্কবিতর্কেরই সাধনে পরিণত হলো :

'আর যদি তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর, তাকে কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে সে অবশ্যই বলবে : আল্লাহ ! তাহলে, তারপর তাদের কীভাবে মতিভ্রম হয়ে যায় ! আর সে এটাই বলবে : হে প্রভু ! এরা তারাই, যারা ঈমান রাখে না। অনন্তর, এই অত্যাচারীদের প্রতি মনোযোগ দিয়ো না এবং বল সালাম। এরা অনতিবিলম্বেই জ্ঞাত হয়ে যাবে।' – আজ জুখরুফ : ৮৭-৮৯

পরন্তু বুদ্ধিহীনতার জন্য হঠকারিতা ও পক্ষপাত সীমালংঘন করে যায়। সাধারণ মানুষ পশুর সমান হয়। অতএব, তাদের পক্ষে যা বলা হয় তারা তার পরম ভক্ত এমনকি দাস হয়ে যায়। বিবেক শক্তি ও স্বাধীন বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত

---

১. জাহিলিয়াত বা মূর্খতা বা মূর্খতার যুগ। ইসলাম-পূর্ব আরবের উদ্দেশে এ কথাটি ব্যবহৃত হয়। ইসলামের ইতিহাসে একে অন্ধকারময় যুগ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। জাহিলিয়াত বিভিন্ন সমাজে আছে তবে তা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে ও অবস্থায়।– অনুবাদক

২. মুক্তির সাধন। – অনুবাদক

৩. মুশরিক শব্দের প্রতিশব্দ মালাউন, পৌত্তলিক, অনেকেশ্বরবাদী ইত্যাদি। – অনুবাদক

হওয়ার কারণে তারা আজীবন সেই বস্তুরই পূজারি হয়ে থাকে। যাকে তারা নিজেরাই জানে না বা বোঝে না।

যে সমস্ত মানুষের চিন্তা-ভাবনার শক্তি প্রদান করা হয়েছে তাদেরও এই যোগ্যতা, ইচ্ছা তথা কাম-বাসনার চারদিকে ভনভন করে ঘুরতে থাকে। প্রায়শই এসব লোক জেনে বুঝেও তাকে গোপন করে যায়। অথচ এর বাস্তবতাকে তারা বোঝেন। এই জ্ঞান থেকেই সংগ্রাম শুরু করে দেয়। এমন লোক খুব কমই দেখা যায়, যারা সমাজের ঐ সুদৃঢ় ঐতিহ্যাবলির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন এবং প্রকৃত সত্যের ঘোষণা দেন। প্রকৃতপক্ষে এমন লোকেরা তো খাদ্যে লবণের সমান, যাঁরা সত্যের জন্য জীবিত থাকেন এবং সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হওয়ার পূর্বে কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিলেন, যাঁরা আরবদের মূর্তিপুজোকে ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং তাঁরা উপহাস করতেন। তাঁরা ভালোভাবেই জানতেন, জাতি মনগড়া ও বাতিল[১]-এর পিছনে পড়ে আছে কিন্তু তাঁদের মধ্যে তা রোধ করার বা প্রতিবাদ করার শক্তি ও সামর্থ্য ছিল না।

'ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহি[২] আগমনের আগে জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সাথে মিলিত হলে তিনি (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সামনে পানাহারের ব্যবস্থা করলেন, যাতে গোশতও ছিল। সে তা খেতে আপত্তি করল এবং বলল, আপনারা তো থানে[৩] জানোয়ার চড়ান, আমি এ গোশত খাই না। আমি কেবল সেই গোশতই খাই, যা আল্লাহর নামে বধ করা হয়। সে কুরাইশদের বলি-র নিন্দা করত। বলত, ছাগল আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ধরিত্রীর বুক থেকে তিনিই ফসল উৎপাদন করান, তা সত্ত্বেও আপনারা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে পশু বধ করেন ! সে ঘৃণার বশে এ সব কথা বলেছিল।' – বুখারী

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল সত্য-ধর্মের বা তার অনুসারীদের সন্ধানে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। অনন্তর এক ইহুদি আলিম-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি তার দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, হয়ত আমি তা গ্রহণও করতে পারি। সে বলল, তুমি

---

১. বাতিল শব্দের অর্থ মিথ্যা, প্রত্যাখ্যাত, ঘৃণ্য ইত্যাদি। – অনুবাদক

২. অহি আল্লাহ কর্তৃক জিব্রাইল মারফত নবী (স)-র উপর অবতরিত সত্যনিষ্ঠ বাণী।

৩. সে মনে করেছিল, আরব জনসাধারণের ন্যায় এ গোশতও 'থান'বা বলিকাঠে চড়িয়ে পশু বধের পরিণাম। এ ছিল তার ভ্রম। কেননা, আল্লাহর রসুল ও তাঁর পরিবার এ ধরনের গোশত খেতেন না। জায়েদ তাকে জানান যে, এ হারাম নয়। তখন সে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে। আল্লাহর রসুল তাঁর এ কাজে খুব খুশি হয়েছিলেন– অনুবাদক

আমাদের ধর্ম গ্রহণ কোরো না, তাহলে তুমি আল্লাহর কোপে পড়ে যেতে পারো। জায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহর প্রকোপ থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কেননা আমি তাঁর প্রকোপ বা ক্রোধ সহ্য করতে পারব না। তারপর তিনি বললেন, তাহলে অন্ততপক্ষে আপনি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিন, যাতে সত্যের সন্ধান পাই। আলিম বললেন, আমি জানি না, কিন্তু আপনি 'হানিফ' হয়ে যান। জায়েদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হানিফ' কী জিনিস ? আলিম বললেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অনুসারীদের হানিফ বলা হয়, যারা না ইহুদি আর না ঈসায়ী। সে কেবল আল্লাহরই ইবাদত করে। জায়েদ আরো অগ্রসর হলেন এবং এক ঈসায়ী আলিমের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তার কাছেও একই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমার ধর্ম গ্রহণ করবেন না, তাহলে আল্লাহর লানত পড়ার আশঙ্কা আছে। জায়েদ বললেন, যেভাবেই হোক, আমি তাঁর লানত থেকে আত্মরক্ষা করব, তাহলে আপনি অন্য কারো সন্ধান দিন। তিনি বললেন, আমি জানি না, কিন্তু আপনি 'হানিফ' হয়ে যান। জায়েদ জিজ্ঞাসা করলেন, হানিফ কাকে বলে ? তিনি বললেন, ইব্রাহিমের দ্বীন, তিনি না ইহুদি ছিলেন আর না ঈসায়ী ; বরং তিনি কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। অনন্তর জায়েদ যখন বুঝে নিলেন যে, তাঁর পছন্দের এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তু ইব্রাহিমের দ্বীনের মধ্যে আছে, তখন তিনি ঐ আলিমের কাছ থেকে উঠে বাইরে এলেন এবং দু'হাত তুলে আল্লাহর উদ্দেশে বললেন, হে আল্লাহ ! আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি ইব্রাহিমের দ্বীনের উপরই আছি।

এ হাদিস ঐ হয়রানি ও বিস্ময়তার প্রতি ইঙ্গিত করছে, যা ঐ সময়ে পুরো বিশ্বের উপর ছেয়ে গিয়েছিল। তথা ধর্ম তার নিজের আচ্ছাদনের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। ইহুদিরা এ কথা ভালো মতোই জানত যে, পৃথিবীতে তারা অনাদর, অপমান ও উপেক্ষা পেয়েছে, অনন্তর তাদের ধর্মে আগমনকারী ব্যক্তি তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, যে শাস্তি তারা নিজেরাই ভোগ করছে।

ঈসায়ীদের মধ্যে মসিহের স্বভাব, তাঁর জন্ম তথা তাঁর মায়ের সন্তান প্রসবের বিষয়ে বড় মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যার পরিণামে তারা হিংসাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, যারা সর্বদাই একে অন্যের নিন্দায় মুখর ছিল।

সিরিয়ার সেই ঈসায়ী, জায়েদ যাকে প্রশ্ন করেছিলেন, রোমের গির্জায় ঐতিহ্যগত ধর্মমতের ঘোরবিরোধী ছিলেন। অতএব, জায়েদকে এ ধর্মমতে প্রবেশ করে নিদারুণ যাতনা-ভোগের অংশীদার না হতে তিনি যে নিষেধ করেছিলেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বাস্তবিকই এই নিন্দা তথা ধিক্কার সেই ভ্রান্তির বিস্ময়কর পরিণাম, যা আদম আলাইহিস সালাম করেছিলেন এবং পরে তার সন্তানরা তা ভোগ করছিলেন। যেমন, ঈসায়ীরা দাবি করে যে, মসিহকে শূলে চড়ানোটা

বৈধ ছিল। অতএব, জায়েদের এই দ্বীন, সম্প্রদায়, দল বা উপদল থেকে দূরে থেকে ইব্রাহিমের দ্বীনের সন্ধানে ফেরাটা ঠিক ছিল।

'আসমা বিনতে আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহা' হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, তিনি বলেন, আমি জায়েদ বিন আমর ইবনে নুফাইলকে কাবার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তিনি বলছিলেন, হে কুরাইশ লোকসকল ! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ ইব্রাহিমের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। তিনি জীবিত কবর দিতে নিয়ে যাওয়া কন্যাদের লালন-পালন করতেন। যখন কোনো ব্যক্তি তার জীবিত কন্যাকে কবর দিতে নিয়ে যেত তখন তিনি বলতেন, 'আমি তোমাকে এই কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি এবং এই কথা বলে তিনিই শিশুকন্যাটিকে নিয়ে লালন-পালন করতেন এবং যখন সে বয়োপ্রাপ্তা হতো তখন তিনি তার পিতাকে ডেকে বলতেন, যদি তুমি একে চাও তাহলে আমি তাকে তোমার অধিকারে দিয়ে দিতে পারি, নইলে তাঁর ভরণ-পোষণের ব্যয় আমি নিজেই বহন করি।'– বুখারী

জায়েদ সেই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা জাহিলিয়াতের অপকর্ম সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন। সত্যকে গ্রহণ করতে খুবই উদগ্রীব ছিলেন কিন্তু তিনি আরো অনেকের ন্যায় জাতির জাতীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করতেন না। কিন্তু আল্লাহ এ সমস্ত কাজের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে চয়ন করেছিলেন, যিনি কেবল সত্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখতেন না ; বরং শক্তি এবং সামর্থ্যও রাখতেন যিনি কুফরি তথা অন্ধকারের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারতেন এবং সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে সব সময়ের জন্য উৎসর্গিত করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারতেন।

এক মহান দায়িত্বশীলতার বোঝা ওঠানোর জন্য প্রকৃতি এক মহান ব্যক্তিকে গড়ে তুলছিলেন।

বাস্তবিকই, মহান কাজ মহৎ লোকদের দ্বারাই হয়ে থাকে।

এগারো
হেরা গুহায়

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো। চিন্তা-চেতনার পার্থক্য তাঁর ও তাঁর জাতির মধ্যে এক বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আধুনিক শৈলীতে তিনি তাঁর জাতির প্রতি এই দৃষ্টিতে দেখছিলেন, যেমনটি নভো-বিজ্ঞানের কোনো বিশেষজ্ঞও সেই লোকদের প্রতি দেখেন, যারা বিশ্বাস করে যে, এই বিশাল পৃথিবীটি একটি গরুর শিঙের উপর দাঁড়িয়ে আছে, অথবা পরমাণু বোমার বিশেষজ্ঞ কোনো বিজ্ঞানী দেখেন যে, কোনো গৃহযুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে পাথর ছুড়ে আক্রমণ করছে বা গরুর গাড়িতে করে রণক্ষেত্রে যাত্রা করছে।

চিন্তার দৈন্যই ছিল এই অধঃপতনের মূল কারণ। মানসিক তথা আর্থিক অবস্থা ছিল আরো করুণ। ঐ যুগের অধার্মিকেরা শপথ করে বলত যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ লোকদের কখনোই পুনরুত্থান ঘটাবেন না। এই চিন্তাধারা এতদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, সৎকর্মশীল সুশীল স্বভাবের মানুষও এই মানসিক যুদ্ধে ফেঁসে গিয়েছিল। সে জন্য তারা ভাবত যে, মানবজীবন এই পৃথিবীতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ মৃত্যুই এর পরিসমাপ্তি।

কিন্তু এই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যেও এক প্রকাশমান আলোকস্তম্ভ ছিল !

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছরই রমজান মাসে মক্কা ছেড়ে হেরা পর্বতের গুহার মধ্যে চলে যেতেন এবং সেখানে কয়েক মাস যাবৎ অতিবাহিত করে আসতেন। এই গুহা মক্কার কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ থেকে কয়েক মাইল দূরে নীরব-নিস্তব্ধ একটি পাহাড়ি চটিতে অবস্থিত ছিল। যেখানে লোকদের হইহট্টগোল ও কোলাহলের কোনো আওয়াজ পৌঁছাত না, তা ছিল অত্যন্ত মনোরম ও শান্তিপূর্ণ স্থান। এই শান্তিময় ও স্বচ্ছ বাতাবরণে তিনি কয়েক দিনের পানাহার একসাথে নিয়ে যেতেন এবং সমস্ত জগৎ সংসারের মায়া মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'রাব্বুল আলামিন'-এর ধ্যান-জ্ঞানে লীন হয়ে থাকতেন, অর্থাৎ তিনি যেন পাহাড়ি উপত্যকায় অবস্থিত অন্ধকারময় তথা ভয়াল গুহার মধ্যে অবস্থান করে প্রাণী জগতে বিকাশমান সমস্ত অশ্লীলতা, দুষ্কর্ম, হিংসা, অত্যাচার, অন্যায় তথা বহু ঈশ্বরবাদী এবং অন্ধবিশ্বাসী বাতাবরণের জন্য বড়ই চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু এ সমস্ত বিকার দূর করার উপায় তাঁর জানা ছিল না এবং এর কোনো চিকিৎসাও তিনি জানতেন না।

এই একান্ত নির্জন পর্বত-প্রকোষ্ঠে এক দূরবর্তী ও সদা জাগ্রত চোখ আল্লাহর পরগাম্বরের আকাঙ্ক্ষায় সদা-প্রকাশমান ছিল। তিনি যেন একটি খনির মধ্যে অবস্থান করছিলেন, যেখান থেকে অতি পরিশ্রমে কোনো মূল্যবান ধাতু খুঁজে বের করে আনা যায়। যখন সোনা ও মাটি পরস্পর মিলে একাকার হয়ে যায় তখন তাকে পরস্পর আলাদা করে ফেলাটা কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এর আগে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাই অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম বড়ই উদ্বেগজনক অবস্থায় মিশরের জঙ্গলের দিকে পলায়ন করেছিলেন এবং নিজের এবং নিজের জাতির জন্য শান্তি, সন্তোষ ও হেদায়েতের সন্ধানে মরণভূমিতে প্রাণ-ভয়ে ঘুরে ফিরছিলেন। ইতিমধ্যে আইমন পাহাড়ি উপত্যকা থেকে অগ্নিশিখা দেখা গেল এবং তিনি যখন সেখানে পৌঁছালেন তখন এক মুকাদ্দাস আওয়াজ[১] তাঁর হৃদয়-মন-প্রাণ চিন্তা-চেতনা তথা তাঁর সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করে তুলল।

---

১. পবিত্র কণ্ঠস্বর।

'নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতএব, তুমি আমার ইবাদত কর আর আমাকে স্মরণের জন্য নামাজ কায়েম কর।' – ত্বাহা : ১৪

এই অগ্নিশিখা শত শত বছর পর এই গুহার মধ্যে প্রকাশমান হলো এবং যার কোলে এমন এক ব্যক্তি ভক্তি ও উপাসনার মধ্যে লীন ছিলেন, যিনি কুফরির ন্যায় ঘৃণিত অপকর্মের দুর্গন্ধ হতে শত শত যোজন দূরে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু এ অগ্নিশিখা প্রকৃতপক্ষে আগুন ছিল না, যা দর্শকের নিকটবর্তী হয় ; বরং তা ছিল এমন এক উজ্জ্বল জ্যোতি, যা অহির শুভসূচনা হয়ে ধরিত্রীর বুকে মঙ্গলবার্তা বয়ে নিয়ে এল, যা হৃদয়কে হেদায়েত[১] ইলহাম ধৈর্য তথা ঐশ্বরীয় ধ্যানে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছিল। সহসা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয় ও আশঙ্কার সাথে ফিরিশতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, তিনি বলছিলেন :

'পড়ো' আর তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন : 'আমি পড়তে জানি না।'

এই প্রশ্নোত্তর কয়েকবার হলো, এমনকি, তারপর কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হলো : পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাংসপিণ্ড থেকে। পড়ো, তোমার প্রভু বড়ই উদার, যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন মানুষকে সেই বস্তু দ্বারা, যা সে জানত না। – সুরা আলাক : ১-৫

বারো
অরাকা ইবনে নওফেল

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন, কিন্তু দুনিয়া একই প্রজাতির ব্যক্তিদের মধ্যে সেই পার্থক্য করে না, যেমনটি সাধারণত মানব জাতির মধ্যে দেখা যায়। কিছু ব্যক্তি নক্ষত্রের চেয়েও উঁচু হন, কিন্তু মানুষের মধ্যে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা রাখতে ব্যর্থ হন যদিও সবার মাঝে তিনি 'মানুষ' বলেই পরিচিত থাকেন।

এই পার্থক্য 'অহি'র প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং সাধারণভাবে তা হতে বঞ্চিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। ঐ ব্যক্তির সাথে সাধারণ ব্যক্তিদের কী তুলনাই বা হতে পারে, যাঁকে চয়ন করে নেয়া হয়েছে ? আর জনসাধারণের মধ্যে যাঁর বিশেষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। আর তাঁর মধ্যে উপদেশ, ক্ষমতা, সামর্থ্য ও সহায়তার কিরণমালা বিদ্যমান রয়েছে।

---

১. উপাস্য।

'তিনি ফিরিশতাদের রুহের মাধ্যমে নিজের ভাষায় যার উপর চান অবতারণ করেন যে, সচেতন করে দাও আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর।' – আন নহ্‌ল : ২

গর্ভস্থ ভ্রূণে আল্লাহ যখন প্রাণ সঞ্চার করেন তখন তার প্রকৃতিই বদলে যায়। তা প্রথম ছয়টি পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়। মাটির সার, নুতফা[১], রক্তরস, মাংসপিণ্ড হাড় ও মাংসে ঢাকা শরীর– এ সমস্ত পর্যায় পিছনে রয়ে যায়। এই অবস্থা নবীদেরও, যখন অহি[২]'র সাথে তাঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং তাঁর রুহের মধ্যে একটি নতুন রুহ প্রবিষ্ট হয়ে যায় তখন তাঁরা অন্য রকমের ব্যক্তিত্ব হয়ে যান যাঁর প্রখর আলোক-দীপ্তির ধারে কাছেও কেউ যেতে পারে না।

এই পরিবর্তনই সেই রহস্য যে, আল্লাহ হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যা মানুষের জমাটবদ্ধ রক্ত হতে সৃষ্টি করেন। যে শক্তি এই বিচিত্র মানুষকে রচনা করেছেন এক সাধারণ মাংসপিণ্ড থেকে, তিনিই ঐশ্বরীয় নিয়ামত প্রদান করে মুহাম্মদকে রসুল বানাচ্ছেন এবং তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও পড়তে থাকেন :

'আর এভাবেই (হে মুহাম্মদ) 'রুহ' (কুরআন) আমার আদেশে তোমার প্রতি 'অহি' প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না যে, কিতাব কী বস্তু আর জানতে না ঈমান কী ? পরন্তু আমরা একে আলোক বানিয়েছি যে, এর দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চাই, তাকে পথ প্রদর্শন করি। আর নিঃসন্দেহে তুমি তো (হে মুহাম্মদ) এক সরল পথ প্রদর্শন করছ। সেই আল্লাহর পথ যার তিনিই সবকিছু, যিনি ভূমণ্ডলেও আছেন এবং নভোমণ্ডলেও আছেন।' – আশ শুরা : ৫২-৫৩

'মুমিনদের জননী হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হতে হাদিসে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহির প্রারম্ভ সত্য-স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হয়। তিনি স্বপ্নও দেখতেন, তা এমনই হতো যেন প্রকাশ্য দিবালোকে সবকিছু দেখছেন। তারপর একান্তপ্রিয় হয়ে গেলেন এবং কোনো কোনো দিন হেরা গুহায় একান্তে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি পানাহার সামগ্রী সাথে করে নিয়ে গিয়ে সেখানে দিনাতিবাহিত করতেন, আবার যখন তা ফুরিয়ে যেত তখন পুনরায় হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহার কাছে আসতেন এবং তিনি আবারো কয়েক দিনের পানাহার তাঁকে প্রদান করতেন। এমনকি, এভাবে, হেরা গুহায় একান্তে তাঁর কাছে সত্য প্রকাশ হয়ে গেল। তাঁর কাছে ফিরিশতা এলেন এবং বললেন : 'পড়ো' ! তিনি বললেন, 'আমি পড়তে পারি না।' তিনি বলেন : তারপর ফিরিশতা আমাকে তাঁর বুকে ধরে চাপ দিলেন তখন

---

১. বীর্য।

২. আল্লাহর আদেশ ফিরিশতার মাধ্যমে নবীর কাছে পৌছানো।–অনুবাদক

মনে হলো, আমায় প্রাণশক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন 'পড়ো' আমি বললাম আমি পড়তে পারি না। তিনি আবারো আমাকে চেপে ধরলেন, তখন আমার জীবনীশক্তি নিঃশেষ প্রায়। তারপর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন ; 'পড়ো' তখন আমি আবারো বললাম আমি পড়তে জানি না। তিনি তৃতীয় বারের মতো যখন আবারো আমাকে চেপে ধরলেন, তখন মনে হলো আমার জীবনশক্তি নিঃশেষিত প্রায়। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন ; 'পড়ো' তোমার প্রভুর নামে, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন' তারপর 'যা সে জানত না' পর্যন্ত পৌছালেন, অর্থাৎ সুরা 'আলাক'-এর পাঁচটি আয়াত পাঠ করলেন।

তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে নিজের বাড়ি চলে এলেন এবং হজরত খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও।' অতএব, তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দেয়া হলো। কিছু সময় পর তাঁর ভয়ের দশা কেটে গেলে তিনি খাদিজাকে বললেন, খাদিজা ! আমার কী হলো ? তারপর পুরো ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন এবং সবশেষে বললেন : 'আমার প্রাণের ভয় হয়।'

হজরত খাদিজা বললেন, কখনোই নয়। আপনি প্রসন্ন হোন আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে অপদস্ত করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, আপনি সত্য বলেন, অসহায় লোকদের ভার নিজে বহন করেন, দরিদ্রদের সাহায্য করেন, আপনি অতিথিদের সেবা করেন এবং সুকর্মে সহযোগিতা করেন।

এরপর তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অরাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন, যিনি তাঁর চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি ইসলাম-পূর্বযুগে মূর্তিপুজো ত্যাগ করে ঈসায়ী হয়ে গিয়েছিলেন। আরবি ও হিব্রু ভাষায় সুপরিচিত ছিলেন এবং বাইবেল অনুবাদ করতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও নেত্রহীন হয়ে পড়েছিলেন। হজরত খাদিজা তাঁকে বললেন, ভাইজান ! একটু শুনুন আপনার ভাইয়ের কথা ! অরাকা বললেন, ভাই ! তুমি কী দেখেছ ? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন, তার সবটাই বর্ণনা করলেন। অরাকা বললেন, 'ইনি সেই জিব্রাইল ফিরিশতা, আল্লাহ যাকে মূসার প্রতি অবতরণ করেছিলেন। উহ, কতই না ভালো হতো যদি আমি যুবক ও শক্তিশালী হয়ে বেঁচে থাকতাম, যেদিন তোমার জাতি তোমার মাতৃভূমি মক্কা থেকে বের করে দেবে !' রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কী এরা আমাকে বের করে দেবে ?' অরাকা বললেন, হ্যাঁ, কখনো এমন হয়নি, যারা সত্য-সংবাদ নিয়ে এসেছেন, অথচ দেশবাসী তার সাথে শত্রুতা না করেছে। আমি যদি ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু

অনতিকাল পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। আর এদিকে অহি আসাও কয়েক দিনের জন্য বন্ধ রইল।' – বুখারী, মুসলিম

যেন বিগত চল্লিশটা বছর একটিমাত্র দিনের মধ্যে একীভূত হয়ে গেল। অহি এক নতুন দিবসের আলোকবার্তা বয়ে নিয়ে এল। বিস্মিত, নিঃসহায় ও অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধি 'সত্য'-এর প্রকাশ দেখতে পেল এবং এ সংবাদ সীমিত ও ভগ্ন-হৃদয় বিশ্বাস ও আশার এক নব দিগন্তের সূচনা অনুভব করল। আর নবুয়তের কিরণমালা দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নিঃসন্দেহে এ প্রতিষ্ঠা ও তার শ্রেষ্ঠত্ব কতটা উচ্চ ছিল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যের অনুসন্ধানে জীবন উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, তা কত না মহান ছিল ?

অতি শীঘ্রই তিনি সন্তোষ লাভ করলেন। যে সময়ে খাদিজার স্থান তাঁর পরবর্তী কালের সমস্ত যুগের নবীদের জন্য এক অনুকরণযোগ্য ও প্রশংসনীয় বিষয় ছিল। তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিলেন, অনুপ্রাণিত করলেন। তিনি উদ্বিগ্ন হলে তাঁকে শান্তি দিলেন, তিনি পরিশ্রান্ত হলে তাঁর প্রতি তিনি শ্রেষ্ঠতম আয়েশের দৃষ্টান্ত রাখলেন এবং বললেন, এমন ব্যক্তি কখনো অসম্মানিত হন না। আল্লাহ আপনার মধ্যে উচ্চ নৈতিকতা, শ্রেষ্ঠ গুণাবলি তথা সদ্ব্যবহার এজন্য উৎপন্ন করে দিয়েছিলেন যে, তিনি সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ না করে যান না। এই দৃঢ় মত ও শুদ্ধ সহৃদয়তার কারণে হজরত খাদিজা সেই সম্মানের পাত্রী হলেন, যাঁকে আল্লাহ, সমস্ত জগতের প্রভু তাঁকে 'সালাম' পাঠিয়ে সম্মানিত করলেন। অনন্তর জিব্রাইল ফিরিশতা মারফত আল্লাহ তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করতেন।[১]

---

১. মূল গ্রন্থের লেখক এখানে ঐ হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, জিব্রাইল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসুল ! ইনি খাদিজা, সাথে করে পানাহার বা শরাব নিয়ে আসছেন। তিনি আপনার কাছে এলে তাঁকে তাঁর প্রভু ও আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাঁকে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ দেবেন। যেখানে না কোলাহল আছে আর না শ্রান্তি।(–বুখারী, মুসলিম) এ সময় পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি। অনুবাদক

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীনের দাওয়াতের প্রারম্ভ

অহির বিলম্ব কাল
ইসলামী দাওয়াতের বুনিয়াদ
গুপ্ত দাওয়াতের জমানা
দাওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা
'আবু তালিব' রসুলুল্লাহর অভিভাবক
মুসলমানদের উপর অত্যাচার
আম্মার বিন ইয়াসির
বিলাল ইবনে রবাহ
হজরত খাব্বাব ইবনে আরাত
সমঝোতা তথা সওদাবাজির প্রয়াস
হাবশায় হিজরত
হজরত হামজা ও হজরত উমর (রা) ইসলামের ছায়াতলে
সামাজিক বহিষ্কার
আমুল হুজন (শোকের বছর)
তায়েফ যাত্রা
ইসরা ও মিরাজ
ইসরার হিকমত (তত্ত্বদর্শিতা)
অন্তিম ইট
প্রাকৃতিক দ্বীন ?
নামাজ ফরজ হয়ে গেল
'কুরাইশ' ও 'ইসরা'

এক
অহির বিলম্ব কাল

বিস্ময়ের ঘোর কেটে গিয়েছিল। সেই সাথে বাস্তবিকতার চিহ্নও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে গেল যে, তিনি পরম করুণাময় মহিমান্বিত আল্লাহর মনোনীত নবী হয়ে গেছেন এবং 'অহি' বহনকারী ফিরিশতা আল্লাহর প্রত্যাদেশ নিয়ে তাঁর কাছে আসেন কিন্তু মানুষ ও ফিরিশতার মধ্যে এই সম্পর্কের পরিণামস্বরূপ যে ভয় আশঙ্কা উৎপন্ন হয়েছিল তা তাঁকে অত্যধিক পরিশ্রান্ত করে তুলেছিল, যেন তিনি অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত অহির তীব্রতা অনুভব করতে লাগলেন। প্রথম অহি অবতরণের পর এক দীর্ঘ সময় অবধি অহির ধারাবাহিকতা বন্ধ রইল, হাদিসে একে 'ফতরাতুল অহি' অর্থাৎ অহির বিলম্ব কাল বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই বিলম্ব এ জন্যই করা হলো, যাতে অহির প্রতীক্ষা তথা তার প্রয়োজনীয়তার আভাস রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে ধৈর্য, স্থিরতা ও সহন-শক্তি সৃষ্টি করার একটা সাধনে পরিণত হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও মানবশক্তি এর চাপের তুলনায় প্রভাবহীন ছিল।

দ্বিতীয়বার জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এলেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসুলকে অহির বিলম্বকালের বিষয়ে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি আমাকে বলেন–

'একদিন আমি পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সহসা আমি এক আকাশবাণী শুনলাম, তারপর মাথা তুলে দেখলাম সেই ফিরিশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে এক কুরসিতে বসে আছেন। আমি খুব ভীতত্রস্ত হলাম এবং মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর আমার পরিজনদের কাছে এলাম এবং বললাম, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। তারপর তারা আমাকে চাদর জড়িয়ে দিলেন। সে সময় আল্লাহ অহি অবতারণ করলেন :

'হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী ! ওঠো এবং লোকদের সচেতন করো, এবং নিজের বস্ত্র পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখো এবং সমস্ত প্রকারের অপবিত্রতা থেকে নিজেকে পৃথক রাখো।' –আল-মুদ্দাসসির : ১-৫

এ আদেশ ছিল এই ঘোষণারই নামান্তর যে, অতীত কাল শান্তি ও সন্তুষ্টির সাথে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আর যখন আপনাকে এমন এক নবীন কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে যা সচেতনতা, বুদ্ধিমত্তা, ভয় ও শুভ-সূচনার দাবি জানায়। এখন আপনি রিসালতের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিন, মানুষের প্রতি মনোযোগ দিন, অহির মাধ্যমে সহযোগিতা নিন এবং সেই কষ্টকে সহ্য করে নিন। কেননা, এটাই হবে আপনার রিসালতের স্রোত ও দাওয়াতের হাতিয়ার।

অহি হলো আল্লাহর প্রেরণা, যা আল্লাহর ইচ্ছায় এবং স্পষ্ট নিঃশব্দরূপে অন্তরে এসে যায়। এর বিভিন্ন পর্যায় এবং শ্রেণী আছে, যেগুলোর মধ্যে কিছুটা সহজ ও সূক্ষ্ম, কিছুটা জটিল বা কঠিন। হজরত উমর হতে হাদিসে উল্লেখ আছে :

'আল্লাহর রসুলের উপর যখন অহি আসত তখন তিনি তার মাথার কাছে মধু-মক্ষীদের ন্যায় গুনগুন আওয়াজ শুনতে পেতেন।' –তিরমিজি

'অহি' কখনো আসত ঘন্টার আওয়াজের মতো শব্দ করে– এই পর্যায়টি হতো সবচেয়ে কঠিন– ফিরিশতা তাঁর সাথে কথা বলতেন, সে সময়ে এমনকি প্রচণ্ড শীতেও ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যেতেন। (বুখারী) আর তিনি উটের উপর বসে থাকলে সে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে বসে পড়ত। (আহমদ, হাকিম) একবার তিনি জায়েদ ইবনে সাবিত রাজিয়াল্লাহু আনহুর উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন, এমন সময় অহি এল, সে সময় তাঁর উপর এতটা চাপ পড়ল যে, মনে হলো তাঁর উরু ভেঙে যাচ্ছে। (বুখারী) কখনো কখনো এর চেয়ে সহজ ও হালকা ঢঙেও আসত।

প্রায়শই প্রশ্ন করা হয় যে, অহির সময়টি এত কঠিন কেন হতো ? কুরআন অবতারণ স্বপ্নাবস্থায় ইলহামের রূপে কেন হয়নি ? অথবা জাগ্রতাবস্থায়ও তো ইলহাম হতে পারত ? যেমনটি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'রুহুল কুদ্দুস' (জিব্রাইল ফিরিশতা) আমার হৃদয়ে এই কথা সঞ্চার করে দিয়েছেন যে, কোনো প্রাণীর জীবিকা পুরো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং সৎ-পথে জীবিকা উপার্জন কর। (হাকিম)

এই ভয় তথা অবসাদ কি উত্তম ঢঙে ছিল না ?

এর উত্তর এই যে, কুরআন অবতারণে এই ঢং প্রারম্ভেই অবলম্বন করা হয় এবং ফিরিশতা এই রূপে এজন্যই প্রকাশ হন, যাতে কুরআনের আয়াতরাজি[১]

---

১. বাক্যাবলি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার ব্যাপারে যেন কোনো ভ্রম বা শঙ্কা না থাকে এবং এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর ভার সহনযোগ্য তখনই করে নেয়া হয়েছিল, যখন তাঁকে এ কাজের জন্য চয়ন করা হয়েছিল এবং এই ভার তাঁর কমিয়ে নেয়া হয়েছিল, এজন্য তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষও করা হয়েছিল। এ কুরআন কোনো নির্জনপ্রবাসী একান্ত ভক্তের চিন্তাধারার পরিণাম নয়, এ নয় কোনো দর্শনশাস্ত্রের দর্শন-কথা, যা বিতর্কের পাহাড় জমাতে পারে। এ সেই পরম উপাসকের ভাষা, যার কোনো অংশ নেই।

'এ তো সেই 'অহি' যা তাঁর উপর অবতারণ করা হয়। তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন সেই প্রবল শক্তির অধিকারী, যা সুদৃঢ়পূর্ণরূপে প্রকটিত, যা আকাশের সর্বোচ্চ কিনারায় অবস্থান করছিল। তারপর তা নিকটস্থ হলো ও নিচে নেমে এল, যা দুই জগৎ দূরত্বের অবস্থিত ছিল ; বরং আরো নিকটে তারপর, তিনি তাকে 'অহি' করলেন। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা কিছুই (অবতারণ) করেছেন। সে যা কিছু দেখেছে, তা ধোঁকা নয়। তাহলে কি সে যা কিছু দেখেছে, সে জন্য তোমরা ভর্ৎসনা করবে ?' – আন-নজম : ১–১২

দুই
ইসলামী দাওয়াতের বুনিয়াদ

হজরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর অবতারিত আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর প্রত্যাদেশ প্রচারের কাজে নেমে পড়লেন।

কুরআনের যে সমস্ত সুরা[১] মক্কায় অবতারিত হয়েছিল, তাতে ঈমান,[২] আকিদা[৩] কর্ম ও আচরণকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাঁর প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাঁর রসুলকে তাকিদ দিয়েছিলেন। এতে সর্বপ্রথম ছিল বিশুদ্ধ একত্ববাদের শিক্ষা।

১. বিশুদ্ধ একত্ববাদ

মানুষ বিশ্ব-ভুবনের কোনো সৃষ্টি বা স্রষ্টার দাস নয়, কেননা প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর দাস এবং এরা সকলেই তার প্রতাপকে স্বীকার করে এবং তার প্রতিই প্রণত হয়।

---

১. সূরা–অর্থাৎ অধ্যায়।
২. ঈমান– বিশ্বাস।
৩. আকিদা– বিশ্বস্ত ধারণাবলি।

অতএব, এখানে কোনো অংশীদার, কোনো সুপারিশকারী অথবা তার কোনো প্রকারের সাধনের কোনো স্থান নেই। প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো অন্য কোনো প্রাণীর সহায়তা ছাড়াই প্রত্যক্ষরূপে আপন প্রভুর প্রতি ফিরে যাওয়া। প্রতিটি ব্যক্তির জন্য এটাই ফরজ[১] যে, সদা-সর্বদা সেই ব্যক্তির বিরোধিতা করা যে নিজেকে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি তাকে আল্লাহর সমীপবর্তী বলে মনে করে। সে তাকে সীমিত স্থানে রাখে তা সে মানুষ, পাথর বা যা কিছুই হোক না কেন। মানুষকে সমস্ত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্বে তাঁর একত্বের ভিত্তির উপরেই করা উচিত এবং সন্দেহাতীতরূপে বিশুদ্ধ একত্ববাদ গ্রহণ করা উচিত।

এই ধারণার পরিণাম এটাই যে, আরবের অধিবাসীরা যে সমস্ত পাথরের পুজো করত তার স্থান ঘরে অথবা রাস্তায় বিছানো পাথরগুলোর সমকক্ষও রইল না। আর অন্য সমস্ত ধর্মে যে মানুষগুলো ঈশ্বরের আদেশ পালনে সর্বদাই আগ্রহী ছিল কিন্তু অবজ্ঞাকারীদের পিছনে ছিল, আর তাদের সৃষ্টি করার এবং অন্নদান করার শক্তি ছিল না।

২. আখিরাত

মৃত্যুর পরে এমন একদিন অনিবার্যরূপে আসবে, যে দিন লোকদের আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং তিনি তার গত জীবনের সমস্ত হিসাব তন্ন-তন্ন করে গ্রহণ করবেন। অতএব, যে বিন্দু পরিমাণ সৎকর্মও করেছে, সে তা দেখতে পাবে এবং তার সুফল পাবে এবং যে বিন্দুমাত্রও কুকর্ম করেছে, তার কবল থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। একদিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও পরিপূর্ণ বাগ-বাগিচা এবং নেয়ামতের প্রাচুর্য সে লাভ করবে, যার ফলে সে বিলাসিতাপূর্ণ আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করবে অন্যদিকে কুকর্মীরা জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় অনন্তকাল ধরে দগ্ধীভূত হতে থাকবে।

ব্যক্তি যে কাজই করুক না কেন, 'আখিরাত'[২] এর চিন্তা রাখা তার ইসলামী দীক্ষার বুনিয়াদি সিদ্ধান্ত। অতএব, একজন যাত্রী যেমন বিশ্বাস রাখে যে, পরবর্তী স্টেশনে সে নেমে যাবে, এরকমই একজন মুসলমান ভালো মতোই এ বিশ্বাস রাখে যে, তার জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং সে তার প্রভুর সাথে গিয়ে মিলিত হবে, যেখানে সে সারা জীবনের সঞ্চয় লাভ করবে এবং দুনিয়াবি জীবনের জীবন ক্ষেত্রে যে ফসল সে বুনেছিল, সে ফসল সে ওখানেই কেটে নেবে।

---

১. ফরজ– অবশ্যকর্তব্য করণীয়।

২. আখিরাত–পরলোক বা পরকাল।

৩. মনের শুদ্ধিকরণ

তৃতীয় বুনিয়াদি সিদ্ধান্ত হলো মনের পবিত্রতা ও তার বিশুদ্ধিকরণ[১]। মনের শুদ্ধি তখনই সম্ভব ব্যক্তি যখন ঐ সমস্ত নির্ধারিত ইবাদত রসুলের তরিকা[২] অনুসারে আদায় করে, আল্লাহ যা বৈধ করেছেন এবং প্রতিকূল বিষয় বা বস্তু থেকে আল্লাহ যা রক্ষা করেছেন।

'বলে দাও : এসো, তোমাদের প্রভু কোন কোন বস্তু তোমাদের জন্য হারাম করেছেন তা বর্ণনা করি ; তা হলো এই যে, তাঁর সাথে কোনো কিছুর শরিক করবে না, এবং মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ কর এবং দারিদ্র্যের কারণে আপন সন্তানদের হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের রুজি প্রদান করি এবং তাদেরও। আর অশ্লীলতার ধারে কাছেও যেয়ো না, আল্লাহ যে জীবকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা কোরো না, এ জন্যই যে পরিবর্তে তাই করতে হয়। আর এ সমস্ত বিষয় তিনি যা তোমাদের তাগিদ দিয়েছেন, যাতে বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন করতে পার। এবং অনাথের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না, পরন্তু তার সাথে উত্তম আচরণ কর তার সুব্যবস্থায় পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত। আর তোমরা ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে থাক এবং পরিমাপে ঠিক দাও। আমি কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপাই না। আর যখন কথা বলবে তখন ন্যায়ের সাথে বলবে, তা সে নিজের আত্মীয়-স্বজন হোক বা না হোক এবং আল্লাহর সাথে করা প্রতিশ্রুতি পুরো কর। এই সমস্ত কাজ যা তিনি করতে তাগিদ দিয়েছেন, যাতে তোমরা মনোযোগী হও। আর এ (তাগিদ) হলো আমার পথ অবলম্বন, যা সম্পূর্ণ সরল। অতএব, তোমরা এই পথ ধরে চল, আর অন্য পথে যেয়ো না (তাহলে) তোমাদের ঐ পথ থেকে সরিয়ে তোমাদের বিভ্রান্ত করে দেবে। আর তাগিদ হলো তোমরা তার ভয় কর।' – আল আনআম : ১৫২-১৫৪

আকতাম ইবনে সাইফী বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা যদি ধর্মরূপে না আসত তা সত্ত্বেও তা হতো লোকদের জন্য শ্রেষ্ঠতম আবার ব্যবহারের জন্য উত্তমতম শিক্ষা।

৪. ইসলামী জামাআতের সংগঠন অজুদ এর সুরক্ষা

ইসলামী সংগঠন হলো এক শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় একত্বের নাম। এর বুনিয়াদ হলো পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও একে অন্যের সহযোগিতা। এর দাবি হলো উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, অভাবগ্রস্তকে দান করা ও দুর্বলকে সহযোগিতা করা।

---

১. সূক্ষ্মতার ভিন্ন প্রেক্ষিতে হলেও একে আত্মশুদ্ধি বলেও অভিহিত করা যায়।

২. তরিকা– পদ্ধতি বা নিয়ম।

সুরা মুদাসসির হলো প্রথম সুরা, যাতে আল্লাহ তাঁর রসুলকে গণ-দাওয়াতের আদেশ দিয়েছেন :

'প্রত্যেক জীব তার কামাইয়ের সাথে আবদ্ধ ডান হাত ব্যতীত। বাগিচাগুলোতে অপরাধীদের সম্পর্কে একে অন্যের কাছে জানতে চাইবে :

জাহান্নামে তোমরা কী নিয়ে এসেছ। তারা বলবে : আমরা নামাজিদের দলভুক্ত ছিলাম না, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতাম না এবং বাজে কথা বলা লোকদের সাথে আমরাও মিথ্যা রচনায় অংশ নিতাম এবং প্রতিদান পাওয়ার দিনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতাম, এমনকি আমাদের উপর সেই বাঞ্ছিত বস্তুটি এসে গেছে। এখন সুপারিশকারীদের কোনো সুপারিশ আর কাজে আসবে না।' –আল-মুদাসসির : ৩৮–৪৮

হজরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন দেখতেন দুর্বল ও অসহায় কোনো মুসলমানকে পীড়ন কিংবা কষ্ট-যন্ত্রণা দেয়া হচ্ছে তখন তিনি তাঁকে স্বাধীন কিংবা সেই পীড়া থেকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য নিজের ঘরের সম্পদ বের করে দিতেন। কেননা, এ ব্যক্তির মুসলিম-জামাআতের উপর অধিকার রয়েছে।

তিন
গুপ্ত দাওয়াতের জমানা

মক্কায় ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং সাহসী লোকদের প্রভাবিত করতে লাগল। লোকেরা অত্যন্ত দ্রুত পুরাতন গুমরাহি ত্যাগ করে নতুন দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতরাজি তাঁদের হৃদয়-মনের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে ঈমানের বীজ বপন করতে লাগল, যেন উর্বর জমিতে মুষলধারায় বারি বর্ষণ করতে লাগল :

'(তারপর তুমি জমিকে শুকনো পড়ে থাকতে দেখো) তারপর তার উপর যখন বারিবর্ষণ করলাম তখন তাতে তেজস্বিতা এসে গেল এবং তা ভরে উঠল। এবং সে সমস্ত প্রকারের শোভায়মান বস্তু উৎপাদন করল।' – আল হজ : ৫

এই সমস্ত আকিদা অনুযায়ী গভীর প্রেমভাবের সাথে তারা একত্রিত হতে লাগল এবং চারিদিক থেকে ভেঙে-ভেঙে এসে সানন্দে ইসলামী আকিদার জন্য একত্রিত হতে লাগল এবং অত্যন্ত সাবধানতার সাথে নিজের চিন্তাধারাকে স্পষ্ট করে তোলার কাজে নেমে পড়ল।

ঈমানের শক্তি জাদুর মতো, যখন তা হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং গভীর হৃদয়পটে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে যায় তখন তা অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলে।

আমরা এমন বয়োবৃদ্ধ ও যুবকদের দেখেছি যে একটা চিন্তাকে অবলম্বন করে এবং তাকে দৃঢ় আকিদারূপে গ্রহণ করে, যদিও তা বিশুদ্ধ ভৌতিক চিন্তা তাকে গ্রহণ ও প্রচার করার জন্য সে নিজের জীবনে কঠিনতম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ও তার জন্য সমস্ত রকমের কঠোরতম কষ্টটি সয়ে যায়।

এ সময়ে কারাবাসকালে এমন যুবকের সাথেও আপনার সাক্ষাৎ হয়ে যাবে, যে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষালাভ করেছে এবং সে তার জীবনের দীর্ঘ একটা সময় চোর ও ডাকাতদের সাথে কাটিয়েছে।

সে তার সিদ্ধান্তের সাফল্য তথা তার উন্নতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাটাকে একটা সাধারণ কাজ বলে মনে করে। আর ইসলামের প্রারম্ভে যখন ঈমান অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যাবে তখন তার অবস্থা হয় দেওয়ানার মতো। তার ঈমানই বা কেমন হবে ? পৃথিবী, আকাশ তথা আল্লাহর উপর ঈমান ! আখিরাতের উপর ঈমান ! যেখানে মানুষ দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর রহমতের ধারায় স্থান পাবে, যেখানে ঘন বাগ-বাগিচা হবে, উঁচু উঁচু মহল হবে। তার নিচে নহর বইবে এবং সর্বকালিক সুখসামগ্রী লাভ হবে। এভাবে সৎ-পথের কাফেলা তৈরি হতে লাগল এবং দিনের পর-দিন তার সংখ্যা বেড়ে চলল।

এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম নিজের নিকটাত্মীয়দের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করবেন। এঁদের মনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্রেষ্ঠত্ব, স্থান ও সততার প্রতি কোনো সন্দেহ ছিল না। অতএব, এটাই আবশ্যক ছিল যে, এঁরাই সর্বপ্রথম তাঁর দাওয়াতের গুরুত্ব দেবেন, তাঁর সহযোগিতা করবেন এবং তাঁকে অনুসরণ করবেন।

'তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন হজরত খাদিজা, তারপর, তাঁর দাস জায়েদ বিন সাবিত, চাচাত ভাই আলী ইবনে আবী তালিব (যিনি তখনও বালক ছিলেন এবং রসুলুল্লাহ্‌র ভরণ পোষণে ছিলেন) এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবুবকর ঈমান আনলেন, তারপর আবুবকর প্রচারে যত্নবান হলেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব ও বিশ্বস্ত সাথিদের ইসলামে নিয়ে এলেন। উসমান ইবনে আফফান, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও সাদ ইবনে ওয়াক্কাস তাঁরই মাধ্যমে ইসলামে প্রবিষ্ট হলেন। আরাকা ইবনে নওফেলও[১] ঈমান গ্রহণ করলেন। উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পরে স্বপ্নে তাঁকে সুন্দররূপে অবস্থান করতে দেখেন, যা আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মান ও মর্যাদারই সাক্ষ্য ছিল। – আহমদ তথা জুবাইর বিন আওয়াম আবুযর গিফারী।

---

১. রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অরাকাকে মন্দ বোলো না, আমি তাঁর জন্য এক বা দুটি বাগিচা দেখেছি।– হাকিম

আমর বিন আবসা ও সাঈদ বিন আস রাজিয়াল্লাহু আনহু ইসলামে প্রবেশ করেন এবং মক্কায় ইসলাম ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে স্থান করে নিতে লাগল, যাঁদের হৃদয় ছিল আলোকমান, যদিও ইসলাম গুপ্তরূপে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই দিনগুলোতে কোনো প্রকাশ্য সাবধানবাণী ও বীরত্ব প্রদর্শন করা হলো না।

এসব খবর যখন কুরাইশদের কাছে পৌছাল তখন তাঁরা এর কোনো গুরুত্ব দিলেন না। সম্ভবত, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তির অন্যতম বলে, মনে করা হলো, যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে সাধারণভাবে চর্চা করতেন, যেমন– উমাইয়া বিন সালাত, কায়েস বিন সাঈদা ও আমর বিন নুফাইল প্রমুখ একত্ববাদী ছিলেন। কিন্তু এই দ্বীনের প্রচার এবং প্রভাবের কারণে তাদের কিছুটা চিন্তা হলো এবং তাঁরা আরো প্রতীক্ষায় রইলেন যে, এই ব্যক্তি তথা এর আন্দোলনের পরিণাম কী হয় তা দেখার জন্য।

গুপ্ত দাওয়াতের এ পর্যায় তিন বছর পর্যন্ত চলল। তারপর, অহি মারফত প্রকাশ্য দাওয়াতের ঘোষণা দেয়া হলো আর অসত্য ও মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার স্পষ্ট আদেশ এসে গেল।

চার
দাওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা

ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, যখন কুরআনে এই আদেশ 'এবং নিজের নিকটস্থ ও পরিজনদের সচেতন কর' (আশ শূরা : ২১৪) অবতীর্ণ হয়, তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতের উপর উঠলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন– প্রাতের বিপত্তি ঘনিয়ে আসছে। তখন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে লোকেরা দৌড়াতে লাগল, যখন সবাই একত্রিত হলো এবং যে না আসতে পারল সে লোক পাঠিয়ে দিল। তিনি সমস্ত বংশ ও গোত্রের নাম উচ্চারণ করে বলতে লাগলেন 'হে বনু ফিহর ! হে বনু আদী ! হে বনু হাশিম ! হে বনু আব্দুল মুত্তালিব ! ইত্যাদি। যদি আমি তোমাদের বলি, পাহাড়ের পিছনে এক বিরাট সেনাদল তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে ? লোকেরা বলল, আমরা কখনোই আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাদের সচেতন করে দিচ্ছি যে, একটি আজাব তোমাদের দিকে দ্রুত ধেয়ে আসছে। কুরাইশদের মধ্য থেকে তাঁর চাচা আবু লাহাবও এসেছিল। সে কাউকে আর কিছু বলতে না দিয়ে গণ্ডগোল পাকানোর মানসে বলল– গোল্লায় যাও তুমি, তুমি এ জন্যই আমাদের এখানে ডেকে এনেছ ? অনন্তর, সুরা লাহাব অবতীর্ণ হলো। –বুখারী

আবু হুরাইরাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ যখন সুরা শুআরার ২১৪ সংখ্যক আয়াত অবতারণ করেন, তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন ! হে কুরাইশবৃন্দ ! নিজেদের রক্ষা কর। আমি আল্লাহর সামনে তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না ! হে বনু আব্দুল মুত্তালিব ! আমি তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচাতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ! আমি আল্লাহর কাছ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। হে (রসুলের ফুফু) সফিয়া ! আমি তোমাদের কোনো কাজে আসতে পারব না। হে (রসুলের কন্যা) ফাতিমা ! যা কিছু চাও নিয়ে নাও, কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। (বুখারী)

এ আহ্বান ছিল অত্যন্ত উচ্চস্তরের তবলিগ, যেখানে আল্লাহর রসুল প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষায় তাঁর জাতির সামনে দাওয়াত পেশ করেছিলেন এবং নিজের আত্মীয় পরিজনদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, এ রিসালতের আহ্বান তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তার সাধন হতে পারে। অতএব, আত্মীয়তাজনিত পক্ষপাত আরবদের কাছে যা অতীব প্রিয় ছিল, তা এই ঐশ্বরিক উদঘোষণার তাপে গলে একাকার হয়ে গেল।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্মভূমিতে মহা সম্মান, মহা-বিশ্বাসের প্রতীক ও মহা-ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি ঐ ক্ষেত্রে সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছিলেন, তারা বুদ্ধিহীন ও আত্মগর্বীদের সাথে সংঘর্ষের দিনক্ষণ দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল। একেবারে প্রথম দিকে যারা তাঁকে অত্যন্ত কৃপা ও স্নেহ-ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতেন, সর্বোপরি, যাঁরা তাঁর সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনও ছিলেন, তাঁরা তাঁর এ দুঃখ-কষ্টের দিনে, তার সৎ-পথ প্রদর্শনের দিনগুলোতে কী ভূমিকা রেখেছিলেন ? এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে, তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্তে সুখ-নিদ্রা যাওয়াও আর সম্ভব ছিল না। কেননা, সে সময়ে মক্কায় তাঁর দাওয়াতের কারণে প্রতিনিয়ত ঘৃণা হিংসা-বিদ্বেষ-বেড়ে চলেছিল আর সমগ্র মক্কা তাঁর এ ইনকিলাব– মহাবিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এই ইনকিলাব–মহাবিপ্লব, যা অকস্মাৎ প্রকট হয়েছিল এবং সে বিষয়ে তাদের ভয় ছিল যে, এ তাদের রীতি-রেওয়াজ ও আচার-সংস্কৃতিকে ভস্মীভূত করে ছাড়বে।

কুরাইশদের দ্বেষ ও সত্য বিমুখতা তার পথে অটল ও গতিশীল রইল আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিকে তাঁর নিজের মত ও পথে সুদৃঢ়ভাবে কায়েম রইলেন এবং আল্লাহর প্রতি তাদের আহ্বান করতে থাকলেন, ইসলামকে অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা ও তত্ত্বদর্শিতার সাথে পেশ করে চললেন। মূর্তিপুজোর ন্যায় দুষ্কর্মের পরিণামের কথা তাদের বুঝিয়ে চললেন এবং লোকদের আপত্তির কথা শুনতে লাগলেন এবং তার জবাবও দিতে লাগলেন। শিরক বা

অংশীদারিতা বা বহু-ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ হানতে লাগলেন এবং ইসলামকে পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করে চললেন এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তার মর্মবাণী তুলে ধরে তাঁদের সত্য-পথে নিয়ে আসার জন্য তীব্র ইচ্ছা আর তাদের উপেক্ষা তাঁকে বিবশ করে তুলল তা সত্ত্বেও তাঁদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পূর্ণরূপে পেশ করলেন। কেননা, আরবে যে স্থান তিনি লাভ করেছিলেন, তার কারণে দাওয়াতের সুফল তথা সুপরিণাম সম্পর্কে তাঁর মনে পূর্ণ আস্থা ছিল।

এঁরা তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, তাঁর প্রতি যাঁদের স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল আর তাদের আল্লাহর ক্রোধে পতিত হওয়াটাও তাঁর জন্য ছিল একটা অসহনীয় ব্যাপার।

ইবনে আমির বর্ণনা করেছেন :

'জাফর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি হাকাম বলেন, আল্লাহ যখন তাঁর রসুলের উপর সুরা 'শুআরা'র ২১৪ সংখ্যক আয়াত অবতারণ করেন, তখন তাঁর মধ্যে অস্থিরতা খুব বেড়ে গেল এবং তা উদ্বেগে পরিণত হলো। অনন্তর তিনি তাঁর বাড়িতে রোগীর মতো বসে রইলেন। ফুফুরা তাঁর খবর জানতে এলেন, তখন তিনি বললেন, আমার কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি। কিন্তু আল্লাহ আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজনদের আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানানোর আদেশ দিয়েছেন। তাঁরা সবাই বললেন, বংশের লোকদের দাওয়াত কর, কিন্তু আবু লাহাবকে যেন কোরো না, সে কিন্তু তোমার দ্বীন কখনোই গ্রহণ করবে না। তিনি সবাইকে দাওয়াত দিলেন এবং সবাই উপস্থিত হলেন কিন্তু আল্লাহর রসুলের কিছু বলার আগেই আবু লাহাব বলে উঠল, এখানে তোমার চাচা ও চাচাত ভাইয়েরা উপস্থিত রয়েছেন, তোমার যা ইচ্ছা তাই বল কিন্তু ধর্মান্তরের কথা বোলো না। তুমি জানো তোমার বংশের লোকেরা সমগ্র আরবের সাথে লড়ার শক্তি রাখে না আর তোমাকে বিরত রাখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখেন তোমার বংশের লোকেরা। যে কাজ তুমি করে যাচ্ছ, তার উপর যদি কায়েম থাক তাহলে কুরাইশদের অন্য গোত্রগুলো আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং অন্য আরব গোত্রগুলো তাদের সহযোগিতা করবে। আমি এমন কোনো ব্যক্তি কখনোই দেখিনি, যে তোমার মতো তার বংশের লোকদের বিরুদ্ধে এরকম বিপত্তি উপস্থিত করেছে।

আল্লাহর রসুল মৌন রইলেন এবং এ বৈঠকে কিছু বললেন না। পরে আবারো আহ্বান করলেন এবং আল্লাহর প্রতি প্রশংসা ও স্তুতির পর বললেন :

'সংবাদদাতা তাঁর বংশের লোকদের সাথে কখনোই মিথ্যা বলতে পারেন না। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আমাকে তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে প্রেরণ করা হয়েছে আর অন্যদের প্রতি সাধারণভাবে। যেভাবে তোমাদের নিদ্রা আসে ঐভাবে তোমাদের মৃত্যুও আসবে, আবার যেভাবে তোমরা জাগ্রত হও এভাবে তোমাদের পুনরুত্থানও করা হবে। এবং যে যেমন কাজ

করেছ, তার কাছ থেকে তেমনভাবে তার হিসাব গ্রহণ করা হবে, তারপর, কর্মফল অনুযায়ী চিরকালের জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে।'

আবু তালিব বললেন, 'তোমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য ও সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য, তোমার আদেশ-উপদেশ ও তোমার কথা ও তোমাকে অনুসরণের চেয়ে উত্তম কিছু আর নেই। তোমার চাচা ও ভাইয়েরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, এদের মধ্যে আমি অন্যতম। যে কাজের আদেশ তোমাকে দেয়া হয়েছে, তা তুমি জারি রাখো। আল্লাহর কসম, আমি সর্বপ্রকারে তোমাকে নিরাপত্তা দেব এবং সেই সাথে তোমাকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাব। কিন্তু আমার মন আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়।'

আবু লাহাব বলল :

'আল্লাহর কসম, এ বড়ই খারাপ কথা। তোমরা এখনই একে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে দাও।'

আবু তালিব বললেন, 'আল্লাহর কসম ! আমার শরীরে প্রাণ থাকতে আমি তা হতে দেব না।'

পাঁচ
আবু তালিব

যদিও আবু তালিব শিরক বা বহু-ঈশ্বরবাদে অবিচল রইলেন এবং নিজের পূর্বপুরুষদের ধর্মও ত্যাগ করলেন না তা সত্ত্বেও আপন ভাইপোর প্রতি সহানুভূতি ও সুরক্ষার দায়ভার বহন করে চললেন। তিনি ভালো মতোই জানতেন এবং বুঝতেন যে, আত্মীয়-স্বজনদের সমর্থন তার জন্য কতটা প্রয়োজন এবং কতটা মূল্য তাকে চুকাতে হবে এবং তাঁদের কত-না-কষ্ট সহ্য করতে হবে। কিন্তু যেহেতু হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ সম্মান ছিল বাহ্যিক, সেহেতু তাঁকে কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করাও ছিল একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের দিক থেকে চিন্তা, ভাবনা, স্বাধীনতা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যও সহযোগিতা পেতে থাকলেন। শুধু তাই নয় ; বরং তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁরা তৎপর রইলেন, আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তবলিগ এবং প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন।

আবু তালিব মক্কার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন। তিনি তাঁর বংশের লোকদের কাছে শ্রদ্ধেয় ও জনসাধারণের দৃষ্টিতে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। অতএব, কারো পক্ষেই তাঁর নিরাপত্তা ভঙ্গ করার সাহস হলো না। মক্কায়

তাঁর উপস্থিতি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহায় বলে সিদ্ধ হলো। সেই সাথে তাঁর অধিকারও সুরক্ষিত থাকল।

কিন্তু আবু লাহাব ছিল সেই ক্ষমতাশালী শাসকদের আদর্শস্বরূপ, যারা সত্যাসত্যের পার্থক্য না করে আপন হিত, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনপাত করে। যে কাজ তার বিবেচনায় তার হিতের বিপক্ষে যায় ততই তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এবং তার রোষও শতগুণে বেড়ে যায়, যা দফায় দফায় তাদের নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞতাকে সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশ করে দেয়। আবু লাহাব ছিল কঠোর ও ইতর প্রকৃতির লোক, যা তাকে উচ্ছৃঙ্খল ও নিকৃষ্ট করে তুলেছিল, সে তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) প্রতি মানুষকে নিকৃষ্টতর আচরণে প্ররোচনা যোগাত। তার দুই পুত্রের সাথে মুহাম্মদ-এর দুই কন্যার বিয়ে হয়েছিল, সে তাঁদের তালাক দিয়ে দিল। উতবা এবং উতাইবা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তালাক দিয়ে দিল।

সম্ভবত, এই রোষ ও হিংসা-বিদ্বেষের পিছনে তার পত্নী উম্মে জামিলের হাত ছিল। সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন। সে ছিল অত্যন্ত দুষ্কৃতিপরায়ণ ও অশ্লীলভাষী রমণী। বিভিন্ন কারণে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দ্বীনের প্রতি কট্টর বিরোধী হয়ে উঠেছিল। এ সমস্ত কারণে তার অশ্লীল ভাব অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর হয়ে ঝড়ের বেগে প্রকাশ পেত। এ হতভাগিনী হজরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল।

ইসলামের বিরোধিতায় তাঁর নিজের চাচার যেখানে এই ভূমিকা ছিল সেখানে দূরস্থ লোকদের দশা কী হতে পারে তা তো সহজেই বোঝা যায়। তাদের কাজই ছিল তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) প্রতিটি ব্যাপারেই বিরোধিতা করা এবং নির্দোষ মানুষদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো ও তাদের কলঙ্কিত করা।

পরন্তু আবু লাহাব, কুরাইশ, আরব ও সমগ্র বিশ্বের লোক ঐ ব্যক্তির কী ক্ষতি করতে পারত, যিনি তাঁরই প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছিলেন, যিনি সমগ্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের প্রতিপালক ও প্রভু। সেই ব্যক্তি চাইতেন সৎ-পথ থেকে বিচ্যুত দুনিয়া সেই পথে আবারো চলে আসুক এবং অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্তির কাঁটাতার ঝোপঝাড়কে সম্পূর্ণ সাফ করে ফেলতে। কেননা, চারদিকে অন্ধকার, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের রাজত্ব চলছিল। এই মহান সুসংবাদ তথা প্রত্যাদেশকে তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনো বুদ্ধিহীন বা অপদার্থের কোনো রোষ কী প্রতিবন্ধকতাই বা সৃষ্টি করতে পারত ? পানির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রবল বাতাসের কবল থেকে নৌকার গতি কে রোধ করতে পারে ? মুশরিক বা পৌত্তলিকরা মুসলমানদের উপর কোনো প্রতিশোধ নিলে এবং তাঁর প্রত্যাদেশের কারণে তাঁদের অপমানিত করলে মুসলমানরা ধৈর্য, সহনশীলতা, সন্তোষ ও দৃঢ়তা

প্রদর্শন করেছেন এবং সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন, যার জন্য আল্লাহতালা কোনো প্রমাণ অবতারণ করেননি।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার উপত্যকায় যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তা সীমিত ও নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডের জন্য ছিল না ; বরং তা ঐ সমাজ ও জাতির নব-নির্মাণের দাওয়াত ছিল এবং এই হক বা সত্যের আলোকে সমগ্র পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে পৌঁছে দেয়ার কথা ছিল। যে সত্য বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এসেছে, কোনো গোত্র, কোনো দল, কোনো ব্যক্তি তথা কোনো শত্রুর শত্রুতা তার কী ক্ষতিই বা করতে পারত ? এর শত্রু কে হবে ? সে হবে সেই ব্যক্তি যে অন্ধ পক্ষপাত ও বিদ্বেষগ্রস্ত, যার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেছে ও যে ক্ষমতার নেশায় চুর হয়ে রয়েছে।

'আর যখন আমার প্রত্যক্ষ আয়াত তাদের শোনানো হয় তখন তুমি কুফরিকারীদের চেহারায় অসন্তুষ্টি দেখতে পাও, মনে হয় যেন তারা এখনই তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, যে আমাদের আয়াত তাদের শোনায়।' –আল হজ : ৭২

অথবা শত্রুতা করবে ঐ শ্রেণীর লোক, ধন সম্পদ যাদের অহঙ্কারী করে তুলেছে, তারা সেই শ্রেণীর লোক, যারা অসত্যকে এ জন্যই পছন্দ করে যে, তারা বিলাসিতার সামগ্রীর উপরই অধিকার কায়েম রাখতে চায় এবং সত্যকে তারা এ জন্যই ঘৃণার চক্ষে দেখে যে, তা তাদের বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত রাখে।

'যখন আমার প্রকাশ্য আয়াত তাদের শোনানো হয়, তখন সেই সমস্ত লোক, যারা কুফরি করেছে, তারা ঈমান গ্রহণকারীদের বলে : (আমাদের এবং তোমাদের) দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের দৃষ্টিতে কারা উত্তম আর মজলিশের দৃষ্টিতে কারা ভালো ?' –মরিয়ম : ৭৩

অথবা ঘৃণা ও বিদ্বেষের এই নীতি তারাই অবলম্বন করে, যারা অন্যের মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়, তারা 'রাহমান'[১]-এর হেদায়েতের বস্তুকে ছেলেখেলা বলে মনে করে আর কথায় কথায় আপত্তি তোলে, শুধু তাই নয়, তারা !

'আর যখন তাদের সামনে আমার প্রকাশ্য আয়াত পাঠ করা হয় তখন সেই সমস্ত লোক, যারা আমার সাথে মিলনের আশা রাখে না, (তারা) বলে : এ ছাড়া অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এস অথবা এতে কোনো পরিবর্তন সাধন কর।' –ইউনুস : ১৫

অথবা দুষ্কৃতকারী ও উপদ্রবকারীই সমস্ত লোক, যারা কুরআন পাঠের সময় একে অন্যকে গণ্ডগোল পাকাতে, ঝামেলা পাকাতে এবং বাধা দিতে পরামর্শ দেয়, যাতে পঠিত আয়াত শোনা না যায়, বোঝা না যায় এবং শুদ্ধ অন্তর ও স্বচ্ছ বুদ্ধির উপর কোনো প্রভাব না ফেলে :

---

১. মহাকৃপাশীল দয়াময় আল্লাহ।

'আর যারা কুফরি করেছে তারা বলে : এ কুরআন শুনোই না, আর এর মধ্যে গণ্ডগোল বাধাও, হয়ত দাবিয়ে রাখতে পারবে।' – হা মিম আস সিজদা : ২৬

মক্কাবাসীরা যদি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করতে কিছুটা বিলম্ব করত, গভীরভাবে ভেবে চিন্তে দেখত আর কিছুদিন বিলম্ব করে নিজেদের ও হজরত মুহাম্মদ প্রচারিত প্রত্যাদিষ্ট শিক্ষার মধ্যে তুলনা করত তাহলে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাঁকে ঘৃণিত বলে ভাবতে পারত না। কিন্তু ইসলাম থেকে পলায়নের অবস্থাটি ছিল সেই অপরাধীর মতো, যে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর আদালত থেকে পালানোর চেষ্টা করে।

আল্লাহর রসুল তাঁর প্রচারিত শিক্ষাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টার জন্য খুবই দুঃখিত হলেন। কেননা, প্রত্যেক সত্যবাদী, সুশীল, সচ্চরিত্র এবং দয়াবান ব্যক্তিই তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপেক্ষার কারণে খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত হন এবং এ অধিকারও তাঁর থাকে।

কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং মিথ্যাচারীদের বাস্তবিকভাবে তাঁর সামনে প্রকাশ্যে তুলে ধরলেন :

'আমি জানি, তারা যা কিছু বলে, তা তোমার জন্য দুঃখের কারণ হয়। অনন্তর, তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে না ; বরং তারা তো অত্যাচারী, তারাই আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।' – আনআম : ৩৩

যদি কোনো পাগল আপনার যাওয়ার পথে দাঁড়ায় এবং চাটুকারিতার দ্বারা আপনাকে অপমান করে তাহলে লোকে বলবে, সে আপনার উপর জুলুম করছে না ; বরং সে তার স্বভাবের উন্মত্ততার প্রেরণাকেই প্রদর্শন করছে। ঠিক এই অবস্থাই ছিল মক্কার মুশরিকদের। এ সমস্ত লোক ঐ ব্যক্তিকে অস্বীকার করার আগে অথবা তাঁর আচরণকে কলঙ্কিত করার আগে স্বয়ং নিজেদের স্বভাবজাত অস্বীকৃতি ও বিরোধের প্রেরণাই নিজেদের আচরণে স্পষ্ট করে তুলেছিল :

'এরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না ; বরং এই জালিমরা তো আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করছে।' – আনআম : ৩৩

অতএব, দাওয়াত ও প্রচারের পথে অগ্রবর্তী থাকা এবং এ পথে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করা হজরত মুহাম্মদের দায়িত্ব ছিল এবং তাঁর রিসালতের উপর ঈমান আনয়নকারীদের উপর ফরজ ছিল, তাঁরা দৃঢ়পদে যাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কিন্তু এ দৃঢ়তা তাঁদের নিজেদের স্বার্থের জন্য ছিল না ; বরং তাঁরা অনাগতদের জন্য এ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। কোনো উঁচু ইমারত ভূতলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ; বরং তাঁর জন্য প্রয়োজন গভীর ভিত্তি। এই ভিত্তিই সেই ইমারতকে স্থির রাখে এবং তার ভার রক্ষা করে। হজরত মুহাম্মদের

সাথিরা[১] তাঁদের বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও বিমুগ্ধতাপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তাঁর রিসালতের স্তম্ভ তথা সেই ইসলামরূপী মহাবৃক্ষের মূল শিকড়স্বরূপ ছিলেন, যার শাখা-প্রশাখা দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছয়
মুসলমানদের উপর অত্যাচার

মক্কার মুশরিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা সমস্ত প্রকারে ইসলামের বিরোধিতা করবে এবং এতে প্রবেশকারীদের সমস্ত রকমের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা দিয়ে তাদের স্বাগত জানাবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন থেকে গণ-দাওয়াতের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন এবং স্বজাতির বিপথগামিতার কথা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন তখন থেকেই মক্কা বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠেছিল এবং দশ বছর যাবৎ মুসলমানদের উপর অত্যাচারের চূড়ান্ত করা হলো। তাঁদের উপর যাতনার পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হলো। 'হরম'-এর ক্ষেত্রে তাঁদের জীবন ও সম্পদ অপহরণকে বৈধ করে নেয়া হলো। অতএব, অত্যাচার ও যাতনার এক দমনচক্র শুরু হয়ে গেল।

মক্কাকে সন্ত্রাসের জনপদে পরিণত করা হলো। এই বেদনাদায়ক ও ভয়ানক পরিস্থিতিতে উপহাসের লড়াই শুরু করে দেয়া হলো। যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের অপমানিত করা ও তাঁদের প্রকৃত শক্তিকে দুর্বল করে দেয়া। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করা হলো। সেই সাথে তাঁদের সামনে পাগলামি করা হতে লাগল। ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরা ও নিকৃষ্ট চক্রান্ত চালানোর জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলা হলো। যেমন, আধুনিক যুগে বিরোধী-সংস্কৃতির লোকেরা করে থাকে। অতএব, যখন বিরোধী পক্ষ থেকে স্পষ্টতার জন্য বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, তখন জনসাধারণও তাঁকে অপমানিত করার জন্য হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গচিত্রও প্রকাশ করে তেমনই দফায় দফায় তাঁদের অপমান করা হতে লাগল।

হিংসা-বিদ্বেষ-অত্যাচারের দুই যাঁতাকলের মধ্যে মুসলমানরা পিষ্ট হতে লাগলেন এবং তাঁদের রসুলকে উন্মাদ বলে প্রচার করা হতে লাগল :

'আর এ সমস্ত (কাফির) লোক বলে : এ সেই ব্যক্তি, যার উপর জিন ভর করেছে, তুমি অবশ্যই উন্মাদ।' –আল হিজর : ৬

রসুলুল্লাহকে জাদুকর এবং মিথ্যাবাদী বলেও প্রচার করা হলো :

---

১. সাহাবি, আরবি বহুবচনে সাহাবা, বাংলায় সাথিরা।

'আর তারা এ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছেই এসেছেন। আর কাফিররা বলে : ইনি এক জাদুকর, বড় মিথ্যুক।' –সাদ : ৪

বিভিন্ন প্রকারের কুৎসার আশ্রয় নেয়া হলো, উত্তেজনাত্মক বাক্য প্রয়োগ করা হতে লাগল এবং সমস্ত রকমের বদনাম ও কুৎসা প্রচারিত হতে লাগল :

'আর এই কুফরিকারীরা যখন জিকর (কুরআন) শোনে, তখন মনে হয় এবং তাদের দৃষ্টির আগুনে তোমাকে পুড়িয়ে মারবে আর বলে : সে তো উন্মাদ।' –আল কালাম : ৫১

সাধারণ মুসলমানের দশা তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ভিন্ন ছিল না। তাঁরা দিন-রাত নিন্দা-কুৎসা, ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হতেন :

'যারা অপরাধী, তারা ঈমান আনয়নকারীদের দেখে বিদ্রুপের হাসি হাসত, আর যখন তাঁরা আপন বাড়ির দিকে যেতেন তখন এরা তাদের দিকে আড় চোখে চেয়ে ঐভাবে ফিরে আসত, আর যখন তাঁদের দেখত, তখন বলত, এরা তো বয়ে গেছে। যদিও এদের উপর নজরদারি করার জন্য তাদের পাঠানো হয়নি।' –আল তাতফিফ : ২৯-৩৩

তারপর এ সংঘর্ষ নিঃসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের হত্যা ও রক্তপাতে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এবং এদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে, এই অসহায় এবং দুর্বল মুসলমানদের রক্ষা করতে এবং অপমান, হত্যা ও রক্তপাত থেকে রক্ষা করতে পারত। তাদের উপর দুঃখকষ্ট যন্ত্রণার যাঁতা ততক্ষণ পর্যন্ত পেষা হতো যতক্ষণ তাঁদের মৃত্যু না হতো, অথবা কুফরিতে ফিরে না আসত অথবা অত্যাচারী ভ্রান্ত ও ক্লান্ত না হয়ে পড়ত।

সাত
আম্মার ইবনে ইয়াসির

এই অসহায় পীড়িতদের মধ্যে আম্মার ইবনে ইয়াসির রাজিয়াল্লাহু আনহু অন্যতম ছিলেন। তিনি প্রথম দিককার মুসলমানদেরও অন্যতম ছিলেন এবং ইনি ছিলেন বনু মাখজুমের ক্রীতদাস। যখন ইসলাম এল তখন এর মাতা-পিতা সকলই মুসলমান হয়ে গেলেন। অতএব এর পুরো বংশকে দমন-পীড়ন-নির্যাতন-অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করা হলো। মুশরিকরা তাঁর বংশের সমস্ত লোককে প্রকাশ্যে ময়দানে নিয়ে যেত এবং মরুভূমির বালি যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠত তখন তাদের দফায় দফায় নানা রকমের কষ্ট-যন্ত্রণা দেয়া দিত। একদিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেখানে তাদের যন্ত্রণা দেয়া হচ্ছিল।

তিনি বললেন :

'হে ইয়াসির তনয় ! তো ধৈর্য ধর, তোমার জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।' –তিবরানী, হাকিম

হজরত ইয়াসির রাজিয়াল্লাহু আনহু এই কষ্ট-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর পত্নী সুমাইয়া রাজিয়াল্লাহু আনহা আবু জেহেলের কোনো কথার কঠোর স্বরে জবাব দিলে সে তাঁর বুকের মধ্যে বল্লমের ফলা ঢুকিয়ে দিল। এতে তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল। ইনিই হলেন আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া প্রথম ভাগ্যবতী মহিলা। হজরত আম্মার রাজিয়াল্লাহু আনহুকেও কঠোর শাস্তি দেয়া হলো। কখনো তাঁকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শোয়ানো হলো আবার কখনো বা তাঁকে পানিতে ফেলে চুবানো হলো। মুশরিকরা বলল : আমরা তোকে তখনই ছাড়ব, যখন তুই মুহাম্মদকে গালি দিবি 'লাত' উজ্জা'র জয়ধ্বনি দিবি। অনন্তর আম্মার এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাদের শর্ত মেনে নিয়ে জীবন রক্ষা করলেন। তারপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন। আল্লাহর রসুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার অন্তরের অবস্থা ? তিনি বললেন– ঈমানের উপর পূর্ণ সন্তুষ্টি। তিনি (রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হে আম্মার ! ভবিষ্যতে সুযোগ এলে তারপর আরো কিছু বলব। অনন্তর আল্লাহ এই আয়াত অবতরণ করলেন :

'যে কেউ তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে, সে ছাড়া যাকে (এ জন্য) বাধ্য করা হয়েছে এবং অন্তর যার ঈমানের উপর সন্তুষ্ট।'–নহল : ১০৬

আট
বিলাল ইবনে রবাহ

এই পীড়িতদের মধ্যে হজরত বিলাল ইবনে রবাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুও অন্যতম ছিলেন। তাঁর মালিক ছিল উমাইয়া ইবনে খলফ। মধ্যাহ্নের সময় যখন রোদের তেজ প্রচণ্ড বেড়ে যেত তখন তাঁকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালির উপর চিৎ করে কিংবা উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর উপর ভারি পাথর চাপিয়ে দিত। তারপর উমাইয়া তাকে বলত, আল্লাহর কসম, তোকে এই অবস্থায় ফেলে রাখা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোর মৃত্যু আসবে অথবা তুই মুহাম্মদকে যতক্ষণ না অস্বীকার করবি আর লাত ও উজ্জার উপাসনা না করবি। কিন্তু তিনি কেবল 'আহাদ' 'আহাদ' করে যেতে লাগলেন। অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।

নয়

খাব্বাব ইবনে আরাত

যখন অসহায় এবং নিঃস্ব লোকদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার অত্যধিক বেড়ে গেল তখন তাঁদের মধ্যকার অন্যতম পীড়িত ও অত্যাচারিত ব্যক্তি খাব্বাব ইবনে আরাত প্রিয়তম রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে ফরিয়াদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। খাব্বাব রাজিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বলেন, আমি রসুলুল্লাহর সমীপে নিবেদন করলাম– সে সময়ে তিনি কাবা গৃহের প্রাচীরের ছায়ায় বসে ছিলেন। হে আল্লাহর রসুল ! আপনি আমাদের দৃঢ়তা ও সফলতার জন্য কেন দুআ করছেন না ? এখন তো অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন :

'তোমাদের আগে যাঁরা ঈমান এনেছিলেন, তাদের উপর এর চেয়েও বেশি অত্যাচার করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যেকার কাউকে গর্ত খুঁড়ে বসিয়ে তার মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দু'টুকরো করে ফেলা হতো, কারো শরীরে গরম লোহা দিয়ে দাগানো হতো যাতে তারা ঈমান ত্যাগ করে ফিরে আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কেউ ঈমান ত্যাগ করে সত্যধর্ম থেকে ফিরে যায়নি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ এ কাজ সম্পূর্ণ করে দেবেন এবং এমন একদিন আসবে, যেদিন এক ব্যক্তি 'সানআ' থেকে 'হাদর মাউত' পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে পথ চলবে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় করবে না, কিন্তু তোমরা বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছ।' – বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মুহূর্তে এই দুর্দশাগ্রস্ত ও পীড়িত মানুষদের জন্য কী-ইবা করতে পারতেন ? তিনি তাদের কারোর উপর সমর্থন ও নিরাপত্তার চাদর বিছিয়ে তাকে রক্ষা করতে পারতেন না। কেননা, তাঁর নিজেরও এতটা শক্তি ও সামর্থ্য ছিল না যে, তিনি এদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। নামাজ পড়ার সময় সিজদাবনতাবস্থায় তাঁর[১] উপর খড়কুটো ও পশুর নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়া হতো। তাঁর বাসঘরের সামনে মলমূত্র ও দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ফেলে দেয়া হতো কিন্তু তিনি ধৈর্যের পাহাড় বনে যেতেন।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলম্বে কিংবা অনতিবিলম্বে প্রাপ্ত 'গনিমত'[২]-এর মালের জন্য নিজের সাথিদের একত্রিত করেননি। তিনি তো চোখের উপর আচ্ছাদিত পর্দাটাই তুলে দিয়েছিলেন, যা যুগ-যুগান্তর ধরে আচ্ছাদিত ছিল। তিনি অন্তরে জমে থাকা সমস্ত ময়লা সাফ করেছিলেন।

---

১. প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ।

২. গনিমত– যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

অতএব, তাঁরা সত্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, যা তাদের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে একীভূত হয়েছিল, কিন্তু জাহিলিয়াত[১] এ সময় পর্যন্ত তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত রেখেছিল। তিনি মানুষকে সেই 'রব'[২]-এর সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন এবং সুদৃঢ় বন্ধনের দ্বারা তাঁদের রব-এর সাথে সম্পর্ক স্থির করে দিয়েছিলেন, এর আগে পর্যন্ত তাঁরা বিস্মিত ও বিমূঢ় ছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যে সমাপ্তি ও স্থায়িত্বের মধ্যে তুলনা পেশ করলেন। অতএব আপামর জনসাধারণ অস্থায়ী দুনিয়ায় আখিরাতের স্থায়িত্বের প্রাধান্য দেখতে লাগলেন। তিনি তাঁদের তুচ্ছ মূর্তিরাজির বিপক্ষে, মহানতম আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো একজনকে চয়ন করার কথা বুঝিয়ে দিলেন। অতএব, লোক নিজ হাতে গড়া তুচ্ছ মূর্তিরাজিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন এবং সেই মহান সত্তার প্রতি নিজেদের নিবিষ্ট করলেন, যিনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তিনি জনসাধারণের সমক্ষে মহাকল্যাণ পেশ করেছিলেন এবং সাহাবা-কিরামের জন্য এতটাই যথেষ্ট ছিল যে, আল্লাহর অনুকম্পাই তাঁদের রক্ষা করবে। যদি তাঁদের দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা দেয়া হয় তা কেবল এই জন্যই যে, তাতে তাঁদের আত্মশুদ্ধি ঘটবে, আর যদি মূর্তিরাজির দাসেরা তাঁদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তা এজন্যই হবে যে, তাঁরা ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত বা শিক্ষাকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরছেন, যার পরিচয় তাঁরা লাভ করেছেন। কুফর ও ঈমানের মধ্যেকার এই যুদ্ধ একদিন অবশ্যই সমাপ্ত হবে, তারপর ঐ সময় জানা যাবে যে, কে শহীদ হবে, আর কে বরবাদ বা ধ্বংস হবে। কোনো মুমিন আছেন যে আল্লাহর আদেশাবলির উপর কর্মশীল থাকবেন আর কোনো মুশরিক আছে যে আল্লাহর অনুজ্ঞা থেকে ধিক্কৃত হয়েছে :

'এবং ঐ সমস্ত লোক, যারা ঈমান আনেনি, তুমি ওদের বলে দাওঃ তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করতে থাক, আমরাও করছি আর প্রতীক্ষা কর ! আর আমরাও প্রতীক্ষা করছি। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সমস্ত গুপ্ত বস্তুই আল্লাহর জন্য আর সমস্ত কিছুই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অনন্তর, (হে নবী !) তুমি তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর উপরই ভরসা রাখ। তোমরা যা কিছু কর তা তোমার রবের অনবগত নয়।' – হুদ : ১২১-১২৩

আল্লাহর রসুল তাঁর সাথিদের অন্তরে বিশ্বাসের বীজ বপন করতেন এবং ইসলামের প্রভুত্ব, সত্যের প্রচার এবং পূর্ব ও পশ্চিমে আল্লাহর সৈনিকদের সামনে

---

১. জাহিলিয়াত –মূর্খতা, সাধারণভাবে আইয়ামে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগ বলা হয়েছে। –অনুবাদক

২. 'রব' –মালিক, প্রভু, আল্লাহ। –অনুবাদক

চক্রান্তকারীদের পতন এবং ধ্বংসের শুভ-সূচনার কথা শুনিয়ে দিতেন এবং তাদের অন্তরে সেই আমার আলো জ্বালিয়ে রাখতে, বা স্বয়ং আল্লাহ তাঁর হৃদয়ে আলোচিত করে রেখেছিলেন। মুশরিকরা এই আত্মবিশ্বাসকে উপহাস করত। অনন্তর, আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ও তার বন্ধুবান্ধবরা মুসলমানদের দেখে উপহাস করে বলত : তোমাদের কাছে দুনিয়ার রাজা এসে গেছেন, যিনি আগামীকালই কিসরা ও কায়সারের রাজত্বের উপর প্রভুত্ব কায়েম করবেন। তারপর তারা শিস দিত আর হাততালি দিত।

ইসলামী দাওয়াতের অবস্থা যখন সুদৃঢ় হয়ে উঠল তখন মক্কায় মুশরিকরা সিদ্ধান্ত নিল, বাইরে থেকে আগত লোকদের মুহাম্মদের কথা শুনতে বাধা দিতে হবে। ওয়ালিদ বিন মুগিরা কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বলল, তোমরা মুহাম্মদ সম্পর্কে লোকদের কাছে যদি নানা রকমের আজেবাজে কথা বল তাহলে তোমাদের কথা কেউ-ই বিশ্বাস করবে না। কেউ বলবে জ্যোতিষী, কেউ বলবে কবি, কেউ বলবে উন্মাদ, কেউ বলবে জাদুকর– এরকম নানা রকমের কথা লোকদের সাথে বললে তারা তোমাদের কথা নিরর্থক বলে মনে করবে। অতএব, তোমরা সবাই মিলে একটাই এবং একটা প্রভাবশালী কথাই বলবে এবং তোমরা একবাক্যে বলবে, মুহাম্মদ জাদুকর। মুহাম্মদ এমন বাণী প্রচার করছেন, যা মানুষকে বাপ, ভাই, মা সন্তান তথা সবার থেকে সবাইকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছেন। এরপর হজ্জের মওসুমে সমস্ত লোককে বিভিন্ন দলে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে বসিয়ে দেয়া হলো, যেখান দিয়ে লোক যাওয়া আসা করেন। তারা এবার পরামর্শ মতো আগত লোকদের সচেতন করার কাজে নেমে পড়ল এবং সবাই একবাক্যে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদুকর বলে প্রচার করতে লাগল।

অন্যদিকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজিদের এক-একটি শিবিরে গিয়ে তাঁদের কাছে ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরতে লাগলেন এবং তাঁদের সহযোগিতা কামনা করতে লাগলেন।

'জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলতেন : কে এমন আছেন, যিনি আমাকে তাঁর গোত্রের সামনে নিয়ে যাবেন ? কেননা, কুরাইশরা আমাকে আমার প্রভুর প্রত্যাদিষ্ট বাণী প্রচার করতে বাধা দিচ্ছেন।'–আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা

দশ

সমঝোতা তথা সওদাবাজির প্রয়াস

মুশরিকরা ভেবেছিল যে, দুর্বল ও নিঃসহায় লোক ও ক্রীতদাসদের উপর জুলুম-অত্যাচার দমন-পীড়ন অব্যাহত রাখলে সাধারণ লোকেরা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। তাদের ধারণা ছিল মুসলমানদের অনবরত উপহাস করে গেলে তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং মুসলমানদের প্রকৃত শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হলো। কেননা, প্রকৃত অবস্থা ছিল কেউ একবার ইসলামে প্রবেশ করলে কোনো অবস্থাতেই সে আর পিছু হটত না ; উল্টো মুসলমানদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল। উপহাসের সমস্ত হাতিয়ার আল্লাহর পথের বান্দাদের সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে গেল। মুসলমানরা ঐ বিপথগামীদের সমস্ত অপকর্ম ও জারিজুরি সম্পর্কে অধিক হতেও অধিকতররূপে পরিচিত হয়ে উঠছিলেন। যে ব্যর্থতার বীজ ঐ মূর্তিপুজোর মধ্যেই নিহিত ছিল। অতএব, জাহিলদের ঐ সমস্ত উপহাস আর হাসিঠাট্টা তাঁদের কী ক্ষতিই বা করার যোগ্যতা রাখত ?

'এবং সে নৌকা বানাতে লাগল, আর যখন ঐ জাতির নেতা তাকে অতিক্রম করত, তখনই তাকে উপহাস করত। সে তখন বলল : তুমি আমাকে দেখে হাসছ, আমরাও তোমাকে দেখে হাসছি। অনতিবিলম্বেই তুমি জানতে পারবে যে, কার উপর যাতনা আসছে, যা তাকে অপমানিত করবে এবং স্থায়ী যাতনা এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।' (হুদ : ৩৮-৩৯)

এবার কুরাইশরা অন্য এক চাল চালল যাতে প্রলোভন ও ভয় উভয় সাধনই বিদ্যমান ছিল। এবার তারা নিশ্চিত করল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধন-সম্পদ, উপাধি ও পদমর্যাদার প্রলোভন দেখাবে এবং সর্বপ্রকারে সমর্থনকারী তাঁর চাচাকে নিয়ে বলবে, হয় তাঁকে এসব প্রচার করতে বন্ধ করুন, নতুবা তাঁর নিরাপত্তার দায় থেকে আপনি সরে যান। নইলে অবস্থা খারাপ হবে।

কুরাইশরা উতবা ইবনে রবিআর ন্যায় একজন চালাক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাঠাল, সে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করল :

'ভ্রাতুষ্পুত্র ! তোমার বংশে তুমি কতটা সম্মান ও মর্যাদার পাত্র নিশ্চয় তুমি তা ভালোমতোই জান। বংশগতভাবে তুমি এক মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তুমিই বল, তুমি তোমার জাতির মধ্যে এ সব কী উপস্থিত করেছ ? তুমি পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছ। অতএব, তুমি আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শোন এবং আমার পরামর্শটি ভেবেচিন্তে দেখ এবং যে কোনো একটি কথা তুমি স্বীকার করে নাও। যদি তুমি ধন-সম্পদ চাও তো বল, আমরা

সবাই মিলে তোমাকে এত সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে ধনী হয়ে যাবে। আর যদি তুমি সম্মান চাও তাহলে আমরা তোমাকে নেতৃত্বে বরণ করে নেব। আর যদি তোমাকে জিন-ভূতে পেয়ে থাকে তাহলে বল, বৈদ্য-ওঝা এনে আমাদের খরচে তা ভাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি।'

উতবার যখন বলা শেষ হলো, তখন আল্লাহর রসুল বললেন, তোমার কথা তো শুনলাম, এবার আমার কথাও শোন ! এই বলে তিনি সুরা 'হা-মিম আস সিজদা' পাঠ করতে শুরু করলেন এবং এই নিম্নলিখিত অনূদিত অংশটি পাঠ করলেন :

'হা-মিম। অবতরিত হলো অত্যন্ত কৃপাশীল ও দয়াবানের পক্ষ হতে, এক কিতাব, যার আয়াত অত্যন্ত স্পষ্টভাষায়, প্রকাশ্যে বয়ান করা হয়েছে : 'কুরআন' আরবিতে অবতীর্ণ হলো ঐ লোকদের জন্য, যারা জ্ঞান রাখে। শুভসংবাদ দানকারী এবং সচেতনকারী। তা সত্ত্বেও ঐ লোকদের মধ্য হতে অধিকাংশ লোক বিমুখতা প্রদর্শন করছে, তারা শোনে না এবং বলে : যার জন্য তুমি আমাদের আহ্বান করছ, তার দিক হতে আমাদের অন্তর আচ্ছন্ন রয়েছে, আর আমাদের কান শোনে না, আর আমাদের এবং তোমার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তাহলে তোমরা তোমাদের কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করি। হে নবী ! বল আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ । আমার প্রতি প্রত্যাদেশ আসে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র প্রভু, অনন্তর, তোমরা তাঁর প্রতি অবনতমুখী হও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ধ্বংস তাদের যারা শিরক করে, জাকাত না দেয় এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে। যারা ঈমান এনেছে এবং তদনুসারে কাজ করেছে, তাদের জন্য অনন্তকালব্যাপী প্রতিদান রয়েছে (যা কখনো শেষ হবে না।) হে নবী ! বল : তোমরা সেই আল্লাহকে অস্বীকার কর, যিনি ধরিত্রীকে দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছ ? তিনি সমগ্র জগতের প্রভু এবং তিনি তার উপরে পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং তাতে তাদের খাদ্যসামগ্রী রেখেছেন, চারদিনে বরাবর কামনাকারীদের জন্য.....। তারপর আকাশমুখী করলেন এবং তা ছিল একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো এবং তিনি ধরিত্রীকে বললেন, তোমরা স্থির হয়ে যাও, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় । তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় হাজির। তারপর তিনি দু'দিনে এই সাতটি আকাশকে পুরো করে দিলেন এবং প্রতিটি আকাশে যা কিছু আদেশ দেয়ার ছিল তা পাঠিয়ে দিলাম এবং আমি দুনিয়ার আকাশ (নিকটবর্তী আকাশ)-কে গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করলাম এবং এরকম সুরভিতও করে দিলাম। এ হলো প্রভুত্বশালী ও সর্বজ্ঞের বেঁধে দেয়া শৃঙ্খলা।

তা সত্ত্বেও যদি কাফিররা সীমালঙ্ঘন করে তাহলে বলে দাও : আমি তোমাদের বজ্রপাত দেব। সাবধান করে দিয়েছি, সেই রকমই, যেমন বজ্রপাত 'আদ' ও 'সামুদ' জাতির উপর হয়েছিল।' – ১-১৩

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর অবতারিত প্রত্যাদিষ্ট বাণী থেকে এই আয়াতগুলো চয়ন করলেন, যাতে সে সম্বোধিত রিসালাত ও রসুলের বাস্তবিকতার সাথে সুপরিচিত হয়ে যায়। আল্লাহর রসুল এমন এক কিতাব এনেছিলেন, যা মানুষকে বিপথগামিতা থেকে মুক্ত করে সুপথ প্রদর্শন করে এবং তাদের ধ্বংস ও সর্বস্বান্ততা হতে মুক্তি দেয়। রসুলুল্লাহ অন্য সকলের আগে এই 'কিতাব'-এর অনুসরণ করতে, তার উপর আমল করতে এবং তদনুসারে আপন জীবনকে পরিচালিত করতে বাধ্য ছিলেন। যখন আল্লাহতা'লা জনসাধারণের কাছে দাবি করেন যে, তারা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করুক এবং তাঁর কাছেই তওবা-অনুশোচনা করুক, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে যে, আল্লাহর রসুলই ছিলেন সর্বাপেক্ষা ক্ষমা প্রার্থনাকরী। তিনি শাসন, সম্পদ, ধন-দৌলত ও পদলাভে ইচ্ছুক ছিলেন না। আল্লাহ তাঁকে এ সমস্ত কিছুর উপর প্রভুত্ব দান করেছিলেন। অতএব, এর কোনো দিকের প্রতিই হাত বাড়ানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা তাঁর ছিল না। যা কিছু আল্লাতা'লা তাঁকে প্রদান করেছিলেন, তিনি তাঁর সৎকর্মে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজের ধন-সম্পদকে তিনি আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন এবং দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময়ও তিনি নিজের সন্তানের জন্য এক কানাকড়িও রেখে যাননি।

উতবা চাচ্ছিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের প্রচার কাজ এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়ের সমতা স্থাপনার কাজ ছেড়ে দিন। জীবনের আনন্দ থেকে তিনি কি বঞ্চিত হবেন ? যদি সূর্য বা অন্য কোনো গ্রহ তার আপন গতিপথ থেকে বিচ্যুতি হয় তাহলে কি এ জগৎ তার আলো ও উত্তাপ থেকে বঞ্চিত হবে না ?

কী অদ্ভুত আর আশ্চর্যজনক দাবি এ ! কী সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যিনি আপন স্থান ও সম্মানের দিকে ফিরে যান এবং তার সীমালংঘন না করেন। অনন্তর, উতবা যখন কুরআনের আয়াত শুনল তখন তার নিদ্রিত চিন্তন জাগ্রত হয়ে উঠল। সে কুরআনের ভর্ৎসনা শুনল এবং তার ঘুমন্ত ভাবনা জেগে উঠল।

'তারপরও যদি কাফিররা বিমুখ হয়, তাহলে বলে দাও আমি তোমাকে বজ্রপাত থেকে সাবধান করে দিয়েছি, তেমনই বজ্রপাত যেমনটি 'আদ' ও 'সামুদ' জাতির উপর হয়েছিল।'

উতবা তার হাত দুটি পিছনের দিকে ঠেকা দিয়ে মাটিতে বসে খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। সহসা সে উঠে দাঁড়াল অর্থাৎ আজাব বা যাতনার ভয়ে সে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। সে ফিরে এসে কুরাইশদের পরামর্শ দিল 'মুহাম্মদ' কে তাঁর নিজের উপরেই ছেড়ে দাও।

কুরাইশদের এক প্রতিনিধি দল আবু তালিবের কাছে এসে সাক্ষাৎ করল এবং বলল :

'আবু তালিব ! আপনার ভাইপো আমাদের উপাস্যদের অপমানিত করেছেন, আমাদের ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধিকে মূর্খতার নামান্তর বলে অভিহিত করেছেন আর আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বিপথগামী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, হয় তাঁকে আমাদের দুঃখ দেয়া থেকে বিরত রাখুন নতুবা আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে থেকে আপনি সরে যান, কেননা স্বয়ং মুহাম্মদ আমাদের ধর্মের বিরোধী, আমরা নিজেরাই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিই।' আবু তালিব অত্যন্ত বিনম্র জবাব দিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করলেন এবং তারা চলে গেল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কর্তব্যকর্ম পুরো করে চললেন। যার ফলে কুরাইশ নেতারা মনে মনে ক্রোধে ফুঁসছিল। তারপর, তারা ধৈর্য ধরতে না পেরে আবারো ষড়যন্ত্র রচনা করল এবং পুনরায় আবু তালিবের কাছে গেল এবং বলল :

'আবু তালিব ! আপনি আমাদের মধ্যেকার একজন বৃদ্ধ এবং সম্মানিত ব্যক্তি, মান এবং মর্যাদায় আমাদের মধ্যে আপনার স্থান অনেক উর্ধ্বে। আমরা আপনাকে বলেছিলাম, আপনি মুহাম্মদের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সরে যান, কিন্তু আপনি তাকে বিরত করেননি। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের নিন্দামন্দ, নিজেদের উপাস্যদের অপমান ও নিজেদের বুদ্ধির মূর্খতা মেনে নিতে পারব না। এখন হয় আপনি একে বিরত রাখুন নতুবা আপনার বিরুদ্ধে আমরা মোকাবিলায় অবতীর্ণ হব এবং তখন এর ফায়সালা হয়ে যাবে।' তারপর তারা চলে গেল।

নিজের জাতির শত্রুতা, বিরোধিতা এবং হুমকিতে আবু তালিব খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। অনন্তর, তিনি তাঁর ভাইপোকে কাছে ডাকলেন এবং পুরো পরিস্থিতি তাঁকে অবগত করালেন এবং বললেন :

'প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ! তোমার জাতি আমাকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন দেখতে চায় এবং আমাকে জীবনমৃত্যুর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। তুমি আমার উপর এতটা ভার চাপিয়ো না, যা আমরা দুজনেই বহন করতে অক্ষম হই। তুমি বরং তোমার জাতির সাথে এমন কথা বোলো না, যা তাদের অপছন্দ।'

আবু তালিবের এ কথা থেকে তিনি পুরো বিষয়টিই আঁচ করেছিলেন। তিনি বুঝলেন যে, এখন তাঁর চাচার পক্ষে তাঁর নিরাপত্তা দেয়া সুকঠিন হয়ে পড়েছে এবং তিনি এখন আর তাঁকে সাহায্য না করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং তাঁর থেকে সরে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। তখন তিনি বললেন :

'চাচা ! আমার এক হাতে যদি দেয়া হয় আকাশের চাঁদ, অন্য হাতে পৃথিবীর রাজত্ব তা সত্ত্বেও এ সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন এবং এই পথ থেকে আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই।' – ইবনে ইসহাক, ইবনে জরীর

তিনি এত দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেন যে, তার ভারে তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি সেখান থেকে রওনা দিলে পিতৃসম চাচা তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন :

'বৎস ! তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, মন যা চায়, তাই কর, আল্লাহর শপথ, কোনো অবস্থাতেই আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।'

এভাবে সব রকমের ভয় ও প্রলোভনের সমস্ত হাতিয়ার যেখানে ব্যর্থ হয়ে গেল। কুরাইশরা বুঝে নিল যে, এই ব্যক্তি যে প্রত্যাদিষ্ট বাণী প্রচার করছেন তা সমুদ্রের চেয়েও গভীর, আকাশের চেয়েও অসীম– তার প্রভাব অতি গভীর। অতএব, আগের পদ্ধতি তারা পুনরায় অনুসরণ করল এবং মুসলমানদের উপর সমস্ত রকমের ক্রোধ, রোষ ও যন্ত্রণার কষাঘাত বর্ষণ করতে লাগল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁদের উপর কঠোরতম যন্ত্রণার পাহাড় চাপিয়ে তথা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাদের ইসলাম থেকে ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সমস্ত ঘটনার ফলে যারপরনাই দুঃখিত ও চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এ থেকে তাদের বিরত রাখতে অসমর্থ ছিলেন। অতএব, নিঃসহায় এবং পীড়িত মুসলমানদের তিনি মক্কা থেকে হিজরত[১] করে হাবশায়[২] চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এ ঘটনা তাঁর বাইয়াতের পঞ্চম বর্ষ বা গণ-দাওয়াতের ঘোষণার দু'বছর পর সংঘটিত হয়েছিল।

এগারো
হাবশায় হিজরত

হাবশায় হিজরত প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গোপনে সম্পন্ন হলো যাতে কুরাইশরা তাদের ধাওয়া করতে না পারে। এ জন্য হিজরত প্রকাশ্যে এবং বহু সংখ্যায় হয়নি। প্রথম দলটি ছিল মাত্র কয়েক জনের। এতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়া এবং তাঁর স্বামী হজরত উসমান ইবনে আফফান রাজিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন, এই দলটিতে সব মিলিয়ে ষোলোজনের বেশি ছিলেন না। এঁরা সমুদ্র বন্দরে গিয়ে দেখলেন হাবশাগামী জাহাজ তখনো বন্দরে অবস্থান করছে। তাঁরা এই জাহাজে চড়ে হাবশা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা জানতে পেরে পিছু ধাওয়া করে বন্দরে গিয়ে জানতে পারল যে, এঁরা নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে রওনা হয়ে গেছেন।

---

১. হিজরত– স্বদেশ বা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ। –অনুবাদক

২. বর্তমানে আফ্রিকার এ দেশটির নাম ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া। –অনুবাদক

তখনো শরণার্থীরা বহু দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেননি, এমন সময় তাঁরা খবর পেলেন মুশরিকরা ইসলামের প্রতি উদার হয়ে গেছে এবং তাঁর অনুসারীদের মুক্ত করে দিয়েছে এবং জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়ার পুরাতন পদ্ধতিও ত্যাগ করেছে, সুতরাং দেশে ফেরায় এখন আর কোনো বিপদ নেই।

এই খবর মুসলমানদের অন্তরকে প্রভাবিত করল এবং তাঁরা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন, এমনকি, যখন মক্কার সন্নিকটে এসে পৌঁছালেন তখন সুখদায়ক বাস্তবিকতার সঠিক জ্ঞান লাভ করলেন। সে সময়ে তাঁরা জানতে পারলেন, জুলুম-পীড়ন-অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছে এবং আল্লাহর রসুল ও তাঁর সাহাবিদের সাথে শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অত্যাচার একদিনের জন্যও বিরত রাখা হয়নি।

অনেক নির্বোধ লোক মনে করে যে, ইসলাম ও মূর্তিপুজোর মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। এর ভিত্তি তাদের কাছে এটাই যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্তির প্রশংসা করে এবং তাদের স্থান ও সম্মানকে স্বীকার করে তাদের সামীপ্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং এই বাস্তবিক চাটুকারিতাই মুসলমানদের হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসতে উৎসাহিত করেছিল।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্তিদের প্রশংসায় কী বলেছিলেন ? এ মূর্খরা বলে, তিনি বলেছিলেন : এরা উচ্চস্তরের দেবী, এদের শাফায়াত[১]-এর আশা অবশ্যই রাখা উচিত।

এই কথাগুলো কোথায় পাওয়া যায় ? 'সুরা জুম'-এ লাত, মানাত ও উজ্জার উল্লেখের পরে। এ ধরনের আয়াতরাজি অর্থ এটাই হয় যে, আমাকে তোমাদের মূর্তিদের সম্পর্কে বল যে, এগুলো কি অমুক মূর্তি ? এদের শাফায়াত তো আশান্বিত। এগুলো এমন সব নাম যে, যাদের বাস্তবিকতা হলো এদের কোনো অস্তিত্বই নেই। তোমাদের কী হয়েছে যে, এদের তোমরা স্ত্রী-লিঙ্গে অভিহিত করছ আর আল্লাহর সাথে এদের সম্পর্ক স্থাপন করছ, যেখানে তিনি নিজেই কন্যার সম্বন্ধকে অত্যন্ত নিন্দিত বলে অভিহিত করেন, এ তো বড়ই ভুল কথা।

আল্লাহর 'অহি' সে তো অনেক বড় ব্যাপার। এ ধরনের কথা কি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির হতে পারে ? কিন্তু এ ধরনের খুরাফাত[২] আমাদের রেওয়ায়েতের কিতাবাদিতে আরো অনেক রয়েছে ! এবং এসবের বর্ণনাকারীরাও রয়েছে।

---

১. সাফায়াত –সুপারিশ।
২. গাঁজাখুরি গল্প।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে কোনো মনগড়া কথা বলতেন তাহলে কুরআন অনুসারে তাঁর গলা কেটে নেয়া হতো :

'আর যদি নবী আমার সাথে সম্পর্কিত করে কোনো মনগড়া কথা বলত তাহলে আমি তার ডান হাত বেঁধে ফেলতাম, তারপর তার ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম, তারপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে এ থেকে বিরত রাখতে পারত।' –আল হাক্কা : ৪৪–৪৭

কিন্তু ইতিহাস ও তফসিরের গ্রন্থাবলিকে নাস্তিক ও অধার্মিকরা তাদের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নিয়েছে। তাদের গ্রন্থরাজিতে কত না মিথ্যা ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। যদিও এ রেওয়ায়েত শিক্ষা ও ভিত্তিহীন হওয়াটা প্রত্যেক আলিমের কাছেই স্পষ্ট, তা সত্ত্বেও এ ধরনের রেওয়ায়েতরাজি গ্রন্থে স্থান দেয়াটাও খুবই মূর্খতার পরিচয়।

'আল-খাজিন' পুস্তকে সুরা 'হুদ'-এর টীকায় নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পেশ করা হয়েছে :

'যখন হজরত নূহ-এর নৌকায় গোবর ও লেদি প্রচুর পরিমাণে জমা হয়ে গেল তখন আল্লাহ 'অহি' পাঠালেন যে, হাতির শুঁড় ধরো। অতএব, তিনি হাত ফেরালেন আর সাথে সাথে এক জোড়া শুঁড় পয়দা হলো আর তারা সমস্ত লেদি ও গোবর খেয়ে ফেলল। যখন শূকরের উপর হাত ফেরালেন তখন তা থেকে ইঁদুর পয়দা হলো আর যখন সে নৌকা ছিদ্র করতে লাগল তখন আল্লাহ অহি পাঠালেন যে, তাদের সামনে সিংহকে হাত ফেরালে এক জোড়া বিড়াল পয়দা হলো, তারা এবার ইঁদুরগুলোকে খেয়ে ফেলল।'

কী মিথ্যা আর ভ্রান্ত এ কাহিনী ? দেবীদের কাহিনীও এরকমই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ ধরনের অনেক গাঁজাখুরি গল্প আমাদের গ্রন্থাবলিতে মজুদ রয়েছে। জানি না কবে ঐসব গাঁজাখুরির কবল থেকে এসব গ্রন্থাবলি পবিত্র হবে। নিঃসন্দেহে, ঐ গাঁজাখুরি মুসলমানদের গাফিলতির যুগে তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর ইহুদি শত্রুদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রভাবের পরিণাম। এসব সেই সময়েই ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল।

শুদ্ধ হাদিসসমূহে কেবল এতটা বিবরণ পাওয়া যায় যে, একবার এক বড় সভায় মুসলমান, মুশরিক-নির্বিশেষে সকলেই উপস্থিত ছিলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সুরা নজম' তিলাওয়াত করেন, যার উপসংহারে কাফিরদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে যার ফলে তাদের মন উড়ে যাচ্ছিল। যখন আল্লাহর রসুলের কণ্ঠস্বর গুঞ্জরিত হতে লাগল এবং মুশরিকদের হৃদয়কে প্রভাবিত করতে লাগল। এমনকি যখন তিনি নিম্নলিখিত আয়াতে পৌঁছালেন :

'এবং উল্টে যাওয়া বসতিগুলোকে তিনি উঠিয়ে ফেলে দিলেন তারপর তাকে ঢেকে দিলেন। যে বস্তু দিয়ে তিনি ঢেকে দিলেন, তারপর, তুমি তোমার প্রভুর কোনো চমৎকারিত্ব সম্পর্কে ঝগড়া করছ ? ইনি পূর্ববর্তী সচেতনকারীদের মধ্যেকার অন্যতম সচেতনকারী। যার আসার কথা ছিল সে এসে পৌছেছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ তাকে হটাতে পারবে না। তাহলে, তোমরা কি এতে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ এবং হাসছ, কাঁদছ না এবং তোমরা মদমত্ত হয়ে আছ ? আচ্ছা এবার আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁকেই ইবাদত কর।'

অনন্তর কুরআনের সৌন্দর্য ও প্রভাব দুষ্কৃতকারীদের দ্বেষ ও শত্রুতাকে অবদমিত করে দিল এবং তারা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, তারপর পাঠ শেষ হলে তারা অন্য মুসলমানদের সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

যখন মুশরিকদের চেতনা ফিরে এল এবং তারা বুঝতে পারল যে ঈমানের প্রতাপই তাদের এভাবে অবদমিত করে দিয়েছিল, তখন তারা খুবই আত্মগ্লানি অনুভব করল এবং এর প্রভাবকে এরা এই বলে অস্বীকার কিংবা শেষ করে দিতে চাইল যে, আমরা মুহাম্মদের সাথে ঐ সময়ে সিজদা করেছি যখন তিনি আমাদের মূর্তি বা আরাধ্য দেব-দেবীদের প্রসঙ্গে প্রশংসনীয় উক্তি করেছিলেন।[১] এই ধরনের আচরণ এমন কওমের পক্ষে অসম্ভব নয়, যারা মুসলমানদের উপহাস করত, তাদের বিরক্ত করত, হাসিঠাট্টা করত এবং নানা রকমের চুটকি তৈরি করত এবং তাদের মধ্যে রসুলুল্লাহ-কে উপহাস করে এ কথা বলার লোকেরও অভাব ছিল না যে, 'কেমন মুহাম্মদ ! আকাশ থেকে আজ আর কোনো বাণী আসেনি ?'

মুশরিক-পৌত্তলিক-মালাউনরা এ ধরনের মনগড়া কাহিনী হাঁটু গেড়ে দিয়ে প্রচার করতে লাগল যাতে আল্লাহর রসুলের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়ে, 'অহির' বিরুদ্ধে জনমনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মুহাম্মদ কখনো কখনো মুশরিক পৌত্তলিকদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং দুর্বলতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু মুশরিক-পৌত্তলিক-মালাউনদের মুখে চুনকালি পড়ল। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তা আরো বেগবান হলো এবং মূর্তিপুজোর দাসদের সাথে শত্রুতা বেড়ে গেল।

হাবশার শরণার্থীরা মক্কায় ফিরে এলেন। কিছু মুসলমান তাঁদের পরিচিত লোকদের কাছে শরণ নিলেন বা গুপ্ত রইলেন। ফিরে আসা মুসলমানদের উপর কুরাইশদের দমনচক্র পুনরায় শুরু হয়ে গেল এবং তারা তাদের গোত্রগুলোর সমস্ত লোককে মুসলমানদের উপর দমন-পীড়ন-জুলুম-নির্যাতন চালানোর জন্য প্রস্তুত

---

১. কিন্তু এই ভেজাল-বস্তুটির কোনো বর্ণনা কোনো প্রমাণ শুদ্ধ হাদিসের শুদ্ধ কিতাবটিতে নেই।—অনুবাদক

করিয়ে নিল। অতএব আল্লাহর রসুলের পক্ষে তাঁর সাথিদের পুনরায় হিজরত করে হাবশায় যাওয়ার আদেশ দেয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না। এই দ্বিতীয় হিজরত আগের চেয়ে কষ্টদায়ক বলে সিদ্ধ হলো। কুরাইশরা এ কথা জেনে ফেলল। অতএব, হিজরত প্রতিরোধ করার জন্য তারা জোর প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু মুসলমানরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি সতর্কতার পরিচয় দিলেন। এই কাফেলায়[১] ৮৩ পুরুষ ও ১৯ মহিলা ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের যাত্রা সহজ করে দিলেন এবং তাঁরা হাবশার সম্রাট নাজ্জাশির ওখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি সেখানে তাঁদের আশ্রয় দিলেন এবং মান-মর্যাদা ও বসবাসের সুন্দরতর প্রতিবাস লাভ করলেন।

মনে হয় সম্রাট নাজ্জাশি সদাচারী, শুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী, আল্লাহর জ্ঞানের সাথে সুপরিচিত ছিলেন এবং হজরত ঈসা সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস রাখতেন। তাঁর সুশীলতা এবং সঠিক বিশ্বাসের পরিণামেই তিনি ঐ শরণার্থীদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন এবং বসবাসের জায়গা দেন, যাঁরা আপন ধর্মকে বুকে ধরে স্বদেশীয় শত্রুদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁর দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কুরাইশরা এ কথা জানতে পেরে বড়ই দুঃখিত হলো যে, স্বদেশত্যাগীরা বিদেশে গিয়ে সুরক্ষিত আবাস পেয়েছে। অতএব, ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ যেন লকলক করে এমনভাবে জেগে উঠল যে, তাঁদের দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তিবিধান করার জন্য কিছু উপহার-উপঢৌকন দিয়ে এক প্রতিনিধি দল নাজ্জাশির কাছে পাঠিয়ে দিল, যাতে তিনি মুসলমানদের প্রতি সমস্ত সহানুভূতি ও সমর্থন প্রত্যাহার করে তাঁদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেন।

এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিল আমর ইবনে আস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রবিআ। এরা সম্রাটের দরবারিদের উপহার-উপঢৌকন দিল এবং তাদের কান ভাঙিয়ে এই বলে রাজি করিয়ে নিল যে, তাঁরা এদের সাথে একবাক্যে মুসলমানদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য সম্রাটকে প্রভাবিত করবেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বলল যে, আমাদের জাতির কিছু মূর্খ লোক নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে এক নতুন ধর্মে প্রবেশ করেছে। তারা সম্রাটের ধর্মেও প্রবেশ করেনি, যার সাথে আমরাও অপরিচিত, সম্রাটও অপরিচিত।

অতএব, সম্রাট নাজ্জাশির সামনে যখন এ মামলা পেশ হলো তখন চারদিক থেকে সমানে ইশারা-ইঙ্গিত এল যে, এদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু সম্রাট ভাবলেন, অনুসন্ধান করে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

তারপর, তিনি শরণার্থীদের আহ্বান করলে তাঁরা দরবারে এলেন। তাঁরা প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, সম্রাটের সামনে প্রকৃত সত্য কথাই বলবেন, তাতে সম্রাট প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন যাই হোন না কেন। শরণার্থী দলের প্রতিনিধি

---

১. যাত্রীদলে।

ছিলেন জাফর ইবনে আবু তালিব। সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা স্বধর্ম ত্যাগ করে এমন কোন ধর্ম গ্রহণ করেছেন যে কারণে আপনাদের স্বজাতির সাথে আপনাদের বিরোধ উপস্থিত হয়েছে ? আপনারা না আমার ধর্ম গ্রহণ করলেন আর না দুনিয়ায় অন্য কোনো ধর্ম ?

হজরত জাফর উদাত্ত কণ্ঠে বললেন :

মান্যবর সম্রাট ! আমরা এক পথভ্রষ্ট জাতি ছিলাম, মূর্তিপুজো করতাম, মৃত জীবজন্তুর মাংস খেতাম, অশ্লীল কর্ম করতাম, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম এবং ন্যায্য হক থেকে তাদের বঞ্চিত করতাম। প্রতিবেশীদের কথা বিবেচনা করতাম না। কথা দিলে বা প্রতিশ্রুতি দিলে আমরা ভঙ্গ করতাম এবং আমাদের মধ্যেকার শক্তিমানরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করত। এটাই ছিল আমাদের দুর্দশা। অনন্তর আল্লাহ্ আমাদের মধ্য থেকে আমাদের মাঝে এক নবী প্রেরণ করলেন, যাঁর বংশ, সততা, আমানতদারিতা ও সাধুতা সম্পর্কে আমরা ভালো মতোই অবগত আছি। তিনি আমাদের আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন, তোমরা কেবলমাত্র এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করো আর মূর্তিপুজো ত্যাগ করো, যাদের উপাসনা আমাদের পূর্বপুরুষরা ও আমরা করতাম। তিনি আমাদের সত্য বলতে, আমানতদারি এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ককে গভীর করতে, প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে, প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি পুরা করতে, অবৈধ কর্মকাণ্ড ও হানাহানি রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষার আদেশ দিলেন। তিনি আমাদের অশ্লীলতা থেকে, মিথ্যাচারিতা থেকে, অন্যের সম্পদ অপহরণ থেকে, সচ্চরিত্র রমণীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ থেকে আমাদের বিরত করলেন এবং আমাদের এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং কোনো বস্তুকে তা সে প্রাণী বা অপ্রাণী যাই-হোক তাকে আল্লাহর সাথে শরিক বা অংশী না করতে উপদেশ দিলেন এবং আমাদের নামাজ পড়তে, জাকাত দিতে এবং রোজা রাখতে আদেশ দিলেন (এবং অন্যান্য ইসলামী আদেশের কথা তাঁকে বললেন)। অতএব, আমরা তাঁকে অনুসরণ করি এবং তাঁর উপর ঈমান আনি তিনি যা কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং আমরা তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলি। আমরা কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমরা তাঁর কোনো অংশী স্বীকার করি না। যে বস্তু তিনি আমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন আমরা তা হারাম বলে পরিত্যাগ করেছি, আর যে বস্তু তিনি আমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করেছেন তা হালাল বলে গ্রহণ করেছি। এসব কারণে আমাদের স্বজাতি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা আমাদের উপর সীমাহীন যন্ত্রণা দিয়েছে এবং দ্বীনের প্রশ্নে তারা আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে, যাতে আমরা আমাদের অবলম্বিত ধর্ম ত্যাগ করে মূর্তি পুজোয় ফিরে আসি এবং আমাদের পরিত্যক্ত সমস্ত অপবিত্রতাকে

আবার হালাল বা বৈধ বলে গ্রহণ করি। তারা আমাদের উপর সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে এবং তারা আমাদের ধর্মপালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, ফলে বাধ্য হয়ে আমরা স্বদেশ, স্বভূমি ত্যাগ করে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আপনার দেশে চলে এসেছি। এখন আমাদের আশা যে, আপনি আমাদের উপর আর অত্যাচার-নির্যাতন হতে দেবেন না।

নাজ্জাশি এ বক্তব্য শোনার পর বললেন, তোমাদের নবীর উপর অবতীর্ণ প্রত্যাদিষ্ট কোনো বাণী আমাকে শোনাতে পারবে ? জাফর বললেন, হ্যাঁ এবং তিনি সুরা মরিয়মের অংশবিশেষ পাঠ করে শোনালেন। অনন্তর নাজ্জাশি ও তাঁর পাদরিরা তা শুনে কেঁদে ফেললেন। তারপর নাজ্জাশি বললেন, নিঃসন্দেহে এ কালাম ও ঈসার উপর প্রত্যাদিষ্ট বাণী একই উৎস থেকে এসেছে। আল্লাহর কসম ! আমি এদের তোমাদের হাতে তুলে দেব না। তোমরা ফিরে যাও। এরা দুজন নিরাশ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল এবং আমর আব্দুল্লাহ ইবনে রবিআকে বলল, 'আল্লাহর কসম ! কাল আমি এমন একটা যুক্তি তুলে ধরব যে তারা আর পালাবার পথ পাবে না।'

পরদিন আমর নাজ্জাশিকে বলল, 'এরা ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে আজব সব কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে।' সম্রাট নাজ্জাশি মুহাজিরদের পুনরায় দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। হজরত জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা তাই বলব। আমাদের নবী যা নিয়ে এসেছেন। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসুল এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রুহ ও এক কালেমা কুমারী মরিয়মের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন।

নাজ্জাশি এ কথা শুনে ধরিত্রীর বুক হতে একটি খড়কুটো তুললেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি যা কিছু বলছেন, ঈসা এর চেয়ে বেশি কিছু ছিলেন না। এ কথা শোনার পর তাঁর আশপাশে বসে থাকা পাদরিরা ক্রোধে হাত পা ছুড়তে লাগল। কিন্তু নাজ্জাশি বললেন, আল্লাহর কসম, তোমরা যতই হাত পা ছোড় প্রকৃত সত্য কিন্তু এটাই এবং মুসলমানদের বললেন, 'যান, আপনারা আমার দেশে নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় পরম শান্তিতে বসবাস করুন। আপনাদের কেউ বিরক্ত করলে তাদের দণ্ডিত করা হবে। যদি আমাকে আপনাদের বিনিময়ে সিনাই পাহাড়ের সমান ধন-সম্পদও দেয়া হয় তা সত্ত্বেও আপনাদের আমি কষ্ট দেব না।'

আমরের চাল ব্যর্থ হয়ে গেল এবং প্রতিনিধি দল মুখে ব্যর্থতার চুনকালি মেখে মক্কায় ফিরে এল। এভাবে কুরাইশরা সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারল যে, তারা কেবল তাদের দেশ ও দেশের সীমার মধ্যেই ইসলাম প্রেমীদের বদলা নিতে পারে এর বাইরে নয়। অতএব, তারা এবার সিদ্ধান্ত নিল যে, এবার যাকেই তারা হাতে পাবে অতি নির্মমভাবে তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে যাবে।

বারো

হজরত হামজা ও হজরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ

মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এমনভাবে চমকায় যে, আশপাশের সমস্ত বাতাবরণ আলোকিত হয়ে ওঠে। মক্কায় এমন কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে অধিকাংশ পরিবার পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। যাঁরা তখনো পর্যন্ত টিকে রইলেন তাঁরা মুশরিক, পৌত্তলিক, মালাউনদের নিশানায় পরিণত হয়ে রইলেন, কিন্তু কিছু নতুন লোকের ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরাইশরা নিজেদের দমননীতির ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল।

হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিলেন। তিনি রসুলুল্লাহর চাচা ও অন্যদিকে দুধভাই সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিমান, সাহসী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি এ রকম :

'একদিন আবু জেহেল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি করে এবং তার প্রচারিত দ্বীন (ইসলাম)-এর বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। কিন্তু তিনি তার কথায় একটা উত্তরও দেননি। এ ঘটনার খবর আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের মুক্ত হয়ে যাওয়া দাসী হজরত হামজাকে দিতে গিয়ে বলে, আবু আম্মারা ! আপনি যদি আপনার ভাইপোর অবস্থা দেখতেন তাহলে সহ্য করতে পারতেন না। আবু হাকাম ইবনে হিশাম তাকে কী কষ্ট-যন্ত্রণাই না দিল, আর কী অকথ্য ভাষায় তাঁকে গালিগালাজ করল, অকথ্য ভাষায় তাঁকে উৎপীড়িত করল ; কিন্তু তিনি একটি কথাও বললেন না। এই মহিলা নিকট থেকে পুরো ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছিল। এ কথা শুনেই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় হরমে পৌঁছালেন, সেখানে আবু জেহেল তার দলবলের মধ্যে বসেছিল। গিয়েই তিনি তাঁর হাতের ধনুক দিয়ে তার মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল এবং বললেন, কেন তুই মুহাম্মদকে গালি দিয়েছিস জেনে রাখ আজ থেকে আমি তাঁর ধর্মে শামিল হলাম।'

হামজার ইসলাম গ্রহণ ছিল এক সাহসী ব্যক্তির ক্রোধের পরিণাম, যিনি তাঁর ভাইপোর অপমান সহ্য করতে পারেননি। তারপর আল্লাহ তাঁর কথা প্রমাণিত করে দিলেন, আর তিনি অত্যধিক শক্তিশালী একটি অবলম্বনকে ধরে নিলেন এবং এ ঘটনায় মুসলমানরা বড়ই শক্তি ও সন্তোষ লাভ করলেন।

হজরত উমরের ঘটনা আরো আকর্ষণীয়, যিনি ইসলামের উপহাসের ক্ষেত্রে বড়ই অগ্রণী ছিলেন এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। গর্ব, অহঙ্কার ও কটু স্বভাবের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনিও মুসলমানদের কম দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা দেননি।

আমির বিন রবিআর পত্নী উল্লেখ করেছেন, আমি হাবশায় হিজরত করার জন্য জিনিসপত্র বাঁধছিলাম আর আমার স্বামী কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। এমন সময় তিনি এলেন (তিনি তখনো মুশরিক ছিলেন)। আমরা তাঁর কাছে খুবই কষ্ট সহ্য করেছিলাম। পরন্তু তিনি সে সময়ে দাঁড়িয়ে আমার ব্যস্ততা দেখতে লাগলেন। এরপর বললেন, আব্দুল্লাহর মা এখনই প্রস্থান করবে ? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তোমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আশা করি, পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের এই বিপত্তি থেকে বাঁচার কোনো উপায় বের করে দেবেন।' এ পর্যন্ত শুনে উমর বললেন, আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন ! এ সময় আমি তাঁর মধ্যে এক গভীর আর্দ্রতা ও গাম্ভীর্য লক্ষ করি। তিনি বলেন, আমার স্বামী ফিরে এলে আমি পুরো অবস্থাটা তার কাছে বর্ণনা করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন উমরের মধ্যে মুসলমান হওয়ার কোনো লক্ষণ অনুভব করলে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তিকে তুমি এইমাত্র দেখলে সে সেই সময় পর্যন্ত মুসলমান হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খাত্তাবের গাধাটাও মুসলমান হয়ে যাবে।' কেননা মুসলমানদের উপর তাঁর জুলুম-নিপীড়নের কথা তাঁর ভালোরকম জানা ছিল।

কিন্তু স্ত্রীর অনুমান পুরুষের মতের তুলনায় সত্য বলে প্রতীয়মান হলো। উমরের কঠোরতা ছিল এক ছিলকা পরিমাণ, কিন্তু তাঁর পিছনে রোদন, আর্দ্রতা, নম্রতা ও সহৃদয়তার স্রোত সদা বহমান ছিল।

মনে হয় যে, উমরের অন্তরে পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব চলছিল। একদিকে ঐ সমস্ত ঐতিহ্য ও রীতি রেওয়াজের প্রশ্ন ছিল, যা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন আর আমোদ-প্রমোদ বিলাসব্যসন ও মাদকতার বিষয়টিও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন রেখেছিল, অন্যদিকে মুসলমানদের দৃঢ়তা ও ঈমান-আকিদার পথে কষ্ট সহ্য করার শক্তিও তাকে আশ্চর্যান্বিত করে তুলত। এই সাথে তাঁকে এই সন্দেহও উদ্বিগ্ন করে তুলছিল যে, যেসব সিদ্ধান্ত ও ধ্যান-ধারণার পথে ইসলাম আহ্বান জানাচ্ছিল তা কি অন্যের চেয়ে উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ হতে পারে ? এই কারণে তিনি ক্রোধ ও রোষে ফুঁসে উঠছিলেন। এই মানসিক টানাপড়েন তাকে রসুলুল্লাহকে হত্যা করার পথে প্ররোচিত করল, যাতে সমস্ত সন্দেহ ও অপশক্তি এখানেই শেষ হয়ে যায়। যখন পথিমধ্যেই তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর বোন ও বোনাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে বোনের বাড়িতে পৌছলেন। বোনকে তিনি এতটা প্রহার করলেন যে, তাঁর মাথা ফেটে গেল। বোনের প্রবাহিত রক্তই তাঁর মনোভাবকে সত্য পথে ঘুরিয়ে দিল। কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভালো-মন্দের মধ্যে এক প্রবল দ্বন্দ্ব তাঁকে উদ্বেলিত করল। উমর কুরআনের লিখিত অংশ স্বহস্তে তুলে নিলেন এবং সুরা ত্বাহা-র অংশবিশেষ পাঠ করলেন এবং বললেন, কী সুন্দর ও কী উচ্চস্তরের বাণী এ ?

উমর সত্যের সামনে পরাজিত হলেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় উপস্থিত হলেন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার জন্য।

যখন উমরের মন সমস্ত অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় ধ্যান-ধারণা থেকে পবিত্র হয়ে গেল এবং ইসলামের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়ে গেল, যা আল্লাহর সৈন্যদের জন্য সহায়ক সিদ্ধ হলো, মুসলমানদের শক্তি বেড়ে গেল এবং কাফিরদের মনে নৈরাশ্য ছেয়ে গেল।

যখন কুরাইশরা দেখল যে, ইসলাম সাফল্য ও উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের প্রতিরোধ করার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলে গেছে এবং ইসলামের সহযোগী ও রক্ষকদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তারা তাদের কর্মপন্থা নিয়ে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা শুরু করল, যাতে আরো কঠোর, আরো কঠিন, আরো দৃঢ়, আরো ব্যাপক চাল চালতে পারে।

তেরো
সামাজিক বহিষ্কার

মুশরিকদের রোষ এমন একটা পর্যায়ে পৌছে গেল যে, তারা পরস্পরে মিলেমিশে একটি সমঝোতা করল তাতে মুসলমান, তাদের সহায়তাকারী, তাদের রক্ষাকারী এমনকি তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকারী এ রকম যে কোনো ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীকে তারা একটি দল বা পৃথক সম্প্রদায় বলে অভিহিত করল এবং সমাজের অন্য সমস্ত মানুষকে তাঁদের থেকে পৃথক করে দেয়া হলো এবং পরস্পরে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা কেউ মুসলমানদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনা, বিয়ে-শাদি ইত্যাদি কোনো সম্পর্কই গড়বে না– এই মর্মে তারা একটি দস্তাবেজ লিখে তাতে স্বাক্ষর করে সেটি কাবার দরজায় টাঙিয়ে দিল।

নিঃসন্দেহে ক্রোধান্ধ ও রোষলিপ্ত হিংসুক মুশরিকরা প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হয়ে গেল। অনন্তর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের শো'বে আবি তালিব[১] এ বন্দি করে ফেলা হলো এবং বনু মুত্তালিবের প্রত্যেক ব্যক্তি তা সে কাফির হোক বা মুমিন হোক তারা তাঁর সহযোগী হয়ে গেলেন এবং কুরাইশদের বিরোধিতা করে গেলেন।

---

১. শো'বে শব্দের অর্থ উপত্যকা। এই উপত্যকায় আবু তালিব থাকতেন। সেজন্য এর নাম শো'বে আবু তালিব। অর্থাৎ আবু তালিবের উপত্যকা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। –অনুবাদক

মুসলমানরা উপত্যকায় অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন। এক পর্যায়ে তাঁদের জন্য এ অবরোধ বড়ই কষ্টদায়ক হয়ে উঠল। সাহায্যের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল। খাদ্যবস্তুর ভাঁড়ারে টান পড়ল। অনাহার বেড়ে চলল। উপত্যকা থেকে ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে বংশ ও দলগত পক্ষপাত জেগে উঠল এবং শত্রুদের মধ্যে সহানুভূতি এসে গেল। অতি প্রতিকূল বাতাবরণেও মুসলমানরা আল্লাহর নামে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সয়ে যেতে লাগলেন।

ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে মূর্তিপূজকদের কঠোরতায় ভাটা পড়ল না এবং পুরো আরব এঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেও যেন কুণ্ঠিত হলো না।

সুহাইলী বর্ণনা করেছেন, যখন কোনো বাণিজ্যিক কাফেলা মক্কায় আসত তখন মুসলমানরা ক্রয় করার জন্য বাজারে যেতেন। এ সময় আবু লাহাব বলে বেড়াত– 'বণিক সকল ! তোমরা এদের কাছে এত বেশি দাম হাঁকাও তারা যেন কিনতে না পারে। আমার সহায় সম্পদের কথা তো তোমাদের জানা আছে, আমি তোমাদের সমস্ত ক্ষতি পূরণ করে দেব।' অতএব, বণিকেরা বেশি বেশি দাম চাইত আর খরিদ্দার বেচারা তা কিনতে না পেরে ক্ষুধার্ত শিশুদের কাছে খালি হাতে ফিরে যেত। তারপর আবু লাহাব সে সকল পণ্য বাজারদরে কিনে নিয়ে গুদামজাত করে রাখত। পরিণামে মুসলমানরা ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট পেত।

ইউনুস সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস হতে বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন রাতে প্রস্রাবের জন্য বাইরে আসি এবং আমি প্রস্রাবের নিচে কোনো কিছুর আওয়াজ শুনি, মনোযোগ দিয়ে দেখি সেখানে উটের একটি শুকনো চামড়া পড়ে রয়েছে। সেটি নিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে তারপর তাকে জ্বালালাম এবং টুকরো করে তিন দিন যাবৎ ভিজিয়ে খেলাম।

কুরাইশদের অবরোধ কতই না কষ্টদায়ক এবং কঠোর ছিল ? অভাব অনটন ও তাঁদের এমন বস্তুও খেতে বাধ্য করে দিয়েছিল, যা সাধারণ পরিস্থিতিতে খাওয়ার কথা কল্পনাও করা যেত না। এই বিপত্তি ও কষ্ট কুরাইশদের কিছু আত্মীয়-স্বজনকে দুঃখিত ও সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। অনন্তর, কিছু আত্মীয়-স্বজন গোপনে উটের পিঠে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য বস্তু সামগ্রী চাপিয়ে নিয়ে উপত্যকার দিকে এসে ছেড়ে দিয়ে যেত, যাতে সে পীড়িতদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। এভাবে তাদের ক্ষুধা অনাহার কিছুটা নিবারণ হতো।

এ অবরোধ পুরো তিন বছর চলল। এই দীর্ঘ অবরোধে তাঁদের শক্তি ছিল একমাত্র ঈমান, যা সমস্ত রকমের দুঃখ-কষ্টকে সহজে বরণ করে নিতে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল এবং শক্তি, সাহস, সামর্থ্য ও দৃঢ়তায় শক্তি জুগিয়ে চলেছিল।

প্রকৃত সত্য ছিল এই যে, মুসলমানরা এই বিপত্তি ও কষ্টদশা থেকে মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। বেশ কিছুদিন ধরে সাফল্য ও প্রভুত্বের সুসংবাদ শুনিয়ে

আসা হচ্ছিল কিন্তু তাদের ভাগে ভয় ও আতঙ্ক ছাড়া আর কিছু এল না ! এঁদের কাছে নিজেদের মাতৃভূমিকে যেন অদ্ভুত এক অচেনা বস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল এবং তাদের হৃদয়-মন-মস্তিষ্ক মুশরিকদের বিরুদ্ধে রোষ, ক্ষোভ ও ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যারা তাদের নৈতিক মূল্যবোধকে উপহাস করেছিল এবং আখিরাতের দিনের মতোই তাদের প্রভুর প্রভুত্বকেও অস্বীকার করেছিল।

উৎপীড়িত মুসলমানদের সফলতার ইচ্ছা যদি এই কঠোর পরিস্থিতিতে মুক্তি পাওয়ার যথার্থ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে বিজয় ও প্রভুত্বের দাবিও তাঁরা অবশ্যই করতেন, যাতে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অপমানিত করতে পারতেন এবং সত্যের বিরোধীদের মজা দেখাতে পারতেন। পরন্তু, অহি অবতীর্ণ হচ্ছিল কিন্তু তার দাবি এটাই ছিল না যে, এর সম্ভাব্য পরিণামের জন্য প্রতীক্ষা করা হোক ; বরং অহির দ্বারা বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও ধৈর্য উৎপন্ন করা হচ্ছিল। তার দাবি তো এটাই ছিল যে, ঈমানের বাস্তবিকতার জন্য আল্লাহর স্তুতি করা হোক, যাকে ঐ সমস্ত মানুষ চিনে নিয়েছেন এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সত্যতা থেকে তারা সাহস ও শক্তি লাভ করেন, যাতে সমস্ত বিপত্তি ও সংকটকে তাঁরা হাসিমুখে সয়ে যেতে পারেন।

কুরআন বলেন–

'যাদের আমরা ভর্ৎসনা করছি তাদের মধ্যে আমি তোমাকে কয়েকজনকে দেখিয়ে দিই অথবা (এর আগে) তোমাকে উঠিয়ে নিই, তাহলে এদের তো আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে, তারপর যা কিছু করছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষী। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন রসুল এসেছেন তাহলে যখন তাদের কাছে রসুল এসে যান, তখন তাদের ফায়সালা ন্যায়ের সাথে করা হয় এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হয় না।' – ইউনুস : ৪৬- ৪৭।

মুশরিকরা নিজেদের ও মুসলমানদের মধ্যেকার সংঘর্ষের পরিণাম দেখার জন্য তাড়াহুড়ো করছিল। তাদের এই তাড়াহুড়োর প্রধান কারণ হলো, তারা ইসলামের শিক্ষাবলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করছিল, মৃত্যুর পরের জীবন এবং আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার উপর তাদের কোনো ঈমান ছিল না। তারা কখনো চিন্তাও করতে পারত না যে, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ইসলাম সূর্য পূর্ণরূপে আলো দেবে মক্কা মূর্তিশূন্য হবে এবং তৌহিদের আওয়াজ ঐ পশ্চিম থেকেই আসবে যেখানে অর্থাৎ শো'বে আবু তালিবে তাঁরা অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন, সেখানে অবরুদ্ধ উৎপীড়িত মুসলমানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভুত্ব লাভ করবেন। আদেশ তথা নিষিদ্ধের অধিকার তারাই লাভ করবেন এবং তারাই মুসলমানদের হাতে বন্দি হবে এবং তাদের কাছেই তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, এদের সকলের মধ্যে ইনকিলাবের কী গভীর আশাই না বিরাজ করছিল :

'এবং বলে, যদি তুমি সঠিক হও, তাহলে এ ধমকি কবে পুরো হবে ? বলে দাও, আমার না মন্দের অধিকার আছে আর না ভালোর। ব্যস ! আল্লাহ যা

চাইবেন তাই হবে। প্রত্যেক জাতির জন্য সময় নির্দিষ্ট আছে। যখন তাদের সময় এসে যায় তখন তারা এক পা পিছাতেও পারে না আবার এক পা বাড়াতেও পারে না। বলো, সঠিকভাবে চিন্তা করে দেখো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর যাতনা রাতে অথবা দিনে এসে যায়, তাহলে তার মধ্যে এমনকি বস্তু আছে যে, অপরাধীরা তার জন্য তাড়াতাড়ি করছে ? যখন তা এসে যাবে, তখন কি তোমরা তাকে মেনে নেবে ? কী এখন ? তোমরা তো এর জন্য বড় তাড়াতাড়ি করছিলে ?' – ইউনুস ৪৮-৫১।

ইসলামে প্রবেশ তথা তাতে স্থির এবং দৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকা সমস্ত সাহসের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহস। বহু লোক পূর্ণ বিশ্বাস এবং সততার সাথে কোনো সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে তার ঈমান তাকে লাভপ্রাপ্তি, উন্নতি ও প্রগতি থেকে বিমুখ করে না। পরন্তু প্রারম্ভিককালে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, লাভ থেকে বঞ্চনা ও ব্যক্তিগত হিতের জন্য হানি হলো সেই প্রথম কুরবানি, যা তাঁর আকিদার বিশ্বাসের পথে উপস্থিত হবে।

আমার জানা মতে, স্বয়ং সত্যের জন্য, সত্যই বিবেচিত হয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় কোনো বস্তু ব্রহ্মচর্য সংযম ও সন্তোষ বিধান করতে সক্ষম নয়। কুরআন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছিল যে, আকিদা ও সিদ্ধান্তের তুলনায় ব্যবসাদারি ও দুনিয়াদারিকে কুরবানি করে দাও এবং দুনিয়াবি লাভের চেয়ে আখিরাতের সাফল্যের কথা চিন্তা করো।

'যারা এই সাংসারিক জীবন ও এর সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষী হয় তাদের কর্মের প্রতিদান আমি এখানেই দিয়ে দিই এবং এখানে তাদের বিন্দুমাত্র কম দেয়া হয় না। এরা তারাই, আখিরাতে যাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। আর তারা এখানে যা কিছু করেছে সবই অকার্যকর হয়ে গেছে এবং তাদের কর্মপন্থা সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।' – হুদ : ১৫, ১৬

এই শিক্ষা সাহাবিদের মধ্যে যে সততা, সংযম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা, নিষ্কপটতা তথা খুলুস (আন্তরিকতা) উৎপন্ন করে দিয়েছিল তার উদাহরণ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। অতএব রাজরাজড়াদের মুকুট তাঁদের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল এবং সুদূর ক্ষেত্রগুলোতে তাঁর সৈন্যরা অত্যধিক পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করলেন এবং সেই পরিস্থিতিতেও আকিদার প্রেরণা ও উদ্দেশ্যই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হয়ে রইল এবং ধনদৌলতের প্রতি তাঁরা বিন্দুমাত্র লোলুপ দৃষ্টি দিলেন না এবং সুচ পরিমাণ সম্পদও তাঁরা সেনাধ্যক্ষের সামনে এনে জমা করে দিলেন। প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে এবং প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তাঁরা নামাজ, জাকাত এবং নেকির চিন্তায় মশগুল থাকলেন এবং সৎকর্মে আদেশ দিলেন ও অসৎকর্মে বাধা দেয়ার চিন্তা করে গেলেন।

এই কঠোর ও নির্মম অবরোধের কালে, হজের দিনগুলোতে মুসলমানরা অন্যদের সাথে মিলিত হতেন এবং দ্বীনের প্রচার কাজ চালিয়ে যেতেন। তাঁদের উপর আরোপিত এসব বিপত্তি ও কষ্ট তাঁদের এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারল না বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হলেন এবং তাঁদের কাছে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে দিলেন। দমন ও অত্যাচারের লহর দাওয়াত তথা আন্দোলনকে দমন করতে পারল না ; বরং তার মূল আরো গভীরে প্রোথিত হলো এবং তার শাখা-প্রশাখা চারদিকে বিস্তৃত হতে লাগল। এই পর্যায়ে ইসলামের শিক্ষা অনেক ব্যক্তিকে সাহায্যকারী করে তুলল এবং সেই সাথে মুশরিকরা দুটি বড় দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং যা কিছু বাহাদুরি ও বোকামি করেছিল তা তাদের চর্চার বিষয় হয়ে গেল এবং এর বাস্তবিকতা সম্পর্কে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল। অতএব তাদের মধ্যেকার একদল লোক সামাজিক বহিষ্কারকে অযৌক্তিক এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং এই চুক্তিপত্রকে ধ্বংস করে দেয়ার কাজে সচেষ্ট হয়ে উঠল।

এই কাজে সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন হিশাম ইবনে আমর। মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন এবং খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। অতএব, তিনি জুহাইর বিন আবি উমাইয়ার সাথে মিলিত হলেন। তিনিও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বড়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর মা আতিকা বিনতে মুত্তালিব, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু ছিলেন। হিশাম বললেন : 'জুহাইর ! তুমি কি এতে বড়ই সুপ্রসন্ন যে, তোমরা নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া করছ, বিয়ে-শাদি করছ, আমোদ-ফুর্তি করছ আর তোমার মামার বাড়ির লোকেরা অনাহারে মরছে এদের সাথে লেনদেন, বিয়ে-শাদির সম্পর্কও ছিন্ন । আল্লাহর কসম এটি যদি আব্দুল হাকাম ইবনে হিশামের (আবু জেহেল) নিজের হতো এবং তুমি যদি তার মামার বাড়ির লোকদের সাথে এই আচরণ করতে তাহলে কোনো অবস্থাতেই আমি তা চলতে দিতাম না।'

জুহাইর বললেন : 'হিশাম ! কিন্তু আমি একা কী করতে পারি ? যদি আর কেউ আমার সাহায্যকারী হতো তাহলে আমি এ চুক্তিপত্র টুকরো টুকরো না করে ছাড়তাম না।'

হিশাম : 'একজনকে তো তুমি পেয়ে গেছ।'

জুহাইর : 'কে ?'

হিশাম : 'কেন আমি ?'

জুহাইর : 'আর একজনকে পাও কি না দেখো !'

তারপর হিশাম, মুতইম ইবনে আদির কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, 'মুতইম ! আবদে মানাফের লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর তুমি তামাশা দেখবে,

এটা কি তুমি পছন্দ করতে পারো ? এদের ব্যাপারে তুমি কুরাইশদের সহযোগিতা করলে এবং তাদের ধ্বংস হতে দিলে তো অনতিবিলম্বেই তোমার সাথে একই আচরণ করা হবে।'

মুতইম ইবনে আদি : 'আমি একা কী করতে পারি ? আর কাউকে দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করো।'

হিশাম : 'এক আমি আছি, আর দুই জুহাইর আছে।'

মুতাইম : 'আরো একজনকে নিয়ে এসো।'

তারপর হিশাম, আবুল বখতারি ও আস ইবনে হাশিমের কাছে গেলেন এবং মুতইমের কথাটি তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আর কেউ আমাকে সহযোগিতা করতে রাজি আছে ? হিশাম বললেন, আমি আছি। জুহাইর ইবনে আবু উমাইয়া ও মুতইম ইবনে আদি আছে। তিনি বললেন, ব্যস আর একজনকে নিয়ে এসো। অতএব, হিশাম জমআ ইবনে আসওয়াদের কথা বললেন এবং তার সাথে নিজের আত্মীয়তার কথাও শুনিয়ে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আর কোনো সাহায্যকারী পাওয়া যাবে ? হিশাম বললেন, হ্যাঁ এবং গুনে গুনে সবার নাম বলে দিলেন।

আতএব, এই পাঁচ ব্যক্তি রাতের বেলায় মক্কার 'জনুন' নামক একটি উঁচু জায়গায় গিয়ে একত্রিত হলেন এবং স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন, যে কোনো প্রকারে চুক্তিপত্র ছিন্নভিন্ন করে ফেলার প্রয়াস চালানো হবে। জুহাইর বললেন, লোকদের সামনে কথা তুলব। পরদিন জুহাইর কাবা তাওয়াফ করলেন। তারপর মক্কাবাসীদের সম্বোধন করে বললেন :

'মক্কাবাসীগণ ! আমরা সবাই নিশ্চিন্তে পানাহার করব, ঘুমাব, আরাম করব আর বনি হাশিমের লোকেরা অনাহারে মারা পড়বে ? তাদের সাথে সমস্ত লেনদেন বন্ধ। তাদের কাছ থেকে না কিছু কেনা হচ্ছে আর না কিছু বেচা হচ্ছে। আল্লাহর কসম ! যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অন্যায় বহিষ্কারের চুক্তি ছিন্নভিন্ন করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের সভায় বসব না।'

আবু জেহেল চিৎকার করে বলল : 'তুই মিথ্যা বলছিস। তা কখনোই হবে না।'

জমআ বললেন : 'আবু জেহেল ! আল্লাহর কসম ! তুই সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। সমঝোতা চুক্তির ব্যাপারে আমরা একমত ছিলাম না।'

আবুল বখতারি : 'জমআ ঠিক বলেছে। ঐ চুক্তিপত্রের ব্যাপারে আমিও একমত ছিলাম না এবং আমিও তা স্বীকার করি না।'

মুতইম : 'তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ। এর অতিরিক্ত সবই মিথ্যা। আমরা আল্লাহর সামনে এই চুক্তিপত্র এবং এতে যা কিছু লেখা আছে তা খণ্ডন করছি।'

হিশাম ইবনে আমরও এর সমর্থন করল। আবু জেহেল ভড়কে গিয়ে বলে উঠল : 'এ এক গভীর ষড়যন্ত্র, যা গত রাতেই কোনো গোপন স্থানে বসে করা হয়েছে। অনন্তর মুতইম, এ চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলার জন্য অগ্রসর হয়ে দেখতে পেল, এ চুক্তিপত্র পোকায় কেটে সব নষ্ট করে দিয়েছে, কেবলমাত্র 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' বাদে আর কিছু নেই। আরবরা কোনো কাজ বিসমিকাল্লাহুম্মা (অর্থাৎ হে আল্লাহ, তোমার নামে শুরু করছি) দিয়ে আরম্ভ করত।

চৌদ্দ
আমুল হুজন (শোকের বছর)

সামাজিক বহিষ্কার বা অবরোধের পরিসমাপ্তির পর মুসলমানরা তাঁদের প্রয়াস পুনরায় শুরু করলেন। তাঁদের পুরাতন ক্ষত তখনো দগদগ করছিল আর মুক্তির আনন্দ আর অস্থায়ী রূপে লাভ করা সন্তোষ যেন শোক-সূর্যের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। প্রথমে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষ্ঠাবান পত্নী হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহু দেহান্ত হয়ে গেলেন। তারপর তাঁর সমর্থক এবং সহায়ক চাচা আবু তালিবও পরলোকগামী হলেন।

অর্থাৎ রসুলুল্লাহর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তার গভীর প্রভাব পড়ল।

হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ছিলেন এক বিরাট পুরস্কার। তিনি অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতেও তাঁর জন্য ছায়াস্বরূপ ছিলেন। রিসালাতের তালিমে তিনি তাকে সহায়তা দিয়েছিলেন এবং জিহাদের অত্যন্ত কঠিন ও বেদনাদায়ক পর্যায়গুলোতে তিনি সম্যকভাবে তার সাহায্যকারিণী হয়েছিলেন। তিনি তার জীবন ও সম্পদকে রসুলের সহায়তায় নিবেদিত করেছিলেন। আল্লাহর এই নিয়ামতের গুরুত্ব আপনি তখনই অনুভব করতে পারবেন, যখনই আপনি অবগত হবেন যে, কয়েকজন নবীর পত্নী এমন ছিলেন, যারা খেয়ানতি[১] করেছিলেন, রিসালাতকে[২] অস্বীকার করেছিলেন এবং শিরক ও কুফরির আহ্বায়ক ও পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতা করে রসুলের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

'আল্লাহ কুফরিকারীদের জন্য 'নূহ' (আ) এবং 'লুত'-এর স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করছেন, এই দুই মহিলা দুই নেক বান্দার অধীনে ছিল। তারপর তারা

---

১. বিশ্বাসঘাতকতা।
২. আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব।

তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং আল্লাহর সামনে তাদের কোনো কিছুই কাজে এল না এবং বলা হলো : 'দু'জনেই প্রবেশ করো আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে।' – আত তাহরীম : ১০

কিন্তু খাদিজার (রা) ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। তিনি নিষ্ঠাবান, সাধ্বী ও সদাচারিণী স্ত্রী ছিলেন। দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সময়ে তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি গভীর সমবেদনা দেখিয়ে গেছেন। তিনি নেকি, পবিত্রতা, সদাচার ও খোদায়ী গুণাবলির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। অহি আসামাত্রই তিনি তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময় পর্যন্ত রসুলুল্লাহর সাথে অতিবাহিত করেন। যে সময় তাঁর ইন্তিকাল হয় তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর এবং তিনি পয়ষট্টি বছর বয়স অতিক্রম করেছিলেন। আল্লাহর রসুল তাঁকে আজীবন স্মরণ করেন।

আবু তালিবের বিষয়টি তো হতচকিত করার মতোই। একদিকে একথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যে, হজরত মুহাম্মদের দেখাশোনায় তিনি কত না ভদ্রতা, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তাঁকে রক্ষা করতে বীরত্ব, সাহস ও ত্যাগ তিতিক্ষা দেখিয়েছেন আর গণদাওয়াতের ঘোষণার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর প্রকোপ থেকে আশঙ্কিত করার পর্যায়গুলোতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কী সমর্থনই না করে গেছেন। আবার অন্যদিকে লোকে একথা জেনেও দাঁতে আঙুল কাটত যে, তার মৃত্যু কী আফসোসজনকভাবে হলো যে, তিনি মৃত্যুর আগে বলে গেলেন, আমি আমার পূর্বপুরুষদের ধর্মে কায়েম রয়ে গেলাম !

আবু তালিবের মৃত্যুতে রাসুলের (সা.) উপর যেন শোকের পাহাড় ভেঙে পড়ল। তিনি কি সেই নাদান এবং বড় আক্রমণগুলোর কবল থেকে তাঁকে সুরক্ষার জন্য দুর্গের মতো কাজ দিতেন না ? তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তাঁর ভাইপোকে সমর্থন দিয়েছিলেন এবং কষ্ট ও উদ্বেগ থেকে রক্ষার জন্য নিজের মান-মর্যাদা ও প্রভাব প্রয়োগ করেছিলেন। এখন কুরাইশরা দেখল যে, মুহাম্মদের কোনো পৃষ্ঠপোষক রইল না, অতএব তাঁর মোকাবিলায় এবার তারা অধিক দুঃসাহসী ও উদ্ধত হয়ে উঠল।

বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন : 'আবু তালিবের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কুরাইশরা আমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারেনি।' – ইসহাক

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এরা এতটাই নির্ভীক হয়ে গেল যে, তাঁর পবিত্র মস্তকে একবার উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিল :

'হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, একবার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার কাছে নামাজ পড়ছিলেন আর

কুরাইশদের লোকেরা তাদের বৈঠকে নানা কথাবার্তা বলছিল। তাদের মধ্য থেকে আবু জেহেল বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে অমুক ব্যক্তির বাড়ি থেকে জবাই করা উটের নাড়িভুঁড়ি এনে সিজদাবনত মুহম্মদের কাঁধের উপর চাপিয়ে দিতে পারে ? একথা শুনে তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে নোংরা ও দুষ্ট লোকটি উঠে গিয়ে সেই নোংরা নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এল।

তারপর রসুলুল্লাহ যখন সিজদায় গেলেন তখন সে সেটি তার পিঠের উপর চাপিয়ে দিল। কুরাইশদের লোকেরা এ দৃশ্য দেখে হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল। আমি দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য দেখছিলাম। যদি আমার শক্তি থাকত তাহলে তার পিঠ থেকে এই নোংরাগুলো সরিয়ে নিয়ে মুক্ত করতাম। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় পড়ে রইলেন। আর মাথা তুলতে পারলেন না। এমন সময় কেউ গিয়ে ফাতিমা (রা)-কে খবর দিয়ে এল। ফাতিমা (রা) তখন শিশু। তিনি দৌড়ে এলেন এবং সেই নোংরাগুলোকে টেনে টেনে ফেলে দিলেন এবং কুরাইশ লোকদের খুব ভর্ৎসনা করলেন এবং তাদের অভিশাপ দিলেন। যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়া শেষ করলেন তখন তিনিও সেই অত্যাচারীদের অভিশাপ দিলেন।

তিনি অভিশাপ তিনবার উচ্চারণ করতেন। অতএব, তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের মধ্য থেকে এদের নিপাত করো। হে আল্লাহ তুমি কুরাইশদের মধ্য থেকে এদের নিপাত করো। হে আল্লাহ, তুমি কুরাইশদের মধ্য থেকে এদের নিপাত করো।' কুরাইশরা যখন একথা শুনল তখন তাদের হাসি গায়েব হয়ে গেল এবং তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারপর তিনি দুআ করলেন- 'হে আল্লাহ, তুমি আবু জেহেল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবি'আ, শাইবা ইবনে রবিআ, ওয়ালিদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খলফ, উকবা ইবনে আবু মুয়িত ও আম্মারা ইবনে অলিদকে নিপাত করো।'

সেই সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এই নির্দিষ্ট নামের লোকগুলোকে বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি তারপর বদরের কূপগুলোতে তাদের টেনে এনে ফেলে দেয়া হয়েছিল।' – বুখারী।

মক্কায় কুফরি চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। সেখানকার অধিবাসীরা এবার মুসলমানদের মাথায় নোংরা দুর্গন্ধ ঢেলে দেয়াটাকে তাদের জন্য একটা রুচিকর ও আনন্দদায়ক ব্যাপার বলে ভাবতে শুরু করেছিল এবং এ বিরল দৃশ্য দেখে তারা কতই আনন্দ পেত। তাদের মধ্যে সদাচার আর সুকুমার বৃত্তির অবশিষ্ট পর্যন্ত আর ছিল না।

আরব সমাজে কন্যাসন্তান পিতার নিরাপত্তাধীনে থাকত ও তাকে নিয়ে গর্ব করত এবং তাকে নিরাপদ রাখতে খুবই পছন্দ করত। পরন্তু তার জীবন কীভাবে

অতিবাহিত হতে পারত, যার দেখাশোনোর কেউ থাকত না ? হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও সমস্ত কষ্ট ও মুসিবত সয়ে নিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও অন্য লোকালয়গুলোতে অন্য ক্ষেত্রগুলোতে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন এই আশায় যে, সেখানে লোকপ্রিয়তা ও দাওয়াতের বিকাশের জন্য কোনো না কোনো পথ বেরিয়ে আসবে। অনন্তর তিনি জায়েদ ইবনে হারিসাকে সাথে নিয়ে তায়েফ অভিমুখে সকিফদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

পনেরো

তায়েফ যাত্রা

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ যাওয়ার সংকল্প করলেন, যেখানে সকিফ গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। তায়েফ মক্কা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সেখানকার সমাজের প্রভাবশালী লোকদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি তাদের সাথে ইসলাম বিষয়ে আলাপ করলেন এবং তা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করল এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর জবাব দিল। তিনি সেখানে দশ দিন অপেক্ষা করলেন এবং লোকদের কাছে ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

যখন তিনি তাদের কাছে নিরাশ হলেন তখন প্রস্থানের সময় তাদের বললেন : 'যে ব্যবহার তোমরা আমার সাথে করলে তা অবশ্যই গোপন রেখো।'

এ কথা তিনি এ জন্যই বলেছিলেন যে, কুরাইশদের পক্ষ থেকে তার প্রতি আরো বেশি নির্মম-নিষ্ঠুর আচরণের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তারা তা না করে বরং বাজারি লোকজন, উচ্ছৃঙ্খল ও বখে যাওয়া বালকবৃন্দ ও ক্রীতদাসদের তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিয়ে লোকালয় থেকে বের করে দিয়ে আসতে বলল। ফলে তারা তাকে গালি-গালাজ ও সেই সাথে সমানে পাথর বর্ষণ করতে লাগল। জায়েদ ইবনে হারিসা রসুলুল্লাহকে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজে ঢাল হয়ে গেলেন। এবার পাথর তাঁর নিজের দেহে পড়তে লাগল এবং সে আঘাতে তার মাথা ফেটে গেল। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পায়েও ভীষণ আঘাত লাগল আর প্রচণ্ড রক্তপাত হতে লাগল। এই গুণ্ডা বদমাইশরা তাদের লোকালয়ের বাইরে উতবা ও শাইবার বাগান পর্যন্ত নিয়ে গেল। ঐ বাগানের মালিক সেখানে উপস্থিত ছিল। সে ধাওয়াকারীদের ফিরিয়ে দিল। রসুলুল্লাহ একটু স্বস্তি ও শান্তির জন্য বাগানের আঙুর ঝোপের ছায়ার নিচে বসে পড়লেন। তিনি এই কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

এমনকি তিনি মক্কাবাসীর আচরণের কথাও স্মরণ করতে লাগলেন। শোক-তাপ ও দুঃখ-কষ্টের শৃঙ্খল যেন শেষ হাচ্ছিল না। সে সময় তিনি তার প্রভুর উদ্দেশে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দুআ করলেন :

'হে আল্লাহ ! আমি তোমার সামনে আমার অপারগতা, অসহায়তা ও লোকদের কাছে অপমানিত হওয়ার অভিযোগ করছি। হে মহা অনুগ্রহশীল ! তুমি সমস্ত দুর্বলের প্রভু এবং আমার প্রভু একমাত্র তুমিই। তুমি আমাকে কাদের হাতে তুলে দিচ্ছ ? কি কোনো বিরোধীদের কবলে ? যারা আমার সাথে কঠোর আচরণ করেছে ? অথবা কোনো শত্রুর কবলে, যাদের তুমি আমাকে কাবু করার সামর্থ্য প্রদান করেছ ? তুমি যদি আমার প্রতি অপ্রসন্ন না হও, তাহলে তা আমার জন্য বড় অনুগ্রহ। আমি তোমার অস্তিত্বের সেই নূরের আশ্রয় গ্রহণ করছি, যা অন্ধকারে আলোকিত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতকে আলোময় করে। আমাকে তোমার প্রকোপ থেকে বাঁচিয়ে নাও এবং তোমার ক্রোধ থেকে সুরক্ষিত রাখো। আমি তোমার প্রসন্নতা ও সন্তোষে সন্তুষ্ট এবং রাজি ! তুমিও আমার প্রতি রাজি হয়ে যাও। তুমি ছাড়া আর কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।'

বনি রাবিআর অন্তরে আত্মীয়তার আবেগ জেগে উঠল এবং সে তার খ্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাসকে ডেকে একটি পাত্র ভরতি করে আঙুর পাঠিয়ে দিলে সে সেটি রসুলের সামনে এনে রেখে দিল। তখন তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে তা খেয়ে নিলেন। আদ্দাস বলল : 'এ মুলুকে একথা বলার মতো তো কেউ নেই।' তিনি বললেন, 'তুমি কোন দেশের অধিবাসী ?' সে বলল : 'আমি ঈসায়ী। নাইনাওয়ার অধিবাসী।' তিনি বললেন : 'ইউনুস বিন মত্তার দেশে থাক ?' সে বলল : 'ইউনুস বিন মত্তাকে আপনি কীভাবে চেনেন ?' তিনি বললেন : 'তিনি আমার ভাই, তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী।' একথা শুনতেই আদ্দাস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাঁর মাথা, হাত ও পায়ে চুম্বন দিতে লাগল।

রবিআর দুই পুত্রের একজন অন্যকে বলল– 'নাও ইনি তোমার গোলামের মাথাটিও বিগড়ে দিয়েছেন।' আদ্দাস ফিরে এলে সে বলল– 'তোমার কী হলো আদ্দাস যে ঐ ব্যক্তির হাতে-পায়ে চুমু দিয়ে এলে।' সে উত্তর দিল : 'মালিক ! এ পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে ভালো লোক আর কেউ নেই।' (ইবনে ইসহাক) এবার এরা দু'জন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান ও বিরক্ত করতে লাগল। তারা যে কোনো প্রকারে তাকে তায়েফ থেকে বের করে দিতে চাচ্ছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন– সেই নগরাভিমুখে, যেখানে তাঁর প্রিয় সঙ্গীসাথিরা অবস্থান করছিলেন। কিছু তো হাবশায় হিজরত করেছিলেন আর কিছু পাহাড়ি উপত্যকাগুলোতে রয়ে গিয়েছিলেন এবং নিরন্তর দুঃখকষ্ট-যন্ত্রণা সয়ে চলেছিলেন। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশের সংকল্প নিলেন তখন জায়েদ ইবনে হারিসা নিষেধ করলেন, 'আল্লাহর রসুল মক্কাবাসীরা

তো আপনাকে বের করে দিয়েছে, সেখানে কীভাবে পুনরায় প্রবেশ করবেন ?' তিনি বললেন– 'জায়েদ ! বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ আল্লাহ বের করে দেবেন।'

তায়েফের খবর নিঃসন্দেহে মক্কায় পৌছে গিয়েছিল। অনন্তর, তিনি চিন্তা করলেন, মক্কায় প্রবেশের আগে কারো সঙ্গে নেয়া অবশ্যই জরুরি। তিনি মুতইম ইবনে আদিকে বলে পাঠালেন, তুমি কি আমাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত আছ ? যাতে আমি আমার প্রভুর প্রত্যাদিষ্ট বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছে দিতে পারি ? সে রাজি হলো। তখন তিনি নগরে প্রবেশ করলেন। তার বাড়িতেই রাত কাটালেন। সকালে মুতইম ও তার ছয় পুত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হরমে গিয়ে পৌছালেন। মুতইম তার উটনীর কুঁজের উপর বসে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল : 'কুরাইশ লোকসকল ! আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় দিয়েছি। অতএব কেউ তাকে বিরক্ত করবে না।' আল্লাহর রসুল কাবায় পৌছে দু রাকাত নামাজ পড়ে ফিরে এলেন। এ সময় তার ছয় সশস্ত্র পুত্র তাঁর দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালন করলেন। আবু জেহেল মুতইমকে জিজ্ঞাসা করল, 'আশ্রয়দানকারী ও তার অনুসারীরা কি মুসলমান হয়ে গেছেন ?' মুতইম বলল : 'না বরং আশ্রয় দিয়েছি।' আবু জেহেল বলল : 'যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ তাকে আমরাও আশ্রয় দিলাম।'

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতইমের এ উপকারের কথা স্মরণ রেখেছিলেন। অনন্তর, বদরের যুদ্ধবন্দিদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 'যদি মুতইম ইবনে আদি জীবিত থাকত এবং এই ঘৃণিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে যদি আমি কিছু করতাম তাহলে তার উপকারের কথা বিবেচনা করে এদের মুক্ত করে দিতাম।'

মুতইমও আবু তালিবের ন্যায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের ধর্মে কায়েম থাকেন। তিনি শিষ্টতা ও মর্যাদায় আবু তালিবের সমকক্ষ ছিলেন। আবু জেহেল রসুলুল্লাহকে ব্যঙ্গ করে বলল– 'এ কেমন নবী, যিনি অন্যের আশ্রয় প্রার্থনা করেন।' অর্থাৎ সে বলতে চাচ্ছিল যে, নবীকে রক্ষার জন্য ফিরিশতারা নেমে আসে না কেন ?

আবু জেহেল যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখল তখন বলল : 'ওহে আবু আবদে মনাফ ! ঐ দেখো তোমাদের নবী।' উতবা ইবনে রবিআ উত্তর দিল : 'আমাদের কেউ নবী অথবা সম্রাট হলে অন্য কারো ঈর্ষার কী কারণ থাকতে পারে ?' আল্লাহর রসুল এ প্রশ্নোত্তর শুনে খুবই খুশি হলেন এবং বললেন : 'উতবা ! তোমার মনের অজান্তে একটা সত্যি কথা তুমি উচ্চারণ করলে !' আসলে এ কথা তিনি ঈমান ও বিশ্বাসতপ্ত চিত্তে বলেননি, গোত্রগত বিদ্বেষের কারণেই বলেছিলেন। আর বললেন : 'আবু জেহেল ! সেই সময় অতি শিগগিরই এগিয়ে আসছে, যেদিন তুমি হাসবে কম, কাঁদবে বেশি। আর কুরাইশ লোকসকল !

অনতিবিলম্বেই তোমরা সেই ধর্মে আশ্রয় নেবে, আজ যাকে তোমরা ঘৃণিত বলে মনে করছ।' – ইবনে জরীর

এই সমীক্ষা থেকে একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বিষয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কী গভীর বিশ্বাস ছিল। যদিও অসংখ্য বিপত্তি তাঁকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। মক্কায় ফিরে এসে তিনি ইসলাম প্রচারের বিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী নীতি পুনর্বিবেচনা করলেন এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ নিলেন। তিনি দ্বীনের প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময়কালেই ঘটল মিরাজের ঘটনা এবং মক্কায় হইচই পড়ে গেল।

ষোল
ইসরা ও মিরাজ

ইসরার অভিপ্রায় হলো সেই অদ্ভুত ও অলৌকিক যাত্রা, যা মক্কার মসজিদে হারাম থেকে শুরু হয়ে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত হয়েছিল এবং মিরাজের অভিপ্রায় হলো এই যাত্রার পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকাশ পথে চড়া তথা ঊর্ধ্ব ভ্রমণের মাধ্যমে ঊর্ধ্বলোকের সেই অংশ পর্যন্ত পৌছানো যে বিষয়ে দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নীরব। যার বাস্তবিকতাকে কেউ জানে না। তারপর পুনরায় মসজিদে হারামে ফিরে আসা পর্যন্ত কুরআনে এই দুই যাত্রা বিষয়ে দুটি ভিন্ন সুরায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ঘটনা ও তার তত্ত্বদর্শিতার কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

'মহিমাময় সেই আল্লাহ, যিনি এক রাতে তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ)-কে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যান এবং যে বাতাবরণকে আমি বরকতময় করে দিই, যাতে আমি তাঁকে কিছু নিশানা দেখাই। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা।' – বনি ইসরাইল

মিরাজের ঘটনা ও তার পরিণামে এই আয়াতরাজি অবতীর্ণ হয়েছে :

'এবং সে তাকে আরো একবার দেখেছে, পরবর্তী সীমায় পর্দার কাছে, যার কাছে রয়েছে জান্নাত, যা অনন্তকালের ঠিকানা। যখন ছায়া হয়ে বিরাজ করছিল ঐ পর্দার উপর, যা কিছু দেখেছিল, দৃষ্টি এদিক-ওদিক হয়নি। এমনকি সামনেও না পিছনেও না। নিশ্চয়ই সে তার প্রভুর বড় বড় নিশানা দেখেছে।'– আন নজম ১৩-১৮

সুরা বনি ইসরাইলের সংখ্যক আয়াত অনুসারে ইসরার তত্ত্বদর্শিতা এটাই ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে তাঁর কিছু নিশানা দেখাতে চাচ্ছিলেন আর মিরাজের আয়াতগুলো একথাই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহারিকরূপে কিছু বিশেষ নিশানা দেখেছিলেন।

উলামাদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই এই মতভেদ পরিলক্ষিত হয় যে, এই অলৌকিক এবং অস্বাভাবিক যাত্রা কেবল রুহানী বা আত্মিক ছিল না আত্মিক ও শারীরিক উভয়ই ছিল। অধিকাংশই শেষ মতটিকে সহিহ বলে মনে করেন।

এ বিষয়ে ডক্টর হাইকেলের অদ্ভুত অভিমত রয়েছে। তিনি বলেন, এ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত উৎপন্ন হওয়া সমস্ত সৃষ্টি স্রষ্টার মধ্যে আত্মলীন হওয়ার কারণে এ হলো এক মানসিক এবং আত্মিক যাত্রা। ডক্টর সাহেবের মতে, যে সমস্ত সাংসারিক বাধাবিপত্তি আমাদের জ্ঞান ও অনুভবের মধ্যে আসতে থাকে, পরিস্থিতি, সীমা তথা অনুমান স্বতঃই সংসারে এবং এর সমস্ত তত্ত্ব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে যায় কিন্তু এ মানবশক্তির বাইরে আত্মিক অলৌকিকত্ব তথা মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ হজরত মুহাম্মদের মতো নবীর মধ্যেই হয়ে থাকে। এ আধ্যাত্মিক এবং মানসিক শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা ধর্ম ও দুনিয়ার সমস্ত বাস্তবিকতার উপর প্রকাশ হয়ে যায় এবং আজাব ও সওয়াবের প্রতিদানকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে (মুসাহিদা) দর্শন করেন।

ইসরা সত্য এবং এ তার কাছে রুহানী ছিল, ভৌতিক নয় এবং এ যাত্রা জাগ্রতাবস্থায় হয়েছিল, নিদ্রিতাবস্থায় নয়। এ কোনো সত্য স্বপ্ন ছিল না ; বরং এ ছিল বাস্তব, যে চিত্র তিনি অংকন করেছেন। এরপর ডক্টর সাহেব বলেন, এই স্থান পর্যন্ত সেই ব্যক্তিই পৌছাতে পারেন, যিনি এমন শক্তি ও সামর্থ্য রাখেন, যাঁর সাথে মানব প্রকৃতি আজও পরিচয় লাভ করতে পারেনি।

প্রকৃত বাস্তবিকতা তো এটাই যে, রুহানী ও ভৌতিক শক্তির মধ্যে সীমা, ঘন্টা ও দূরত্ব কম হতে থাকে এবং এই বস্তুকে আধ্যাত্মিক লোকে মানুষ সরলভাবে দেখতে পায় এখন তাকে ভৌতিক বা প্রকৃতি জগতে দেখাটা কঠিন নয়।

আমার বিচারে বিজ্ঞান দ্বারা যেমন-যেমন সৃষ্টির রহস্যোদঘাটন হবে তেমনি পদার্থও রুহের সমান হয়ে যাবে, যার বাস্তবিকতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতে পারেন না।

মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায় যখন সে জানতে পারে যে, পরমাণু তার নিজের মধ্যে আকাশে ঘূর্ণায়মান সূর্যচক্রের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তার নিজের মধ্যে ভয়ানক আগুন রেখে দেয়। যদি তাকে ভেঙে ফেলা হয় তাহলে সে সমস্ত সবুজ ও শুকনো বস্তুকে ভস্মীভূত করে দেবে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই যাত্রা বা উর্ধ্বগমন মিরাজ নামে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো কিন্তু এ যাত্রা কীভাবে সম্পন্ন হলো ? এমন বাহন কি তিনি পেয়েছিলেন, যা শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলতে পারত, পরবর্তীকালের লোকেরা যেমনটি আবিষ্কার করেছে ?

তিনি 'বুরাক'[১] এ চড়ে ভ্রমণ করেছিলেন, যার প্রতিটি ধাপ বা পদক্ষেপ দৃষ্টির অন্তরীণ সীমায় গিয়ে পতিত হতো, অর্থাৎ তা আলোর গতিবেগের সমান ছিল। বুরাক শব্দটি 'বর্ক' থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ বিজলি বা বিদ্যুৎ, অর্থাৎ এ যাত্রায় বিদ্যুৎগতিও বশীভূত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতিতে মানব শরীর এ পৃথিবীতে বিদ্যুৎ গতিতে চলতে পারে না। সে জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল– যা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তার ব্যবস্থাবলিকে এমন দীর্ঘ সময়ের জন্য সুরক্ষিত রাখতে পারত।

আমার বিচারে সাক্কে সদর বা হৃৎপিণ্ড ধৌতকরণ ইত্যাদি ঘটনাবলি এই বিশেষ প্রস্তুতির প্রতি ইঙ্গিত করে এবং মিরাজের ঘটনাও এ ধরনের সংকেতের ঘটনায় পূর্ণ।

ইসরা ও মিরাজের ঘটনাবলি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে ঘটে গেল। কেননা, তাঁর ব্যক্তিত্ব এই পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল, যেখানে রুহ তাঁর আলো এবং জ্যোতির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল আর তাতে শরীরের সমস্ত মলিনতা ঘুচে গিয়েছিল, এমনকি শরীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলির অনেক উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা এই শুভ যাত্রার বাস্তবিকতা ও তার সমস্ত পর্যায়ের বর্ণনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কোমল শৈলীতে বর্ণনা করেছেন, যাতে মানববুদ্ধি পদার্থ এবং রুহের সমস্ত বাস্তবিকতার জ্ঞান লাভ করতে পারে আর তাতে যে সমস্ত লক্ষণ ও শক্তি রাখা হয়েছে তাতে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যবোধ করতে পারে। অতএব, এই বিতর্ক ত্যাগ করে আমরা অধিকতর সরল এবং লাভজনক যুক্তিকে গ্রহণ করব। এই বিচারে ইসরা এবং মিরাজের ঘটনা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি কি দেখেন না যে, মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র সেই সময়েই উন্নতি লাভ করল, যখন তা রুহ বা আত্মা ও তার অর্থের বিতর্ক থেকে পৃথক হয়ে গেল।

বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ কেন করানো হলো ? এবং মসজিদে হারাম থেকেই সোজা সিদরাতুল মুনতাহা[২] পর্যন্ত একটানা নিয়ে যাওয়া হলো না কেন ? এর কী ঔচিত্য ছিল ?

এর উত্তর জানার জন্য আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হবে। নবুয়তের ধারাবাহিকতা এক যুগ আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনি ইসরাইলিদের মধ্যে নবুয়ত শেষ হয়ে গিয়েছিল। 'বাইতুল মুকাদ্দাস' ছিল অহির মূল কেন্দ্র ও সমগ্র জগতের আলোকস্তম্ভ এবং আল্লাহর অতি প্রিয়ভূমি।

---

১. এ ঘোড়ার মতো এক ধরনের বাহন। – অনুবাদক

২. সপ্তম আকাশে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে সৃষ্টির সীমা শেষ হয়ে যায়, তারপর কী আছে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না – অনুবাদক

কিন্তু ইহুদিরা যখন অহির মর্যাদা স্বীকার করল না এবং যখন এই নবুয়তরূপী সম্মানকে ছিন্নভিন্ন করে দিল এবং আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল, তখন তাদের উপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ বা ধিক্কার নেমে এল এবং এই জাতিকে চিরকালের জন্য নবুয়ত থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হলো।

ইহুদিরা এই পরিবর্তনের ফলে রোষগ্রস্ত হয়ে গেল, অনন্তর, তারা সবার আগে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালতকে অস্বীকার করল :

'কতই না নিকৃষ্ট বস্তু, যার বদলে তারা নিজেদের প্রাণ নিয়ে সওদা করল যে, আল্লাহ যে বস্তু অবতারণ করেছেন তাকে তারা জিদের বশে এই নিয়মের কারণেই মানল না যে, আল্লাহ তায়ালা তার ফজল যে বান্দার উপর ইচ্ছা তার উপরই অবতারণ করতে পারেন। তারা প্রকোপের পর প্রকোপ মাথা পেতে নিয়ে ফিরল।' – আল বাকারাহ : ৯০

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা কাজে পরিণত হলো এবং নয়া উম্মত তার কার্যভার ও প্রত্যাদেশ গ্রহণ করে সহ্য করে নিল এবং নিজেদের কার্যভার গ্রহণ করল ও হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হজরত ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালামের শিক্ষা ধারণের উত্তরাধিকারী বনে গেলেন এবং তার প্রচার এবং প্রসারের জন্য জনসাধারণকে একত্রিত করার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। অতএব, বর্তমানকে অতীতের সাথে সম্পর্কিত করতে এবং ভবিষ্যৎকে এক বাস্তবিকতায় সমন্বিত করার পরিণামে ইসলামে মসজিদে আকসা মক্কা ও মদিনার পবিত্র মসজিদদ্বয়ের পরে তৃতীয় মসজিদের মর্যাদা লাভ করল এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইসরা'য় এই মসজিদে গেলেন। এ যাত্রা ছিল ঈমানের সেই মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত, যা প্রাচীনকালের গ্রন্থাবলিতে ছিল।

তারপর এই ধরিত্রীতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবীকে একত্রিত করলেন, যাতে তারা অন্তিম নবীকে স্বাগত জানান। নবুয়ত একে অন্যকে অনুসরণ করে এবং পরে আগতদের স্বাগত জানায়। আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের নবীদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন :

'এবং স্মরণ কর যখন নবীদের (দ্বারা তাঁদের অনুসারীদের) কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হলো, আমি তোমাদের যা কিছু কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছি, অনন্তর, পুনরায় তোমাদের কাছে এক রসুল তার অনুসরণ করে আসবেন, যা তোমাদের কাছে রয়েছে, তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সহায়তা করবে। প্রশ্ন করলাম, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এতে আমার পক্ষ থেকে অর্পণ করা দায়িত্ব তোমরা পালন করবে ? তারা বলল, আমরা স্বীকার

করলাম । বললাম, তাহলে সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আছি ।' – আল ইমরান : ৮১

সহিহ হাদিসে আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবী-ভাইদের দু'রাকাত নামাজ পড়ালেন। এই ইমামত একথাই স্পষ্ট করে ঘোষণা করছিল যে, সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তাআলার শেষ প্রত্যাদেশ যা মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে পুরো করা হয়েছে এবং এর পূর্বে সমস্ত নবী এর জন্যই পথ সমতল করেছিলেন।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দ্বীনকে মর্যাদা ও সম্মান দেখানো ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই বা কোনো মর্যাদাপূর্ণ আসরে গেয়ে তা প্রতিষ্ঠা করারও প্রয়োজন নেই ; বরং এ এক প্রকৃত ও বাস্তবিকতারই বয়ান, যা সে সময়ে নিশ্চিত করে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা যখন এই পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের সুপথ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন এই পথের দিশা সঠিক সময়েই প্রকাশ পেল।

দ্বীনের দাওয়াতের যে ভারি বোঝা আল্লাহ তাআলা তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁকে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও অপপ্রচারের সুতীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝার মোকাবিলা করতে হলো। তাঁর অনুসারীদের একতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হলো। ঈমান আনয়নের পর তাঁদের সহায়-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে শান্তিতে থাকতে দেয়া হলো না এবং এই প্রত্যাদেশের পথে অন্তিম কষ্ট-যন্ত্রণাটি এল বনু সকিফ গোত্রের দিক থেকে, যারা তাঁকে প্রবল এক আঘাত দিল, তারপর পবিত্র হারাম শরিফে প্রবেশের জন্য তাঁকে এক মুশরিকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো। মানবীয় দৃষ্টিতে তাঁর এ অপমান ও অমর্যাদা আল্লাহর সামনে দু'আ ও কান্না হয়ে ঝরে পড়েছিল।

অতএব, আল্লাহ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে ও তাঁর নিয়ামতের অনুভূতি জীবিত রাখার জন্য এই আকাশ যাত্রার ব্যবস্থা করলেন, যাতে তাঁর হৃদয় স্বস্তি ও শান্তি লাভ করতে পারে আর সর্বদাই এ আভাস পেতে থাকলেন যে, তিনি সর্বক্ষণই আল্লাহর সুরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা আচ্ছাদিত আর বাস্তবিকতাও এটাই যে, যখন থেকে তাওহিদ ও ইবাদতের প্রতি জনসাধারণকে আহ্বান করতে শুরু করেন, তখন থেকেই তিনি আল্লাহর সুরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রইলেন।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন :

'যদি তোমার ক্রোধ ভেঙে না পড়ে তাহলে আমার কোনো ভয় নেই।'

ইসরার রাতেই তিনি সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারলেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা লাভ করেছেন এবং তাঁর স্থান তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে।

ইসরা ও মিরাজের ঘটনা তাঁর ২৩ বছরের রিসালাতের জীবনের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিল। এর অভিপ্রেত ছিল বিগত দিনের কষ্ট যন্ত্রণার লাঘব ও ভবিষ্যতের সাফল্যের বীজবপন।

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে আল্লাহর মহত্তম নিদর্শনাবলির মধ্য থেকে কিছু বস্তুর প্রদর্শন করেছেন কাফিরদের চালবাজি ও চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে, তাদের সম্প্রদায়গুলোকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে এবং তাদের অপকর্মগুলোকে অবগত করাতে বড়ই প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করল।

এই ভ্রমণ থেকে তাঁর বিশ্বাস জন্মাল যে, তাঁর পয়গাম বা রিসালাত জগতে প্রভুত্ব বিস্তার করবে এবং নীল ও ফোরাতের সবুজ উপত্যকাগুলোতে তাঁর শিক্ষা এই খোদায়ী শাসনব্যবস্থা কায়েম করবে এবং ইরানের অগ্নিপুজোবাদ এবং রোমের ত্রিত্ববাদকে উৎখাত করবে। শুধু তাই নয় ; বরং এঁদের উত্তর পুরুষেরা বংশ পরম্পরা ও উত্তরাধিকারসূত্রে ইসলামের অনুসারী হবে। জান্নাতে নীল ও ফোরাত নদী দেখানোর উদ্দেশ্য এটাই ছিল। এর অর্থ এই ছিল না যে, এ দুই নদীর পানি জান্নাত থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। এ তো বুদ্ধিহীন তথা মূর্খদের সাজে। উদাহরণস্বরূপ তিরমিজির একটি রেওয়ায়েত এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'যখন তোমাদের কাউকে রাইহান [১] দেয়া হয় তখন তা যেন তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না, কেননা তা জান্নাত থেকে এসেছে।'

এর অর্থ এই নয় যে, 'রাইহান' জান্নাত থেকে এসেছে ; যেখানে আমরা ক্ষেত ও বাগানগুলোতে জন্মাতে দেখি এবং ফুলও ছিঁড়তে দেখি ?

সতেরো
ইসরার হিকমত (তত্ত্বদর্শিতা)

আল্লাহ তাআলা নবী ও রসুলদের তাঁর কুদরত তথা লীলার বড় দ্যোতকগুলোর সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ প্রদান করেন, যাতে তাঁর হৃদয় ঈমান-বিশ্বাস, ইয়াকিন এবং ইতমিনান বা আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কেননা তাঁদের কাফির এবং শত্রুদের মোকাবিলা করতে হয় এবং তাঁর জমজমাট আধিপত্যের সামনে সত্যের ঘোষণা দিতে হয়।

অতএব, হজরত মূসাকে রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করার আগে আল্লাহ তাআলা তাঁকে স্বীয় কুদরতের কারিশমা দেখিয়ে দেন এবং তাঁকে আদেশ দেন, তোমার লাঠিটি মাটির উপর ফেলে দাও :

---

১. এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস। –অনুবাদক

'বললাম : হে মূসা ! ওটি ফেলে দাও। তো সে ফেলে দিল, তখন সে দেখল সেটি সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। বললাম, এটিকে ধরো এবং ভয় কোরো না। আমি এটিকে আবারো প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে দেব এবং তাকে বগলদাবা করে নাও, ওটি বিনা বাধায় একটি আলোকদণ্ডে পরিণত হবে। এ অন্য নিশানি, যাতে তোমাকে আমি আমার বড় বিশ্বাস দেখাতে পারি।' ত্বাহা : ১৯-২৩

যখন এ সমস্ত মহান এবং অদ্ভুত নিশানা দেখানোর পর তাঁর হৃদয় সন্তুষ্ট হয়ে উঠল তখন তাঁকে পুনরায় আদেশ দেয়া হলো : 'এখন তুমি ফিরাউনের কাছে যাও, সে বড় অবাধ্য হয়ে উঠেছে।' ত্বাহা : ২৪

এখন আপনি জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে মহান নিদর্শনাবলি দেখিয়েছিলেন। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, মূসার বিপরীতে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের ১২ বছর পর এ ঘটনা ঘটল। এমনটি কেন হলো ? এর কারণ ছিল অতীতের নবীদের সময়কার মুজিজার উদ্দেশ্য ছিল সম্বোধিত নবুয়তের সততার প্রতি সন্তুষ্ট করা। এ অস্বাভাবিক ঘটনাবলি তথা মুজিজা দুশমনদের অভিযোগ ও আক্ষেপের মোকাবিলায় নবীদের শক্তি যোগাত এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী এই স্তর থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল।

কুরআন প্রথম দিন থেকেই বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবীদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। রসুলের পথে মুজিজা বা অলৌকিকত্বের প্রকাশ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মানের জন্য। পরন্তু, এ থেকে ঐ ভৌতিক দার্শনিক প্রশ্নাবলির উপর আঘাত আসত না, যাকে কুরআন বৈধ বলে অভিহিত করত।

মুশরিকরা যখন দাবি করল যে, নবী আকাশে চড়ে যান, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হলো :

'বলে দাও : মহিমাময় আমার প্রভু ! আমি কি এ ব্যতীত অন্য কিছু যে, আমি মানুষও এবং নবীও ?' বনি ইসরাইল : ৯৩

কিন্তু যখন তাঁকে আকাশে ডেকে পাঠানো হলো তখন এ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না যে, এ আকাশ ভ্রমণ বিগত দাবির উত্তরেরই পরিণাম ; বরং তা ছিল রসুলের সম্মান এবং অবগতির জন্য।

আঠারো
অন্তিম ইট

ইসরা তথা মিরাজের ঘটনার দ্বারা নবীদের মধ্যে আত্মীয়তা এবং সম্পর্কের কথাও জানতে পারা যায়। এ ইসলামের সিদ্ধান্তগুলোর অন্যতম :

'রসুল সেই বস্তুর প্রতি ঈমান এনেছেন, যা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। এবং ঈমানওয়ালাও ঈমান আনলেন। এঁরা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাদের উপর এবং তাঁর গ্রন্থাদির উপর এবং তাঁর রসুলদের উপর ঈমান এনেছেন– এঁরা বলেন, আমরা আল্লাহর রসুলদের মধ্যে কারো সাথে কারো পার্থক্য করি না।' – আল বাকারাহ : ২৮৫

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভাই অন্য নবীদের সাথে সালাম বিনিময় করে সম্পর্ককে আরো গাঢ় ও দৃঢ়তর করে তুললেন। প্রত্যেক আকাশে আল্লাহ তাঁর এক এক রসুলকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌছাতেন, তখন– 'হে পুণ্যাত্মা ভাই ! তোমার আগমন শুভ হোক' বলে তাঁকে স্বাগত জানানো হতো।

নবীদের মধ্যে ভেদ বা অন্তর নিতান্তই কাল্পনিক, যা সুপথবিমুখ জাতি, জ্যোতিষী বা ধর্মব্যবসায়ীরা গড়ে নিয়েছে। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়ে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে যে, তাঁকে সেই অট্টালিকার নির্মাণ পুরো করার জন্য পাঠানো হয়েছে, যা নির্মাণে পূর্বের নবীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এর দেয়ালগুলোকে ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো হয়েছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

'আমার এবং অন্য নবীদের মধ্যে উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে একখানি অট্টালিকা নির্মাণ করেছে কিন্তু তাতে একটি ইট বাকি রয়ে গেছে, লোকেরা ঐ অট্টালিকা পরিক্রমণ করতে গিয়ে বিস্ময়ের সাথে বলতে থাকে : এখানে একটা ইট খালি কেন ? (এখানে কি আরেকটা ইট রাখা হবে না ?) আমি হলাম সেই ইট (যা দিয়ে এটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে) এবং আমি খাতামুন্নাবিইন অর্থাৎ শেষ নবী। (আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন না)।' –বুখারী, মুসলিম

ঐশ্বরীয় ধর্ম প্রসিদ্ধ, যাতে এমন কোনো ধর্ম নেই, যাতে লোকেরা সবাই হতাশ হয়নি। যেমন হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম।

এতে এমন কোনো চিন্তাধারাও নেই, যাকে অন্তিম যুগে গড়ে নেয়া হয়নি এবং পাশ্চাত্য সমাজ প্রৎসাহিত করেনি এবং সেগুলোর আহ্বায়কের সংখ্যাও দেখতে দেখতে অগণিত হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা এতে এ জন্য

উৎসাহ দেখিয়েছে যাতে পূর্বের বধস্থল বা বধ্যভূমিগুলোকে পুনরুত্থিত করতে পারে এবং তাদের নাকে দড়ি দিয়ে রেখে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে, স্বাধীন মুসলমানদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে এবং কাঙ্ক্ষিত বাতাবরণে শ্বাস নিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন : 'বাহাইয়াত' ও 'কাদিয়ানিয়াত'।

ধর্মীয় ঐক্য যদি হয় ন্যায়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংকল্প যদি থাকে শুদ্ধ, তাহলে অন্য পক্ষের শোষণের শিকার হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মতভেদ দৃঢ় করে তুলতে সমর্থ হবে।

ইসলাম যে নিজের শিক্ষাসমূহকে বিগত নবুয়তগুলোর শিক্ষার সাথে জুড়ে দেয়, তাকে সুদৃঢ় অট্টালিকায় পরিণত করতে তাকে অন্তিম ইট বলে অভিহিত করে। এ হলো সেই প্রথম ধর্ম, যা এই প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষাকে স্বাগত জানায় এবং তাকে শুদ্ধ করে তোলে।

উনিশ
প্রাকৃতিক দ্বীন

ইসরা ও মিরাজের রাতে এই দ্বীনের বিশেষত্ব এই প্রথম স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল তা হলো ইসলাম প্রাকৃতিক দ্বীন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

'... তারপর, আমার সামনে দুটি পেয়ালা নিয়ে আসা হলো, এর একটিতে দুধ, অন্যটিতে শরাব। আমি দুধের পেয়ালা তুলে নিলাম, তা দেখে জিবরাইল আমাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন, এটাই প্রাকৃতিক পথ, যার উপর আপনি এবং আপনার উম্মত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' – ইবনে হিব্বান

শান্তি তথা প্রকৃতিই হলো ইসলামের সারাংশ। কোনো অপ্রাকৃতিক বা কুপ্রাকৃতিক ব্যক্তির জন্য আকাশ-দুয়ার খুলে যাওয়া অসম্ভব। এরকম ঐ ব্যক্তির জন্যও অসম্ভব, যার মন পাপগ্রস্ত এবং হৃদয়ে কুটিলতা রাখে। দুটি প্রকৃতি হলো ঐ পীড়াগ্রস্ত চোখের সমান, যা থেকে পিচুটি ও দুর্গন্ধ ব্যতীত কিছুই বেরোয় না।

প্রায়শই এই দুর্গন্ধযুক্ত কালিমা বিভিন্ন রং ও বস্তুর মধ্যে গুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে বস্তু লোকদের সামনে প্রকট না হতে পারে তাহলে স্বয়ং আল্লাহও কি তা থেকে ধোঁকা খেতে পারেন ?

ইবাদত যখন দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের জন্য পর্দার কাজ করে, তখন এমন অশুদ্ধ ইবাদতগুলো নিকৃষ্টতম পাপ এবং গুনাহে পরিণত হয়ে যায়।

ব্যক্তি যেমন সাংস্কৃতিক উন্নতি করবে, তেমনিই লোক দেখানো কৃত্রিমতাও বাড়তে থাকবে আর প্রাণহীন ইবাদত, কঠোর পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও রীতি-রেওয়াজের মধ্যে নিজেকে বেঁধে ফেলবে।

এগুলোর অধিকাংশই কৃত্রিমতায় রূপান্তরিত হয় এবং প্রাকৃতিক সত্য ও তার আলোকে দাবিয়ে রাখে এবং তাঁর স্বচ্ছতা ও পবিত্রতাকে দুর্গন্ধময় করে তোলে।

আল্লাহর কাছে এর চেয়ে অধিকতর অপ্রিয় বিষয় আর কী হতে পারে যে, মানুষকে ধর্মের নামে অধর্মের আর প্রাণীকে এর মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে, যার সীমার মধ্যে সে দিশেহারার মতো ঘুরে ঘুরে দিশা খুঁজে ফিরতে থাকবে ?

কুড়ি
নামাজ ফরজ হয়ে গেল

মিরাজের রাতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দেয়া হলো। নামাজ আকাশের উপর ফরজ হলো, যাতে মুসলমান এর মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং এই মিরাজ তার সোপান বলে সিদ্ধ হতে পারে আর তারা কাম-বাসনা থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং দুনিয়াবি সম্পদের মোহ ত্যাগ করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা যে নামাজ ফরজ করেছিলেন তা ছিল সেই নামাযের থেকে ভিন্ন, যা আমরা পড়ে থাকি। নামাজের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো নামাজি তুচ্ছ, হীন ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং তাতে ঠিকমত অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তার মধ্যে মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ জন্মাবে এবং সে তৎক্ষণাৎ তওবা অনুশোচনা করবে। যদি পুনঃ পুনঃ নামাজ পড়া সত্ত্বেও সে এ পর্যায়ে পৌঁছাতে না পারে তাহলে সে নামাজ মিথ্যা।

নামাজ হলো পবিত্রতার সাধন[১] কিন্তু এ পবিত্রতার সাধন কেবল জীবিত ব্যক্তির দুর্গন্ধময় শবের জন্য নয়।

এই পবিত্রতা আল্লাহ ভক্তের মনের পঙ্কিলতাকে সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়। মানবজীবনে চলার পথে অত্যধিক দুর্গন্ধ ও নোংরা সামনে আসে, যা হৃদয়কে অপবিত্র করে দেয় এবং তা সাফাই করা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

---

১. হাদিসে আছে, যদি কোনো ব্যক্তির দরজার সামনে দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় এবং তাতে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করা হয় তাহলে কি শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে ? এই উদাহরণ থেকে বুঝা যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দ্বারা সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যায়। –নাসায়ী

'মানুষের জন্য তার পত্নী, তার সম্পদ, তার নফস ও প্রতিবেশী ফিতনাস্বরূপ, যা তাকে রোজা, নামাজ, সদকা ও ফিতরার আদেশ দেয়া এবং অপকর্মে বাধা দেয়া থেকে বিরত রাখে।' – বুখারী, মুসলিম

আল্লাহ ভক্তি থেকে রিক্ত-হৃদয় মোটেও লাভবান হয় না। এ দশা ঐ সময় পর্যন্ত রয়ে যায়, যতক্ষণ না সে কল্যাণের ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।

হাদিসের গ্রন্থাবলি হতে জানা যায়, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভ্রমণে সুকর্মীদের সুপ্রতিফল ও কুকর্মীদের শাস্তিদানের বহু দৃশ্য অবলোকন করেছিলেন এবং সিরাতের গ্রন্থাবলিতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, ইসরা ও মিরাজ রাত্রিবেলায় সংঘটিত হয়েছিল। যদিও এ কথা সত্য যে, সাধারণ রাতগুলোর মধ্যেকার কোনো একটি রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নাবস্থায় তাকে দেখানো হয়েছে, যেমনটি শুদ্ধ হাদিসগুলো থেকে তা সপ্রমাণিত। (বুখারীর হাদিসগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

একুশ
কুরাইশ ও ইসরা

এই শুভ রাত্রির যখন অবসান হলো তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের পুরো বৃত্তান্ত শোনালেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে নিশানাগুলো দেখিয়েছিলেন তা বর্ণনা করলেন। যারা পৃথিবীতে অহি অবতারণকে অস্বীকার করেছিল, তাদের পক্ষে কি তাঁর আকাশ ভ্রমণের কথা বিশ্বাস করা বা মেনে নেয়া সম্ভব ছিল ?

একে অন্যকে একত্রিত করে এই বিচিত্র ঘটনা তারা শোনাতে লাগল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও আশঙ্কা ছড়াতে লাগল। কিছু লোক বলল যে, তিনি যদি বায়তুল মুকাদ্দাস দেখে থাকেন তাহলে তাঁর নকশা বর্ণনা করুন।

হজরত জাবির হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

'কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করল তখন আমি হিজরের স্থানে দাঁড়িয়ে গেলাম আর আল্লাহ তাআলা আমার সামনে বায়তুল মোকাদ্দাসকে এমন প্রকট করে দিলেন, যা দেখে আমি এক এক করে সমস্ত চিহ্ন বলে দিতে লাগলাম। – বুখারী, মুসলিম

ডক্টর হাইকেল বলেন : 'যাঁরা ইসরাকে রুহানী বলে মনে করেন তাদের যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তারা তা থেকে মোটেও আশ্চর্যান্বিত হবে না। কেননা, আধুনিক যুগে বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, নিদ্রিতাবস্থায় সুদূর স্থানসমূহ ও তার ঘটনাবলি দেখা যেতে পারে। এ তো সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু যাঁদের আধ্যাত্মিক ও বাস্তবিক শক্তিকে বিশ্ব পর্যায়ের বলে মনে করা হয় এবং খোদার অনুগ্রহ ও কৃপা এই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাঁদের সামনে অনাদি ও অনন্ত দুটি কালই একইরূপে প্রকট হয়।

আমরা ঐ পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে বাদ বিবাদে অবতীর্ণ হতে চাই না, যার দ্বারা ইসরা বা মিরাজ সম্পন্ন হয়েছে। দুটিই সত্য। তা সত্ত্বেও এই ভ্রমণ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলে। অতএব তিনি স্রষ্টার প্রশংসা করলেন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও জাহিলদের ভর্ৎসনা ও মিথ্যারোপের প্রভাব তাঁর উপর থেকে কমে গেল এবং তিনি দ্বীনের প্রচারের জন্য পুনরায় যত্নশীল হলেন। তাঁর মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল যে, যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে তাঁর সাফল্য ততই নিকটবর্তী হচ্ছে।

কিছু লেখক মনে করেন যে, কিছু মুসলমান ইসরা ও মিরাজকে অস্বীকার করে বিধর্মী হয়ে যায়। এর চেয়েও অগ্রসর হয়ে ডক্টর হাইকেল বলেন, 'যখন একথা ছড়িয়ে পড়ল তখন বহু মুসলমান হতচকিত হয়ে পড়লেন' এ একেবারেই ভুল কথা। কেননা, এর সপক্ষে না আছে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ আর না আছে এর বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তথ্য। আমরা জানি না যে, কিসের ভিত্তিতে এ ধরনের কথা বলা হচ্ছে !

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতিতে দ্বীন প্রচারে আবারো গতিশীল হয়ে উঠলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তিদের অহি শোনাতে লাগলেন, বৈঠকে এবং দাওয়াতে তাঁর বার্তা প্রচার করতে লাগলেন এবং হজের দিনগুলোতে হাজিদের শিবিরগুলোতে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন, তাছাড়া উকাজ, মাজান্না ও জুলমাজাজের বাজারগুলোতে গিয়ে জনসাধারণকে দাওয়াত দিয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা মূর্তি পুজো থেকে তওবা করো এবং কুরআনের হিদায়াতকে মনোযোগ দিয়ে শোন, এক একটি গোত্রের আবাসস্থলগুলোর খোঁজ নিতে লাগলেন এবং সেখানে গিয়ে তাদের বলতে লাগলেন, তোমরা আমার উপর ঈমান আনো, আমাকে অনুসরণ করো এবং এর দাওয়াত রক্ষা করো।

তাঁর চাচা তাঁর পিছু পিছু চলত আর বলত : 'এর কথা তোমরা শুনো না, এর কথা শুনো না, এ বিধর্মী হয়ে গেছে, এ মিথ্যা বলছে।' লোকেরা উত্তর দিত :

'আপনার আত্মীয়-স্বজনরাই আপনার ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানে, তারপর তাঁর কথা আর শুনত না।'

সেই সমস্ত গোত্র, যাদের তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন, অথচ তারা তা মানতে অস্বীকার করেছিল, তারা হলো বনু ফজাবা, বনু গাসসান, বনু মুররা, বনু হানিফা, বনু সুলাইম, বনু আবস, বনু নজর, বনু কুনদা, বনু কলব, বনু উজ্জা, বনু আমির বিন সাসিয়া, বনু মুহারিব বিন হাফসা প্রমুখ।

এই গোত্রগুলো থেকে একজন লোকও তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। এর বিপরীতে যাত্রী ও স্থানীয় সকলেই তাঁর থেকে সবাইকে দূরে থাকতে উপদেশ দিত এবং তাঁর প্রতি আঙুল ইশারা করত।

বাইরের লোক তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেশে এলে তাঁর জাতির লোকেরা নসিহত করত যে, ঐ যুবকের সান্নিধ্যে যেয়ো না, তাহলে ফেঁসে যাবে।

এতসব সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সংকীর্ণ বাতাবরণে নিরাশ না হয়ে দৃঢ়তার সাথে দাওয়াতের প্রয়াস জারি রাখলেন। এমনকি, অবশেষে মক্কা ত্যাগ করার প্রস্তুতির আদেশ এসে গেল।

তৃতীয় অধ্যায়
গণ-হিজরত
(ভূমিকা এবং পরিণাম)

মদিনায় ইসলামের জোয়ার
দুই নগরের মধ্যে পার্থক্য
ইহুদিদের চক্রান্ত
বাইয়াতে আকাবা (প্রথম)
বাইয়াতে আকাবা (দ্বিতীয়)
হিজরতের অগ্রণী দল
সর্বপ্রথম মুহাজির
দার-উন-নদওয়ার কার্যক্রম
আল্লাহর রসুলও হিজরত করলেন
গুপ্ত ব্যবস্থা
সওর গুহায় কী হয়েছিল
মদিনা যাত্রা
দু'আ
মদিনায় প্রবেশ
মদিনায় বসবাস

এক

মদিনায় ইসলামের জোয়ার

মক্কায় মুশরিকরা রিসালাতকে অস্বীকার করে সদাচার এবং সৎপথের শত্রু বনে গেল এবং ঈমান আনয়নকারীদের ভয়ভীতি ও হুমকি-ধমকি দিতে এবং সৎপথ থেকে বিচলিত করে বিপথগামী করার জন্য আদাজল খেয়ে নেমে পড়ল।

গোত্রগুলোকে ইসলামে প্রবেশ করা থেকে বাধা দিয়ে তাদের মিথ্যা প্রচারে যদি তারা সফলও হয়ে যেত তাহলে কী-ই বা এসে যেত ? সত্য তো শ্রেষ্ঠই এবং পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী লোকদের তো সত্যের পথে আসতেই হবে। আর যদি সত্যের অনুসারী ও আহ্বায়ক সমস্ত বাধা-বিপত্তি ও ছলনা, কপটতা-অত্যাচার-নির্যাতনকে ধৈর্যের সাথে সয়ে নেয় এবং সত্য পথে অবিচল ও অনড় থাকে তাহলে তার বাধা দানকারীদের কি উদ্দেশ্য আর কোনো লিল্লাই বা সফল হতে পারে ?

ইসলামের জন্য আল্লাহ এমন ব্যক্তিদের নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন, যারা সেই আচ্ছাদিত বাতাবরণ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। অতএব আতঙ্ক এবং অস্থিরতায় পড়ে তাঁরা ভালোবাসা ও আত্মীয়তা লাভ করলেন এবং ব্যাকুলতা ও বিস্ময়তার পর নতুন ঘরের ঠিকানা[১] পেলেন আর তাঁরা জীবনে চলার পথের দিশা পেলেন এবং সেই চলার পথ থেকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি সরিয়ে দেয়া হলো।

এ ইনকিলাব[২] হজের দিনগুলোতে মদিনা থেকে আগমনকারী প্রতিনিধিদের দ্বারা কার্যকর হলো।

মদিনার অধিবাসীরা ইহুদিদের প্রতিবেশী ও একত্ববাদী আকিদার সাথে সুপরিচিত হওয়ার কারণে সমস্ত আরব গোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। অধিকাংশ ইহুদি তাদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করত এবং মূর্তিপূজো করার জন্য তাদের নিন্দা করত।

---

১. এ ঠিকানা এ যুগের কবির কথায় যেন এরকমই : 'কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই। দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু পরকে করিলে ভাই ॥' এ তো ইসলামের ভ্রাতৃত্বেরই অনুরূপ।—অনুবাদক

২. বিপ্লব

তর্ক-বিতর্ক বাড়তে বাড়তে এক সময়ে পরস্পর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে গেলে ইহুদিরা বলত, ঘাবড়িয়ো না, অনতিবিলম্বেই আমাদের মধ্যে একজন নবী আসবেন, তখন আমরা তাঁর অনুসারী হব। তখন আমরা তাঁর সাথে যোগ দিয়ে তোমাদের আদ ও ইরম জাতির লোকদের মতো নিপাত করে দেব।

কী বিচিত্র ব্যাপার যে, সবার আগে ইহুদিরাই সেই নবীকে অস্বীকার করল, অনন্তর, কুরআন প্রতিকূল ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলল :

'আর যখনই আল্লাহর পক্ষ হতে এক কিতাব অবতীর্ণ হলো, যারা তাঁর পায়রবি করে এবং যা থেকেই কাফিরদের মোকাবিলায় বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করত। তারপর, যখন এই পর্যন্ত তাদের কাছে এসে গেল, যার সাথে তারা আগে থেকেই পরিচিত ছিল, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল।' – আল বাকারা : ৮৯

যে আরবদের ইহুদিরা নতুন পয়গম্বর আসার হুমকি দিয়েছিল, সেই আরবরাই তাঁর বার্তা ও শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হলো।

যখন হজের সময় এল তখন মদিনার গোত্রগুলো মক্কায় এল এবং তারা যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তাঁর বার্তা শুনল তখন তাদের মধ্যকার কেউ একজন বলল :

'আল্লাহর কসম ! হে আমার কওমের লোকসকল ! তোমরা জান যে, ইনিই সেই নবী, যাঁর আগমনের কথা বলে ইহুদিরা আমাদের হুমকি-ধমকি দেয়। দেখো, তারা যেন আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হতে না পারে।'

মদিনায় ইসলাম শনৈঃ শনৈঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যদি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ইসলাম ছড়িয়ে না পড়ত তাহলে বাধা দেয়া সত্ত্বেও তার গতি রোধ করা সম্ভব হতো না।

ঘৃণা ও বিরোধের যে কথা ইসলাম মক্কায় অনুভব করেছিল তা এখানে সম্মান ও জনপ্রিয়তায় পরিবর্তিত হয়ে গেল আর ইসলামের নতুন সাথিদের কাছে সে শুভবার্তা পৌঁছানোর তিন বছর কাল অতিক্রান্ত হতে না হতেই তা তাদের জন্য এক মজবুত দুর্গ ও নিকটতম আত্মীয় বনে গেল।

দুই
দুই নগরের মধ্যে পার্থক্য

মক্কার অধিবাসীরা সুদীর্ঘকাল যাবৎ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করে আসছিল। খুবই স্বস্তি ও শান্তির জীবন ছিল তাদের। অন্নের দ্বার তাদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল দুটি :

১। মক্কার অধিবাসীদের বাণিজ্যিক দক্ষতা।

২। হরম (কাবা)-এর ধর্মীয় গুরুত্ব।

উপরোক্ত কারণই ছিল এই নগরের উপর কল্যাণ ও প্রাচুর্য বর্ষণের মূল কারণ। এমনকি এখানকার লোকেরা মূলত এই কারণেই অনিয়ন্ত্রিত ও ইতর হয়ে উঠেছিল। তারপর তাদের মধ্যে সমস্ত রকমের বিকার ও ব্যাধি জন্মে গেল যেমনটি প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মাতে দেখা যায়। এটা হয় মূলত ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির কারণে প্রতিষ্ঠিত বা মদমত্ত হওয়ার কারণে। অহঙ্কারী, হঠকারিতা, কঠোর হৃদয়তা, নির্মমতা ইত্যাদি রোগ তাদের মধ্যে জন্মে গিয়েছিল। যখন ইসলাম এল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের বার্তা শোনালেন তখন তিনি তাদের শত্রু হয়ে গেলেন। প্রারম্ভেই তাদের ব্যবহারে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা বেরিয়ে এল। তারা ঘোষণা করে দিল, যদি ইসলাম গ্রহণ করা হয় অথবা ইসলামকে বাঁচতে দেয়া হয় তাহলে এই নগরের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং মূর্তিপুজোর একমাত্র রাজধানীটি ধ্বংস হয়ে যাবে, মূর্তিদের রমরমা বন্ধ হয়ে যাবে এবং হাজি ও অতিথিদের সাহায্যের ধারা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ বিশ্বাস স্থাপন করানোর চেষ্টা করলেন যে, সত্যকে স্বীকার করে নিলে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও মান-প্রতিষ্ঠায় তার কোনো আঁচড় পড়বে না, কিন্তু কাফিররা অনড় রইল :

'এবং তারা বলল : যদি আমরা এই পথ অনুসরণ করি তাহলে এ ভূমি থেকে আমাদের উৎখাত করা হবে। আমি কি এখানে তাদের এক শান্তিপূর্ণ হরমে স্থান দিইনি, যার আকর্ষণে প্রতিটি উৎপন্ন বস্তু চলে আসে, আমার পক্ষ থেকে জীবিকা। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তা মানে না।' –আল কাসস : ৫৭

মক্কার নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ঐ আলোচনা করেছে। কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতা আরো বাড়তে লাগল এবং ইসলামকে নিজেদের ভৌতিক উন্নতির পথের প্রতিবন্ধক মনে করল এবং আরো কঠোরভাবে শত্রুতা করতে লাগল। অনন্তর, পবিত্র কুরআন তাদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করল :

'আর কতই লোকালয় না আমি উজাড় করে দিয়েছি, যারা তাদের জীবনাচরণে বড়ই ইতর হয়ে উঠেছিল। অতএব (দেখো), এসব হলো তাদের (উজাড় হয়ে যাওয়া) ঘরবাড়ি যাতে তাদের অতি অল্প মাত্রই অবশিষ্ট রয়েছে আর আমিই তাদের উত্তরাধিকার করেছি।' -আল কাসস ৫৮।

কিন্তু মদিনার মামলাটি ছিল ভিন্ন। ওখানকার অধিবাসীদের পারস্পরিক হানাহানি ও বিদ্বেষ তাদের দুর্বল করে তুলেছিল। তাদের ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, পরস্পরের মধ্যে উস্কানি পাওয়া এ যুদ্ধ তাদের দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছিল, যে কারণে সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা বড়ই দুঃখিত ছিল এবং তা থেকে তারা বেরিয়ে আসার কামনা করছিল। আউস এবং খাজরাজ– যারা একই গোত্র

ছিল, মদিনায় এই বিদ্বেষেরই সাজা ভোগ করতে লাগল এবং তাদেরই হিংসা-বিদ্বেষ তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে চলেছিল। তারা তাদের সন্তানদেরও এই ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলত। আর এই বিদ্বেষ বাষ্প ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করত ইহুদিরা।

তিন
ইহুদিদের চক্রান্ত

মদিনায় যে ইহুদিরা বসবাস করত তারা ঐ সমস্ত অত্যাচারের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করে এই উপদ্বীপের গ্রাম এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এরা প্রাচীনকাল থেকেই নিজেরা ঈসায়ী হওয়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল এবং উল্টো ঈসায়ীদের ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কেননা, ঈসা এবং তাঁর মাতা সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা ছিল খুবই ভ্রান্ত। ঈসায়ীরা মনে করত ঈসা আলাইহিস সালামকে ইহুদিরাই হত্যা করেছে এবং তাঁকে হত্যার জন্য এরাই দায়ী।

নিঃসন্দেহে ইহুদিরা অত্যন্ত চালাক জাতি, এরা যেখানেই গিয়েছে সেখানকার অর্থনীতিকে কব্জা করার চেষ্টা করেছে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সব রকমের ছলনা ও কপটতার চাল নিঃসঙ্কোচে প্রয়োগ করেছে। তারা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করত। তারা একথা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, যদি তারা আরবদের মধ্যে মিশে যায় তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব, তারা তাদের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করতে লাগল এবং তারা সর্বদাই এই কাজের মধ্যে ততক্ষণ ব্যস্ত থাকত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার একটা দুষ্পরিণাম বেরিয়ে আসে এবং পরস্পরের জানী-দুশমন না হয়ে যায়। যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে একটানা চলে আসছিল এবং তা থেকে মুক্তির কোনো উপায়ই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আর ইহুদিরা এসব যুদ্ধের কারণে শক্তিশালী পুঁজিপতি বনে রইল। তাদের সহায়-সম্পত্তি বেড়ে চলছিল। তাদের দুর্গগুলো মজবুত হয়ে উঠছিল এবং তারা প্রভুত্ব কায়েম করে ফেলেছিল, যার ফলে লোকেরা তাদের ভয়ের দৃষ্টিতে দেখত।

হিজরতের কয়েক বছর আগেই 'আউস' ও 'খাজরাজ' গোত্রের মধ্যে 'বুয়াস'-এর ভীষণ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে 'খাজরাজ' গোত্র জিতেছিল, পরে যুদ্ধের গতি ঘুরে গিয়ে আউসরা বিজয় ও প্রভুত্ব লাভ করেছিল। দু'পক্ষই একে অন্যের এত বড় শত্রু হয়ে গেল যে, তারা একে অন্যের উৎখাত করার জন্য

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হলো। অনন্তর বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অগ্রসর হলেন এবং দু' পক্ষকে উপদেশ ইত্যাদির মাধ্যমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করালেন এই মর্মে যে, তোমাদের এবং তোমাদের ভাইদের জীবন অতি মূল্যবান, তোমরা শত্রুতা ত্যাগ কর। কেননা তোমরা এবং তোমাদের প্রতিযোগীরা এই ইহুদি নামক নেকড়েদের চেয়ে অধিক উত্তম।

মদিনাবাসী যখন ইসলামের শুভবার্তার কথা জানতে পারলেন তখন তাঁরা নিরন্তর রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামের মধ্যে এলেন এবং কল্যাণের কিরণমালা দেখতে পেলেন। কে জানে, এই নতুন ধর্মই তাদের জীবনকে সতেজতায় পূর্ণ করে তুলবে না এবং তাদের সামগ্রিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনবে না এবং এমন আধ্যাত্মিক জীবন তারা লাভ করবে, যা ইহুদিদের মোকাবিলায় তাদের সামগ্রিক শক্তি অনেক বাড়িয়ে দেবে ?

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনের প্রভুত্ব চাইলেন, নিজের নবীকে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন এবং নিজের অঙ্গীকার পুরো করতে চাইলেন, তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজের দিনগুলোতে বেরিয়ে পড়লেন এবং কিছু আনসারীর[১] সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আকাবা উপত্যকায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে খাজরাজের একটি দলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো, যাদের দ্বারা আল্লাহ মঙ্গল ও কল্যাণের সংকল্প করিয়েছিলেন। তারপর বর্ণনাকারীর কাছে আসিম বিন উমর বিন কাতাদা তাঁর গোত্রের শেখদের মাধ্যমে বয়ান করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা কারা ? তারা বলে : আমরা খাজরাজ গোত্রের লোক। তিনি বললেন : তোমরা কি আমার কাছে একটু বসবে, আমি তোমাদের সাথে একটু আলাপ করি। তারা বলল : অবশ্যই। অতএব, তারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসল। তিনি তাঁদের আল্লাহর বার্তা শোনালেন, ইসলাম পেশ করলেন এবং কুরআন শোনালেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তারা তাঁর কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনল, সন্তোষ লাভ করল এবং তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল। তাঁকে স্বীকার করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর তারা নিবেদন করল, 'আমরা আমাদের জাতিকে এমন একটা অবস্থায় রেখে এসেছি যে, বর্তমানে তাদের মতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জাতি আর কেউ নেই। আমাদের জাতিতে পারস্পরিক হানাহানি, বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে, আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলুন।

---

১. মদিনাবাসী।

আমরা তাদের কাছে এ শুভবার্তা বয়ে নিয়ে যাব, তারপর এ নতুন ধর্ম তাদের কাছে পেশ করব, যা আমরা গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্ যদি তাদের আপনার সাথে একত্রিত করে দেন তাহলে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ হতে পারবে না।'

এরপর এরা আপন নগর মদিনায় চলে গেলেন। এঁরা ঈমান এনেছিলেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁর অনুসারী হয়ে গিয়েছিলেন।

এঁরা ছিলেন মদিনায় ইসলামের অভিপ্রচারের অগ্রবর্তী একটি দল। এঁদের প্রচেষ্টা শীঘ্রই সাফল্য লাভ করল। এমন কোনো ঘর অবশিষ্ট রইল না, যেখানে ইসলাম প্রবেশ করল না। এর এক বছর পর হজের মওসুমে মদিনা থেকে ১২ জন মুসলমান হজ করতে এলেন, এঁদের মধ্যে ছয়জন গত বছর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। এঁরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একত্রিত হয়ে ইসলামের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন।

চার
বাইয়াতে আকাবা (প্রথম)

রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার অধিবাসীদের সাথে আকাবা উপত্যকায় সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে আল্লাহর পথে ঐক্যবদ্ধ হতে, ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হতে এবং অবৈধ ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড হতে আত্মরক্ষার অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

হজরত উবাদা ইবনে সামিত রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা প্রথম বাইয়াত[১] আকাবার রাতে নিম্নলিখিত বিষয়ে করেছিলাম :

'আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করব না, কারো বিরুদ্ধে সামনে বা পিছনে কুৎসা রটনা করব না এবং কোনো সুকর্মে রসুলুল্লাহকে অবজ্ঞা করব না।'

তারপর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

'যদি তোমরা তোমাদের এই অঙ্গীকার পুরো কর তাহলে তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত আর যদি অবৈধ কাজগুলোর মধ্যে তোমরা কোনো কাজ কর তাহলে তার দণ্ড তোমাদের দুনিয়ায় দেয়া হলে তা হবে তোমাদের জন্য কাফফারা

---

১. বাইয়াত– অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা।

বা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। আর যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা তা থেকে রেহাই পাও তাহলে কিয়ামতের দিন তোমাদের বিষয়টি আল্লাহর কাছে উত্থাপিত হবে, তা তিনি ক্ষমা করুন বা দণ্ড দিন।'—বুখারী-মুসলিম

এ ছিল সেই বার্তা, যা আল্লাহর রসুল শুনিয়ে চলেছিলেন আর জাহিলিয়াত[১] নিরন্তরভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে চলেছিল। এ সমস্ত বাইয়াত তারাই অস্বীকার করতে পারে, যারা আপামর জনসাধারণকে ভ্রান্তি ও আশঙ্কার মধ্যে ফেলে ধরণীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায়।

আনসাররা এ অঙ্গীকার পুরো করলেন, তারপর মদিনা অভিমুখে রওনা হলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত নিলেন কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাদের সাথে মদিনায় পাঠাবেন, যাতে সেখানে ইসলামের প্রচারকাজ গতিলাভ করতে পারে ও মদিনাবাসীকে কুরআন শিক্ষা দিতে পারেন এবং তাদের ইসলামী শিক্ষায় আচ্ছা রকম শিক্ষিত করে তুলতে পারেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দেয়ার জন্য তাঁর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হলো মুসআব বিন উমাইর রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর এবং তিনি তাঁকে তাঁদের সাথে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন।

হজরত মুসআব ইসলাম প্রচারে ও জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেন। তাঁর কাছে আগত ব্যক্তিরা যেন সমস্ত কাঠিন্যকে জয় করার প্রেরণা লাভ করতে লাগল, আর তিনি বিপথগামী ও বিভ্রান্ত লোকদের ইসলামের পথে এক নতুন ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন, যাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে আচ্ছাদিত অথচ তাদের মধ্যে ঈমান, আমল, সদাচরণ নৈতিকতা সবই অবচেতন অবস্থায় বিরাজ করছে।

মুসআব রাজিয়াল্লাহু আনহুকে ঐ সমস্ত বেতনভুক্ত পাশ্চাত্য ধর্ম প্রচারকারীর সাথে মিলিয়ে দেখুন, যাদের সামনে রেখে পাশ্চাত্য সম্রাজ্যবাদীরা প্রাচ্যের দেশগুলোতে সাম্রাজবাদী থাবা বিস্তার করেছে। আমরা এই খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের দেখি যে, প্রত্যেক রোগীর খাটিয়ারই নিচে তারা একটি করে বোতল রেখে দেয় এবং তারা তাকে বোঝায় যে, এ কুমারী মাতা মরিয়ম তার জন্য পাঠিয়েছে এবং এ খাটিয়া মসিহ তাদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা এক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছে যেগুলোর বাহ্যিক উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার করা, অথবা কোনো ধর্মশালা বা অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রচার করেছে বিশুদ্ধ কল্যাণ ও পরহিতই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু এর

---

১. জাহিলিয়াত– কুফরি বা মূর্খতাপূর্ণ জীবনাচরণ, হাতে গড়া মূর্তির কাছে যারা আত্মসমর্পণ করে নিজেদের মনুষত্বকে কালিমালিপ্ত করে। – অনুবাদক

পরে যে কী হয়, শিক্ষা-দীক্ষা নিতে আসা বালক-বালিকারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায় এবং তারা সম্পূর্ণ তাদের অধীনস্ত হয়ে যায়।

এ হলো সেই আধ্যাত্মিক চুরি, যা ধর্ম প্রচারের নামে জারি রয়েছে। যারা সেখান থেকে শিক্ষালাভ করবে তারা তাদের সমস্ত কার্যক্রম, সাহস, হেদায়েত ঐ সমস্ত দেশ থেকে লাভ করে, যাদের তারা সেখানে পাঠায়। যদি আপনি তাদের রুচিও দেখেন তাহলে তাদের শক্তির দম্ভকে কখনোই ভুলবেন না, যারা জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বত্রই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

হজরত মুসআব রাজিয়াল্লাহু আনহুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মজলুম নবী-ব্যক্তিত্ব ও সমসাময়িক কালের প্রচলিত বিধিবিধানের বিপরীত রিসালাত, যার কাছে লোভী ও ভাগ্যান্বেষীদের ভাগ্য রাতারাতি বদলে দেয়ার ও সম্পদের লোভে মোহিত করে দেয়ার কোনো হাতিয়ার বর্তমান ছিল না। সম্পদ বলে যদি তাঁর কাছে কিছু থেকে থাকত তা ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং বিবেক। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং এই ভাবনাই তাদের ধন-সম্পদ, সম্মান এবং পদমর্যাদাকে আল্লাহর পথে কুরবান করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। যখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন তখন তাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেত এবং নতুন দ্বীনের প্রতি তারা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে যেতেন।

হজরত মুসআব হজের আগে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন যাতে তাঁর কাছে শুভ সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন যে, মদিনায় ইসলাম কী অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং কত বেশি সংখ্যক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা তাঁরা সন্তোষ লাভ করেছেন এবং তাদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে গেছে। অনতিবিলম্বেই হজের অবসরে তাদের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ হবে, যা তাঁর চোখ জুড়িয়ে দেবে।

পাঁচ
বাইয়াতে আকাবা (দ্বিতীয়)

যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে তাদের নিকটতম ইতিহাস এবং সে পথে আগমনকারী ভয়ানক উপত্যকাগুলোর সাথে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁরা বড়ই দুঃখ অনুভব করছিলেন যে, তাঁদের ভাইয়েরা মক্কায় অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনাতিবাহিত করছেন এবং তাঁদের নবী আল্লাহর প্রতি আহ্বান

জানানোর জন্য বাড়ি থেকে বের হন কিন্তু কুফরি অবজ্ঞা ও বিমুখতা ছাড়া আর কোনো উত্তর তিনি পান না। হজের সংকল্প নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হওয়ার সময়ে তারা পরস্পর প্রশ্ন করলেন : আমরা আর কতকাল আল্লাহর রসুলকে মক্কায় পাহাড়ি উপত্যকায় ফেলে রেখে মদিনায় নিশ্চিন্তে অবস্থান করব ? ভয় ও আতঙ্কের এই অবস্থা আমাদের উপর আর কতকাল ধরে বিরাজ করবে ? ঈমান এই যুবকদের সমস্ত সত্তার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, ঈমানের উত্তাপে অনুপ্রাণিত এ যুবকরা তাঁদের সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁরা চাচ্ছিলেন দাওয়াত ও তার আহ্বায়কের চারপাশে অবস্থান করে অত্যাচারের অবরোধগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে।

'হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমাদের মধ্যেকার সত্তর ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং আকাবা উপত্যকায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করলেন এবং তাঁর কাছ থেকে সময় নিলেন। আমরা একে একে ঐ উপত্যকায় গিয়ে একত্রিত হলাম। আমরা নিবেদন করলাম : হে আল্লাহর রসুল ! আমরা কোন কথার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব ? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে, ভালো এবং মন্দ–উভয় পরিস্থিতিতেই আমার হুকুম শুনতে এবং আদেশ পালন করতে প্রস্তুত থাকবে এবং সম্পন্ন হও বা দুর্দশাগ্রস্তই হও সকল পরিস্থিতিতেই সম্পদ ব্যয় করবে, সৎ কর্মের আদেশ দেবে, অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর পথে সর্বদাই সত্য কথা বলবে, কোনো নিন্দাকারীর নিন্দার ভয়ে ভীত হবে না, আর তোমরা এই মর্মে শপথবদ্ধ হও যে, আমি যখন তোমাদের ওখানে চলে আসব তখন তোমরা আমাকে ঐ সমস্ত বস্তুর চেয়ে বেশি সহায়তা ও নিরাপত্তা দেবে, যেমনটি তোমরা তোমাদের জীবন ও সন্তানদের ক্ষেত্রে দিয়ে থাকো, এর প্রতিদানে তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত।'

'এরপর আমরা উঠে তাঁর প্রতি অগ্রসর হলাম এবং আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে কম বয়সী যুবক আসাদ ইবনে জুরারা তার হাত নিজের হাতের সাথে ধরে রাখলেন এবং বললেন : 'মদিনাবাসীগণ ! একটু শোনো, আমরা উটের মতো দল বেঁধে এঁর কাছে ছুটে এসেছি শুধু এজন্যই যে, ইনি আল্লাহর রসুল এবং আজ এঁকে এখান থেকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো সমগ্র আরব উপদ্বীপের বিরুদ্ধে শত্রুতার মোকাবিলা করা। এর পরিণামে তোমাদের যুবকরা নিহত হবে এবং তরবারিগুলো রক্তস্নান করবে। অতএব, তোমরা যদি তোমাদের অন্তর থেকে এসবের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি ও প্রেরণা অনুভব করো তাহলেই তাঁর হাতে হাত রাখো এবং এর সুপ্রতিফল আল্লাহর অধিকারে। কিন্তু যদি

তোমরা প্রাণের ভয় অনুভব করো তাহলে সময় আছে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও এবং নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করো, আল্লাহর কাছে এটাই বরং গ্রহণীয় হবে।'

অতএব, সকলেই সমস্বরে বললেন : 'হে আসাদ ! আমাদের উভয়ের মধ্য থেকে আপনি সরে যান ; আল্লাহর কসম, আমরা এ প্রতিশ্রুতি কখনোই পরিত্যাগ করব না এবং আমরা তাঁর দিক থেকে কখনোই হাত গুটিয়ে নেব না। তারপর একে একে সবাই প্রতিজ্ঞা[১] করলেন।' – আহমদ, বাইহাকী, হাকিম

কা'ব বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেন, আমরা আকাবার রাতে আমাদের শিবিরে সাথিদের সাথে ঘুমিয়েছিলাম। এক-তৃতীয়াংশ রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা গোপনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে চললাম। কেননা, আমরা আমাদের জাতির মুশরিকদের কাছে এই বিষয়টি গোপন করতে চাচ্ছিলাম। অনন্তর আমরা আকাবা উপত্যকায় একত্রিত হলাম, আমরা মোট ৭৩ জন ছিলাম। আমাদের সাথে সুমাইয়া বিনতে কাব ও আসমা বিনতে আমর ইবনে আদি নামক দুই মহিলা ছিলেন।

আমরা সেখানে উপস্থিত হলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে মুত্তালিবকে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, সে সময় পর্যন্ত আব্বাস পুরাতন ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি তার ভাইপোর মদিনায় যাওয়ার আগে সমস্ত কথা পাকা করে নেয়ার জন্য এসেছিলেন। অতঃপর, সবার আগে আব্বাস বার্তা শুরু করলেন। তিনি বললেন :

'খাজরাজের লোকসকল ! আমাদের এখানে মুহাম্মদের যে স্থান তা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। আমার সহধর্মীদের মোকাবিলায় এখনো পর্যন্ত তিনি সুরক্ষা ও নিরাপত্তার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন এবং এখনো পর্যন্ত এ শহরে তিনি যথেষ্ট মজবুত অবস্থায় রয়েছেন। পরন্তু, এখনো ইনি তোমাদের ওখানে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু পছন্দ করছেন না। এখন যদি তোমরা তোমাদের শপথ পুরো করতে প্রস্তুত থাকো, যার উপর ভিত্তি করে তোমরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ এবং বিরোধীদের সমস্ত শত্রুতার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছ এবং যার দায়দায়িত্ব নিজেদের অধিকারে নিতে চাচ্ছ নাও, কিন্তু এখান থেকে এর চলে যাওয়ার পর এবং তোমাদের সাথে বসবাসের পরে যদি তোমরা কোনো রকমের আশঙ্কা এবং অসুবিধা বোধ করো যে তাঁকে ত্যাগ করতে অথবা শত্রুদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হওয়ার মতো পর্যায়ে পৌঁছে যাও, তাহলে এখনই তাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়াটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল। কেননা স্বজাতি ও স্ব-নগরে এখনো তিনি যথেষ্ট মজবুত অবস্থানে রয়েছেন।'

---

১. প্রতিজ্ঞা– বাইয়াত, শপথ, অঙ্গীকার।

কা'ব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমরা আপনার কথা শুনলাম, এখন আপনি আদেশ দিন এবং আমাদের কাছ থেকে যে প্রতিজ্ঞাই চান, করিয়ে নিন। অনন্তর, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত করলেন, আল্লাহর প্রতি আমন্ত্রিত করলেন, ইসলামের প্রতি প্রবৃত্ত করলেন, তারপর বললেন :

'আমি তোমাদের কাছ থেকে সেই অঙ্গীকার গ্রহণ করছি যে, তোমরা আমাকে ততটাই সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দেবে যেমনটি তোমাদের সন্ততিদের দিয়ে থাক।'

হজরত কাব বর্ণনা করেন : বরা ইবনে মারুর রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাত নিজের হাতে রেখে বললেন :

'অবশ্যই, সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমরা আপনাকে সেই সমস্ত বস্তু থেকে রক্ষা করব, যাদের থেকে আমরা আমাদের প্রাণ ও সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা করি। অতএব, হে আল্লাহর রসুল ! আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হোক, আমরা যুদ্ধকুশলী, যা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি।'

মাঝখানে কথা কেটে দিয়ে আবুল হাইসাম বিন আতাইহান বললেন : 'হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমাদের এবং অন্যদের অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রয়েছে, আমরা তা অবিলম্বেই সমাপ্ত ঘোষণা করতে চলেছি। এরপর কখনো এমনটি হবে না যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে প্রভুত্বব্যঞ্জক অবস্থান দান করলেন আর আপনি আমাদের ত্যাগ করে স্বজাতি ও স্বদেশে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন ?'

উল্লেখকর্তা বলেন, রসুলুল্লাহ হেসে ফেললেন এবং বললেন :

'না ! বরং রক্তের সাথে রক্ত এবং কবরের সাথে কবর। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। যাদের সাথে তোমাদের বিরোধ তাদের সাথে আমারও বিরোধ, যাদের সাথে তোমাদের সন্ধি তাদের সাথে আমারও সন্ধি।'

যখন সব কিছু নিশ্চিত হয়ে গেল তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে আমাকে ১২ জন প্রধান ব্যক্তিকে দাও, যারা নিজ নিজ গোত্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। এই আদেশানুসারে ১২ ব্যক্তিকে নির্ধারিত করা হলো, খাজরাজ গোত্র থেকে নয়জন এবং আউস গোত্র থেকে তিনজন। আল্লাহর রসুল তাঁদের বললেন :

'তোমরা তোমাদের জাতির জন্য এতটাই দায়িত্বশীল হও, ঈসা ইবনে মরিয়মের সহযোগীরা যতটা দায়িত্বশীল ছিলেন।' – ইবনে ইসহাক, আহমদ

এই হলো বাইয়াতে আকাবা ও তার মধ্যেকার প্রতিজ্ঞা ও বার্তারাজি।

সেই সময়ে লোকদের উপর বিশ্বাস, দায়িত্বশীলতা ও আত্মদানের রুহ পুরো বাতাবরণকে আচ্ছাদিত রেখেছিল, যা তাদের প্রতিটি কথার সাথে টুপিয়ে টুপিয়ে

পড়ছিল। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আবেগপূর্ণ ভাবালুতা এই বার্তা ও প্রতিজ্ঞাবলির প্রেরণা ছিল না ; বরং ভবিষ্যতের প্রতি তাদের দৃষ্টি ও ভ্রান্তিপূর্ণ সুফলপ্রাপ্তির আগে সম্ভাব্য বিপদাপদের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল।

লাভ কিংবা হিত ? এই বাইয়াতে হিতের প্রশ্ন ছিলই না। সমস্ত বিষয়টিই শুদ্ধ মন ও বিশুদ্ধ দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতেই হয়েছিল।

এই ৭০ ব্যক্তি ইসলামের প্রচারকার্যে মনোনিবেশ করলেন এবং স্বাধীন চিন্তাধারা ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ আনজাম দিতে লাগলেন।

এরা মদিনায় ঈমানের উত্তাপ সৃষ্টির জন্য ত্যাগ ও আত্মদানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর আহ্বায়কের দাওয়াতে উপস্থিত হয়েছিলেন, যদিও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের পরিচয় ছিল অতি অল্পই। ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত, এই পরিচয়ও সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ কথা উপেক্ষা করা সম্ভব নয় যে, বীরত্ব ও আত্মবিশ্বাসের এই শক্তির মূলে প্রেরণা শক্তি ছিল কুরআন, যদিও অন্তিম বাইয়াতের আগে আনসাররা রসুলুল্লাহর সান্নিধ্য অতি অল্পই পেয়েছিলেন। অতএব, আকাশ হতে আগত অহি তাঁদের সুপথ প্রদর্শনে আলোকিত রেখেছিল এবং তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যকেও স্পষ্ট করে দিয়েছিল।

মক্কায় কুরআনের প্রায় অর্ধেক অংশই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তা হাফিজদের মুখে মুখে ধারাবাহিকভাবে আবৃত্ত হয়ে চলেছিল আর সেই সাথে অহি লেখকরা তা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের অংশগুলোতে আখিরাতের জীবনচিত্র চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল।

মুসলমানদের হাত জান্নাতের ফল লাভের জন্য অগ্রসর হতে লাগল। সত্য পথের পথিকরা যে কোনো মুহূর্তে সত্য ও সুন্দরের প্রতি দায়িত্বশীলতার চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে এবং আত্মত্যাগের ভাবনায় এতটা উন্মত্ত হয়ে উঠতেন যে, সেই দ্বীপের উত্তপ্ত বালুকণা থেকে জান্নাতের লহর ও মোহরবন্ধ শরাবের স্বর্গীয় বাতাবরণে পৌঁছানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। কুরআন অতীত মুসলমানদের বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে যে, মুমিনরা কী রকম বিশুদ্ধ আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন এবং সমকালীন রসুলদের সাথে মুক্তি পেয়েছেন। এবং কী প্রচারে কাফিররা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের আশ্রয় নিয়েছে এবং কীভাবে তারা সত্যের বিরোধিতায় চরম উন্মত্ততার সাথে সীমা লংঘন করে গিয়েছে। তারপর আল্লাহর ন্যায়পূর্ণ সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ হলো এবং অত্যাচারীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, পড়ে রইল তাদের ধ্বংসাবশেষ এবং তারা তাদের বিধ্বস্ত লোকালয়গুলো ছেড়ে চলে গেল।

এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান এবং ইসলামকে ভিত্তি করে পূর্ব এবং পশ্চিমের মুসলমানদের প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন।

যদিও মদিনার মুসলমানরা মক্কার মুসলমানদের সাথে পরিচিত ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সহানুভূতি, স্নেহ, অনুগ্রহ ও ভালোবাসার ফুল বর্ষণ করত, তাদের পক্ষাবলম্বন করত, অত্যাচারীদের প্রতি রোষ প্রকাশ করত এবং তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। আনসাররা [১] যখন মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখন থেকে মক্কায় ঐ মুসলমানদের জন্য তারা ভালোবাসা, সহানুভূতি ও অনুকম্পার গভীর মনোভাব পোষণ করতেন অথচ তাঁরা তখনো তাঁদের কাছে অপরিচিত ছিলেন।

আবু মূসা আশআরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

'লোকসকল ! শোনো এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করো আর জেনে রাখো যে, আল্লাহর এমনকিছু বান্দা আছে, যারা না নবী না শহীদ কিন্তু আল্লাহর সমীপে তাদের স্থান, পদ এবং নৈকট্য নবী ও শহীদদেরও ঈর্ষান্বিত করবে।'

একথা শুনে পৃথকভাবে বসে থাকা এক বেদুইন উঠে দাঁড়াল এবং তার হাত নবীর প্রতি প্রসারিত করে বলল : হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! এমনকিছু লোকও কি আছে, যারা নবী এবং শহীদ তো নয়ই কিন্তু আল্লাহর সমীপে তাদের মান ও মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদরাও গর্ব করবেন– বলুন, এরা কারা হবে ? বেদুইনের এ প্রশ্ন শুনে রসুলুল্লাহর চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন :

'তারা অপরিচিত এবং বিভিন্ন গোত্রের লোক হবে, তাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কও থাকবে না, তারা আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভালোবাসবে এবং ঐক্যবদ্ধ হবে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য একটি নূরের মঞ্চ বা অবস্থান তৈরি করবেন, তাতে ওঠামাত্রই তাদের মন নূরময় বা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তাদের বস্ত্র আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে ; ঐদিন লোক ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে কিন্তু তারা ভীত হবে না। তারা আল্লাহর বন্ধু হবে, তাদের না থাকবে দুঃখ আর না হবে সন্তাপ। – আহমদ, হাকিম

---

১. আনসার মদিনার সেই সমস্ত ব্যক্তি, যাঁরা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের নিজেদের বাড়িঘরে স্থান দেন এবং তাঁদের সাহায্য করেন। – অনুবাদক

আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর দ্বীনের জন্য ভ্রাতৃত্ব এবং তার নামে একে অন্যের প্রতি সহযোগ, এ সমস্ত নৈতিকতা মক্কার নিকটবর্তী স্থানে রাতের আঁধারে একত্রিত হওয়া ব্যক্তিদের অন্তরকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। এ প্রতিজ্ঞা এ জন্যই হচ্ছিল, যাতে একথাই ঘোষিত হয় যে, আল্লাহর এ সাহায্যকারীরা তাদের রসুলকে নিজেদের জীবনের বিনিময়েও রক্ষা করবেন। যেভাবে তাঁরা নিজেদের ইজ্জত ও মর্যাদাকে রক্ষা করেন, সেভাবেই নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে তাঁরা তাকে রক্ষা করবেন, তারা জীবিত থাকতে আল্লাহর রসুলকে কেউ সামান্যতম কষ্টও দিতে পারবে না।

মক্কার মুশরিকরা ভেবেছিল যে, তারা ইসলামকে এমন একটা এলাকার মধ্যে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে যেখান থেকে সে কখনোই বেরুতে পারবে না আর মুসলমানদের তারা এতটা রক্তপাত করেছে যে, তাতেই তারা ফেঁসে গেছে। অতএব তারা অপরাধীদের সমান হয়ে গেছে, যারা অপরাধ করেছে এবং কিসাস বা প্রতিহত্যা থেকে তারা রেহাই পেয়ে গেছে। ঐ রাতে সত্যের সেনানীরা পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা করল যে, তারা মূর্তিপুজোকে উৎপাটিত করে ছাড়বে এবং কাফির ও তাদের অনুসারীদের বিনাশ করে দেবে।

ঐ সময় কিছু মুশরিক হাজিদের শিবিরগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে আকাবার কাছে এসে তাদের কিছু কথাবার্তা শুনে ফেলল। অনন্তর তারা মক্কাবাসীর উদ্দেশে চিৎকার করে সচেতন করে দিয়ে বলল : 'মুহাম্মদ ও তাঁর বিধর্মী সাথিরা তোমাদের উপর আক্রমণের পাঁয়তারা চালাচ্ছেন।

তাদের এ আওয়াজ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। বাইয়াতকারীরা অনুমান করলেন যে, তাদের পরিকল্পনার রহস্য উদঘাটিত হয়ে গেছে কিন্তু এর পরিণামের কোনো পরোয়াই তাঁরা করলেন না।

সাদ বিন উবাদা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল ! কসম সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি আদেশ দেন তাহলে আগামীকাল ভোরেই আমরা মিনা আক্রমণ করি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এর কোনো আদেশ আমাকে দেয়া হয়নি। এখন তোমরা নিজ নিজ শিবিরে চলে যাও।'

কাব ইবনে মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, প্রাতঃকালে এক কুরাইশ নায়ক আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, 'হে খাজরাজের লোকসকল ! আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনারা রাতের বেলায় এই ব্যক্তির[১] সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং একে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন আর

---

১. হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।– অনুবাদক

আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহর কসম ! আরবের সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমরা প্রস্তুত হলেও আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটা আমরা অত্যন্ত অপছন্দনীয় বলে বিবেচনা করি।'

একথা শুনে মদিনার কিছু মুশরিক শপথ করে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করল যে, এ সমস্ত কোনো কিছুই তারা জানে না। বাস্তবিকই তাদের দিক দিয়ে তারা সত্যি কথা বলেছিল। কেননা বাইয়াতের কোনো ঘটনাই তারা জানত না। কা'ব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমরা একে অন্যে চোখাচোখি করছিলাম।

কিন্তু আনুষঙ্গিক নানা আলামত বা লক্ষণ থেকে বেরিয়ে এল যে, এ আশঙ্কা সঠিক ছিল। অনন্তর কুরাইশরা আনসারদের অনুসন্ধানে বের হলো কিন্তু সাদ বিন উবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত আর কাউকে পেল না।

কুরাইশরা সাদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর দু'হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে তাঁকে মারধর করতে করতে এবং চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে মক্কায় নিয়ে গেল। সেখানে জুবাইর ইবনে মুতইম এবং হারিস ইবনে হরব তাকে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্ত করলেন। কেননা সাদ রাজিয়াল্লাহু আনহু তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোকে মদিনায় আশ্রয় দিতেন।

ছয়
হিজরতের অগ্রণী দল

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নির্মাণ, তাও এমন এক মরুস্থলে যা কুফরি ও অজ্ঞানতার কেন্দ্র বলে পরিচিত, তা ছিল অত্যন্ত ভয়ানক ও চিন্তাজনক ব্যাপার, ইসলামী দাওয়াতই তা সম্ভব করে তুলেছিল। মুসলমানরা চারদিক থেকে ছুটে চললেন। হিজরত কেবল কষ্ট, পরীক্ষা ও উপহাস থেকে মুক্তির শুধু একটি পথই ছিল না ; বরং এক শান্তিপূর্ণ নগরে এক নতুন সমাজ নির্মাণের জন্য সাধারণ সহযোগের একটা পর্যায়ও ছিল।

এই নতুন দেশ নির্মাণে অংশ নেয়া এবং তার স্থিরতা বা তার বিস্তারে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য অনিবার্য হয়ে গিয়েছিল। আর হিজরতের পর মদিনা ত্যাগ করা আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের সহায়তা থেকে বিমুখ হওয়ার সমান বলে বিবেচনা করা হলো। কেননা, সেখানে বসবাস করা আর দ্বীনের মধ্যে একীভূত হয়ে যাওয়া একই কথা। সে জন্য এ

নগরে ব্যাপকভাবে দ্বীন প্রচার হওয়াটা আবশ্যিক ছিল এবং তা এ নগরকে ভিত্তি করেই হওয়া প্রয়োজন ছিল।

বর্তমান যুগে ইহুদিরা বড়ই প্রসন্ন এবং তারা একে অন্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কেবল শত শত বছর যাবৎ দেশবিহীন ও তিরস্কৃত জীবনযাপন করার পর তারা এক রাষ্ট্র কায়েম করেছে। কিন্তু এই রাষ্ট্র বিনির্মাণে আমরা ইয়াহুদিদের না ঘৃণা করি আর না পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে এসে অন্যের ভূমি বেদখল করে বাড়িঘর বিনির্মাণের প্রচেষ্টাকে আমরা ঘৃণা করি।

কিন্তু কী বিস্তর পার্থক্য এতে, যা এ যুগের ইহুদিরা করেছে বরং তাদের জন্য সঠিক কথাটিই প্রয়োগ করা হয়েছে– আর তাদের মধ্যে ইসলাম ও তার আনুসারীরা সে সময় হিজরত করে নিজেদের দাওয়াতকে সুরক্ষার জন্য ও আপন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মদিনায় পৌঁছেছিলেন। ইহুদিরা ফিলিস্তিনে সেই সময় পৌঁছায়, যখন আরবরা ছিন্নভিন্ন ও অব্যবস্থিত ছিল, উন্মত্ততা তাদের আচ্ছাদিত করে রেখেছিল, তারা দুর্বল ও বিবশ ছিল, ইহুদিরা ইসলাম ও তার আহ্বায়কের বিরুদ্ধে প্রতিশোধকামী পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল। এরপর সমগ্র বিশ্ব সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র, রমণী ও লম্পটদের নিয়ে ফিলিস্তিন-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কোটি কোটি আরবও তাদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হলো। তারা প্রকাশ্য দিবালোকে আরব ভূমিতে আক্রমণ হানল এবং এই আক্রমণ ও আধিপত্য আমেরিকা, রাশিয়া, ইংরেজ ও ফরাসিদের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে হলো। আরব সম্রাট হাত গুটিয়ে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে বসে রইল আর এভাবে আরব ভূমিতে ইহুদিদের রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেল, যেখানে বসবাসের জন্য সমগ্র দুনিয়ার ইহুদিদের উৎসাহিত করা হতে লাগল এবং বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে সম্পদ ও রাজনৈতিক চালবাজির মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা দেয়া হতে লাগল।

আল্লাহর পথে যারা ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছিলেন এ ধরনের ষড়যন্ত্র ও চালবাজির সাথে তাদের কী সম্পর্ক ? যাদের মন দুনিয়াবি সম্পদ ও লোভ-লালসা থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিল এবং যারা সামান্য লাভ ও শান্তি থেকেও নিস্পৃহ ছিলেন। তারা তো অন্ধ বোবা ও বধির ছিলেন এবং বাহ্যিক জগতে উচ্চতম মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তারা নিজেদের ভবিষ্যৎকে ঐ পবিত্র পয়গামের ভবিষ্যত্বের সাথে একীভূত করে নিয়েছিলেন, যাকে তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং যার আহ্বায়করূপে যুদ্ধ ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাদের এই ঘোষণায় কোনো সংকোচ ছিল না।

'বলে দাও : আমার পথ তো এটাই যে, আমি পূর্ণ বোধের সাথে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আর যারা আমার অনুসারী তাঁরাও এবং আল্লাহ মহিমাবান আর আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' – ইউসুফ : ১০৮

সদাচারী ও সৎকর্মশীল সমাজের যে কল্পনা দার্শনিকেরা করে গিয়েছেন তা মুহাজিরদের কর্মকাণ্ডের সামনে বড়ই হীন প্রতিপন্ন হয়, যা সবার আগেই তারা দেখিয়ে গিয়েছেন। তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, সুদৃঢ় ঈমান মানুষের মধ্যে বড়ই সুশীলতা ও পবিত্র নৈতিকতা উৎপন্ন করে দিতে পারে, যার প্রকাশ ও পবিত্রতা দেখে ফিরিশতারাও ঈর্ষা করতে থাকে।

মুসলমানরা রসুলুল্লাহরই আদেশে মক্কা ও তার চারপাশের এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। বিশ্বাস ছিল তাদের বাহন আর আত্মবিশ্বাস তাদের মস্তককে শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত করে তুলেছিল।

এ হিজরত কোনো সওদাগরের নিকটতম নগর থেকে সুদূরতম নগর অভিমুখে পলায়ন ছিল না আর সম্পর্ক ছিল না সেই যাত্রার সাথে, যারা একটি অনুর্বর ভূমি থেকে জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনো উর্বর ও হরিৎক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করে।

এই হিজরত ছিল সেই মুমিনদের, যারা নিজ নিজ পরিবার ও আত্মীয় পরিজনদের সাথে থাকতেন, যারা তাদের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, এ তাঁদের হিত বা লাভালাভের বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, নিজেদের সহায় সম্পদের পরোয়া না করে, কেবলমাত্র নিজেদের জীবন বাঁচিয়ে অন্য স্থানে পলায়ন করে চলে যাওয়ার দাওয়াত ছিল। তাঁরা মদিনা অভিমুখে চলে যাওয়ার পরিণাম জানতেন। পথে সমস্ত কিছুই লুট হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল শুধু তাই নয় ; বরং জীবন যাওয়ারও ভয় ছিল তারা জানতেন না ভবিষ্যতে তাদের কী কষ্ট সইতে হতে পারে। তা সত্ত্বেও তারা চলেছিলেন। বিষয়টি যদি হতো একজনের তাহলে না হয় বলা যেত যে যুদ্ধাবস্থায় পড়ে বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এখানেও তো সর্বত্রই একই অবস্থা চলছিল, প্রত্যেকেই সপরিবারে হিজরত করছিলেন এবং সকলেই ছিলেন প্রসন্ন এবং সন্তুষ্ট।

এ ছিল সেই ঈমান, যা ছিল পাহাড়তুল্য, কেবলমাত্র পাহাড়ের সাথেই যার ওজন করা যায় আর এরা ছিলেন সত্যের পথে নির্ভীক। এ ঈমান ছিল কার প্রতি ? কোন সত্তার প্রতি ? তাঁর প্রতি যিনি বিশ্বভুবনের প্রতিপালক ও প্রভু, আগে এবং পরে, আদি এবং অনাদি সমস্ত অবস্থাতেই সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি তাঁরই। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত কিছুই যাঁর অধীন।

এই ভয়াল উপত্যকা স্বল্প কয়েকজন মাত্র মুমিনই অতিক্রম করতে পারেন, যারা তার যোগ্য এবং সে জন্য যিনি অধীর যাদের বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন :

'আর আমি যদি এদের আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজে নিজেকে হত্যা করো অথবা নিজেদের বাড়িঘরকে ভুলে যাও, তাহলে এদের মধ্যেকার অল্পই তা করত।' – আন নিসা : ৬৬

পরন্তু মক্কায় যারা রসুলুল্লাহর সাথে আত্মার সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে হিদায়াতের আলো গ্রহণ করেছিলেন, একে অন্যকে সত্য এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের যখন বলা হলো হিজরত করো, যাতে ইসলামকে শক্তিশালী করে তুলতে পারো এবং নিজেদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করে তুলতে পারো, তখন তাঁরা সাথে সাথেই প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

দেখতে দেখতে মক্কা উজাড় হয়ে গেল এবং বাড়িঘরগুলো বিরান হয়ে পড়ে রইল।

উমর ইবনে রবিআর ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হলো, ঘরের মালিক, তার পত্নী, তার ভাই সবাই হিজরত করেছিলেন। উতবা, আব্বাস ও আবু জেহেল ঐ দিক থেকে বেরিয়ে এলেন, উতবা নিরাশ হয়ে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে শূন্য বাড়িঘরগুলোর পানে তাকিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল :

'প্রতিটি বাড়িঘর, তা সে যতদিন যাবৎ সুরক্ষিত থাকুক না কেন, তাকে একদিন না একদিন শূন্য হতেই হয়।'

তারপর বলল : 'বাড়িঘরগুলো জনশূন্য হয়ে গেছে।'

একথা শুনে আবু জেহেল আব্বাসকে বলল, 'এসব তোমার ভাইপোর কারণেই হয়েছে। সে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।'

আবু জেহেল তার অবজ্ঞাকারী ও শয়তানি স্বভাবটিই উন্মোচন করে দিল। প্রকৃত অপরাধী তো সে নিজেই অথচ সে অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করছে আর যখন উৎপীড়িত তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন এ প্রতিরোধ অত্যাচারী ও অপরাধীদের দৃষ্টিতে বড়ই কঠিন বলে প্রতীত হয়।

সাত
সর্বপ্রথম মুহাজির

সর্বপ্রথম মুহাজির ছিলেন আবু সালমা, তাঁর পত্নী ও তাদের ফুলের মতো নিষ্পাপ এক শিশু। যখন তারা প্রস্থানের মনস্থ করলেন তখন শ্বশুরকুলের লোকেরা বলল :

'তুমি তো স্বয়ং আমাদের বংশের কেউ নও, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, কিন্তু আমাদের মেয়েকে পথে-প্রান্তরে বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর জন্য তোমার সাথে যেতে দেব না।' তারা তাঁর পত্নীকে আটকে দিল।

তারপর আবু সালমা রাজিয়াল্লাহু আনহুর বংশের লোকেরা বলল :

'যখন তোমরা তোমাদের মেয়েকে আটকে দিলে তখন আমরা আমাদের শিশু কন্যাটিকে তার কাছে কেন থাকতে দেব ?'

এই কাড়াকাড়ির মধ্যে শিশুকন্যাটির হাত ভেঙে গেল এবং তার বংশের লোকেরা তাকে নিয়ে গেল। পরিণামস্বরূপ আবু সালমা রাজিয়াল্লাহু আনহু মদিনার পথে একাই পাড়ি দিলেন।

আবু সালমার পত্নী উম্মে সালমা প্রায় এক বছর যাবৎ প্রতিদিনই আবতায় যেতেন আর সেখানে বসে বসে কান্নাকাটি করতেন। তাঁর এ দশা দেখে এক ব্যক্তি খুবই দয়াগ্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং তিনি তাঁর পরিজনদের কাছে গিয়ে বললেন : 'তোমরা এই দুখিনীকে কেন যেতে দাও না ? তোমরা এর স্বামীকেও ছাড়িয়ে দিলে, আবার নাড়িছেঁড়া ধন নিষ্পাপ শিশুকন্যাটিকেও ?' এবার তারা উম্মে সালমাকে বলল : 'যদি তুই তোর স্বামীর কাছে যেতে চাস তাহলে চলে যা।' তারপর, বনু আবদুল আসাদ তার শিশুকন্যা সালমাকেও ফিরিয়ে দিল। এবার মা ও মেয়ে এক উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সম্পূর্ণ একাকী মদিনার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হজরত সুহাইব রুমী রাজিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের সংকল্প করলে কুরাইশ কাফিররা তাকে বলল :

'তুমি এখানে সম্পূর্ণ কাঙাল ও নির্ধন অবস্থায় এসেছিলে আর আমাদের সাথে থেকেই ধনশালী হয়ে উঠেছ। এখন তুমি চাচ্ছ তোমার ধনসম্পদ নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে। আল্লাহর কসম ! তা কখনোই হতে দেব না।'

হজরত সুহাইব উত্তর দিলেন :

'যদি আমার সমস্ত ধনসম্পদ তোমাদের দিয়ে দিই তাহলে কী আমাকে যেতে দেবে ?' তারা বলল : 'হ্যাঁ !' অনন্তর হজরত সুহাইব সমস্ত ধনসম্পদ তাদের দিয়ে দিলেন এবং হাত ঝেড়ে সম্পূর্ণ খালি হাতে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়লেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন একথা জানতে পারলেন তখন বললেন : 'সুহাইব বড়ই লাভের সওদা করেছে।' – ইবনে হিশাম, হাকিম

এভাবে লোক ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবেও মক্কা ত্যাগ করতে লাগল। এমনকি দেখতে দেখতে মক্কা মুসলমানশূন্য হয়ে পড়ল এবং কুরাইশদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ইসলাম আশ্রয়স্থান লাভ করেছে, যেখানে সে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অতএব, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়গাম থেকে তারা ভয়ংকর পরিণামের আশংকা করতে লাগল এবং তারা আহত বাঘের মতো তড়পাতে লাগল, যে তার নিজের জীবন সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়ে। এবার তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ তো এখনো মক্কাতেই অবস্থান করছেন, না জানি তিনি কবে তাঁর সাথিদের সাথে মিলিত হন। সুতরাং তাঁকে আটকানোর উপায় এখনই বের করো।

দার-উন-নদওয়ার কার্যক্রম

মক্কার অশুভ শক্তি সম্মিলিতভাবে এবার দার-উন-নদওয়ায় একত্রিত হলো, যাতে এ বিষয়ে একটি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কেউ বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাতে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখা হোক যেন তিনি আর কোনো দিন ফিরে আসতে না পারেন এবং তাঁর সাথে কুরাইশরা সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করুক।

এসব প্রস্তাব সর্বসম্মত না হওয়ার কারণে তা বাতিল করে দেয়া হলো। সবশেষে আবু জেহেলের এই প্রস্তাবে সকলেই একমত হলো যে, আমাদের সমস্ত গোত্রের মধ্য থেকে একেক জন যুবককে চয়ন করা হোক, তারা সবাই মিলে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহাম্মদকে হত্যা করবে। এভাবে মুহাম্মদের রক্তপণ সমস্ত গোত্রের মধ্যে বিভাজিত হয়ে যাবে আর সমস্ত গোত্রের সাথে বনু হাশিমদের মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অতএব, তারা নিরুপায় হয়ে রক্তপণস্বরূপ অর্থদণ্ড গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

এই প্রস্তাব সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলো এবং তারা ভাবল এতেই মুশকিল আসান হয়ে যাবে আর সাথে সাথে সব উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এবার তারা এর বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। কুরআন এই অপরাধ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলে :

'এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কারো) যখন কাফিররা তোমার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করছিল যে, তোমাকে বন্দি করবে অথবা হত্যা করবে বা তোমাকে দেশছাড়া করবে এবং তারা তাদের চাল চালছিল আর আল্লাহ তাঁর নিজের চাল চালছিলেন। আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম পরিকল্পনাকারী। – আনফাল : ৩০

এ সিদ্ধান্ত কোনো গোপন সভায় নয় ; বরং প্রকাশ্য সভায় হয়েছিল। এ ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার যে, আল্লাহর রসুল এ খবর জেনে যাবেন এবং তিনি এই উদ্বেগজনক অবস্থা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেবেন।

এ তো অসম্ভব ছিল যে, আল্লাহর রসুল তাঁর সাথিদের হিজরতের আদেশ দিয়ে নিজে পিছপা হবেন।

মদিনায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তিনি সেই সময়েই নিয়েছিলেন, যখন তিনি মুসলমানদের হিজরতের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

জুহরী, উরওয়ার মাধ্যমে হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় বলেছিলেন :

'আমাকে হিজরতের স্থান দেখিয়ে দেয়া হয়েছে খেজুর বৃক্ষ সম্বলিত সুকঠোর ভূমি, যা কালো উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত, তা অবলোকন করানো হয়েছে।' –বুখারী, হাকিম

অতএব, যখন আল্লাহর রসুল এর বর্ণনা করেছেন তখন মদিনা অভিমুখে হিজরতের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। যারা হাবশায় হিজরত করেছিলেন তারাও মদিনার দিকে ফিরে আসতে লাগলেন।

নয়

আল্লাহর রসুলও হিজরত করলেন

হজরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তাঁর মনে অহি-র সংকেত অনুভব করলেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে কুরআনের মাধ্যমে তাঁকে হিদায়েত করা হলো :

'এবং বলো : প্রভু ! তুমি আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও সততার সাথে নিয়ে চলো এবং যে কোনো স্থান থেকেই নিয়ে যাও, সততার সাথে নিয়ে যাও এবং তোমার পক্ষ হতে আমাকে সহায়ক অধিকার প্রদান করো।' – বনি ইসরাইল : ৮০

আমাদের জানা নেই যে, আল্লাহর সমর্থন ও সাহায্যের পাত্র সেই রসুলের চেয়ে অধিক কে হতে পারেন, যিনি আল্লাহর পথে সীমাহীন কষ্ট-যন্ত্রণা ও পীড়ন সহ্য করেছেন, তারপরও আল্লাহর সমর্থন তাঁর পক্ষেই রইল ! যিনি কঠিন প্রাপ্তি এবং উপকরণাদি জোটাতে কণামাত্রও ত্রুটি করেননি।

অনন্তর, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হিজরতের কর্মপরিকল্পনা নির্দিষ্ট করলেন এবং সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করলেন সম্পূর্ণ ত্রুটিহীনভাবে।

সাধন ও সামগ্রীর এই দুনিয়ায় মুমিনের ব্যবহার এমনই হয়, অর্থাৎ এটাই সাফল্যের পথ। তারপর আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন। কেননা, সমস্ত কিছুই আল্লাহর দ্বারাই কার্যকর হয়।

নিজের কর্তব্য পালনে ব্যক্তি তার সমস্ত প্রচেষ্টাকে কাজে লাগানোর পরও সে ব্যর্থ বা অসফল হলে আল্লাহ তার নিন্দা করেন না। এমনটি সেই সময়েই হয়, যখন আল্লাহর ইচ্ছার কোনো ব্যত্যয় ঘটে এবং এই অবস্থায় ব্যক্তি বিফল মনোরথ হয়।

প্রায়শই এমনটি হয় যে, মানুষ সাফল্যের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়াসই সুক্রমানুসারে সম্পন্ন করে, তারপর উচ্চতম সহায়তা আসে, যা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা থেকে কয়েক গুণ বেশি সাফল্য বয়ে আনে। যেমন একটি নৌকা সমুদ্রে

ভেসে চলে, সহসা অনুকূলে হাওয়া এলে তাঁকে অতি দ্রুত গন্তব্যস্থলে অনেক কম সময়ে পৌঁছে দেয়।

মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত ঠিক এভাবেই হয়েছিল। রসুলুল্লাহ কেবলমাত্র আবুবকর ও আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুকেই বিরত রেখেছিলেন। অবশিষ্ট সমস্ত মুসলমানকেই তিনি মদিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন।

হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন হিজরতের অনুজ্ঞা চাইলেন তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'ব্যস্ত হয়ো না, সম্ভবত আল্লাহ তোমাকে কোনো সাথি দিয়ে দেবেন। (ইবনে ইসহাক) হজরত আবু বকর অনুভব করলেন যে, আল্লাহর রসুল তাঁর সাথি হবেন।'

হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু দুটি উট ক্রয় করে তাঁর বাড়িতে এনে তাদের দানাপানির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন।

হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি এক বিশেষ কাজের জন্য প্রস্তুত করিয়ে নিলেন, যে কাজটি সেই সংবেদনশীল ও সন্ত্রস্ত বাতাবরণে করার প্রয়োজন ছিল।

হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন সকালে অথবা সন্ধ্যায় আমার ঘরে আসতেন কিন্তু যেদিন তিনি হিজরতের অনুজ্ঞা লাভ করেন সেদিন এলেন জুহরের সময়ে, যখন তাঁর আসার কথা ছিল না। হজরত আবু বকর তৎক্ষণাৎ বললেন : 'আমার মাতা পিতা উৎসর্গিত হোন আপনার প্রতি, নিঃসন্দেহে কোনো জরুরি কাজে এ সময়ে এখানে ?' তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে আসার অনুমতি নিলেন। যখন ভিতরে এসে গেলেন তখন আবু বকর নিজের চারপাই থেকে সরে গেলেন এবং আল্লাহর রসুল বসে গেলেন, সে সময়ে রসুলুল্লাহ (সা) এর কাছে আমি ও আমার বোন আসমা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি বললেন : 'আমাদের কাছ থেকে সবাইকে সরিয়ে দাও।' আবু বকর নিবেদন করলেন : 'আল্লাহর রসুল ! আমার মেয়েরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোন আপনার প্রতি, কী খবর ?'

তিনি বললেন : 'আল্লাহ আমাকে হিজরত ও মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুজ্ঞা দিয়েছেন।' আবু বকর বললেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমি কি আপনার সাথি হব ?' বললেন : 'হ্যাঁ।' হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন : 'আল্লাহর কসম ! আমি সেই দিন থেকে বুঝতে শিখেছিলাম মানুষ আনন্দাতিশয্যে কাঁদে। আমি ঐ দিন দেখি যে, আবু বকর (তার পিতা) আনন্দাতিশয্যে কাঁদছেন।' আবু বকর নিবেদন করলেন : 'হে আল্লাহর রসুল আমার কাছে এই দুটি উট

আছে।' আমি এদের এই দিনের জন্য লালন পালন করে আসছি। অনন্তর তাঁরা দুজনে আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকাতকে পরিশ্রমের বিনিময়ে পথপ্রদর্শকরূপে নিয়োজিত করলেন এবং নিজেদের বাহন দুটি তার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিলেন এই মর্মে যে, যখন যে স্থানে আমরা ডাকব এদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে যাবে। –ইবনে ইসহাক

দশ
গুপ্ত ব্যবস্থা

একথা বিচার্য যে আল্লাহর রসুল তাঁর প্রস্থানের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ গোপন রাখলেন। তিনি একথা কেবলমাত্র তাঁর কয়েকজন নিকটস্থ ব্যক্তিকে বললেন, যাঁদের কিছু করণীয় ছিল।

জঙ্গল ও মরুস্থলে পথপ্রদর্শনের জন্য একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করা হলো, যাতে ধাওয়াকারী ব্যক্তিদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন। এই নিযুক্তিতে কেবলমাত্র যোগ্যতাকেই মাপকাঠি করা হলো। এই যোগ্যতার নিরিখে একজন মুশরিক পৌত্তলিককেই এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হলো এবং তার যোগ্যতাকেই কাজে লাগানো হলো।

নীতি এবং কার্যক্রমের নিশ্চয়তার সাথে রসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূল্য পরিশোধের আগ্রহও প্রকাশ করলেন কিন্তু আবু বকর তাঁকে সেটি স্বেচ্ছায় দিতে চাচ্ছিলেন। কেননা হিজরতের কাজে দান করা ছিল বড় ইবাদত, যার ইচ্ছা প্রত্যেকেরই রাখা উচিত ছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাথে প্রস্থানের পথের বিবরণ নিশ্চিত করলেন এবং আশ্রয়ের জন্য একটি গুহা নির্বাচন করলেন। পিছু ধাওয়াকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইয়েমেন অভিমুখী পথটিই ঠিক করলেন এবং পুরো বিষয়টিও বুঝিয়ে দিলেন তাদের সাথে, যাদের নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ ও প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার কথা। তারপর আল্লাহর রসুল বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন কুরাইশ যুবকরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে এবং তাঁকে হত্যার পূর্ণ সংকল্প নিয়ে নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রসুলুল্লাহ এই ভয়ানক রাতে আলী বিন আবি তালিবকে নিজের বিছানায় তাঁর সবুজ চাদরটি মুড়ি দিয়ে শুইয়ে দিয়ে অন্ধকার রাতে চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে আবু বকরের বাড়িতে পৌঁছালেন। তারপর রাতের আঁধারেই সওর গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেই গুহা, আল্লাহ যাকে তাঁর শেষ নবীর জন্য ঠিকানা বানিয়ে দিয়েছিলেন।

এক পূর্ণ সভ্যতা-সূর্য যেখান থেকে উদিত হতে চলেছিল এবং যাকে প্রকৃতি মৌনতা ও একান্ত সুরক্ষায় আপন বুকে স্থান দিয়ে রেখেছিল। এ হলো সেই গুহা, আল্লাহর শেষ নবী নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে যেখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এগারো

সওর গুহায়[১] কী হয়েছিল

সমস্ত বিষয়টি ঐভাবে, সম্পন্ন হলো, দুই মহানুভব যেভাবে তা নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন। হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে হিদায়েত করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন সারা দিন মক্কায় থেকে সারা দিনের সমস্ত খবরাখবর রাতের বেলায় তাঁদের কাছে জানিয়ে আসেন। তাঁর স্বাধীন ক্রীতদাস আমির বিন ফুহাইরাকে আদেশ দিয়ে গেলেন যে, সে যেন সারাদিন যথারীতি ছাগল চরাতে থাকে আর রাতেরবেলায় তাঁদের কাছে এসে দুধ দিয়ে যায়। অনন্তর আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর সারাদিন মক্কায় অবস্থান করে সেখানকার সমস্ত খবরাখবর নিয়ে রাতের বেলায় সমস্ত তথ্য তাঁদের অবগত করাতেন, আর আমির মক্কাবাসীদের সাথে ছাগল চরিয়ে রাতের বেলায় আবু বকরের কাছে ছাগলের পাল নিয়ে গিয়ে তাদের দুধ দিয়ে আসত। অতএব, এঁরা ছাগল জবাই করে গোশতও খেয়ে নিতেন। আব্দুল্লাহ যখন মক্কায় ফিরে আসতেন আমিরও তখন তাঁর পিছু পিছু ছাগলের পাল নিয়ে মক্কায় চলে যেত। ফলে তাঁর পায়ের চিহ্নও মুছে যেত।

সাবধানতার জন্য এসব উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল, প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের জন্যই এর প্রয়োজন হয়। মক্কার মুশরিকরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিল। মক্কা ও তার আশপাশের সমস্ত এলাকাতেই তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, এমনকি অনুসন্ধানী দল সওর গুহাতেও এসে গেল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথি শত্রুদের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে নীরব হয়ে গেলেন। পদধ্বনি একেবারেই নিকটবর্তী হয়ে উঠছিল। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চুপি চুপি বললেন : 'আল্লাহর রসুল এরা নিচের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে। 'রসুলুল্লাহ বড়ই সন্তোষের সাথে জবাব

---

১. দমক্কা থেকে দু-তিন মাইল দক্ষিণে সওর নামে একটি পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ে একটি গুহা ছিল, এটাই গারে সওর বা সওর গুহা নামে পরিচিত। —অনুবাদক

দিলেন, 'আবু বকর এই দুজন ব্যক্তির জন্য তোমার কিসের চিন্তা যেখানে তৃতীয় জন স্বয়ং আল্লাহ।' – বুখারী

মনে হয় যে, ধাওয়াকারীরা এই গুহায় গিয়ে নিরাশ হয়ে উল্টো পথে ফিরে গেল। মুসনাদে আহমদ-এ বর্ণিত হয়েছে : মুশরিক পৌত্তলিকরা সওর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করল, কিন্তু সেখানে পৌছে তারা বিভ্রান্তিতে পড়ল। তারা পাহাড়ে উঠল, গুহার কাছ থেকে বেরিয়ে দেখল গুহামুখটি মাকড়সার জাল দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আছে। তখন তারা বলল : 'এখানে যদি কেউ প্রবেশ করত তাহলে মাকড়সার জাল কীভাবে অক্ষত থাকত ?' অতএব, তাঁরা সেখানে তিনদিন যাবৎ অবস্থান করলেন।

'মুসনাদে আহমদ'-এর এ বর্ণনা শুদ্ধ, যদিও প্রধান কিতাবগুলোতে এর উল্লেখ নেই। এরকমই কবুতরেরও উল্লেখ নেই, যে গুহামুখে বসে ডিম পেড়েছিল, ইত্যাদি।

হিজরতের বিষয়ে আল্লাহ বলেন :

'যদি তুমি তাকে (আল্লাহর রসুলকে) সহায়তা না-ও করো তাহলে (কী হবে) আল্লাহ তাঁকে সহায়তা সেই সময়েই করেছেন, যখন কাফিররা (মক্কা থেকে) তাঁকে বের করে দিয়েছিল। তিনি দুজনের অন্যতম ছিলেন, যখন তাঁরা গুহায় ছিলেন তখন তিনি তাঁর সাথিকে বলছিলেন, উদ্বিগ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সহায়। তখন আল্লাহ তাঁর উপর শান্তিবর্ষণ করেন এবং তাঁর সহায়তা এমন সৈন্যদের দ্বারা করেন, যাদের তুমি দেখনি এবং কাফিরদের সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছাই সফল (ও সমুন্নত) এবং আল্লাহ প্রভুত্বশালী ও সর্বজ্ঞাতা।' –আত তওবা

অসত্যকে অপমানিত ও সত্যকে সমুন্নতকারী সৈন্যদের কোনো নিশ্চিত রূপ নেই, তা অস্ত্রশস্ত্রও হতে পারে, আবার মুজিজা বা অলৌকিক চমৎকারিত্বও হতে পারে। তার ভৌতিক বা বাস্তব রূপ অনুমানিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। যদি এ সৈন্যরা ভৌতিকও হয় তাহলে তাদের আতঙ্কিত হওয়া তাদের রূপের আধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না– এরকম অসংখ্য জীবাণু আছে, যা বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সহজেই ধ্বংস করে দিতে পারে।

'আর আল্লাহর সৈন্যদের তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।'–আল মুদ্দাস্‌সির : ৩১

রসুলুল্লাহর প্রতি আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দিয়ে শত্রুদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলেন। ভাগ্যের এই নির্ধারণ সেই লোকদের বিরুদ্ধে ছিল না, যা মুক্তির সাধনকে নির্মূল করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেছিল। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল যাঁরা সাবধানতার সমস্ত উপায় অবলম্বন করেছিলেন এবং সব রকমের পরিকল্পনা রচনা

করে দিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন হয় যে, অনেক লম্বা পরিকল্পনা করা হয় কিন্তু আল্লাহর তত্ত্বদর্শিতা ও ইচ্ছাই সেখানে কার্যকর হয়।

'নিজের কাজের উপর আল্লাহর পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।' – ইউসুফ : ২২

বারো
মদিনা যাত্রা

গুহায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনদিন যাবৎ অবস্থান করলেন। তারপর মুশরিক-পৌত্তলিকদের অনুসন্ধান প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ে গেল। এবার মুহাজিরদ্বয় মদিনা অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

আব্দুল্লাহ বিন উরাইকাত দুই উট নিয়ে সঠিক সময়ে গুহামুখে এসে পৌছাল। সে উটনী দুটিকে নতুন যাত্রার জন্য খাইয়ে-দাইয়ে প্রাণবন্ত করে নিল। পথের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও নেয়া হলো।

তারপর এ কাফেলা আল্লাহর নাম নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

কুরাইশরা যখন নিশ্চিত হলো যে, তাঁরা তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছেন তখন তারা ঘোষণা দিল, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথি আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে আনবে অথবা তাদের হত্যা করবে তাদের 'দিয়াত'[১] স্বরূপ ধন দেয়া হবে।

এক বা দুশো উট মরু এলাকায় ছিল অনেক বড় সম্পত্তি। লোকেরা পুরস্কারের লোভে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, মুশরিক-পৌত্তলিকরা অবশ্যই তাঁর পিছু ধাওয়া করবে। অতএব, এ যাত্রায় তিনি বড়ই সাবধানতা অবলম্বন করলেন এবং পথপ্রদর্শককে এমন পথ ধরতে বললেন, যে পথ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অনিশ্চিত ছিল। উটের লাগাম ছেড়ে দেয়া হলো। অতএব, তাঁরা দিনরাত পথ চলতে লাগলেন।

এ যাত্রীদল যখন বনি মুদলিজ গোত্রের এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন এক ব্যক্তি তাদের দেখে ফেলল এবং আপন গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে বলল, আমি এইমাত্র সমুদ্র-তট ধরে কয়েকজন লোককে যেতে দেখে এসেছি। আমার মনে হয়, তারা মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিই হবেন। সুরাকা বিন মালিক ব্যাপারটা বুঝল কিন্তু সে পুরস্কারের লোভে তাদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বলল : 'না আমি

---

১. হত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ।

এই মাত্র তাঁদের অতিক্রম করে এসেছি, তাঁরা নন।' তারপর সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর ফিরে এসে নিজের চাকরকে ঘোড়া প্রস্তুত করে উপত্যকার পিছনে এসে দেখা করতে বলল।

সুরাকা বর্ণনা করেন : 'আমি আমার বর্শাটি হাতে নিয়ে বাড়ির পিছন দিয়ে বের হলাম। আমি সেটি মাটি দিয়ে ঘিঁষড়ে নিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে পৌঁছে তাতে চড়ে খুব চুপিচুপি ঝড়ের গতিতে ছুটতে লাগলাম। এমনকি, তাঁদের কাছেও পৌঁছে গেলাম। সহসা আমার ঘোড়া টক্কর খেল আর আমি পড়ে গেলাম।'

সুরাকা আবারো ঘোড়া ছোটাল। সে এবার ছুটে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের অতি কাছে পৌঁছে গেল। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু এই দুঃসাহসী শত্রুর পদধ্বনি শুনতে পেয়ে বারবার পিছন ফিরে তাকাতে লাগলেন। যখন সে একেবারেই নিকটে এসে পৌঁছাল তখন তাকে পুরোপুরি চিনে ফেললেন। আল্লাহর রসুল সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে পথ চলেছিলেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন : হে আল্লাহর রসুল ! এ সুরাকা বিন মালিক আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। পুরো কথা তখনো বলতে পারেননি, এমন সময় তার ঘোড়ার পেট মাটিতে ঘিঁষড়ে গেল। তখন সে নামল এবং আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগল। সুরাকার মনে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে গেল যে, ইনি আল্লাহর সত্য রসুল। অনন্তর সে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং খাদ্য সামগ্রী ও পথের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর কথা বললে দু'জনে বললেন, 'এসবের কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই, কিন্তু আমাদের খবর কাউকে দিয়ো না।' (বুখারী) সে বলল : 'আপনি সুরক্ষিত।' তারপর ফিরে এল। এরপর যেই আল্লাহর রসুলকে পিছু ধাওয়া করতে আসত সুরাকা তখন তাকে এই বলে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিত যে, আমি নিশ্চিত তিনি এদিকে নেই।

দিন শেষ হয়ে এল। এবার রাত তাঁদের সুরক্ষার আচ্ছাদন হয়ে নেমে এল।

তেরো
দু'আ

মরুভূমি ও অরণ্য পথের যাত্রা বড় বড় বীরের সাহসকেও নস্যাৎ করে দেয়। সেখানে সেই কাফেলার যাত্রীদের বিবশতার কী দশা হতে পারে, যাঁদের রক্তপাতের জন্য মানুষরূপী শ্বাপদদের তরবারির জিহ্বা লক লক করছিল আর যারা একটি ভয়াল উপত্যকা অতিক্রম করছিল।

এই কষ্ট ও দুঃখদায়ক পরিস্থিতি তার পক্ষেই অনুমান করা সম্ভব, যে প্রচণ্ড সূর্যের উত্তাপ ও গরম হাওয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে।

মরুপথের যাত্রীদের নিয়ম হলো মরুস্থল বা রেগিস্তান বিশ্রামের জন্য কোনো ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া। আর যখন সূর্য অস্তমুখী হয় তখন তারা যাত্রা শুরু করে। পথের এবং পানির স্বল্পতার কারণে আরবরা এ ধরনের কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আপনারা পড়েছেন যে, আল্লাহর রসুল তাঁর শৈশবেই মদিনা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের সাথে তাঁর পিতার সমাধি দর্শন করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ফিরেছিলেন একাকী।

আজ তিপ্পান্ন বছর বয়সে আবারো এই পথে যাত্রা করছেন, কিন্তু এ যাত্রা তাঁর মাতা-পিতার সমাধি দর্শনের হেতু ছিল না, যাঁরা মদিনাতেই ছিল, কিন্তু এ যাত্রা ছিল সেই মঙ্গল বার্তার সুরক্ষা হেতু, যা মক্কায় প্রসারিত ও প্রচারিত হওয়ার পর মদিনায় তার মূল অনেক গভীরে প্রসারিত হতে চলছিল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রক্ষক, সমর্থক, সহায়ক এবং ইসলামকে প্রভুত্বদানকারী। কিন্তু প্রারম্ভেই তাঁকে অত্যন্ত তিক্ত, কঠোর ও কষ্টদায়ক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়, প্রত্যাখ্যান ও বিরোধের অভিযান চালানো হয় এবং তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়। তিনি মক্কা থেকে চলে যাচ্ছিলেন আর মক্কাবাসীরা তাঁকে হত্যার জন্য প্রলোভন ও পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

আবু নঈম বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরতের সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেন তখন এই দুআ করেছিলেন :

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন যখন আমি কিছুই ছিলাম না। হে আল্লাহ ! দুনিয়ায় ভয়ংকরতা, যুগের কষ্ট এবং দিন-রাতের সন্তাপের মোকাবিলায় তুমি আমাকে সাহায্য করো। হে আল্লাহ ! আমার যাত্রায় তুমি আমার সাথি হয়ে যাও। আমার পিছনে রয়ে যাওয়া পরিবার-পরিজনদের তুমি রক্ষা করো, আর তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ, তাতে প্রাচুর্য দান করো আর তোমার জন্যই আমার এ আগমন আর আমার প্রতি ব্যবহার আমার সামনে রয়েছ তুমি। তুমি আমাকে সত্য পথে পরিচালিত করো, হে আমার প্রভু ! আমাকে তোমার প্রিয় বান্দা করে নাও, আমাকে তুমি লোকদের হাতে তুলে দিয়ো না। হে দুর্বলদের প্রভু ! তুমি আমার পালনকর্তা, আমি তোমার তেজের মাধ্যমে তোমারই আশ্রয় চাই, যা থেকে বিশ্বভুবন আলোকিত হয় ও অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়।' —ইবনে কাসির

বিচরণায় বিষয় যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা ত্যাগের খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ল এবং মদিনা পর্যন্ত পুরো রাস্তা সরগরম হয়ে উঠল। কিন্তু যে সমস্ত পথ তিনি অতিক্রম করলেন সেসব বিষয়ে মক্কাবাসীরা তখনই জানল যখন তিনি সেখান থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেলেন।

মানুষ তো বীরদের গল্পকাহিনী থেকে বড়ই আনন্দ লাভ করে এবং বিভিন্ন রকমের ঘটনা তাদের অনুপ্রাণিত করে। লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে তাতে অনেক ডালপালা গজিয়ে গিয়ে সত্য-মিথ্যা মিলে এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ লাভ করে। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সমস্ত মুসলমান প্রেমোন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এক সময় কবিদের কণ্ঠ হতে কবিতা হয়ে বেরিয়ে এল। যদিও এমন কবিতার রচয়িতাদের নাম- পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সেই রেওয়ায়েত এসেছে, যা হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে.উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন :

আমাদের জানা ছিল না যে, আল্লাহর রসুল কোন দিকে গিয়েছেন। এই অজানার মধ্য দিয়ে তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মক্কার এক ব্যক্তি এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে এল :

আল্লাহ তাআলা যে দুই সাথির সুপ্রতিফল করল দান,
বলল যারা উম্মে মাবদের তাঁবুর প্রতি করো প্রস্থান।
সত্য শুভ সুপথ নিয়ে
সে দিক যারা গেলেন এগিয়ে–
মুহাম্মদের পথটি ধরে এগিয়ে যেজন গেছে।
সফল সেজন আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি মেহেরবান ॥
বনু কাবের প্রতি জানাই অভিনন্দন বাণী।
মুসলমানের রক্ষা হেতু যাঁরা নিবেদিত প্রাণ ॥[১]

হজরত আসমা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আমরা এ কবিতা শুনলাম তখন নিশ্চিত হলাম যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা অভিমুখে প্রস্থান করে গেছেন।

এ কবিতাবলির রচয়িতা কে বা কারা ? বর্ণনাগুলোতে আছে যে, তা কোনো জিন হবে। আরবরা বিশ্বাস করত যে, প্রত্যেক কবির সাথে জিন থাকে।

গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য বিষয় যে, ঐ কবিতাবলি কোনো মুমিন কর্তৃক রচিত হয়ে থাকবে, যে বা যাঁরা মক্কায় তাঁদের ঈমান গোপন রেখেছিলেন এবং মুহাজিরদের বিষয়ে তিনি জানতেন। অনন্তর, মুহাজিররা যখন নির্বিঘ্নে মক্কা ত্যাগ করে যান তখন তিনি তাঁর আনন্দ এভাবে প্রকাশ করে থাকবেন অথবা তাঁর গোপন ভাবনা এই গীতের মাধ্যমে আবেগ হয়ে ঝরে পড়ে থাকবে।

এই কবিতায় সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে– যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যাত্রার মধ্য পথে বনি খুজাআদের এলাকা বা তাদের লোকালয় অতিক্রম করেন তখন উম্মে মাবদের তাঁবুতে বিশ্রাম করেন এবং তাঁর আতিথ্যে ছাগলের দুধ পান করেন।

---

১. কবিতাটির বাংলা কাব্যরূপ দিয়েছেন অনুবাদক নিজেই।

চৌদ্দ

মদিনায় প্রবেশ

এই মহান মুহাজির ও তাঁর সাথিরা আগমনবার্তা মদিনায় পৌঁছাতে লাগল। মদিনার অধিবাসীরা প্রতিদিন প্রাতে মক্কার মহাসড়কে এসে বসে থাকত আর রোদের উত্তাপে অসহ্য হয়ে উঠলে যার যার ঘরে ফিরে যেত। পরদিনও তারা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা নিয়ে আবারো প্রতীক্ষায় থাকত।

নবুয়ত লাভের ত্রয়োদশ বর্ষে ১২ রবিউল আউয়ালে আনসাররা নিয়মানুসারে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতীক্ষায় বের হলেন। কেননা, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারা দর্শন করে ব্যাকুলিত আঁখি পরম শান্তি লাভের আশায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। যখন রোদের প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে তারা ফিরে যেতে শুরু করেছিল, এমন সময় এক ইহুদি যে কোনো কারণে তার বাড়ির ছাদে উঠেছিল। সে রসুলুল্লাহকে এক ঝলক দেখে নিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল : 'ওহে নবীর অনুসারীগণ ! ঐ দেখো তোমাদের নেতা আসছেন, যার জন্য তোমরা এতদিন ধরে উদ্বেগের সাথে প্রতীক্ষা করে আসছ।'

এ কথা শুনেই আনসাররা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রসুলুল্লাহকে স্বাগত জানানোর জন্য পড়িমরি করে ছুটল এবং মদিনার অলিগলিতে 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে লাগল। সে ধ্বনি মদিনার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। আজ মদিনায় এ সমারোহ এক ঈদ-উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করল।

'হজরত বরা বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথিদের মধ্য থেকে আমাদের কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছেন মুসআব বিন উমাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু বা ইবনে উম্মে মাকতুম। ইনি মুসলমানদের কুরআন পড়াতেন। তারপর আম্মার, বিলাল ও সাদ রাজিয়াল্লাহু আনহু এলেন। তারপর উমর ইবনে খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহু কুড়িজন আরোহীসহ এসে পৌঁছলেন, এরপর এলেন হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহর রসুলকে পেয়ে মানুষ যেভাবে আনন্দোল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন এমনটি তাঁরা আর কখনো হয়নি। এমনকি, নারী-শিশু দাস-দাসী নির্বিশেষে সবাইকে বলতে শুনলাম, আজ আমাদের কী আনন্দ যে, আল্লাহর রসুল আমাদের মধ্যে এসে গেছেন।' —বুখারী

এ দুনিয়াটা কী অদ্ভুত একটা জায়গা আর মানব চরিত্রের কী সাংঘাতিক বৈপরীত্য ! মক্কা যাকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করছিল, যার কারণে তাঁকে বাধ্য হয়ে হিজরত করতে হয়েছিল, তিনিই ছিলেন মদিনার চোখের মণি।

লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল আর আনসাররা তাঁকে সমর্থন, সুরক্ষা ও সহায়তায় একে অন্যকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, মদিনার অধিকাংশ মানুষই রসুলুল্লাহ ও আবু বকর (রা)-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। মহিলারা বাড়িঘরের ছাদের উপর উঠে লোকেদের জিজ্ঞাসা করছিল, রসুলুল্লাহ কোন মহান ব্যক্তিটি ?

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর বিন আউসের বসতিতে অবতরণ করলেন এবং সেখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করলেন। এই সময়কালের মধ্যে তিনি মসজিদে কুবা'র ভিত্তি স্থাপন করলেন। এ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম মসজিদ, যা সেখানে নির্মিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

'হ্যাঁ, সেই মসজিদ, যার ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ-ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে-ই এর বেশি হক রাখে যে তোমাদের মধ্য থেকে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে যায়, সেখানে এমন পুরুষ আছেন, যিনি পবিত্র থাকা পছন্দ করেন। আর আল্লাহ পাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বান্দাদের পছন্দ করেন।' –তওবা : ১০৮

পনেরো
মদিনায় বসবাস

এক চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের পথে তাঁর অনুসারীরা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করে সেখানেই যায়, যেখানে তাদের আকিদা বা বিশ্বাস সুরক্ষিত থাকে এবং যেখানে তারা শান্তি এবং সন্তোষ লাভ করে।

মানুষ তাঁর সাথে এবং সংকল্পের পূর্তিকে তার সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করে এবং মনে উত্তাপ সৃষ্টিকারী চিন্তাধারা প্রচারের প্রয়াসে দুনিয়া ও তার সাজসজ্জার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

পদ, সম্মান, নেতাগিরি এবং নায়কত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি তার লক্ষ্যের নিকটবর্তী হওয়ার চিন্তা থেকে প্রসন্ন বা ক্রুদ্ধ হয়ে গতিশীল হয়ে ওঠে অথবা গতিহীন হয়ে বসে থাকে।

কবি মুতান্নবীকে দেখুন, যিনি কত না প্রশংসনীয় কবিতাবলি রচনা করছেন, কত না ব্যঙ্গাত্মক কাব্য-কবিতা লিখেছেন ! কীভাবে তিনি সিরিয়া হতে মিশর এবং মিশর থেকে অন্যান্য দেশে পরিভ্রমণ করেছেন ? তিনি স্বয়ং তার নিজের বিষয়ে লোকদের উদ্গারকে কীভাবে ভাষায় প্রচার করেছেন :

'লোকে আমায় প্রশ্ন করে থাকেন কেন দেশ-বিদেশে ?
সকল নগর আর শহরে থাকেন কিসের উদ্দেশে ?
কিন্তু লোকে আমার কাছে যে কথাটি শুনতে চায়।
নামটি তার বলে দিতে আমি বড়ই ব্যর্থ হায়।'

যে বস্তুর নাম দিতে তিনি ব্যর্থ, তাঁর উল্লেখ তিনি অন্য স্থানে করেছেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি রাজা বা আমিরদের সাহচর্য লাভ করবেন এবং অধিক হতেও অধিকতর লাভবান হবেন। তিনি বলেন :

'মশকওয়ালা ! মদিরা পাত্রে আছে কিছু আর অবশেষ ?
যাতে আমি পাই গো কিছু মেটে আমার মনের খেদ !
সবাই দেখি পান করে আর বসেই কেবল দেখি হায়,
মদের পাত্র ফুরিয়ে আসে আমি থাকি প্রতীক্ষায়।'

আমার মতে, নিজের যোগ্যতার কারণেই মুতান্নবী শ্রেষ্ঠ স্থানটি লাভের যোগ্য পাত্র ছিলেন কিন্তু পারিপার্শ্বিক স্বার্থ তাঁকে একটি নিকৃষ্ট স্থানে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে, যার উল্লেখ পবিত্র কুরআন এভাবে করেছে :

'যে কেউ শীঘ্রই লাভ হওয়া বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, আমরা অনতিবিলম্বেই তাকে তা দিয়ে দিই, তাকে যা কিছু দেয়ার।' —বনি ইসরাইল : ১৮

কিছু মানুষ সৌন্দর্যে মোহিত কুমারী ও নবযৌবনা ও তন্বী যুবতিদের প্রতি ধাবিত হয়। তাদের এ থেকে সাময়িক আনন্দলাভের অতিরিক্ত আর কোনো আকাঙ্ক্ষা পুরো হয় না। তিনি বলছেন :

'দুনিয়াকে আমি আলোয় দেখি না, দেখি নাকো এই চক্ষে হায়,
আমি তো দেখি দুনিয়াটিকে সুন্দরীদের চোখের তারায়।'

কিছু লোক ধনলোভী হয় আর তারা দিনরাত টাকা গুনতে থাকে, যা সে পায় সে তা গোনে কিন্তু যা না পায়, তা পাওয়ার জন্য তাক করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তাদের আহার-বিহার ও পরিধানের প্রতিও খেয়াল থাকে না।

এ ধরনের মানুষ ছাড়াও আরো এক প্রকারের মানুষ আছে, যারা পরহিত, কল্যাণ, পরোপকার, মানবতা ও মঙ্গল সাধনকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে কখনোই কুণ্ঠিত হন না। তিনি ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য কোনো অবস্থাতেই কুণ্ঠিত হন না, যা তাঁর সত্তার সাথে একাকার হয়ে গেছে।

তাদের দায়িত্ব পালনে যদি সামান্যতম ত্রুটিও হয়ে যায়, তাহলে তাদের ঘুম হারাম হয়ে যায়, তাদের বিশ্রাম শেষ হয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সেই

উদ্দেশ্য সাধনের পিছনে ব্যয়িত হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের নৈতিকতা ও ব্যবহার সেই পর্যায়ে না পৌঁছায়। যে কোনো চিন্তাধারা ও চিন্তনের অনুসারী ব্যক্তি সেই ভারি আমানতের ভারে ন্যুব্জ থাকেন, যা তাদের কাঁধে চাপানো থাকে। তাঁর লাভ ও লোকসান, মিত্রতা ও শত্রুতা, থেমে থাকা বা চলতে থাকা সবকিছুই সেই অর্থ ও মূল্যবোধ অনুযায়ী হয়ে থাকে। তিনি যার আহ্বায়ক হন এবং যার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি জীবিত থাকেন।

শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনে সাহসী এবং বীরদের জন্য এক অদ্ভুত ও অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

যখন থেকে তিনি সেই মোটা চাদরগুলোকে টুকরো টুকরো করে দেয়ার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, যা শিরক বা অনেকেশ্বরবাদের কুক্রিয়াশীলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই সময় থেকেই তাঁকে এ সংকল্প থেকে না কেউ ফেরাতে সমর্থ হয়েছে আর না কেউ এ পথে তাঁকে অবরোধ করতে পেরেছে– প্রলোভন, হুমকি, ধমকি তথা হিংসা ও দমন-অত্যাচারের কোনো হাতিয়ার তাঁর পথ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর সামনে স্থান-কাল-পাত্রের সমস্ত বাধা-বিপত্তি ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক বলে প্রতীত হলো। সত্যের সাথে পরিচয় লাভের পর অজানা-অচেনা মানুষরা একে অন্যের পরম আপনজন হয়ে গেল। স্বদেশ তাঁর বাণীকে গ্রহণ করতে আপত্তি করলে তাদের প্রতি বিরক্তি ও অপ্রসন্নতার ঘোষণা দেয়া হলো। এবং মহা প্রলয়কালাবধি সমস্ত মুসলমান পরস্পরকে ভাইয়ের মতো দেখতে থাকবে– তা সে তাদের দেখুক বা না দেখুক।

মক্কায় তিনি তাঁর জীবনের তিপ্পান্নটি বছর কাটিয়ে দেন এবং দেশের প্রতি গভীর প্রেমও জন্মে গিয়েছিল কিন্তু এখন তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এক নতুন ভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর রোপিত বৃক্ষকে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠতে দেখতে চলেছিলেন। যারা হার্দিকরূপে সৌভাগ্যশালী হয় এবং যাদের অন্তরাত্মা ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তের সাথে একীভূত হয়ে যায়, যারা নিজেরা কোনো বাতাবরণকে ঠিকমত বোঝে না কিন্তু যার মধ্যে তারা তাদের চিন্তাধারা, অনুভূতি ও অন্তরাত্মার স্পন্দন শুনতে পায়, তাকেই তারা সত্য বা সঠিক বলে গ্রহণ করে।

অতএব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে প্রবেশ করলেন এবং আল্লাহ এই হিজরতের পিছনে কল্যাণ ও সাফল্যের যে শুভ সূচনা লুকিয়ে রেখেছিলেন, তিনি তাঁকে তা জানিয়ে দিলেন।

'কুরাইশ- মাঝে তাঁর' জীবনের কাটল বছর কত।
ভেবেছিলেন বন্ধু কোনো পাবেন মনের মতো ॥
হজের সময় লোকের সাথে বলতেন কত কথা।
কিন্তু কেহই স্মরণ দেয়নি শোনেনি তাঁর কথা ॥
আমাদের কাছে এলেন যখন আমরা তাঁকে করেছি গ্রহণ।
তিনি আমাদের আপন হলেন, আমরা তাঁর আপনজন ॥
আর কোনো ভয় নেই কো তাঁর নেই কো শঙ্কা কোনোই ডর।
অত্যাচারী করতে কিছুই পারবে না আর জীবনভর ॥
যুদ্ধে মোরা ধন দিয়েছি, মন দিয়েছি, সব দিয়েছি।
সুখের-দুঃখের হয়েছি সাথি, সান্ত্বনাতে বুক বেঁধেছি ॥
তাহার যারা শত্রু তারা, মোদের শত্রু, আপনজনও।
নবীর তরে যুদ্ধ-সন্ধি, মরণ তাতেই, জীবনপণও ॥
আমরা জানি, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই, প্রভুও নাই।
বক্ষে মোদের তাঁহার কিতাব, রবে হিয়ায় সর্বদাই ॥'

– কবিতার অনুবাদ।

হিজরতের ব্যবস্থা তথা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দ্বীনকে সুরক্ষিত করতে গিয়ে শরণার্থীদের স্বাগত জানানো মোটেও কোনো সহজ ব্যাপার ছিল না। আধুনিক যুগে এ সমস্যাকে অত্যন্ত জটিল বলে বিবেচনা করা হয়, যদিও এর দ্রুত সমাধানও চায়।

ঐ মহাপুরুষের জীবন কষ্টহীন কবে ছিল ?

হিজরতের সময়ে মদিনায় ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই হজরত আবু বকর ও হজরত বিলাল রাজিয়াল্লাহু আনহু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এ হিজরত-স্থান সাহাবিদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হলো না, যা তাঁদের শরণ দিয়েছিল, এ ছাড়া ছেড়ে আসা জন্মভূমির কথাও বড় নিবিড়ভাবে তাঁদের মনে আসতে লাগল এবং তার জন্য মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের কষ্টসহিষ্ণু করে তুলতেন এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ, আত্মদান ও পরিশ্রমের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন। তিনি বলেন :

'আমার উম্মতের মধ্যেকার যে ব্যক্তি মদিনায় কাঠিন্য ও কষ্টকে সহ্য করে নেবে আমি কিয়ামতের দিন তার অনুশংসক ও সাক্ষী হয়ে যাব আর যে ব্যক্তি এর

---

১. হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

জন্য প্রিয় বস্তুকে ত্যাগ করবে সে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাবে।' –মুসলিম

বাস্তবে এই নবীর হিজরতে অন্তরসমূহকে সন্তুষ্ট করার এক উপায় ছিল, যাতে মদিনার বাতাবরণ তাদের জন্য অনুকূল হয়ে যায় এবং বিক্ষিপ্ততা ও অপরিচিততা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়।

হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর রসুল যখন মদিনায় আসেন তখন হজরত আবু বকর ও হজরত বিলাল রাজিয়াল্লাহু আনহু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং প্রশ্ন করলাম : 'আব্বাজি আপনার স্বাস্থ্য কেমন ? হে বিলাল ! আপনি কেমন আছেন ?' যখন আমার পিতা আবু বকরের খুব জ্বর আসত তখন তিনি এই কবিতাটি পাঠ করতেন :

'সবাই থাকে পরিবার আর পরিজনদের মাঝে
যদিও মৃত্যু সুতোর ফিতার মতোই নিকটে আছে ॥'

আর বিলাল রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন একটু সুস্থ হতেন, তখন এই কবিতা পাঠ করতেন :

'হায় ! জানতাম আমি যবে
কিছু রাত মোর উপত্যকায় অতিক্রান্ত হবে,
যেখানে আমার চারদিকে আছে বেদনা-বিষাদময়
জ্বর-মহামারী মুক্ত এলাকা হবে গো সুনিশ্চয় !
হায় ! যদি আমি যেতে পারতাম মজনা[১] উপত্যকায়
হয়ত আমি দেখতে যেতাম তুফেল[২] পাহাড় হায় ॥

হজরত আয়েশা বলেন : আমি একথা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালে তিনি এই দুআ করলেন :

'হে আল্লাহ ! যেভাবে তুমি মক্কাকে প্রিয় করে দিয়েছিলে তার চেয়েও অধিক তুমি মদিনাকে করে দাও। এর পানি-বায়ু তুমি আমাদের জন্য অনুকূল করে দাও, তুমি এতে সম্পন্নতা দান করো আর এ সমস্ত রোগবালাইকে অন্যত্র নিয়ে যাও।' –বুখারী

হজরত আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

'হে আল্লাহ ! তুমি যেভাবে মক্কাকে সম্পন্নতা দান করেছিলে তার চেয়ে দ্বিগুণ সম্পন্নতা তুমি মদিনায় দান করো।' –বুখারী, মুসলিম

---

১. মাজানা–ঘাঁটি বা উপত্যকা।

২. তুফাইল– একটি পাহাড়ের নাম।

হজরত আবু হুরাইরাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, তাঁর মদিনায় আগমনের পর উৎপাদিত ফলের প্রথম ফলটি তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি দুআ করেন :

'হে আল্লাহ ! আমাদের নগরে, আমাদের ফল-ফসলে, আমাদের পানি-বায়ুতে প্রাচুর্য ও সম্পন্নতা দান করো। হে আল্লাহ ! ইব্রাহিম তোমার নবী, তোমার বান্দা এবং বন্ধু ছিলেন। আর আমি তোমার বান্দা এবং নবী, তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য দুআ করেছিলেন, আর আমি তাঁরই মতো মদিনার জন্য দুআ করছি।' তারপর ফলগুলোকে, যেখানে যত শিশু ছিল তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। —মুসলিম

এই প্রেরণা ও উৎসাহের মাধ্যমে মুসলমানদের আত্মায় শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করে এবং লোকেরা অতীতের দুঃখদায়ক স্মৃতি ভুলে গিয়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বিশুদ্ধ হিজরত কোনো লাভের আকাঙ্ক্ষা করে না, আত্মদান থেকে বিমুখ হয় না আর কোনো কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জন্য শোকার্ত হয় না ; বরং তার স্থান কবির এই কবিতার মতো হয় :

'এ মন যখন কিছু হতে যায় উড়ে ঐ আকাশ পথে।
প্রলয়াবধি মনটি আমার বিমুখ থাকে তাহা হতে ॥'

চতুর্থ অধ্যায়
নয়া সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

নতুন সমাজ নির্মাণের প্রতি
মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা
বন্ধুত্ব
অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার
প্রতিষ্ঠিত সাথি
ইবাদতের অর্থ
নেতৃত্ব– যার প্রতি প্রাণ নিবেদিত হচ্ছিল

এক

নতুন সমাজ নির্মাণের প্রতি

উম্মতে-মুসলিমের উদ্দেশ্য কেবল সাধারণ মানুষের মতো জীবন অতিবাহিত করা নয়, আর নয় স্বেচ্ছায় জীবনযাত্রা পরিকল্পনাবদ্ধ করে জীবিকা ও ধনসম্পদ লাভ করে পরম নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করা।

মুসলমানরা এমন এক আকিদার আহবায়ক, যারা আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে স্থিরভাবে নিশ্চিত করে নেয়, জীবনের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থায়ী করে নেয়, পারিবারিক বিষয়াবলিকেও সুব্যবস্থিত করে নেয় এবং এর বাইরেও নিশ্চিত উদ্দেশ্যাবলির সাথে তারা সম্পর্ক গড়ে নেয়।

এক ব্যক্তি বলে যে, আমার জীবনের লক্ষ্য কেবল বেঁচে থাকা, আর অন্য ব্যক্তি বলে, যদি আমি শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকারকে রক্ষা করতে না পারি, ঐশ্বরিক প্রসন্নতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁর ক্রোধের শিকার হয়ে যাই, তাহলে আমি একধাপ না আগে বাড়তে পারব আর না কোনো আঁখি আমাকে দেখতে পাবে। এ দুই ব্যক্তির মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে।

মদিনাভিমুখে হিজরতকারী মুসলমানরা ধনদৌলত, পদ এবং স্থানপ্রাপ্তির জন্য আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করেননি।

এ রকমই যে আনসাররা তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন আর নিজের জাতির শত্রুতাকে অগ্রাহ্য করে সমস্ত বিপত্তি মাথা পেতে নিয়েছিলেন তারা এই কুরবানি ও ত্যাগ এ জন্যই করেননি যে, তাঁরা তাদের মন মতো করে জীবন অতিবাহিত করবেন।

তাঁরা অহির আলো থেকে লাভান্বিত হতে চাচ্ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর প্রসন্নতা ও সন্তুষ্টি লাভ করা এবং উচ্চস্তরের প্রজ্ঞা লাভ করা, যে জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানুষ কি তার প্রভুকে অস্বীকার করে দুষ্প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে দুষ্ট প্রাণী অথবা তিরস্কৃত শয়তান বনে যাবে ?

কারণ এটাই যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রথম ঠিকানা মদিনাকে এমন এক স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করলেন, যা রিসালাতের স্থিরতার জন্য অনিবার্য ছিল। তার ব্যাখ্যা পরে করা যাবে। আর রিসালাত সম্পূর্ণ নির্ভর করে ত্রিবিত সম্পর্কের উপর :

১. আল্লাহর সাথে উম্মতে মুসলিমের সম্পর্ক।

২. উম্মতে মুসলিমের একে অন্যের সাথে সম্পর্ক।

৩. অমুসলিমদের সাথে উম্মতে মুসলিমের সম্পর্ক।

দুই
মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম পদক্ষেপে মসজিদে নববী নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে ইসলামের ধর্মীয় চিহ্ন প্রকট হতে পারে। দীর্ঘ সময়াবধি যার বিরোধিতা করা হয়েছে এবং যাতে নামাজ পড়া হতে পারে ; যা প্রভুর সাথে তাঁর বান্দার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে দেয় এবং তার হৃদয়কে ভৌতিক প্রেম বা দুনিয়াবি ভ্রম-প্রমাদ থেকে পবিত্র করে দেয়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ সেখানেই নির্মাণ করলেন যেখানে তাঁর উটনী এসে বসেছিল। এটি ছিল দুই অনাথ বালকের জমি, যারা আসাদ ইবনে জুরার-এর অভিভাবকত্বাধীন ছিল। দুই বালক প্রতিদানস্বরূপ নিঃশর্তভাবে এই জমি থেকে অধিকারমুক্ত হতে চাচ্ছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অর্থমূল্যে গ্রহণ করলেন। এই ভূমির সামনের কিছু অংশ ধ্বংসাবশেষ বা বিরান হয়ে পড়েছিল, কিছু অংশে খেজুর গাছ ছিল এবং আর কিছু অংশে ছিল মুশরিক-পৌত্তলিকদের প্রাচীন কবরস্থান।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার আদেশ দিলেন। কবরগুলোকে মাটিতে মিলিয়ে দেয়া হলো।[১] উঁচু-নিচু ভূমিকে সমতল করে দেয়া হলো। খেজুর গাছের কাণ্ড দিয়ে মসজিদের স্তম্ভ নির্মাণ করা হলো। কাঁচা ইট ও কাদামাটি দিয়ে দেয়াল তোলা হলো। খেজুরের পাতার চাটাই বিছিয়ে দেয়া হলো। পরে যখন বর্ষার কারণে কাদা হতে লাগল তখন মেঝেতে কাঁকর বিছিয়ে দেয়া হলো এবং গরমের সময় যখন গরমের তীব্রতা অনুভূত হতে লাগল তখন ছাদের ওপরে পলিমাটি লেপে দেয়া হলো। স্বয়ং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১. এ ছিল অতি প্রাচীন কবরস্থান, এর কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না এবং এখানে কাউকে দাফনও করা হতো না।—অনুবাদক

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবিরা নির্মাণকাজে সমানভাবে অংশ নিলেন। সাহাবা কিরাম কাজের তালে তালে কবিতা পড়তেন, যাতে শ্রমের ক্লান্তি ও কষ্ট লাঘব হতে পারে। কবিতার অর্থ :

'প্রভু জানি, আখিরাতের অতীত কোনো জীবন নাই।
তাই তো আমরা সবাই মিলে[১] তোমার অপার রহম চাই॥'

রসুলুল্লাহকে স্বয়ং কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখে সাহাবিদের কর্মশক্তি, প্রেরণা ও সাহস বেড়ে গেল। অনন্তর এই অবসরে কোনো একজন সাহাবি এই কবিতাটি পাঠ করলেন :

'খোদার রসুল কাজ করেন আর বসে থাকি আমরা সবে।
এ যে বড়ই ভুল হবে আর বড়ই ভ্রষ্ট কর্ম হবে॥'

মসজিদ নির্মাণ শেষ হলো, বালি ও কাঁকর দিয়ে মেঝে তৈরি করা হলো, ফলে বর্ষার কারণে কাদা হতে লাগল এবং কুকুরও ঢুকতে পারত।

এ ছিল একটি সাধাসিধে ইমারত। যা মানবরূপী ফিরিশতাদের দীক্ষা দিল, সচ্চরিত্র বাদশাহ তৈরি করল এবং আখিরাতকামী মানুষ তৈরি করল। এই মসজিদে আল্লাহ নবীকে কুরআনের মাধ্যমে মুমিনদের শ্রেষ্ঠতম দীক্ষা দানের সাফল্য দান করেছিলেন। আর প্রাতঃকাল থেকে রজনীর অন্ধকার পর্যন্ত ঐশ্বরিক শিষ্টতা, সচ্চরিত্র ও নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করে দিয়েছিলেন।

ইসলামী সমাজে মসজিদ হলো আধ্যাত্মিকতা ও ভৌতিকতার কেন্দ্র। তা ইবাদতের স্থানও আবার পাঠশালাও। তা শিষ্টতা ও নৈতিকতারও সংস্থা। আবার নামাজের স্থানও। তার সাথে মুসলমানদের সেই নৈতিক সামগ্রিকতা সম্পর্কিত, যা ইসলামের আত্মা। কিন্তু আধুনিক যুগে সেখানে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ নৈতিকতার ভিত্তিতে মানবতার দীক্ষা সুকঠিন হয়ে পড়েছে। তখনই লোকেরা এর বদলে জাঁকজমকপূর্ণ ও বৈভবশালী মসজিদ নির্মাণ করতে শুরু করেছে ; যাতে মসজিদে নামাজিদের ভিড় জমে উঠতে পারে। আমাদের পূর্বপুরুষ ও সদাচারীরা মসজিদগুলোকে জাঁকজমকপূর্ণ করার পরিবর্তে লোকদের দীক্ষা, চরিত্র গঠন ও তার দৃঢ়তার প্রতি মনোযোগী হতেন। ফলে এঁরা ইসলামের আদর্শ বনে যেতেন।

রসুলুল্লাহ যে মসজিদ নির্মাণের সংকল্প সর্বপ্রথম করেছিলেন, তা এমন কোনো স্থান ছিল না, যেখানে ইবাদতকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল আর না তাকে নামাজের জন্যস্থান করে তোলা হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীই তো সিজদা করার জায়গা। আর ইবাদতের জন্য কোনো বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট নয়।

এই মসজিদ ছিল সেই মহান উদ্দেশ্যের প্রতীক, যাকে অবলম্বন করে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বান্দাকে তার প্রভুর সাথে এমন দৃঢ় সম্পর্ক

---

১. আমরা সবাই মিলে– অর্থাৎ আনসার ও মুহাজিরদের কথা বলা হয়েছে।–অনুবাদক

স্থাপিত করে দেয়, যার প্রাণ সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে এবং দিন-রাত বারবার আগমন-নির্গমন ও তার পুনরাবৃত্তির সাথে সাথে তা যেন আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। সেই সভ্যতার মূল্য কী আছে, যা আল্লাহ বিমুখ করে, আখিরাতের দিনকে উপেক্ষিত করে এবং বৈধ-অবৈধ ও কুকর্ম-সুকর্মকে ওলটপালট করে দেয়।

ইসলাম যে সভ্যতা ও শিষ্টতাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে তা সর্বদাই আল্লাহ ও তার দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুকর্ম অবলম্বনে অবৈধ ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড হতে আত্মরক্ষা করতে এবং আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে অবস্থানের উপদেশ দিতে থাকে।

মদিনায় ইহুদি ও মুশরিকরা দেখল যে, এ নতুন রসুল তার সাহাবিদের সাথে মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশ নিয়েছেন, তাকে নামাজের যোগ্য করে গড়ে তুলছেন, বা আপত্তিজনক কোনো তরিকা বা পদ্ধতি তারা দেখেছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় সর্বপ্রথম যে খুতবা দিয়েছিলেন তা ছিল এই : তিনি দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন, যিনি তার পাত্র, তারপর বললেন : লোকসকল ! পুণ্য সঞ্চয় করে নাও, আল্লাহর কসম ! তোমাদের একথা বোঝা উচিত যে, তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি আসবে, যার উপর নিস্তব্ধতা[১] আচ্ছাদিত হবে তারপর সে তার বকরিদের ত্যাগ করে চলে যাবে, যার একটি চারণক্ষেত্র হবে, তারপর তার প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করবে। সে সময় কোনো অনুবাদক থাকবে না, যার মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তোমাদের কাছে কি আমার রসুল আসেননি ? আর তোমাকে আমার কথা কিছু বলেননি ? আমি কি তোমাকে ধনাঢ্য করে দিইনি ? আর আমি তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিনি ? তুমি আমার জন্য কী সঞ্চয় করে নিয়ে এসেছ ? সে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকবে, তবে কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর সে সামনের দিকে তাকাবে, সে তখন জাহান্নামের, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখতে পাবে। তোমরা যারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চাও তাহলে কমপক্ষে একটি খেজুর বিচির পরিমাণ দান করে হলেও তার বিনিময়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নাও। আর যে ব্যক্তি খেজুর বিচির সমতুল্য দানও করতে সামর্থ্য না রাখে তাহলে অন্ততপক্ষে ভালো কথার দ্বারাও নিজেকে বাঁধিয়ে নাও। কেননা সেখানে পুণ্যের প্রতিফল দশগুণ থেকে শতগুণ পর্যন্ত লাভ হয়। আর শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর এবং আল্লাহর রসুলের উপর। (বাইহাকী)

---

১. অর্থাৎ মৃত্যু।

তিন

বন্ধুত্ব

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়া ইমারতরূপী এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন বন্ধুত্বের ভিত্তিতে, যার অন্যতম স্তম্ভ ছিল উম্মতে মুসলিমের পরস্পর সম্পর্ক। এই বন্ধুত্বের ফলে প্রতিটি ব্যক্তির অহঙ্কার সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সে জামাআতের রুহ তার হিত এবং আশানুসারে গতিশীল হয়ে উঠছিল। সে সমাজের না কেউ নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দের কথা চিন্তা করত আর সেখানে না ছিল কারো পৃথক অস্তিত্ব।

এই বন্ধুত্বের অর্থ ছিল পুরাতন দ্বেষ এবং পক্ষপাত নিঃশেষ হয়ে যাক এবং ইসলামে গর্ব ও সম্মানের অতিরিক্ত আর কোনো সম্মান নেই।

রক্ত, বর্ণ ও মাতৃভূমির সমস্ত ভেদাভেদ মিটে গেল। প্রতিটি ব্যক্তির গুরুত্ব এবং তার শিষ্টতা ও সুশীলতার ভিত্তি ছিল আল্লাহ ভীতি।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বন্ধুত্বকে ব্যবহারিকভাবে সামাজিক রূপ দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই এতে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। রক্ত এবং সম্পদের সাথে এই ক্রিয়াকে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। এর চর্চা কোনো মৌখিকরূপে ছিল না যে, সমাজে এর কোনো প্রভাব থাকবে না।

ত্যাগ, কুরবানি, সহায়তা এবং সহানুভূতির ভাবনা এই বন্ধুত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে এ সমাজ অতুলনীয় এবং অদ্ভুত সব উদাহরণে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আনসাররা মুহাজিরদের প্রতি বড়ই আদর, সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করলেন আর অন্য দিকে মুহাজিররা তাদের এই পবিত্র মানসিকতাকে বড়ই সম্মান দেখালেন এবং পর্যাপ্ত সহায়তা নিলেন, যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন।

বুখারীর রেওয়ায়েত অনুসারে মুহাজিররা যখন মদিনায় আসেন তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আব্দুর রহমান বিন আউফ ও সাদ বিন রবিআর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে দিলেন। সাদ রাজিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন : আমি আনসারীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনশালী। আপনি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে নিন। আমার দুজন পত্নী আছেন, আপনার যাকে পছন্দ আমি তাকে তালাক দিই, ইদ্দত পুরো হওয়ার পর আপনি তাকে বিয়ে করে নিন। আব্দুর রহমান উত্তর দিলেন : আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিজন বৃদ্ধি করে দিন আপনি আমাকে কোনো বাজারের রাস্তা বলে দিন।

লোকেরা বনু কাইনুকাদের বাজারটি দেখিয়ে দিল। তিনি যখন ফিরে এলেন তখন কিছু ঘি ও পনির সাথে করে নিয়ে এলেন। পরদিন বাজারে গেলে তার উপর মেহেদির রঙের প্রভাব দেখা গেল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন : কী ব্যাপার ? বললেন : আমি বিয়ে করেছি। জিজ্ঞাসা করলেন : কিছু পেয়েছ ? বললেন : একটি সোনার বালা।

সাদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর উদার হৃদয়তা দেখে লোক শুধু আশ্চর্য হলেন না ; বরং আব্দুর রহমানের শিষ্টতা ও সম্পন্নতা দেখেও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ইনি সেই ব্যক্তি, যিনি বাজারে ইহুদিদের মোকাবিলা করে তাদের পরাজিত করেন। অল্প দিনের মধ্যেই আত্মমর্যাদা রক্ষা করলেন এবং জীবিকা অর্জনের যোগ্য হয়ে গেলেন। তাঁর এ সাহসিকতা ইসলামের শ্রেষ্ঠ নৈতিকতাগুলোর অন্যতম। আল্লাহ তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিন, যারা ইসলামের সাথে সম্পর্কবদ্ধ হয় এবং তার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে অথচ সত্যের মহিমা এবং তার চমৎকারিত্ব ও মর্যাদাকে কলঙ্কিত করতে থাকে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মুমিন জামাতের সবচেয়ে বড় ভাই ছিলেন। তিনি কোনো সম্মান ও বিশিষ্ট পদ না গ্রহণ করলেন, আর না প্রদান করলেন আর না কাউকে কোনো প্রাধান্য দিলেন। হাদিসে আছে, দুনিয়াতে যদি আমি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে আমার রফিক (সাহচর্য) ঘোষণা করতাম তাহলে তিনি হতেন আবু বকর কিন্তু ইসলামে বন্ধুত্ব সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহচর্য। – বুখারী।

সত্যিকারে ভ্রাতৃত্ব দূষিত ও অশ্লীল বাতাবরণে বিকশিত হতে পারে না। অজ্ঞতা, মূর্খতা, অশিষ্টতা, কৃপণতা ও সংকীর্ণমনা পরিবেশে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি সাহাবা কিরাম, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের প্রতিভূ না হতেন, শ্রেষ্ঠতম জীবনাচারগুলোয় তাদের জীবন সুসজ্জিত না হতো তাহলে এ জগৎ সংসার তাঁদের শুদ্ধ ও সহৃদয়তাপূর্ণ বন্ধুত্বের এ দৃশ্য আর দেখতে পেত না আর এ সমস্ত ঘটনার নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়ে থাকত না।

উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব, যার সাথে তাঁরা সহমত ছিলেন, আদর্শের সেই মহত্ত্ব তাঁদের মধ্যে এই গুণ উৎপন্ন করে দেয়। এই দুই বস্তুই তাদের গুণাবলি বৃদ্ধি করে দেয়, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং কুসংস্কার নির্মূল করে দেয়।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেই মানব ব্যক্তি, যিনি ছিলেন সমস্ত গুণ, যোগ্যতা ও সুশীলতার আধার, যা সমগ্র মানব জগতে আর সম্ভব ছিল না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব যে চরম সীমায় পৌছাতে পারে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সীমায় পৌছে গিয়েছিলেন। অতএব, লোক নিঃসন্দেহে তাঁর দ্বারা লাভবান হলেন এবং যারা তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন এমন ব্যক্তি, যাঁরা শিষ্টতা, দায়িত্বশীলতা ও দানশীলতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন।

প্রেম এক স্বচ্ছন্দ স্রোত, যার উত্তপ্ত প্রবাহ স্বতঃই বহমান। তাকে সচল রাখতে কোনো কলকব্জা বা বাইরের কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। এ

ধরনের বন্ধুত্ব আইন কানুনের মাধ্যমে স্থাপন করা যায় না। এ হলো তারই স্বীকারাত্মক পরিণাম যে সমাজ স্বার্থ, সংকীর্ণ মন ও অপবিত্র লালসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্ব এ জন্যই সম্ভব হয়েছিল যে, তাঁরা ইসলামের দ্বারাই নিজেদের জীবনে উন্নতি করেছিলেন। তাঁরা আল্লাহর বান্দা ছিলেন, পরস্পরে ভাই ভাই ছিলেন। তাঁরা যদি প্রবৃত্তির দাস হতেন তাহলে কেউ তাঁদের বিশ্বাস করত না।

কিন্তু বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় মানসিক শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এই নয় যে, কোনো আদেশ দাতার আদেশ প্রয়োগের মাধ্যমে এমন কাজ করা, যার দ্বারা লোকেরা অধিকারের জামানত লাভ করতে পারে ; আর যদি লোক তাতে প্রস্তুত না হয় তাহলে তার উপর বলপ্রয়োগ করা যেতে পারে, যেভাবে জ্ঞানপ্রাপ্তি সেনা ভর্তি এবং খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয়।

বদরের যুদ্ধের অবসরে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ের আইনে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নিকটাত্মীয়ের অধিকারের ভূমিকা গ্রহণ করল এবং আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হলো :

'এবং নিকটাত্মীয় আল্লাহর কিতাবে একে অন্যের অধিকতর হকদার, নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত বিষয় জানেন।' – আল আনফাল : ৭৫

অতএব, উত্তরাধিকার আইনে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে বাতিল করে দেয়া হলো এবং বিষয়টি রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হলো :

'আর আমরা প্রতিটি এমন সম্পত্তির, যাকে মাতা-পিতা ও আত্মীয়রা ছেড়ে যায়, উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, আর যাদের তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তাদেরও তাদের অংশ দিয়ে দাও।' – আননিসা : ৩৩

'উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বুখারী শরিফে বর্ণনা করেছেন, মুহাজিররা যখন মদিনায় আসেন তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের কারণে মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক সম্পর্কের অংশীদার হয়ে যেতে লাগলেন কিন্তু যখন এই আদেশ এসে গেল যে বন্ধুত্বের আত্মীয়তা শেষ করে দেয়া হয়েছে, পরন্তু, কথা বলে দেয়া হলো যে, তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করো এবং শুভ চিন্তা করো। বন্ধুত্বের জন্য মিরাস শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তাদের জন্য অসিয়তের [১] ধারা বজায় রাখা হলো।' – বুখারী

এই বন্ধুত্বের বিবরণ এই রকম যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাথে, হজরত হামজা রাজিয়াল্লাহু আনহু হজরত

---

১. উত্তরাধিকারীকে দান।

জায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাথে, হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু হজরত খাবজা রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ও হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হজরত উতবান বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

কিছু আলেম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শুদ্ধ বর্ণনা মতে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে সেই স্থানে রাখেন, মূসা হারুনকে যে স্থানে রেখেছিলেন। এ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও খিলাফতের অধিকারের উপর এর কোনো আঁচ পড়ে না।

চার
অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার

তৃতীয় স্তম্ভ : অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের ব্যবহারের বিষয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমা, শান্তি তথা অধিকার লংঘন এবং হস্তক্ষেপ না করার এমন আইন প্রণয়ন করলেন, যা দ্বেষ এবং পক্ষপাতিত্বের এ জগতে আর কখনো দেখা যায়নি। যে ব্যক্তি এ কথা চিন্তা করে যে, ইসলাম অন্য কোনো ধর্মের প্রতিবেশী হওয়াটা স্বীকার করে না অথবা মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে ছেয়ে থাকতে এবং প্রভুত্ব কায়েম ছাড়া থাকতে চায় না, তাহলে তা যে শুধু ভ্রান্ত উক্তি নয় ; বরং সে অন্যায়কারী ও দুঃসাহসীও বটে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আসেন তখন সেখানে ইহুদিও ছিল, মুশরিকও ছিল। কিন্তু তিনি এমন কোনো পরিকল্পনা বা নীতি অবলম্বন করেননি যে তাদের সাথে কোনো বিরোধিতা বা শত্রুতা ছড়িয়ে পড়তে পারে, অথবা তাদের দূরে ঠেলে দেয়া বা দেশ থেকে বের করে দেয়া যেতে পারে। এর বিপরীতে তিনি তাদের অস্তিত্ব সানন্দে স্বীকার করে নেন এবং দু'পক্ষের সামনে তিনি এই প্রস্তাব রাখেন যে, সবাই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মমত অনুসরণ করে চলার শর্তে সমঝোতা করে নিন।

ইহুদিদের সাথে তিনি যে সমঝোতা বা সন্ধিচুক্তি করেন তার ভাষা থেকে ইসলামের মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধির কিছু শর্ত ছিল এরকম :

– কুরাইশ বা মদিনার যে সমস্ত লোক মুসলমানদের মধ্যবর্তী স্থলে আছেন অথবা যারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে আছেন এবং ব্যবসায়ে একে অন্যের সাথে মিলেমিশে আছেন তাঁদের সবাইকে একই রাষ্ট্রের অধীন বলে গণ্য করা হবে।

– সন্ধিচুক্তির অধীন যে পক্ষই বিদ্রোহ করবে অথবা অত্যাচার করবে অথবা অন্যায় অথবা অপহরণ করবে এবং ক্ষতি করবে অথবা মুসলমানদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে তার বিরুদ্ধে মুসলমানরা দাঁড়িয়ে যাবে এবং সমস্ত পক্ষই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেও এবং অবমাননাকারী ব্যক্তির নিজের আপন পুত্র হলেও।

– কোনো মুশরিক কুরাইশদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে পারবে না এবং মুসলমানের চলার পথের প্রতিবন্ধক হতে পারবে না।

– প্রত্যেক মুসলমান যারা এই সন্ধিপত্রকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তাদের পক্ষে কোনো অপরাধীকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেয়াটাও বৈধ বলে গণ্য করা হবে না। যে তাকে আশ্রয় দেবে কিংবা সহযোগিতা করবে কিয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহর লানত বা ধিক্কার বা প্রকোপ পতিত হবে এবং সেখানে মুক্তির জন্য কোনো প্রতিদান নেয়া হবে না।

– যুদ্ধের সময় ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিত থাকবে।

– বনি আউফের ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে একই কওমভুক্ত।

– মুসলমান ও ইহুদিরা স্ব-স্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে।

– বনি নজ্জার, বনি হারিস, বনি সাইদা, বনি জুসম, বনি আউস প্রমুখ ইহুদির সাথে বনি আউফের ইহুদিদের ন্যায় ব্যবহার করা হবে।

– ইহুদিদের খরচ ইহুদিদের দায়িত্বে এবং মুসলমানদের খরচ মুসলমানদের নিজেদের দায়িত্বে থাকবে। যে এই সন্ধিচুক্তি লংঘন করবে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে।

– পরস্পরের মধ্যে শুভ চিন্তা, শুভ কামনা এবং লাভদায়ক ও শুভবোধসম্পন্ন সম্পর্ক হবে, পাপপূর্ণ বা অশুভ কোনো কাজ হবে না।

– কোনো ব্যক্তি তার নিজের হলোফের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কোনো কার্যক্রম চালাতে পারবে না এবং উৎপীড়িতকে সাহায্য করা হবে। কেউ কোনো প্রতিবেশীর ক্ষতি করতে পারবে না এবং কেউ কারো সম্পদ হজম করতে পারবে না।

– এই সন্ধিপত্রে যা কিছু আছে তার সংরক্ষক আল্লাহ।

– শপথকারী ব্যক্তিদের জন্য মদিনায় রক্তপাত করা নিষিদ্ধ।

– যে ব্যক্তি মদিনায় টিকে থাকবে অথবা যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রস্থান করবে সে সুরক্ষিত থাকবে, কিন্তু সে যদি অত্যাচারী হয় অথবা পরাস্বাপহরণ করে তাহলে সে কথা ভিন্ন। যে ব্যক্তি সংযমী ও বাধ্য হবে আল্লাহ তাকে শরণ দেবেন। – ইবনে ইসহাক

এ সন্ধিপত্র এ কথাই বলে যে, আশপাশের ক্ষেত্রগুলোতে শান্তি এবং সুব্যবস্থা বজায় রাখতে এবং মদিনার ইহুদিদের সাথে বিশুদ্ধ সহযোগ ও সহমর্মিতা বজায় রাখতে মুসলমানদের কী গভীর আন্তরিকতা ছিল এবং ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী

বিদ্বেষী ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে তাদের চিন্তাধারা কী তীব্র ছিল, তা সে স্বধর্মীই হোক বা বিধর্মীই হোক।

এই সন্ধিপত্রটি স্পষ্ট করে যে, স্বধর্মে চলার পথে পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে। এখানে কোনো দল বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ অথবা দুর্বলের উপর অত্যাচারের কোনো চিন্তাই ছিল না ; বরং এই সন্ধিপত্রই বলে যে উৎপীড়িতকে সাহায্য করা হবে, প্রতিবেশীদের সুরক্ষিত রাখা হবে এবং বিশেষ সাধারণ অধিকারও সংরক্ষিত থাকবে সেই সাথে এই সন্ধিপত্রে আল্লাহর সমর্থন পাওয়া যাবে। অতএব, একে অবজ্ঞাকারী ও এর শত্রুতাকারীর বিরুদ্ধে আল্লাহর লানত বা প্রকোপেরও ঘোষণা দেয়া হলো।

ইহুদি ও মুসলমানরা পরস্পর সমঝোতা করল যে মদিনার উপর কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে তারা একত্রে তাকে রক্ষা করবে। যে ব্যক্তি মদিনা ছাড়তে চাইবে তাতে তার স্বাধীনতা থাকবে আর যে তাকে সম্মান করবে সেখানে থাকার অধিকার তার থাকবে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই সন্ধিনামা বা চুক্তিপত্রে মুসলমান ও মক্কায় মুশরিকদের মধ্যকার বিদ্যমান শত্রুতার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাদের সাথে কোনো প্রকারের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হাত বাড়ানোর বিরোধিতার কথাও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সেই কওমের বিষয়ে আর কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারত, যাদের শত্রুতা, বেঈমানি ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মুসলমানদের ক্ষত থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল !

ইহুদিরা এই সন্ধির বিষয়ে কী যথার্থ ভূমিকা পালন করেছিল ?

বিশ্বাসনীয় বিষয় হলো এই যে, যখন তারা এই চুক্তির কার্যকারিতাকে স্বীকার করে নেয় তখন তারা ন্যায় বা সত্যপ্রিয় ছিল না।

এ ধরনের সমঝোতার দুঃখদায়ক পরিস্থিতি এটাই হয়ে থাকে যে, লোক সদা প্রত্যাশিত লাভ ও হিতের সাথে সংবদ্ধ থাকে। অতএব যখন জানা যায় যে অভীষ্ট হিত সাধিত হচ্ছে না তখন তারা তার পাবন্দ থাকে না এবং সন্ধি ভঙ্গ করার ফিকির খুঁজতে থাকে।

ইহুদিদের ভৌতিক ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি আরবদের পারস্পরিক অব্যবস্থা ও অনৈক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু আরবরা যখন ইসলামের ছায়াতলে এসে গেল এবং পুরনো হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতা নির্মূল হয়ে যেতে লাগল এবং যুগ দেখিয়ে দিল যে আরবরা অতি শীঘ্রই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিবর্তিত হতে চলেছে তখন ইহুদিরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, তাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল এবং এই নব ধর্ম এবং এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে নতুন চাল চালার পরিকল্পনা করতে লাগল।

ইহুদিরা মদিনায় যে বাতাবরণ সৃষ্টি করছিল তাতে মিথ্যা ও মনগড়া ধার্মিকতার নোংরামি তার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং ঐশ্বরিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তিত চিত্রই মাত্র অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। এই বাতাবরণের প্রত্যক্ষ বিশেষত্ব ছিল হিংসা, দ্বেষ, কপটতা, সম্পর্ক বিনাশ, কপটাচার, বাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি। পরোক্ষে যা ছিল মানসিক শূন্যতা, হতাশা ও অসুস্থ ও বিকৃত মনমানসিকতার নামান্তর।

অধিকাংশ ইহুদি আরবের কিছু মরুসুলভ বিশেষত্ব গ্রহণ করত, যেমন বীরত্ব ও দানশীলতা কখনো কখনো ঝলক দেখিয়ে দিত। কিন্তু তাদের বাস্তবিক লক্ষণ তাদের চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকত। অতএব এ সমস্ত সুবিশেষত্বের প্রভাব তাদের মধ্যে এমনটাই ছিল, যেমনটি কৃত্রিম লতাপাতা দিয়ে দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।

আশা ছিল যে, ইহুদিরা ইসলামকে স্বাগত জানাবে আর যদি স্বাগত নাও জানায় তবে মূর্তিপূজকদের ন্যায় বিরোধিতা করবে না। কেননা, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তা একত্ববাদ, সচ্চরিত্রতা, অন্তিম দিনের জন্য প্রস্তুতি– এসব তাদের ধর্মীয় আচারগুলোর অনুরূপ ছিল, যিনি মূসা আলাইহিস সালামেরও নবী ছিলেন, যে পতাকা স্বয়ং মূসা উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাবি করেছিলেন যে, তাঁরাও তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলুন এবং তাঁর অনুসরণ করুন।

কিন্তু ইহুদিরা শুরু থেকেই আতঙ্কগ্রস্ত ও মৌন হয়ে রইল, তারপর এর বাস্তবিকতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর প্রকাশ্য বিরোধিতায় নেমে পড়ল।

এই অপ্রত্যাশিত স্বাগতের প্রমাণ কুরআনের অনেক আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা মূর্তিপূজকরা অস্বীকার করলে কিতাবধারীদের অবশ্যই সাক্ষ্য দেয়া উচিত ছিল :

'আর এই কুফরিকারীরা বলে : তুমি পাঠানো রসুল নও। বলে দাও, তোমাদের এবং আমার মধ্যে সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তারা, যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান রয়েছে।' – আর রাদ : ৪৩

মূর্তিপূজকরা এই সত্যকে অস্বীকার করলে কিতাবধারীরা ছিল এর বিশ্বাসের পূর্ণ পাত্র এবং এই চিরস্মরণীয় বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পর তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

আর আমি তাদের নিকট পর্যন্ত অনবরত বাণী পৌঁছাতে থাকলাম, যাতে তারা মনোযোগী হয়। এর আগে যাদের আমি কিতাব পাঠিয়েছিলাম, যাতে তারা ঈমান আনে।' – আল কাসাস : ৫১-৫২

কিন্তু আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, মুশরিক-পৌত্তলিকদের ন্যায় ইহুদিরা এখানে আল্লাহর বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখাল এবং তাঁর আদেশের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ

করল এবং সম্পূর্ণ অনুচিত ও অযৌক্তিকভাবে তাকে দোষারোপ করার প্রচেষ্টা চালাল।

ইসলাম যখন তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করল, যারা আল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্ক জুড়ে দিল তখন তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভুকে কৃপণ ও পরমুখাপেক্ষী বলে অভিহিত করল :

'আর ইহুদিরা বলে : আল্লাহর হাত বাঁধা। হাত এদেরই বাঁধা এবং ধিক্কার এদের প্রতি এই কারণে যে, তারা অযথা বাজে কথা বলছে।' আল মায়িদা : ৬৪

'আল্লাহ ওদের কথা শুনে রেখেছেন, যারা বলে আল্লাহ ধনহীন ও তারা ধনবান। তারা যা কিছু বলেছে, আমি তা লিখে রাখব আর সেই নবীদের, যাদের তারা হত্যা করেছে তাও। আর আমি বলব : দগ্ধ হওয়ার মজা চাখো।' আল ইমরান : ১৮১

তা সত্ত্বেও ভ্রষ্টতায় আগ্রহী এই শ্রেণী-বর্ণকে ইসলাম তাদের ঐ অবস্থার অধীন করে দেয় এবং তাদের উম্মূলন তরবারির দ্বারা করে না ; বরং বার্তা পৌঁছে দেয়, তাদের বাস্তবতা খুলে খুলে বর্ণনা করে দেয় এবং বাতাবরণকে তার নিশানা ও চিহ্ন দিয়ে ভরে দেয়।

কোনো ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং ইসলামে প্রবেশ করে তো ভালো, নইলে সে স্বয়ং তার ফল ভোগ করবে। ইসলাম তার কাছে কেবল এই দাবিই করে যে, সে সমঝোতা করুক, শান্তিতে বসবাস করুক এবং সত্যের পথে প্রতিবন্ধক না হোক।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আসেন তখন ইহুদিদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন এবং ঔদার্যপূর্ণ কষ্ট সইতে থাকেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, তারা তাঁকে অসম্মানিত করতে এবং তাঁর দ্বীনকে নির্মূল করে দিতে উঠেপড়ে লেগে গেছে, তখন তিনি তাদের প্রতি মনোযোগী হলেন।

আল্লাহর ভয়, নিঃস্বার্থতা ও শুদ্ধচিত্ততার ভিত্তিতে এই নবীন সমাজে রুহানিয়াতের ইমারত দাঁড়িয়ে গেল।

সাচ্চা বন্ধুত্বের মাধ্যমে এর বুনিয়াদ স্থির হলো এবং এর প্রাচীরগুলোতে দৃঢ়তা উৎপন্ন হলো এবং ন্যায়, সাম্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদেশনীতির বুনিয়াদ গড়ে উঠল এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সেই মতো ব্যবহার করা হলো।

এই কারণে ইসলামী শাসন প্রণালি সুদৃঢ় হলো এবং মুসলমানদের নিজেদের শক্তি পুনর্গঠিত হয়ে তার নিজস্ব বিষয়ের ব্যবস্থার জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করল।

পাঁচ
প্রতিষ্ঠিত সাথি

যে মুমিনরা নবীদের সুসঙ্গ লাভ করেছেন তাঁদের জীবনকে কাছে থেকে দেখেছেন এবং লাভবান হয়েছেন, তাঁদের পবিত্রতার স্রোত ও প্রগতির মাধ্যম তারা প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদের পক্ষে তাঁদের পায়ের ধূলিটুকু লাভ করাও সম্ভব ছিল না।

আপনি যখন কোনো মধুর সংগীত শোনেন তখন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন, এই রকমই যখন কোনো বীরের বীরত্বের কাহিনী শোনেন তখন আপনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, এমনকি নাটক ও চলচ্চিত্রের দর্শকদের উপরেও তার কাহিনী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, এমনকি দৃশ্যানুসারে দর্শক হাসেনও আবার কাঁদেনও, আবার কোনো ক্ষেত্রে মৌনতাও অবলম্বন করেন, আবার কখনো বা সংবেদনশীল দৃশ্য দেখে চিৎকার করেও ওঠেন। তখন ঐ ব্যক্তিদের বিষয়ে আপনার কী ধারণা হবে, যারা এমন ব্যক্তির অনুসরণ করে, যার সাথে আকাশ কথা বলে, যার মাধ্যম বিদ্বতা ও বিশেষত্বের স্রোত বইতে থাকে এবং সেই বাতাবরণে পবিত্রতা ও শুদ্ধতার মেঘ ছায়া হয়ে বিরাজ করে। যখন লোকদের মন মঙ্গল ও কল্যাণের প্রেরণায় টগবগ করে ফুটতে থাকে তখন তাকে আগে বাড়িয়ে দেয় আর যখন তার চলার পথে কামনা-বাসনা অবরোধক হয়ে দাঁড়ায় তখন তিনি তাকে সেই পথ থেকে ফিরিয়ে পবিত্রতা এবং স্বচ্ছতার পথে ফিরিয়ে দেন। মহান ব্যক্তিদের সাথে এক প্রকারের আলোও থাকে, যা তার সমস্ত বাতাবরণকে আলোকিত করে থাকে এবং যেভাবে নিভন্ত প্রদীপ আলোকিত প্রদীপের নিকটতর হওয়ার সাথে সাথে আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি সাধারণ কোনো মানুষ যখন কোনো মহান ব্যক্তির নিকট আসে তখন সে তার প্রভাব স্বীকার করে নেয় এবং তার চিহ্নাবলিকে অনুসরণ করতে থাকে।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে সংযমী ও আল্লাহ ভক্তদের একটি দল জমা হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা তাঁর বিশ্বাসভাজন এবং নিষ্ঠাবান শিষ্য ছিলেন। অতএব তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে এসে এ দলও পবিত্র হয়ে উঠল। তাঁদের স্বভাব বদলে গেল এবং ইলহাম [১]-এর আলোকধারায় তাঁরা এমনভাবে স্নাত হয়ে উঠলেন যে, তত্ত্বদর্শিতা, জ্ঞান এবং সম্বোধন-শৈলী যেন তাঁদের মুখের উপর পুষ্প বর্ষণ করতে লাগল।

এখানে সেই বিচিত্রতম এবং তীব্রতম বুদ্ধির কল্পনা করবেন না, যা তার বিশেষ শক্তি থেকে উচ্চতম বিবেকের যোগ্যতা রাখে। কিন্তু যখন ঐ মহান শক্তি তাঁদের পথ প্রদর্শন না করে তখন অভীষ্ট লক্ষ দৃষ্টিতে না রেখে অথবা সঠিক

---

১. ঐশ্বরিক প্রেরণা।

পথের দিশা না পেয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরতে থাকে। যেমন কোনো বায়ুযান আকাশপথে উড়তে থাকে এবং কুয়াশার মধ্যে পতিত হয় তখন চালক সতর্ক হয়ে যান, কুয়াশার বুক চিরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন, কিন্তু যখন সে কোনো পথ না পায় তখন অন্তরীক্ষে সে বৃথাই ঘুরতে থাকে, তারপর এক সময় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যায়।

অনেক দার্শনিক 'ব্রাহ্মাস্ত্র ও জীবন' বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছেন। কিছু লম্বা চওড়া তর্ক-বিতর্ক ও বাদ-বিবাদের পরে কেউ বা সত্যবিমুখ হয়ে গেলেন আর কেউ বা সত্যের সন্ধানে জীবন অতিবাহিত করলেন। এরা যদি আল্লাহর বার্তা বাহক দূত বা নবীদের অনুসারী হয়ে যেতেন, তাহলে অত্যল্প সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারতেন এবং বিমুখতা এবং ভ্রান্তি থেকেও মুক্ত থাকতে পারতেন।

এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, মানুষ কেবল বুদ্ধিই রাখে না ; বরং একটি হৃদয়ও তার রয়েছে, যাতে সে অভিরুচি ও বিমুখতা থেকে সুরক্ষিত থাকে, দুর্ভাগ্য ও অন্ধকার থেকে দূরে থাকে এবং মানুষের মধ্যে সে এমন এক ব্যক্তিরূপে গতিশীল থাকে, যা তাকে কল্যাণ এবং প্রেমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং সৌন্দর্য ও সহানুভূতির প্রেরণা দিতে পারে। আল্লাহর নবীরা মানুষের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ ও পবিত্র করেন শিক্ষা ও শুদ্ধিকরণের দ্বারা।

নবীদের সর্বাধিক সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও অনুরূপ ব্যক্তি তারাই হতে পারেন, যারা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগামী লোক তাঁরাই হতে পারেন, যাঁরা তাঁর নৈকট্য ও গভীর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তার কষ্ট ও জিহাদের দুঃখ-যন্ত্রণার অংশীদার হয়ে থাকেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন : 'যার যে ব্যক্তিকে অনুসরণ করার ইচ্ছা তারা সেই ব্যক্তিকে অনুসরণ করুক, যারা মরে গেছেন। কেননা জীবিত ব্যক্তিকে ফিতনাগ্রস্ত হওয়ার জামানত দেয়া যেতে পারে না।' এঁরা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি ছিলেন, এঁরা উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। সবচেয়ে কোমল হৃদয়, সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে অকৃত্রিম ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের চয়ন তাঁর নবীর সান্নিধ্য এবং তাঁর দ্বীনকে স্থাপন করার জন্য করেছিলেন। তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বকে চিনে নাও। তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করো এবং সম্ভব হলে তাদের ব্যবহার এবং আচরণকে অবলম্বন করো। কেননা, এঁরা সৎপথের অনুসারী ছিলেন।

নিঃসন্দেহে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথিরা মূসা এবং ঈসার সাথিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সাহাবা কিরামের ঈমান ও ইসলাম, জিহাদ বা যুদ্ধ এবং পরবর্তীদের নিকট পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছে দেয়ার ইতিহাস তো দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার, সংগৃহীত এবং ক্রমবদ্ধ, তাতে না আছে ত্রুটি-

বিচ্যুতি আর না তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন হয়েছে। এ ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত অনুপম।

আমরা আজান ও তার প্রারম্ভিক কালের ইতিহাস থেকে উপরোক্ত ভূমিকা প্রস্তুত করেছি। আজানের প্রতীক তার নিজের জন্য স্পষ্ট নিশানি তুলে ধরে এবং একথার স্পষ্ট প্রমাণ তুলে ধরে যে, যখন হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায় এবং সত্যকে স্বীকার করে নেয়া হয় এবং তার উপর ঐশ্বরীয় প্রেরণার কিরণ পতিত হয় তখন তা কত উচ্চ স্তরেই না পৌঁছে যায় ?

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহর রসুল যখন মদিনায় আসেন তখন পর্যন্ত নামাজের জন্য একত্রিত করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। লোকেরা সততই অনুমান করে আসত এবং যার যার নামাজ পড়ে চলে যেত। অতএব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করলেন, ইহুদিদের মতো শিঙা ফুঁকলে কেমন হয়। কিন্তু এ তাঁর পছন্দ হলো না। তারপর শাঁখ বাজিয়ে নামাজের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা মনে এল। এরকমই আরো কতক ধারণা তার মনে এল কিন্তু একদিন রাতে আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ বিন সালব রাজিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে আজানের ধারণা লাভ করলেন এবং তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, 'আল্লাহর রসুল ! আমি স্বপ্ন দেখলাম আমার কাছে একটি লোক এল, তার হাতে ছিল একটি শাঁখ সে ছিল সবুজ পোশাক পরিহিত। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা ! তুমি কী এই শাঁখটি বিক্রি করবে ?

সে জিজ্ঞাসা করল : 'তুমি এটা নিয়ে কী করবে ?' আমি বললাম, 'এর মাধ্যমে নামাজের জন্য লোকদের একত্রিত করব।' সে বলল, 'আমি কী তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি বলে দেব না ?' আমি বললাম, 'তা কী ?' সে বলল, 'তুমি এই কথাগুলো বলো।' তারপর সে এভাবে পুরো আজানের বাণী উচ্চারণ করল :

'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আশহাদু আন্না মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ।

হাই আলাস সালাহ, হাই আলাস সালাহ।

হাই আলাল ফালাহ, হাই আলাল ফালাহ।

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।'

তিনি যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় এ স্বপ্ন সত্য। তুমি বিলাল রাজিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যাও এবং তাঁকে এই কথাগুলো বলে দাও, যাতে সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করতে পারে। তোমার চেয়ে সে উচ্চকণ্ঠী।' হজরত বিলাল রাজিয়াল্লাহু আনহুর কণ্ঠের এ আজান হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু তার বাড়ি

থেকে শুনতে পেলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় উপস্থিত হলেন এবং নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রসুল ! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমিও ঐ সমস্ত দেখেছি, যা সে দেখেছে।' আল্লাহর রসুল বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।'

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত বিলালকে আজান দিতে আদেশ দিলে তিনি আজান দিলেন। ইমাম জুহরী বলেন, হজরত বিলাল রাজিয়াল্লাহু আনহু ফজরের আজানে এ দুটি কথা বাড়িয়ে দিলেন :

'আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাউম'– নিদ্রার চেয়ে নামাজ উত্তম ; তখন আল্লাহর রসুল তা মেনে নিলেন। –ইবনে মাজা

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাঁকে বলছে শাঁখ বাজিয়ো না ; বরং নামাজের জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করো। অনন্তর হজরত উমর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলতে গেলেন ঐ সময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এ বিষয়ে অহি এসে গিয়েছিল। হজরত উমর তখনও আচ্ছন্নাবস্থায় ছিলেন, তখনই হজরত বিলাল উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করতে থাকেন। যখন তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা জানালেন তখন তিনি বললেন, এ বিষয়ে তোমার আগেই অহি এসে গিয়েছিল। –ইবনে মাজা

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অহি আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর স্বপ্নের সাথে সাথেই এসে গিয়েছিল।

এ পবিত্র বাক্যাবলি যা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করা হয়, আমাদের সচেতন করে আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত করে এবং মানুষকে সাবধান করতে থাকে যে, স্রষ্টার প্রতি অগ্রসর হও। এই বাক্যগুলোকে এক আলোকিত মস্তিষ্ক স্বপ্নরূপে সংরক্ষিত করে নেয় এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে প্রকাশ করে দেন। যেভাবে স্বপ্নে দেখেছিলেন ঠিক সেভাবে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, যাতে মুসলমানদের নামাজের জন্য আহ্বান করা যায়।

অহির সাথে হৃদয়ের একরূপতা সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও অত্যধিক আলোক মানতার দ্যোতক এবং তা এ কথারই প্রতীক যে ঐশ্বরীয় পথদর্শন মানবপ্রকৃতিরই অংশ, যে শয়নে স্বপনে তাঁরই নাম জপ করে এবং সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বিপরীতে সে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিদের অহির সাথে স্থায়ীভাবে জুড়ে রাখতেন, তিনি তাঁদের পড়ে শোনাতেন এবং তাঁরা তাঁর সাথে পাঠ করতেন, যাতে পারস্পরিক অবসর থেকে দাওয়াতের

অধিকার এবং কিয়ামতের উপর দায়িত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে কি নিজের চিন্তাভাবনা পর্যাপ্ত মনে হয় না ?

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে কুরআন শোনাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল ! আমি কী আপনাকে কুরআন শুনাব ? এ তো আপনার উপর অবতীর্ণ হয় ? তিনি বললেন : আমি অন্যের মুখ থেকে তা শুনতে পছন্দ করি। হাদিস উল্লেখকর্তা বলেন, আমি কুরআন শোনাতে শুরু করলাম এবং যখন আমি সুরা নিসার এই আয়াতে এসে পৌছলাম :

'তারপর কী অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক দল থেকে একজন সাক্ষী নিয়ে আসব আর তোমাকে (হে পয়গাম্বর !) এই লোকদের সাক্ষী করে নিয়ে আসব।' – আন নিসা : ৪১

তখন তিনি বললেন :

'ব্যস এখন আর পড়ো না। আমি তাঁর পানে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।' –বুখারী, মুসলিম

এক রেওয়ায়েতে এর অতিরিক্ত এও আছে, 'আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে দাঁড় করাব যখন তুমি এদের মধ্যে থাকবে।'

যদি শুদ্ধ স্বভাব ও স্বচ্ছ হৃদয়ে ইবাদতে ব্যস্ত লোক এই স্থান পর্যন্ত পৌছায় যে, তাঁরা আজানের বাণী পর্যন্ত প্রলম্বিত পথ লাভ করে নেবেন, তাহলে সাহাবিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও ছিলেন, যাঁরা ঈমানের অর্থের মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিলেন এবং রিসালাতের স্রোতের জন্য শুদ্ধ-হৃদয় হয়ে গিয়েছিলেন, এমনকি আল্লাহ তাঁর রসুলকে আদেশ দিলেন যে, তাঁকে কুরআনের কিছু সুরা পাঠ করে শোনানো হোক, যাতে তিনি অবগত হয়ে যান যে, আল্লাহর কাছে তাঁর স্থান কোথায় এবং সেই আয়াতের মাধ্যমে তিনি কোথায় পৌছে গিয়েছেন।

হজরত আনাস বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই বিন কাব রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন : 'আল্লাহ আমাকে তোমাদের এই আয়াতটি পাঠ করে শোনানোর আদেশ দিয়েছেন : যারা কুফরি করেছে কিতাবধারী ও মুশরিকদের মধ্যে, তারা তো বাধ্য হবে না।' –আল বাইয়িনা : ১

'হজরত উবাই রাজিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ কি আমার নাম করে আদেশ দিয়েছেন ? বললেন : হ্যাঁ, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, স্রষ্টা কি স্বয়ং আমার নাম স্মরণ করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাবী বলেন, এ কথা শুনে তাঁর দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।' – বুখারী, মুসলিম, আহমদ

ছয়

ইবাদতের অর্থ

সাহাবা কিরাম দ্বারা প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক এবং সার্বিক প্রগতির রহস্য এটাই ছিল যে, তারা সুরীতি তথা সঠিক ভিত্তিতে আল্লাহর সাথে সমৃদ্ধ ছিলেন। অতএব তাঁরা আল্লাহর জন্য সার্বিক প্রচেষ্টায় কোনো দুঃখ-কষ্টের আভাস পেতেন না, আর বিস্ময়াভিভূতও হতেন না।

মানুষের মধ্যে দুটি স্বভাব লক্ষ করা যায় : মহত্ত্বের অভ্যাস ও কৃতজ্ঞতাবোধ। অতএব যখন আপনি কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, কোনো সুন্দর চিত্র অথবা অলঙ্কার সমৃদ্ধ কোনো লেখা দেখেন বা শোনেন তখন আপনি কেবল তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব অনুভবই করেন না ; বরং তার রচয়িতা বা আবিষ্কর্তার মহত্ত্ব যা শ্রেষ্ঠত্বের অনুভবও হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং তার গভীর বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আপনাকে বাধ্য করে তোলে।

এ রকমই যখন কেউ আপনার উপকার করে অথবা আপনাকে কোনো মূল্যবান বস্তু প্রদান করে বা উপহার দেয় তখন আপনি তার উপকারের কথা স্মরণ রাখেন আর কতটা লাভ আপনি তা থেকে পান সেই অনুপাতে আপনি তার প্রশংসা করেন এবং আপনার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে যায়, যেমনটি কবি বলেন :

'তব উপকার আমার তিনটি বস্তু করেছে হরণ।
আমার এ হাত এই জবান আর আমার গভীর মন ॥'

আল্লাহর রসুল ওপরে বর্ণিত দুটি স্বভাবকে উচ্চতম উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এসেছিলেন। আপনি কি কারো মাহাত্ম্য থেকে সুপ্রসন্ন হন না অথবা মহান ব্যক্তিকে সম্মান দেন না ? আপনি কি উপকারির উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হন না ?

আপনি বায়ুযানের আবিষ্কর্তার মাহাত্ম্যের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং যখন তাকে উড়তে দেখেন তখন তার আবিষ্কর্তার চমৎকারিত্বের অনুভব আরো তীব্র হয়ে ওঠে। অনন্তর আপনি সেই অস্তিত্বের বিষয়ে কী মনোভাব পোষণ করেন, যিনি আকাশের অগণিত নক্ষত্রকে নিয়ন্ত্রিত করছেন এবং যারা অন্তরীক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে পরিক্রমা করছে ? এ ক্ষেত্রে ঐ শক্তি বিষয়ে আপনার কী অভিমত, যিনি এই বায়ুযানের আবিষ্কর্তাকে এই বুদ্ধি দান করেছেন এবং তাঁর মনের গভীরে এমন প্রতিভা রেখে দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি এই বিচিত্র এবং আশ্চর্যজনক চমৎকারিত্ব দেখালেন ? আকাশের প্রভু এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রভু কি সর্বাধিক মাহাত্ম্যের পাত্র নন যে, আপনি তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করেন এবং যিনি আপনাকে প্রত্যক্ষ গোচর দৃষ্টিতে শক্তি ও সামর্থ্যের নিশানা দেখান ?

যদি আপনি তাঁর মাহাত্ম্যের পরিচয় ঐ দৃষ্টি মাহাত্ম্য দ্বারা অনুভব করেন, যা আপনার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাহলে আপনি লজ্জায় অবনত হয়ে পড়বেন এবং ইশ্বর পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে চিৎকার করে বলে উঠবেন :

'হে আমাদের প্রভু ! তুমি এসব ব্যর্থ সৃষ্টি করোনি। তুমি মহিমময় ! অনন্তর তুমি আমাদের আগুন (জাহান্নাম)-এর শাস্তি থেকে রক্ষা করো।' –আলে ইমরান : ১৯১

আপনি একজন দ্বীনহীন ব্যক্তি এবং এক দানশীল ব্যক্তি আপনাকে আতিথ্য দিচ্ছেন আর আপনি তার মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন দেখবেন এবং আপনি তাকে উদার হৃদয় ব্যক্তি হিসেবে পাচ্ছেন, তো এমতাবস্থায় আপনি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন এবং আপনি তার এই ব্যবহারের সুপ্রতিফল দেয়ার চেষ্টা করবেন এবং আপনার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সর্বদাই তাঁর প্রশংসা করবেন। অনন্তর সেই মহান শক্তি (আল্লাহর) বিষয়ে আপনার কী মনোভাব যিনি মায়ের কোল থেকে কবর পর্যন্ত তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার অধীনে রেখে দিয়েছেন ? আপনি তাঁর দেয়া অন্ন ভোজন করছেন, তাঁর দেয়া বস্ত্র পরিধান করছেন, তাঁরই আশ্রয়ে লালিত হচ্ছেন এবং তারই সহায়তায় কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করছেন !

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে তার প্রভুর মাহাত্ম্যের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা বোধের দ্বারা সম্বন্ধিত করে দিয়েছেন। অতএব, মানুষ যখন তাঁর আজ্ঞা পালনে সন্তুষ্ট হয়ে যায় তখন লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজে নিজে আন্তরিকভাবে এবং পূর্ণ অঙ্গীকারের সাথে আল্লাহর মহান অস্তিত্বের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করবে। ইবাদত দমন এবং আজ্ঞা পালনের পরিণামমাত্র নয় ; বরং তা প্রেম ও অঙ্গীকারের আজ্ঞাপালন। সে ইবাদত অজ্ঞানতা ও গাফিলতির ইবাদত মাত্র নয় ; বরং তা জ্ঞান ও আধ্যাত্ম ও চেতনাপূর্ণ আজ্ঞাপালন।

প্রায়শ শাসন কর্তৃপক্ষের দিক থেকে মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা হয়ে থাকে এবং ব্যবসায়ীদের বাধ্যতামূলকভাবে তা স্বীকার করতে হয় অথবা রাজা তার দর কমিয়ে দেয় কিন্তু কর্মচারীরা তাকে অপ্রসন্নভাবে স্বীকার করে নেয়।

সাধারণত আপনি পশুদের ইশারায় ডাকেন আর সে আপনার পিছু অনুসরণ করতে থাকে যদিও সে জানে না যে, আপনি তাকে চারণক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছেন না বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছেন। উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের আজ্ঞাপালন সেই ইবাদতের ভাব থেকে ভিন্ন, যা আল্লাহ ফরজ করেছেন। যেমন এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় :

(প্রভু !) আমরা তোমারই উপাসনা করি আর তোমারই সাহায্য চাই।–আল ফাতিহা

এবং যে ইবাদতকে অস্তিত্বের তত্ত্বদর্শিতা এবং জীবনের লক্ষ্য নিশ্চিত করা হয়েছে :

'আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।' – আল জারিয়াত : ৫৬

এর অভিপ্রায় সেই হীনতা এবং বিনয়ের সাথে সম্পর্কিত, যা জ্ঞান, পরিচয় এবং প্রেমের সাথে একীভূত হবে অর্থাৎ আল্লাহর মহিমার প্রতি বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার ভাবনা থেকে উৎসারিত আজ্ঞা পালন হবে। কুরআনের অনেক আয়াত এই বিষয়ে মুসলমানদের পথপ্রদর্শন করে। ধরিত্রীর বুকে ছড়িয়ে থাকা নিশানাবলি একদিকে মানুষকে ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রদান করে তো অন্যদিকে তার অনুপম প্রকৃতি তার অসংখ্য উপকরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং চোখ থেকে অজ্ঞানতা ও অবজ্ঞার পর্দা সরিয়ে দেয় :

'তিনি আল্লাহই, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার দ্বারা তোমাদের রুজির উপকরণরূপে তা থেকে ফলমূল উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকা বা জাহাজকে তোমাদের সেবাকার্যে লাগিয়েছেন যে (যেন) তার আদেশে চলতে পারে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবাকার্যে লাগিয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন, যা নিরন্তর পরিক্রমা করেছে এবং রাত ও দিনকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন এবং তোমাদের তিনি বহু কিছু দিয়েছেন, যা তোমরা তার কাছে চেয়েছ, যদি তুমি আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে গণনা করতে চাও তাহলে তা পুরোপুরি গণনা করতে সমর্থ হবে না। বাস্তবে মানুষ বড়ই অন্যায়ী ও অকৃতজ্ঞ।' – ইব্রাহিম : ৩২-৩৪

মানুষ শক্তি এবং ঘৃণার দ্বারা কার্য সাধন করতে পারে না। সেই কাজই সু-রীতিতে সুসম্পন্ন হয় যখন তা আন্তরিক প্রসন্নতা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে সাধিত হয়। ব্যক্তি যখন কোনো আকিদার প্রতি চিন্তাপূর্বক এবং আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হয় তখন তার অস্তিত্ব তাকে পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে দেয়, প্রতি মুহূর্তে তার জন্য গতিশীল থাকে এবং শয়নে-স্বপনে জাগরণে তাতেই মশগুল থাকে। এ ভাবনা সিদ্ধান্তকে বুঝতে এবং তার উত্তমোত্তম সেবা করতে যথেষ্ট সহযোগ সিদ্ধ হয়, এ কারণে ইসলাম কেবল সৈদ্ধান্তিক ঈমানকে পর্যাপ্ত বলে মনে করে না এবং তাকে ঐ সময়েই স্বীকার করে যখন সে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সিঁড়ির কাজ করে। অর্থাৎ মানুষ বুদ্ধি ও ভাবুকতার সাথে ঈমান আনবে।

ঈমানের বিষয়ে অন্তর্প্রবৃত্তির সৌন্দর্য আবশ্যক। সেই ব্যক্তি মুসলমান নয়, যে আল্লাহকে চেনে কিন্তু তাকে ঘৃণা করে এই রকমই সেই মুসলমানের কোনো গুরুত্ব নেই, যে আল্লাহর জ্ঞান তো লাভ করেছে কিন্তু তার প্রবৃত্তি শূন্য ও মৌন আর তাতে উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা না থাকলেও তার সাথে কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব রয়েছে।

বাস্তবিক অর্থে মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যে বিশ্বাসের শেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহর সাথে পরিচিত এবং তার মধ্যে এ আভাসও থাকবে, যে ঐ মহিমাময় আল্লাহর মাহাত্ম্য ও নিয়ামতরাজিকে স্বীকার করে।

এই প্রচারের ঈমানই ফলদায়ক হয়ে থাকে। এরই মাধ্যমে চমৎকারিত্ব প্রত্যক্ষ হয়, এরই মাধ্যমে দেশ গড়ে এবং এই সভ্যতার জন্ম দেয়। এই ঈমানই কষ্টকে মধুর করে তোলে। অতএব ব্যক্তি দ্বীনের বক্তব্য ও দাবিকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করে নেয়।

আপনি কি মনে করেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন এবং দীর্ঘ সময় যাবৎ নামাজরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে শরীরকে ক্লান্ত, পীড়িত ও কষ্ট-যন্ত্রণায় পেরেশান করে তুলতেন ?

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারটি এরকম ছিল না ; বরং আল্লাহর স্তুতি তাঁর প্রশংসার শিষ্টতা এবং বিনম্রতা ও সীমাহীন আল্লাহভীতি এ সমস্ত বস্তুকে ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং কিছুক্ষণ যাবৎ দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টকে তিনি জয় করে নিয়েছিলেন।

সাহসী, শক্তিশালী এবং আবেগদীপ্ত ব্যক্তি কখনো কখনো কাজ করে এবং নিরন্তর করতে থাকে এমনকি তার এ কাজ এবং পরিশ্রম ঐ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে অলসতা ও মন্দবুদ্ধির পক্ষে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে যায়।

ঈমানদার এবং দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তির ব্যবহার এবং কাজের মানদণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয় এবং ভ্রান্ত শঙ্কাগ্রস্ত ও উদ্যমহীন ব্যক্তির হয় আরেক রকম। হজরত হুজাইফা বিন ইয়ামানকে দেখুন, তিনি খন্দক যুদ্ধের অবসরে মুশরিক-পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করছিলেন । রাতে ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আকাশ মেঘ ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। এক কবির মতে :

'ঠাণ্ডা এমন কঠোর ছিল যে, সাহস ছিল না বাইরে যাবার।
কুকুর কেবল করছিল ছোটাছুটি ঘর ও বার।'

এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাতে হুজাইফা বিন ইয়ামান তাঁর কর্তব্য পূরণ করতে গিয়েছিলেন। তার বর্ণনা মতে, মনে হচ্ছিল 'আমি হিমেল সাগরে সাঁতার কাটছিলাম।'

এ ছিল ঈমানের উত্তাপ, যা এই মুমিন পুরুষকে দিয়ে সেবা করিয়ে নিচ্ছিল এবং তাকে এর যোগ্য করে তুলছিল যে, তিনি রাতের আঁধার চিরে নিজের কর্তব্যকর্ম সমাধা করছিলেন যেন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে গেছে !

অগ্নিবর্ষক চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে এই ঈমান আবর্তিত হচ্ছিল। যিনি ভীষণ যুদ্ধ করেছিলেন এবং স্পষ্ট বিজয়ও লাভ করেছিলেন এবং ঈমানের বলেই শতাব্দীর জমি-জায়গা সংক্রান্ত হিংসা হানাহানি অত্যাচারের নেতৃত্ব ও জমিদারিকে উৎখাত করে ফেলা হয়েছে।

এর মূল ভিত্তি ছিল বুদ্ধি এবং ভাবনার সাথে ঈমানি-প্রকাপের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ, যাকে আল্লাহর পরিচয়, মহিমা এবং নিয়ামতরাজির আভাসের ভাবনাকে সুতৃপ্ত করে তুলেছিল ।

আল্লাহর সাথে পরিচিত করিয়ে তুলতে কুরআনের শৈলীও এটাই । এ এমনই একটা শৈলী, যা মানবতাকে হীনতা তথা অপমানের বন্দেগির উপরে নয় ; বরং আল্লাহর প্রেমে লীন হওয়ার বন্দেগিতে স্থির রাখে । কৃতজ্ঞতার স্বীকার তথা আল্লাহর মহিমারূপ স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে সে আল্লাহর দাস বনে যায়, অস্পষ্ট বা স্পষ্ট থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখে, যা মানব সংকল্পকে হত্যা করে এবং মানুষের মান মর্যাদা অস্বীকার করে :

'(হে নবী) বলো : প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি, যিনি তাঁদের নির্বাচিত করেছেন । (তাদের জিজ্ঞাসা করো) আল্লাহ কি সর্বোত্তম না যাদের তারা আল্লাহর অংশী ভাবে তারা ? তিনি কে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন তারপর তার দ্বারা আমি শোভা বাগিচা সৃষ্টি করেছি । তাদের জন্য বৃক্ষ উৎপাদন করাটা তো তোমার কাজ ছিল না । আল্লাহর সাথে আর কোনো উপাস্য আছেন ? না, বরং এরাই বিপথগামী হচ্ছে ।

তিনি কে, যিনি এই পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন, আর তার মাঝে মাঝে নদনদী প্রবাহিত করেছেন আর তাকে স্থির রাখার জন্য অটল পর্বত সৃষ্টি করেছেন এবং দুই সাগরের মধ্যবর্তী স্থলে স্থাপন করেছেন ? আল্লাহ ছাড়া কি আর কোনো উপাস্য আছে ? না ; বরং তাদের অধিকাংশই জানে না !

তিনি কে যিনি ব্যাকুলিত মানুষের বিনয়াবনত প্রার্থনা শোনেন, যখন সে তাকে আকুলিতচিত্তে ডাকে আর তিনি কষ্ট দূর করে দেন । আর (তিনি কে যিনি) ধরিত্রীতে তোমাকে অধিকার প্রদান করেন ? আল্লাহর সাথে আর কোনো উপাস্য আছে ? তোমরা বড় কমই মনোযোগ দিয়ে থাক । তিনি কে, যিনি ভূমি ও সমুদ্রের ঝড়োচ্ছ্বাসের মধ্যে তোমাদের পথ দেখান আর কে, যিনি তার অনুগ্রহ (বর্ষা) বর্ষণের আগে আগে হাওয়াকে সুসংবাদ দানকারীরূপে প্রেরণ করেন ? আল্লাহর সাথে কি আর কোনো উপাস্য আছে, আল্লাহ সেই সমস্ত শিরকের অনেক উর্ধ্বে, যা তারা করে ।

তিনি কে, যিনি প্রথবার সৃষ্টি করেন এবং তাকে পরেও সৃষ্টি করেন । আর কে তোমাদের নভোমণ্ডল ও ধরিত্রী থেকে জীবিকা দান করেন ? আল্লাহর সাথে কি আর কোনো উপাস্য আছে ? বলো, নিয়ে এসো তোমাদের প্রমাণাদি, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।' – আন নমল : ৫৯-৬৪

এ ধরনের নিরন্তর প্রশ্ন মানুষের মন ও মস্তিষ্কে ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেয় আর তার শিরকের মিশ্রণকে ঘৃণা করে আল্লাহর বিশুদ্ধ ইবাদতের দিকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে দেয়।

অধিকতর ভাবসমৃদ্ধ এবং চিন্তা-ভাবনায় পূর্ণ আয়াতরাজি এরকমই ঘোর বাস্তবতার চারদিকে পরিক্রমা করতে থাকে।

মন যখন বিভ্রান্ত হয় তখন তাকে এক প্রকারের চেতনাত্মক দণ্ড তথা অবজ্ঞার বিরুদ্ধে ধমকানির প্রয়োজন হয়। এ বস্তু আনিবার্যত সেই মূলের বিরুদ্ধেও নয়, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, পিতা যদি তার পুত্রের উপর কঠোর আচরণ করে তাহলে এই কঠোরতা তার দয়ালুতা বা বিনম্র স্বভাবকে বদলে দিতে পারে না।

কুরআন যখন ঐশ্বরিক শক্তির চিহ্নাবলিকে প্রকাশ করতে করতে মানুষের যোগ্যতাবলিকে গতিশীল করে তোলে তখন সাথে সাথে ঝাটকাও দেয়, যাতে অনুভূতি ও চেতনা জাগ্রত হতে পারে এবং সুপ্তবুদ্ধিও আকৃষ্ট হতে পারে। তা এজন্যই নয় যে সে, গোল্লায় যাবে অথবা কাপুরুষ হয়ে উঠবে। আল্লাহতালা বলেন :

'তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর ধরিত্রীর বুকে তা প্রবাহিত করেছেন, তারপর তার পানি দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফলমূল উৎপাদন করিয়েছেন, তারপর তা (ফসল থেকে) শুকিয়ে যায়, তারপর তুমি দেখ যে, তা হলুদবর্ণ হয়ে যায়, তারপর তাকে ভূমি বানিয়ে দেয়া হয়, নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিশালীদের জন্য।' –আজ জুমার : ২১

এরপর বলেন :

'অনন্তর, আল্লাহ (ঐ ব্যক্তির) যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মোচন করে দিয়েছেন, সে তার প্রভুর পক্ষ হতে আলোকপ্রাপ্ত। অনন্তর ধ্বংস তাদের, যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে শূন্য হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। এরা প্রকাশ্য বিপথগামিতার মধ্যে পড়ে আছে।' – আজ জুমার : ২২

স্বয়ং আল্লাহর রসুল ঈমানের বীজ রোপণ করে তার নিজের তত্ত্বাবধানে একে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ ও প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে তাঁর ব্যবহার এক জীবিত উপদেশতুল্য, যা হৃদয়কে আল্লাহর মহিমা এবং প্রতাপের অনুভূতিতে পূর্ণ করে তোলে। তাকে আল্লাহর প্রতি অবজ্ঞা থেকে দূরে রাখে এবং তার আদেশ পালনের জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ করে তোলে । এভাবে হৃদয় আল্লাহর পথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত এবং তার সাথে আর কোনো প্রকারের অবজ্ঞাই অবশিষ্ট থাকত না।

জুবাইর বিন মুতইম রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের নামাজে 'সুরা তূর' পড়তে শুনলাম, যখন তিনি এই আয়াতগুলোতে পৌঁছালেন :

'এসব কি কারো ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে ? না নিজে-নিজেই সৃষ্টি হয়েছে ? অথবা এরাই কি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে ? না ; বরং এরা বিশ্বাস করে না। এদের কাছে কি তোমার প্রভুর কোষাগার রয়েছে ? অথবা এরা কি তার তত্ত্বাবধায়ক ?- আত তুর : ৩৫-৩৭

'তখন আমার মনে হলো যে আমার মন উড়ে যাচ্ছে।' – বুখারী

ঈমান যখন গভীর হৃদয়ে জন্মলাভ করে গভীর অনুভূতির সাথে একাকার হয়ে যায়, তখন মানুষ বিশুদ্ধ বিশ্বাসের মূল্যবান বাণীটিই লাভ করে। এ হলো সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ নৈতিকতা ও উচ্চতর গুণাবলির ভূমিকা, যা মুমিনদের উচ্চ মর্যাদা দান করেছে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে এবং এই হাদিসের অর্থ এটাই যে :

'যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণ আছে, ঈমানের স্বাদ সেই পেয়েছে, যার কাছে আল্লাহ ও তার রসুল দুনিয়ায় সমস্ত কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়, যে কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসলে আল্লাহর জন্য বাসে, কুফরি থেকে মুক্তিলাভের পর তাতে আবার ফিরে যাওয়াটা আগুনে লাফ দেয়ার সমান বলে মনে করে।' –বুখারী, মুসলিম

এতে এ কথাও আছে যে, রিসালাতের প্রতি ঈমান তথা রসুলের প্রতি সম্মান এত বেশি হবে যে ব্যক্তি তার নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যাবে এবং তা ভয় বা কষ্টের কারণ নয় ; বরং প্রেম তথা আত্মসমর্পণের সাথে রিসালাত ও রসুলের উপর নিজের জীবন ও সম্পদকে উৎসর্গ করে দেবে।

'আব্দুল্লাহ বিন হিশাম রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম, তিনি হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরে রেখেছিলেন। হজরত উমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল ! আপনি আমার প্রাণ ছাড়া আর সমস্ত বস্তুর চেয়ে অধিক প্রিয়। আল্লাহর রসুল বললেন : 'না ! সেই সত্তার কসম, যার অধীন আমার জীবন, সেই সময় পর্যন্ত ঈমান পুরো হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমার প্রাণের চেয়েও তোমার অধিকতর প্রিয় না হয়ে যাই।' হজরত উমর নিবেদন করলেন : 'এখন থেকে আপনি আমার প্রাণের চেয়েও অধিকতর প্রিয়।' তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'উমর ! এখন তোমার ঈমান পুরো হয়ে গেছে।' –বুখারী, আহমদ

এই হাদিসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে– লোক স্যামুয়েলের নিষ্ঠাবাদিতা ও ব্যবহারকে বড়ই সম্মান করেছে, যখন তিনি তাঁর পুত্রকে বলি দেয়ার জন্য ছেড়ে দেন, যাতে এ কথাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যে, তার আশ্রয় সুরক্ষিত তথা যিনি আমানতদার বানিয়েছিলেন তাকে যেন তার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে পারেন।

ব্যক্তি যখন তার মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের জীবনকেও বাজি ধরে, তখন সে মনে করে যে, সে তার দায়িত্ব বা কর্তব্য সমাধা করেছে।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের কাছে কখনো এ দাবি করেননি যে, তারা তাদের শরীরকে অপ্রয়োজনীয় কিছু মনে করুন আর না তিনি এ দাবি করেছিলেন যে, তাঁর উদ্দেশে তাঁরা নিজেদের জীবন কুরবানি করে দিন, যাতে তিনি জীবিত থাকতে পারেন, তারা নিজেদের হীনাতিহীন মনে করুন, যাতে তিনি (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান হতে পারেন, অথবা নিজের জীবন যৌবন-ধন-মানকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্য উৎসর্গিত করে দিন অথবা লোকে এ জন্যই তার আজ্ঞা পালন করুন, যাতে তিনি নিজেকে তাদের উপর খোদায়িত্বের ভাব জমিয়ে নিতে পারেন, যেমনটি ফিরাউন ও অন্য অত্যাচারীরা চালিয়েছিলেন।

কখনোই নয়, এ সবের কোনো দাবিই তাঁর ছিল না। তিনি তো কেবল এটাই চাচ্ছিলেন যে, মুসলমানরা তাঁর রিসালাতের কাজের মর্যাদা দিন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুসারী হোন। মৃত্যুর চিহ্ন এবং প্রতীক ও গণ-অনুকম্পার ভাণ্ডার, যা তার অস্তিত্বের সাথে নিহিত ছিল তারা তাকে সুরক্ষিত করেন।

নবী-রসুলগণ তাঁদের নিজেদের জন্য জীবিত থাকেন না এবং তাঁদের উপর যে কষ্ট ও কঠিনতা আসে তা তাঁর নিজের বা পরিবার-পরিজনের কারণে আসে না। তাঁরা সমগ্র সৃষ্টির জন্য জীবিত থাকেন। তাঁরা কি পূর্ণ হিদায়েত ও গণ-উপকার বা কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু হন না ?

অতএব এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে ত্যাগ, বিসর্জন এবং আত্মোসর্গের ভাবনা ঈমানের মূল এবং পূর্ণতার বন্ধনের অস্তিত্ব থেকে আসে। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেই ভালোবাসার পাত্র, যাঁর জন্য সমস্ত কিছুই বিসর্জন দেয়া যায়। দুনিয়া এ রকম কোনো ব্যক্তির সাথে আজো পরিচিত হয়নি, যাঁর এতটা শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে অঙ্কিত হতে পারে এবং যাঁর সম্মান এবং প্রেমভাবে মানুষ উৎসর্গিত হতে পারে, যত সম্মান, ভালোবাসা ও মর্যাদা শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাভ করেছিলেন।

সাত
নেতৃত্ব – যার উপর প্রাণ নিবেদিত হচ্ছিল

হজরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আসেন তখন তাঁর কাছে আগমনকারী লোকদের মিছিল শুরু হয়ে গেল। তাঁদের অন্যতম ছিলাম আমি। যখন আমি তাঁর মুখ প্রথম অবলোকন করলাম এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম

তখন আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, এ মুখমণ্ডল কোনো মিথ্যুক ব্যক্তির হতে পারে না। আমি সর্বপ্রথম যে কথাটি তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে শুনেছিলাম তা হলো এই :

লোকসকল ! সালাম ছড়িয়ে দাও, পানাহার করাও, রাতে যখন লোকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে তখন নামাজ পড়ো, তাহলে শান্তি ও সন্তুষ্টির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' – তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকিম, আহমদ

মনের আলো মুখেই ফুটে ওঠে, যাতে মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা পবিত্রতার ভাষা পড়ে নেয়া যেতে পারে। হজরত আব্দুল্লাহ এই মহান মুহাজিরের আগমন সংবাদ প্রত্যক্ষ করতে গিয়েছিলেন। অনন্তর প্রথম দর্শনেই তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত হলেন এবং সন্তোষ লাভ করলেন যে, এ ব্যক্তি মিথ্যুক হতে পারেন না। কোনো ব্যক্তির বৌদ্ধিক এবং নৈতিক ঝলক প্রথম দর্শনেই গোচর হয় না ; বরং সেই নৈতিক ছাপ, যা এই মহান রুহের উপর প্রত্যক্ষ ছিল তা আন্তরিক সততার বিষয় বনে গেল।

তা সত্ত্বেও যাঁরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসঙ্গতি লাভ করেছিলেন তারা তাঁকে প্রেমোন্মত্তের ন্যায় ভালোবেসেছিলেন। তাঁরা এই প্রেমের পথে জীবন উৎসর্গ করতে কিংবা নখ উপড়াতেও পরোয়া করেননি। এই প্রেমের কারণ কেবল এটাই ছিল যে, যে শ্রেষ্ঠত্ব তিনি লাভ করেছিলেন অন্য কারো পক্ষে সে স্থানে পৌছানো ছিল একেবারেই অসম্ভব। এই শ্রেষ্ঠত্ব মানুষকে প্রভাবিত করত।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্ত করে দেয়া দাস হজরত সওবান তাঁকে বড়ই ভালোবাসতেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া তাঁর মন মানত না। একদিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন, দেখলেন তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে বসে আছেন। তাঁর মুখে শোক ও দুঃখের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তখন আল্লাহর রসুল জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার ? তোমার চেহারা মলিন কেন ? তিনি জবাব দিলেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমি না রোগী আর আমার না আছে কোনো কষ্ট। কিন্তু আপনার থেকে দূরে থাকলে আমি এ রকমই বিক্ষিপ্ততা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করি, আর যখন আখিরাতের কথা স্মরণ করি তখন শঙ্কা জাগে যে, সেখানে আপনার সঙ্গ পাব না, কেননা তখন আপনি ইল্লিয়িন[১]-এ নবীদের সাথে অবস্থান করবেন। আর যদি আমি জান্নাতবাসীও হই তাহলে সেখানে আমার স্থান হবে সবার নিচে আর যদি জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে

---

১. ইল্লিয়িন এক পবিত্রতম স্থান– অনুবাদক

যাই তাহলে তো আপনার দর্শন কোনো দিনও পাব না।' এই অবসরে এই আয়াত অবতীর্ণ হলো :

'যে আল্লাহ ও তার রসুলুল্লাহর আদেশ মেনে চলবে সে ঐ লোকদের সাথে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, (তাঁরা) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যাত্মা মানুষ। আর এঁরা কেমন উত্তম সাথি। – আন নিসা : ৬৯

'হাদিসে আছে, যারা যাদের অনুসরণ করে কিয়ামতে তারা তাদের সাথি হবে।' –বুখারী, মুসলিম

অভিপ্রেত, কামবাসনায় প্রেম নয় ; বরং আদর্শের প্রেম। কেননা, ব্যক্তি যখন নিজের মতো অথবা নিজের চেয়েও উচ্চতর ব্যক্তিকে ভালোবাসে তখন তার প্রেম হৃদয়কে তার গুণাবলির জন্য উদার বানিয়ে দেয়, যিনি সেই মহান ব্যক্তিদের অন্যতম হন এবং তাঁর যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়।

অনুদার এবং কৃপণ ব্যক্তি সাহস ও দানশীলতার গুণাবলিকে স্বাগত জানায় না। এর মাহাত্ম্য সেই বুঝতে পারে, যে নিজেই সেই গুণাবলির সাথে পরিচিত। আল্লাহর ফজল যে, মহান ব্যক্তিরা এমন অনুসারী লাভ করেন, যারা মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যপ্রেমী হয়ে থাকেন। এজন্য উপরোক্ত আয়াতের পর আল্লাহ বলেন :

'এ আল্লাহর অপার অনুগ্রহ আর জ্ঞানের বিচারে আল্লাহ যথেষ্ট।'– আন নিসা : ৭০

একথা সত্য যে, প্রেমের অনুসারী সচ্চরিত্র ও সুশীল হয়ে থাকে। জগতে এমন কৃপণ ও তুচ্ছ ব্যক্তির অভাব নেই যে নিজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলে অন্যকে তুচ্ছ ও হীন ভাবতে থাকে, আর যদি নিজেরা হীন হয় তাহলে তারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ঘৃণা করতে থাকে। জানি না তাদের হৃদয় এ দ্বেষ, ঘৃণা ও হীনতা থেকে কবে মুক্ত হবে। কিন্তু যারা সিদ্ধান্তে কঠোর এবং শুদ্ধপ্রেমী হয় তারা তাদের সিদ্ধান্তের বা মতের ব্যক্তিকে যেখানেই পাবে সেখানেই ঘিরে ধরবে। তার প্রতি প্রেম থেকে তাদের চোখ অলোকিত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্তের বিমুখতা প্রকাশ হয়ে পড়বে, যা তার অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে এবং যারা তার মাধ্যমে শক্তি লাভ করছে।

আপনার প্রভু এই বিশ্বাসকে নিঃশেষ করেন না, আর তাঁকে অনুসরণকারী ব্যক্তিকে বিনষ্ট করেন না।

'হজরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, যখন সেই দিন এল, যখন নবী মদিনায় প্রবেশ করলেন তখন সেখানকার প্রতিটি বস্তু আলোকমান হয়ে উঠল আর যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এল তখন প্রতিটি বস্তু অন্ধকারময় হয়ে উঠল আর আমরা তাঁর অন্ত্যেষ্টি ব্যবস্থা থেকে নিবৃত্ত হতে না হতেই আমাদের হৃদয় আমাদের কাছে বড়ই অপরিচিত হয়ে উঠল।' –তিরমিজি, হাকিম, আহমদ

ভাবনার উৎফুল্লতা দেখুন, কীভাবে এ উৎফুল্লতা বিচিত্র রং সৃষ্টি করেছে। আবার অভাবের নিরাশাও অবলোকন করুন, কীভাবে প্রতিটি বস্তুতে তার অশুভ ছায়া বিস্তার করেছে।

এই ছিল হিজরতের গন্তব্য স্থানের বৃত্তান্ত যেখানে আল্লাহ ও তার নবীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

এই সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী প্রেমই ইসলামের বৈভবপূর্ণ সাফল্যের মূল রহস্য। এই কারণেই প্রতিটি ব্যক্তি পরম আনন্দের সাথে আত্মদান ও ত্যাগের জন্য তৎপরতা দেখিয়েছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মানই কওমকে শান্তি ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ রাখে এবং সাহস ও বীরত্বের সামনে লম্বা লম্বা ব্যবধানকেও ঘুচিয়ে দেয়।

হজরত হাসান ইবনে আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু, হিন্দ ইবনে আবি হালা রাজিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাঁর সেই শারীরিক সৌন্দর্য ও মুখাকৃতির বর্ণনা দেন এবং এ কথাও বলেন :

'শান্তিপূর্ণ এবং সুদৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে পথ চলতেন দেখে মনে এক পূর্ণ শক্তির সাথে তিনি উপর থেকে নিচের দিকে নামছেন, যখন কারো প্রতি মনোযোগী হতেন, তখন সম্পূর্ণরূপে তার প্রতি আকর্ষিত হতেন। দৃষ্টি অবনত থাকত, আকাশের তুলনায় ধরিত্রীর প্রতি দৃষ্টি দীর্ঘতর হতো, দেখার ঢঙে থাকত লাজুকতা, তার সাথিদের চেয়ে আগে পথ চলতেন আর যার সাথে সাক্ষাৎ হতো তখন সালাম দিয়ে কথাবার্তা শুরু করতেন।'

আমি বললাম : ভাষণ শৈলী সম্পর্কে আলোকপাত করুন, তখন তিনি বললেন :

'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরন্তর চিন্তিত থাকতেন, সব সময়ে ব্যাকুল, বিশ্রামের অবসরই নেই, অনাবশ্যক কথাবার্তা বলতেন না, অধিকাংশ সময়ে মৌন থাকতেন। মুখ খুলে এমনভাবে কথা বলতেন এবং শেষ করতেন, সে সময়ে তাঁর দাঁত দেখা যেত। তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যময় কথাবার্তা বলতেন, কথা বলতেন প্রত্যক্ষ এবং নিঃসঙ্কোচভাবে, যেখানে অনর্থক বাক্য ব্যয় হতো না আবার কমও হতো না। না রুক্ষ স্বভাব আর না অশ্লীল ভাষা। উপকারির প্রতি সকৃতজ্ঞ হতেন, তা সে যেই হোক না কেন। কিছুর নিন্দা করতেন না, আহারের সময় খাদ্যবস্তুর নিন্দা করতেন না। যখন হক (স্বত্ব) এর মামলা আসত তখন অত্যধিক ক্রুদ্ধ হতেন এমনকি তাকে ফিরিয়ে দিতেন, নিজের মামলায় না ক্রুদ্ধ হতেন আর না বদলা নিতেন। যখন ইশারা করতেন তখন পুরো হাত দিয়ে ইশারা করতেন, যখন আশ্চর্য হতেন তখন হাত মোচড়াতেন, যখন ক্রুদ্ধ হতেন

তখন মুখ ফিরিয়ে নিতেন, যখন প্রসন্ন হতেন তখন দৃষ্টি অবনত করতেন, তাঁর হাসি অধিকতরই মুচকি হাসির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।'

ইবনে আবি হালা তাঁর ওঠা বসা বিষয়ে বলেন :

'আল্লাহর রসুল অনাবশ্যক কথা বলতেন না। তাঁর সাথিদের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ও সহানুভূতিশীল ছিলেন, তিনি তাদের কখনো ছিন্নভিন্ন হতে দিতেন না। প্রত্যেক জাতির মধ্যেকার বড় এবং গোত্রগুলোর নেতাদের সম্মান করতেন এবং তিনি তাদের সেই গোত্র ও জাতিগোষ্ঠীর জিম্মাদার নিযুক্ত করতেন। জনসাধারণ সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকতেন, কিন্তু কারো সাথে শত্রুতা বা অবিচার রাখতেন না।

নিজের সাথিদের খোঁজখবর নিতেন, একে অন্যের সাথে কুশলাদি বিনিময় করতেন, ভালোকে ভালো বলতেন এবং তাকে আরো উৎসাহ দিতেন, মন্দকে মন্দ বলতেন এবং তাকে প্রভাবহীন করে তুলতেন। অসাধারণ সব গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। কখনো গাফিলতি করতেন না এই আশঙ্কায় যে, লোকেরাও না গাফিল ও উদ্যমহীন হয়ে যায়।

প্রত্যেক অবস্থার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সামগ্রী রেখে দিতেন, হক বা অধিকারের বিষয়ে সচেতন থাকতেন, কখনোই অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিতেন না।

যে বিনম্রতার সাথে মিলিত হতো, তিনি তাকে উত্তম মনে করতেন যে অধিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হতো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত লোক তারাই হতো, যারা অন্যের সহানুভূতি এবং সহযোগিতামূলক আচরণ করত।'

তারপর তার বৈঠককালীন অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন :

'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠতে বসতে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণে লীন হয়ে থাকতেন। নিজের জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট করতেন না, আর না বিশেষ কোনো স্থান। যেখানে সভা সমাপ্ত হতো সেখানেই বসে যেতেন এবং সবাইকে এভাবেই বসতে বলতেন, প্রত্যেক সাথিকে পূর্ণ সুযোগ দিতেন, যাতে একথা কেউ মনে না করতে পারেন যে, তিনি অমুক ব্যক্তিকে তো অধিক সম্মান ও গুরুত্ব দিচ্ছেন। কেউ তার কাছে এসে বসলে বা দাঁড়ালে তিনি নীরব থাকতেন। কোনো ব্যক্তি তার কোনো প্রয়োজনীয়তার কথা বললে তিনি তা পুরো করতেন অথবা বিনম্রতাপূর্ণ উত্তর দিতেন। তার সুশীলতায় সমস্ত মানুষই প্রভাবিত ছিল, যেন তিনি সবার পিতা ছিলেন এবং সমস্ত সত্যের প্রশ্নে তিনি যেন তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেতেন। তারা তাঁর কাছে আল্লাহভীতির ভিত্তিতেই একত্রিত থাকতেন, তাঁর মজলিস হতো শান্তিময়, সৌহার্দ্যপূর্ণ, লজ্জাপূর্ণ এবং আমানতদারদের মজলিশ সেখানে উচ্চৈঃস্বরে

কোনো কথাবার্তা হতো না, কোলাহল হতো না, পরনিন্দা, পরচর্চা হতো না, লোক আল্লাহভীতি ও সংযমের কারণে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল রাখত, বড়দের সম্মান করত, জরুরত মন্দের জরুরত পুরো করা হতো এবং অপরিচিতকে সাদর আমন্ত্রণ জানাত।'

তাঁর জীবনী বিষয়ে বলেন :

'তিনি রূপবান, সুশীল এবং বিনয়নম্র হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি কঠোর হৃদয় বা নিষ্ঠুর ছিলেন না। কোলাহল এবং অশ্লীল বাক্যাবলির সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। নিন্দা-ভর্ৎসনা করতেন না, কাউকে অধিক প্রশংসা করতেন না, যা তিনি পছন্দ করতেন না, তা উপেক্ষা করতেন। নিরাশার মতো বস্তু তার থেকে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থান করত। তিনটি বস্তু থেকে সবসময়ই নিজেকে রক্ষা করে চলতেন। কাউকে নিন্দা করা, কারো দোষ বের করা, পর ছিদ্র অন্বেষণ করা। তিনি সেই বিষয়ে কথা বলতেন, যাতে সুফল আশা করা যেত, তিনি কথা বললে তাঁর সাথিরা এমনই নীরব থাকতেন, যেন মাথায় পাখি বসে রয়েছে। তিনি যখন নীরব হতেন লোক তখন কথা বলত। তাঁর কাছে কেউ কখনো তর্ক-বিতর্ক করত না। যে ব্যক্তিই তার সাথে আলাপ করত লোক তা মনোযোগ সহকারে শুনত তার কথা শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তিনি সেই কথায় হাসতেন, যে কথায় তাঁর সাথিরা একমত। যে বিষয়ে তার সাথিরা আশ্চর্যান্বিত হতেন তিনিও তাই হতেন। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির মন্দ আচরণকে সয়ে যেতেন আর বলতেন, তোমরা মুখাপেক্ষী মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ো আর প্রশংসার আশা তো সেই সত্তার কাছে করতেন, যিনি প্রতিফলদাতা।' – তিরমিজি

এসব ছিল সেই সমস্ত চিহ্ন, যা তাঁর জীবনীতে সাহাবা কিরাম দেখতেন।

কিন্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সুআচরণ, সুব্যবহার ও সুশীলতাগুণে গুণান্বিত ছিলেন, মানুষ তার মর্ম রহস্যের কোনো ঠিকানা খুঁজে পেত না। মানুষ যেখানে বড় লোকদের বিষয়ে পূর্ণ পরিচয় খুঁজেও পায় না সেখানে সেই মহান ব্যক্তির রহস্য কীভাবে খুঁজে পেতে পারে। যাঁর আচরণ এবং নৈতিকতার ভিত্তি ছিল কুরআন ? যে জাতি মদিনায় সৃষ্টি হয়েছিল তা শ্রেষ্ঠত্বের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁরা কেবল আল্লাহর জন্য কাজ করতেন এবং জিহাদে ব্যস্ত থাকতেন আর পুরো সাহস ও বিশ্বাসের সাথে অভীষ্ট গন্তব্যের প্রতি গতিশীল থাকতেন। তাঁরা তাঁদের নবীর আশপাশে এমনভাবে বসতেন, যেন মনে হতো শিষ্যরা গুরুকে ঘিরে বসে আছেন অথবা সৈন্যদের সেনাপতির পিছনে ছুটে যাওয়ার মতো কিংবা শিশুর তার পিতাকে জড়িয়ে ধরার মতো।

এই উম্মত ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে নিজেদের একাত্মতা পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন যেন একটি দেহ, যা সর্বদাই গতিশীল ছিল। তাদের অবস্থান ছিল মজবুত ইটের ন্যায়, যার দ্বারা একটি মজবুত ভবন নির্মাণ করা যায়।

এই উম্মত ন্যায়ের ভিত্তিতে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তাদের প্রতিবেশে কারো প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা হতো না, আর কোনো অসহায় তাদের কৃপা থেকে বঞ্চিত হতো না।

যদিও এ সমস্ত লোক প্রথম থেকেই জুলুম-অত্যাচারে অভ্যস্ত ছিলেন কিন্তু ইসলাম তাদের অতীত ভুলিয়ে দিয়েছিল। যে ব্যক্তি তাঁর অজ্ঞানতা এবং কুফরি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়েছিলেন, সেখানে তাঁদের অতীতের দিকে ফিরে তাকানোর আর প্রয়োজন ছিল না ; বরং তাঁরা তো উম্মতের মুসলিমের এক সম্মানিত অংশ বনে গিয়েছিলেন। তাঁদের অতীতের অপকর্ম নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছিল, যাতে অনুকূলে কর্মের দ্বারা নিজেদের নবজীবন শুরু করতে পারেন ; কিন্তু যারা কুফরিতে অটল রইল এবং সত্য পথ থেকে মানুষকে রুখতে থাকল তাদের মোকাবিলা করাটা ছিল অনিবার্য, যাতে এ ভূভাগ তাদের কুফরি ও অপকর্ম থেকে পবিত্র হয়ে যেতে পারে :

'নিঃসন্দেহে যারা কুফরি করেছে এবং অত্যাচারে অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না আর তাদের কোনো পথও দেখাবেন না। জাহান্নামের পথে সর্বদাই পড়ে থাকবে এবং আল্লাহর জন্য এ বড়ই সহজ।' – আন নিসা : ১৬৮-১৬৯

এ উম্মত আল্লাহর জন্য নিবেদিত হতেন এবং দিন-রাত তাঁরই ইবাদতে লীন থাকতেন। তাঁরা দুটি পথ থেকে একটিকে বেছে নিয়েছিলেন, অথবা তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছা পূর্তির জন্য জীবিত থাকতেন, বা এই পথেই জীবন ত্যাগ করতেন। আপনি যদি ঐ সময়ের তুলনা সমস্ত বিশ্বের সাথে করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, প্রভুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনেক কিছু তাদের মধ্যে পাওয়া যেত, তা সত্ত্বেও অন্য ধর্মগুলোর ভিত্তি একের পর এক ধসে পড়ছিল। অতএব এতে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে, কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁরা এমন এক নবীর রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, যার ভিত্তি তাদের প্রভুর আদেশেরই অনুবর্তী ছিল।

তারপর বিস্তৃত আইন-কানুন মদিনায় অবতীর্ণ হতে লাগল, যাতে মুসলমানরা ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক বিষয়াবলিকে সুব্যবস্থিত করতে পারেন। অতএব ধীরে ধীরে হালাল ও হারামের নিয়ম সৃষ্টি হয়ে গেল, এমনকি পুরো বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে গেল, যার ফলে তাঁরা শরিয়তের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করে নিলেন।

ইসলামী দণ্ডবিধান স্থাপিত হলো, যাকাত ফরজ হলো, রমজানের রোজা ফরজ হলো এবং মদিনায় প্রথম কালেই নামাজের রাকাত বৃদ্ধি করা হলো।

হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

'প্রারম্ভে নামাজ কেবল দু'রাকাত ফরজ হয়, তারপর যাত্রার নামাজের আদেশ এল, তারপর বাড়িতে থাকা অবস্থার (নিয়মানুসারে) নামাজ বৃদ্ধি হলো।' –বুখারী।

অন্য এক হাদিসে হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

'প্রথমে নামাজ দুরাকাত ফরজ হয়েছিল, তারপর নবীজি হিজরত করলে চার রাকাত নামাজ ফরজ হয়ে গেল এবং প্রথম নামাজকে যাত্রার নামাজে পরিবর্তিত করে দেয়া হলো।' –বুখারী।

উল্লেখ্য যে, হিজরতের প্রথম বর্ষেই রসুলুল্লাহ আয়েশাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন ও নিকাহ হিজরতের আগেই হয়েছিল।[১]

আমরা অন্যত্র রসুলুল্লাহর পত্নী এবং বহুবিবাহ বিষয়ে আলোচনা করব।

---

১. হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম হিজরতের দুই বা তিন বছর আগে হজরত খাদিজার ইন্তিকালের পর আমাকে বিয়ে করেন। সে সময়ে আমার বয়স ছিল সাত বছর। তারপর তিনি মদিনায় এলে আমার কাছে কয়েকজন মহিলা এসে আমাকে বিদায় জানিয়ে রসুলুল্লাহর বাড়িতে নিয়ে আসেন। সে সময় আমার বয়স ছিল ন'বছর।–বুখারী

পঞ্চম অধ্যায়

ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহের কাল

শক্তিশালী ও প্রতাপশালী ধর্ম
সারিয়া
সারিয়া-আব্দুল্লাহ ইবনে জহশ
বদরের যুদ্ধ
একটি পর্যালোচনা
যুদ্ধের পরে
ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ
কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযান
উহুদের যুদ্ধ
পরীক্ষা শিক্ষা দেয়
উহুদের শহীদ
উহুদের প্রভাব
বনু নজিরের বহিষ্কার
বদরের শেষ অভিযান
দওয়াতুল জুন্দালের সংঘর্ষ
ইফকের ঘটনা
আহজাবের যুদ্ধ
বনু কুরাইজার পরিণাম

এক

শক্তিশালী ও প্রতাপশালী ধর্ম

ইসলাম মদিনায় প্রবেশ করল, বিরোধী কাফিরের দল চারদিক থেকে ইসলামকে বের করে দিতে লাগল আর মুসলমানরা নিজেদের হিজরতের স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগল ; সৈনিকরা যেমন চারদিক থেকে এসে নিজেদের সুরক্ষিত কেল্লায় এসে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা আত্মপ্রস্তুতি শুরু করলেন, যাতে শত্রুরা তাঁদের উপর চড়াও না হতে পারে। মক্কায় হিজরতকালে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, দুর্বলতা মানুষকে হীন করে তোলে, দুর্বলতা মানুষকে ফিতনাগ্রস্ত করে দেয় এবং বিরল ও অসহায় জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ স্বাস্থ্যের গুরুত্ব ও আনন্দ তখনই বোঝে, যখন সে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে। দৌলত ও ধনের গুরুত্ব তখন বোঝে, যখন সে দারিদ্র্য ও নির্ধনতা থেকে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বিগত পরিস্থিতি থেকে শিক্ষালাভের সর্বাধিক অধিকারী কারা ছিল ?

সর্বাধিক শিক্ষা গ্রহণকারী ছিলেন তাঁদের রসুল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অত্যাচারীরা যাকে এক হাজার মাইল পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করেছিল। মুহাজিররা সর্বস্বান্ত ও সর্বহারা অবস্থায় মদিনায় পৌঁছেছিলেন, তাঁদের বাড়িঘর থেকে তাদের বের করে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের সব কিছু কেড়ে নিয়ে বড় সাধের মাতৃভূমি থেকে মেরে তাড়ানো হয়েছিল। এই আশ্রয়ভূমিতেও মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসীদের যুদ্ধস্থিতি রয়েই গিয়েছিল। এই সংঘর্ষে দ্বেষ ও সংবেদনাত্মক পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানোটা বড়ই বুদ্ধিহীনতার কাজ হবে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের মধ্যেকার শত্রুতা এবার সমগ্র আরবের মুশরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মদিনার মূর্তিপূজকরা প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে লাগল। এই শত্রুতা এবার ইহুদিদের সাথে মিলিত হলো, যারা এই ধর্মের প্রচার-প্রসারের কারণে খুবই ভয়-ভীত ছিল এবং এরা দেখছিল যে ইসলামের সামনে আরবদের পৌত্তলিক সভ্যতা ধরাশায়ী হয়ে পড়ছিল।

অতএব এ সমস্ত তত্ত্বকে উৎপাটিত করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। প্রত্যেক আক্রমণকারীর দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার এবং সেই শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, যে শক্তি ইসলামের শত্রুদের কঠোরভাবে শাস্তি দিতে পারে।

ইসলাম কোনো যুদ্ধের অনুমতি দিল এবং রসুলুল্লাহ ও তার সাথিদের যাতে অংশগ্রহণ করতে হলো তা হলো পবিত্র যুদ্ধ– জিহাদ। আমি আমার গ্রন্থে বৌদ্ধিক এবং ঐতিহাসিক প্রমাণাদি দিয়ে একথা প্রমাণ করেছি যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা সত্যকে রক্ষা, অত্যাচারীদের, উৎপাটন, অবজ্ঞাকারী ও অত্যাচারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য আবশ্যক ছিল।

মুস্তাশিরক[১] ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা প্রচার করে থাকে যে, মুসলমানরা অনাবশ্যক শক্তি প্রয়োগ করেছে, এ হলো ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অভিযোগ, তা হলো সেই ঘৃণিত অপচেষ্টা ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ, যা ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব বিনাশ করার জন্য এবং খ্রিস্টান ও ইহুদি চক্রের দাস বানানোর জন্য চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ইসলাম যত যুদ্ধই করেছে তা সংঘটিত হয়েছে ইসলাম ও তার অনুসারীদের অস্তিত্ব বিনাশের ষড়যন্ত্রকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের অস্তিত্ব বিনাশের জন্য বারবার হুমকি-ধমকি দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয় ; বরং তাঁদের বিরুদ্ধে সমস্ত শত্রু ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এসব ঘটনা ইসলামের প্রারম্ভিককালে, হিজরতের আগে এবং তার পরে সংঘটিত হয়েছিল এবং সে ষড়যন্ত্র আজো সমানে চলেছে। ইসলামী ভূখণ্ডগুলো চোর ও ডাকাতরা দখল করে রেখেছে এবং তাদের নির্মূল করার জন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সমানে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাহলে একথা কেন বলা হচ্ছে যে, ইসলাম প্রচারে তরবারি সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে যেখানে প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানরা কুরবানি, ত্যাগ ও জিহাদের মাধ্যমে নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছে ?

আর সেই জাতি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষার সাথে কীভাবে অপরিচিত থাকতে পারে, যাঁদের উপর চারদিক থেকে চোর, ডাকাত সন্ত্রাসী ও অত্যাচারীরা নিরন্তর আঘাত হেনে চলেছে ? কখনোই নয়, এ অত্যাচারীরা জগতে আর কতকাল দাপাদাপি করে বেড়াবে ?

'যারা কুফরি করেছে তারা যেন একথা মনে না করে যে, তারা জয়ের বাজি মাৎ করেছে, তাদের কখনো হারানো যাবে না।

---

১. সেই অন-এশীয় যারা জ্ঞান বিজ্ঞানের গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন এবং ইসলামের চিরশত্রুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন।– অনুবাদক

যতদূর সম্ভব তোমরা শক্তি ও সৈন্য, বেঁধে রাখা ঘোড়া নিয়ে তাদের জন্য প্রস্তুত থাকো, যাতে এর দ্বারা আল্লাহর শত্রু এবং নিজেদের শত্রু ছাড়াও অন্যদের ভয়ে ভীত করে দিতে পারে, যাদের তোমরা চেন না। আল্লাহ তাদের জানেন এবং আল্লাহর পথে যে বস্তুই তোমরা খরচ করবে তার পুরো প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে আর তোমাদের সাথে কোনো অন্যায় করা হবে না।

আর যদি এরা সন্ধি ও শান্তির প্রতি আগ্রহী হয় তাহলে তাদের প্রতি তোমরাও এর জন্য অগ্রসর হও এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখো, নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। আর তারা যদি তোমাদের টোকা দিতে চায় তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট।' – আল আনফাল : ৫৯-৬২

অহির অনুসরণ ও রাজনীতির এবং শাসনের উপায় ও আল্লাহ এবং জীবনের অধিকার সুরক্ষার জন্য আল্লাহর রসুল তাঁর সাক্ষীদের প্রশিক্ষিত করেছেন। তার সাথে সামরিক প্রশিক্ষণ, যুদ্ধ বা রণক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং রণক্ষেত্রে যুদ্ধপ্রয়াসকে আল্লাহর সামীপ্য সাধন এবং পবিত্র ইবাদত বলে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন, যাতে কুফরি শক্তি বিনাশ করে দেয়া যায় এবং মুসলমানদের অধিক কষ্ট না দিতে পারে :

'অনন্তর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো – তোমরা নিজেরা ছাড়া অন্য কারো দায়িত্ব নেই আর বিশ্বাসীদেরও এ জন্য অনুপ্রাণিত করো। আল্লাহ কাফিরদের শক্তি ধ্বংস করে দিতে পারেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিমান এবং তিনি সবচেয়ে কড়া দণ্ড বিধানকারী।' – আন নিসা : ৮৪

'উৎবা ইবনে আমির রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ আছে, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুনলাম। তিনি বলছিলেন, যতদূর সম্ভব শত্রুদের মোকাবিলার শক্তি সঞ্চার করো, শুনে রাখো শক্তি ধনুর্বিদ্যার, শক্তি ধনুর্বিদ্যার, শক্তি ধনুর্বিদ্যার, শক্তি ধনুর্বিদ্যার।'– মুসলিম ইবনে মাজা, আবু দাউদ, তিরমিজি, আহমদ

এ হাদিস বলে যে, রণক্ষেত্রের লক্ষ্যবস্তু কী ? এ হাদিসে ব্যবহৃত শব্দে রমীর অর্থ ধনুর্বিদ্যা হলেও তা বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, কামান, বোমা বর্ষণ, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ সবই প্রযোজ্য।

'ফকিম লহমী রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি উকবা বিন আমির রাজিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি এই দুই চিহ্নের মাঝখানে বারবার কেন ছোটাছুটি করছেন। আপনি যখন বৃদ্ধ হয়েছেন এবং পরিশ্রম যেখানে স্বরূপ। তিনি বললেন : যদি আমি একথা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনতাম তাহলে এ পরিশ্রম করতাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কী কথা ? তিনি বললেন : আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ধনুর্বিদ্যা শিখে পরে ভুলে যায়, সে আমার জন নয়।' –মুসলিম।

তিনি বৃদ্ধ এবং দীর্ঘায়ু ছিলেন, তা সত্ত্বেও সঠিক লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করতেন, হাত সাফ রাখতে এবং তাকে গতিশীল রাখতে তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কী গভীরভাবে না অনুসরণ করতেন। ইসলাম যখন সামরিক যোগ্যতা অর্জনের উপর জোর দিল তখন যুবক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলের উপর তা ফরজ করে দিল।

'আবু নজিহ সুলমী বলেন : আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : 'যে এক তীর চালিয়েছে, জান্নাতে তার একটি স্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে। অতএব, আমি দশটি তীর চালালাম। আর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি তীর চালিয়েছে, সে একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করে দেয়ার সমান প্রতিদান লাভ করল।' – আবু দাউদ, আহমদ, হাকিম, নাসাঈ

'উকবা বিন আমির রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা এক তীরের প্রতিদানে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন, তার প্রস্তুতকারীকে (যদি সে সদুদ্দেশ্যে তৈরি করে থাকে) তীর নিক্ষেপকারীকে এবং তার হাতে তুলে দেয়া ব্যক্তিকে। অনন্তর তোমরা ধনুর্বিদ্যা শেখো এবং অশ্বারোহণ শেখো, তবে অশ্বারোহণের চেয়ে তীর চালানো প্রিয় হলে তীর চালাও। প্রত্যেক ক্রীড়া ব্যর্থ, কেবল তিন প্রকারের ক্রীড়া সার্থক– ঘোড়সওয়ারীর উত্তম অভ্যাস, বাল-বাচ্চাদের সাথে আদর কৌতুক করে আনন্দ দান করা এবং ধনুক থেকে তীর চালনা। এ সমস্ত ক্রীড়া সত্য এবং যে ধনুর্বিদ্যা শিখে পরে তা ত্যাগ করেছে সে একটি নিয়ামত ত্যাগ করল অথবা তা থেকে বিপথগামী হয়ে গেল।' –আবু দাউদ, নাসায়ি আহমদ

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, ঘোড়ার মস্তকে মহা প্রলয়কালাবধি কল্যাণ, প্রতিফল এবং মালে গনিমত রেখে দেয়া হয়েছে।' – বুখারী, মুসলিম

এভাবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়সওয়ারের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামুদ্রিক যুদ্ধের প্রেরণা দিয়েছেন :

'এক সামুদ্রিক যুদ্ধ দশ স্থলযুদ্ধের চেয়ে উত্তম। যে সমুদ্র অতিক্রম করেছে সে যেন সমস্ত উপত্যকা অতিক্রম করেছে এবং সমুদ্র যাত্রায় বমি করা, মাথাঘোরা ব্যক্তি (জিহাদে) রক্তমাখা ব্যক্তির সমতুল।' – হাকিম

রাষ্ট্রের জল, স্থল ও বায়ুসেনার প্রয়োজন হয় এবং সমস্ত রকমের হাতিয়ার সাফল্যের সাথে নির্মাণ ও ব্যবহার করতে হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি ঐ সৈনিক লাভ

করে, যে শত্রুর কাছ থেকে সর্বাধিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এমন ব্যক্তি তার উম্মত ও আকিদাকে প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত রাখতে সর্বাধিক আগ্রহী হয়, তা সে পদাতিক হোক বা ধনুর্ধর হোক অথবা জল বা স্থল যেখানেই যুদ্ধ করুক না কেন।

দুই
সারিয়া

মুসলমানদের অবস্থান যখন সুদৃঢ় হয়ে গেল তখন তারা সশস্ত্র দলকে এদিকে-ওদিকে পাঠাতে লাগলেন, যাতে মরুভূমির বিভিন্ন এলাকায় চক্কর লাগিয়ে মক্কা এবং সিরিয়ায় কাফেলা এবং এদিক-ওদিকে লুটপাটকারী গোত্রগুলোর প্রতি নজর রাখতে পারেন এবং তাদের চিনে রাখতে পারেন।

১. এক হিজরির রমজান মাসে হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাজিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ত্রিশজন সঙ্গীর সাথে কুরাইশদের কাফেলার নেতৃত্বদানকারী আবু জেহেল ও তার বাহিনীর সাথে একটি সংঘর্ষ হয়। এই বাহিনীতে ৩০০ অশ্বারোহী ছিল। দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন মজদী বিন উমর জুহনী, ফলে যুদ্ধ আর হয়নি।

২. এই বছরের শাওয়াল মাসে উবাইদা বিন হারিস ৬০ অশ্বারোহী নিয়ে রাবিন উপত্যকা অভিমুখে যান, যেখানে ২০০ মুশরিক পৌত্তলিকের সাথে একটি সংঘর্ষ হয়, যার নায়ক ছিল আবু সুফিয়ান। দু পক্ষই ব্যাপকভাবে তীর বর্ষণ করে কিন্তু সর্বাত্মক যুদ্ধ হয়নি।

৩. এই বছর এক মাস পরে জিলকাদ মাসে সাদ বিন আবি আক্কাস ২০ অশ্বারোহী নিয়ে কুরাইশদের এক কাফেলা আক্রমণের জন্য বের হন কিন্তু কাফেলা পিঠ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়।

৪. দুই হিজরি সনের সফর মাসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে স্বয়ং অভিযান চালান এবং বুদান নামক স্থানে পৌঁছে যান, যেখানে কুরাইশ ও বনী হামজার সাথে সহযোগিতামূলক সমঝোতা হয়ে যায়।

৫. দুই হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০০ আনসার ও মুহাজিরকে নিয়ে উমাইয়া বিন খলফের নেতৃত্বাধীন কুরাইশ কাফেলাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য বুআত পর্যন্ত

আসেন। উমাইয়ার সাথে ১০০ পৌত্তলিক ছিল কিন্তু এবারও কাফেলা গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়।

৬. জমাদিতে ইয়াম্বা উপত্যকার নিকটে আশিরা অভিমুখে রওনা হয়ে সেখানে এক মাস যাবৎ অবস্থান করা হয় এবং মুদলিজের সাথে শান্তিচুক্তি করা হয়।

৭. তারপর কুর্জ বিন জাবির ফহরী মদিনায় আক্রমণ চালায় এবং সেখানকার পশুপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিছু ধাওয়া করেন, এমনকি বদরের নিকট সফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে যান, কিন্তু সে আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা একে বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

সশস্ত্র ক্ষুদ্র বাহিনীগুলোকে এদিকে-ওদিকে পাঠানোর মূল কারণগুলো ছিল এরকম :

প্রথমত, মদিনায় মুশরিক-পৌত্তলিক, ইহুদি, লুটেরা, ছিনতাইবাজ, বদমাইশদের এটা বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, মুসলমানরা এখন শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। এখন তারা দুর্বলতা, শক্তিহীনতা এবং দুর্বল অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন এবং মক্কাবাসীর অত্যাচারের যুগ শেষ হয়ে গেছে। সামরিক শক্তি প্রদর্শন করার অধিকারও মুসলমানদের ছিল। কেননা মদিনায় ইসলামের অনেক শত্রু ছিল। অতএব আল্লাহ আদেশ দিয়েছিলেন :

'এই শক্তির দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের শত্রু ছাড়াও অন্য শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দাও, যা তোমরা জানো না, আল্লাহ জানেন।' —আল আনফাল : ৬০

দ্বিতীয় প্রকারের শত্রু তারাই ছিল, যারা জামার হাতার মধ্যে লুকানো সাপের ন্যায় অবস্থান করছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং শত্রুতা প্রকাশ কেবল কাপুরুষতা ও মূর্খতার কুপরিণামের কারণে ছিল না। এসব টুকরো অভিযান যদি প্রেরণ করা না হতো তাহলে শত্রুরা মদিনায় চড়াও হতে এবং মুসলমানদের আতঙ্কিত করতে মোটেও দ্বিধা করত না।

অন্যদিকে কুরাইশদের হুমকি বা ধমকি দেয়াও এর অন্যতম কারণ ছিল।

কেননা, কুরাইশরা প্রথম থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ শুরু করে রেখেছিল। মক্কায় তাদের উপর কষ্ট-যন্ত্রণা অব্যাহত রেখেছিল। তারা আল্লাহর ধর্ম ইসলামে কারো প্রবেশ করাটাও পছন্দ করত না। অতএব, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচ্ছিলেন মক্কায় অত্যাচারী, দমনকারী বা হিংসুকদের জানিয়ে দিতে যে, অত্যাচার ও হিংসার এ নীতি এখন তাদের জন্য ক্ষতিকারকই হবে। এখন মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালিয়ে আর পার পাওয়া যাবে না। এখন তারা রীতিমত সুরক্ষিত ও নিরাপদ।

পাশ্চাত্যের মুস্তাশিরকরা[১] এই ক্ষুদ্র সশস্ত্র দলগুলোকে ডাকাত বলে অভিহিত করেছেন। এ হলো ঘৃণা ও বিদ্বেষেরই একটি রূপ, যা প্রকৃত তথ্যকে উপেক্ষা করে মনগড়াভাবে মিথ্যা জিনিসকে সত্য বা সঠিক বলে চালিয়ে দেয়ার এক ঘৃণ্য অপপ্রয়াস। এই মুস্তাশিরকদের সংগঠনের এ কার্যকলাপ আমাকে ইংরেজদের সেই নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা মধ্য আফ্রিকার অধিবাসীদের বিপ্লব দমনের জন্য প্রয়োগ করেছিল। তারা আপন মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে আসছিল আর বিদেশিদের সেখান থেকে বের করে দিতে চাচ্ছিল।

এক শ্বেতাঙ্গ সৈনিক এই আফ্রিকিদের বিষয়ে তার এক সহকর্মীকে বলেছিল : 'এরা বর্বর ও অসভ্য ! দেখো, এরা একে অন্যকে কীভাবে হত্যা করছে, আর তারা আরো অগ্রসর হয়ে আমাকেও কামড় দিয়েছে।'

পৌত্তলিক মক্কাবাসীদের পক্ষ অবলম্বন করা এবং ইসলাম ও তার অনুসারীদের দোষী সাব্যস্ত করাটা হলো এই মুস্তাশিরকদের দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনারই একটি অংশ।

তিন
সারিয়া- আব্দুল্লাহ বিন জহশ

২ হিজরি সনের রজব মাসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আব্দুল্লাহ বিন জহশ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে কিছু মুহাজিরকে নখলা অভিমুখে প্রেরণ করেন, তাকে একটি পত্রও দেন এবং আদেশ দেন যে মদিনা ত্যাগের দুদিন পর যেন পত্রটি খোলা হয়।

হজরত আব্দুল্লাহ আদেশানুসারে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দুদিন যাবৎ চলতে থাকলেন, তারপর খুললেন। তাতে লেখা ছিল : 'চলতে থাকো, এমনকি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত নখলায় গিয়ে পৌঁছাও আর সেখানে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ করতে থাকো এবং নিয়মিতভাবে জানাতে থাকো।'

হজরত আব্দুল্লাহ এই পত্রের কথা তাঁর সাথিদের অবগত করালেন এবং বললেন, আমি তোমাদের উপর কোনো প্রকারের কঠোরতা দেখাইনি। কেননা, রসুলুল্লাহ আমাকে এই পর্যন্ত বিরত করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার সাথে চলতে চায় এবং শাহাদতের ইচ্ছুক সে আসুক, আর যে তা না চায় এবং

---

১. ইসলামের পৌত্তলিক-শত্রুদের সমমনা, অর্থাৎ আধা-পৌত্তলিক শত্রু, যেমন– ইহুদি, খ্রিস্টান, মালাউন ও অন্যান্য ইসলাম বিদ্বেষী শত্রু সকল।

নিজের জীবন পিয়াসী, সে এখান থেকে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কেউ-ই ফিরে যেতে রাজি হলেন না। ইতিমধ্যে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও উৎবা বিন গজওয়ানের বাহক উটটি কোথাও বেরিয়ে গেল এবং গুম হয়ে গেল। এ দুজনে তার অনুসন্ধানে বেরুলেন এবং আব্দুল্লাহ ও তার অন্য সাথিরাও আরো এগিয়ে গেলেন এবং তাঁরা নখলায় পৌঁছে গেলেন। ওদিক থেকে কুরাইশদের একটি কাফেলা বেরিয়ে এসে আব্দুল্লাহর কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে ছিল। এই সংঘর্ষে আমর বিন হাজরামি নিহত হলো এবং দুই মুশরিককে বন্দি করে নিয়ে আব্দুল্লাহ মদিনায় চলে এলেন।

মনে হয় এ সংঘর্ষ রজবের শেষে অর্থাৎ সম্মানিত মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

যখন এ কাফেলা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় উপস্থিত হলো তখন তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, আমি তো এ সম্মানিত মাসে তোমাদের যুদ্ধ করার জন্যই পাঠাইনি এবং কাফেলা ও বন্দিদের কিছু বললেন না।

এই ঘটনার পর মুশরিক-পৌত্তলিকরা একথা প্রচার করার সুযোগ পেয়ে গেল যে, তারা আল্লাহর হারাম বস্তুকেও হালাল করে নিয়েছে। এ রকম নানা ধরনের কথা তারা প্রচার করতে লাগল। এরপর অহি অবতীর্ণ হলো এবং আব্দুল্লাহ বিন জহশকে সমর্থন জানানো হলো :

'তারা তোমাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রশ্ন করে। বলে দাও, ঐ মাসে যুদ্ধ করা খারাপ কাজ। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ করা, তার কুফরি করা মসজিদে হারাম কাবা থেকে বিমুখ করা এবং তার লোকদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর দৃষ্টিতে এগুলো আরো গুরুতর এবং ফিতনা রক্তপাতের চেয়েও জঘন্য অপরাধ।' –আল বাকারা : ১২৭

মুশরিক-পৌত্তলিকরা মুসলমানদের বীরদের আদর্শ চরিত্রগুলোকে কলঙ্কিত করার জন্য যত রকমের উপদ্রব চালিয়েছে তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। কেননা, সমস্ত পবিত্র হুরমত (সম্মান) ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তাদের উপর অত্যাচার করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর এই সম্মানের সীমা লংঘনের অপরাধ কীভাবে সংঘটিত হলো ? মুসলমানরা কি সে সময় সম্মানিত নগরে বাস করেননি, যখন তাদের নবীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছিল আর তাদের সহায় সম্পদ কেড়ে নেয়া হচ্ছিল ? কিন্তু কিছু লোক নিজের হিতের জন্য আইনের মাধ্যমে কোনো বিচার করে না। আর যখন দেখে যে তাদের হিতে টান পড়েছে বা বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পড়েছে, তখন আইন ভঙ্গ করতেও তারা কোনো কসুর করে না। বাস্তবিকই তারা হলো সুবিধাবাদী এবং সেই আইনকেই গ্রহণযোগ্য মনে করে, যা তাদের নিজের স্বার্থের পক্ষে থাকে।

আল্লাহ যথার্থই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, কোনো সম্মানিত মাস বা নগর তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে বিরত রাখতে পারে না আর সেই পরিকল্পনা ছিল মুসলমানদের উপর অত্যাচারের জন্য, যাতে ইসলাম স্থির ও সুদৃঢ় না হতে পারে :

'আর এরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং সম্ভব হলে তারা তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দেবে।' —আল বাকারা : ২১৭

এরপর, মুসলমানদের এই শয়তানি শক্তির সমক্ষে পরাজিত হওয়া থেকে এবং ঈমানের দুর্বলতা প্রদর্শন থেকে সচেতন করে দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ তাদের প্রদান করেছিলেন এবং তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণকে ধর্মের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

'এবং তোমার মধ্য থেকে যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে এবং কাফির হয়ে মারা যায় তো এমন লোকের দুনিয়া ও আখিরাত ব্যর্থ হয়ে যায় এবং এরা জাহান্নামে যাবে, তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে জ্বলতে থাকবে।' —আল বাকারা : ২১৭

কুরআন হজরত আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথিদের পক্ষাবলম্বন করল, কেননা, তারা পূর্ণ দায়িত্ব, কর্তব্য ও সাহসের সাথে রসুলের আদেশাবলি পালন করেন এবং স্বেচ্ছায় শাহাদৎ প্রাপ্তির ভাবনায় শত্রুদের এলাকায় এমন দীর্ঘ সফরের কষ্ট সয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে শত্রুদের হুমকি-ধমকি ও অত্যাচার নির্যাতন কীভাবে তাঁদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল ? আল্লাহতালা বলেন :

'অবশিষ্ট সেই সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগ করেছে ও জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ আশা করতে পারে এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।' — আল বাকারা ২১৭

এই সমস্ত সংঘর্ষ ও যুদ্ধ ক্ষুদ্র সেনাদলগুলোর দ্বারা কুরআন অত্যাচারী ও হিংসুক মুশরিক-পৌত্তলিকদের সাথে কোনো প্রকারের উদারতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়নি। কেননা মুসলমান ও তার বিরোধীদের উপর তার অত্যন্ত মন্দ প্রভাব পড়তে পারত।

এই সারিয়ায় (খণ্ডযুদ্ধ) প্রথমে মুহাজিররা অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু পরে আনসার [১] ও মুহাজিররা উভয়েই অংশগ্রহণ করতে লাগলেন।

এই ভাবনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল যে, যুদ্ধ বাড়তে পারে এবং এর ফলে ব্যাপক ক্ষতি ও ধ্বংস ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু এ হবে এমনই একটি যুদ্ধ, যাতে ধর্ম ও জাগতিক কল্যাণের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। মক্কাবাসীরাও একথা সুনিশ্চিতভাবে জেনে গেল যে, তারা এতদিন যাবৎ যে সমস্ত

---

১. মদিনা নিবাসী।

অত্যাচার অপকর্ম চালিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করার স্বপ্ন দেখছে এখন তা করে আর পার পাওয়া যাবে না, তার মজা চাখতেই হবে এবং তাদের সিরিয়ার বাণিজ্য মুসলমানদের দয়ার দৃষ্টির উপর নির্ভর করবে।

এভাবে দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল এবং সেই সাথে শত্রুতা ও দ্বেষও বেড়ে চলল। মনে হয় এ সমস্ত ঘটনা সেই মহান ঘটনার ভূমিকাস্বরূপ হয়ে গেল, যা এক মাস পরে মক্কার নেতৃবৃন্দ ও মুসলমানদের মধ্যে বদর নামক স্থানে সংঘটিত হয়।

চার
বদরের যুদ্ধ

মদিনায় এ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা প্রচুর পরিমাণে মাল সামান নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। এই বাণিজ্য বহরে এক হাজার উটের পিঠে চাপানো ছিল সেসব ব্যবসায়িক সামগ্রী, এর নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান বিন হরব। ত্রিশ থেকে চল্লিশজন লোক ছিল তার সাথি। মুসলমানরা যদি এই সম্পদ ছিনিয়ে নিতেন তাহলে মক্কা আর্থিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হতো। এর ফলে মুসলমানদের সমস্ত ক্ষতি পূরণ হয়ে যেত, হিজরতের সময় যে ক্ষতি তাদের করা হয়েছিল। অতএব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এ হলো কুরাইশ কাফেলা, এতে তোমাদের সম্পদ রয়েছে, এর গতি রোধ করো, হয়ত আল্লাহ এর দ্বারা তোমাদের ক্ষতিপূরণ করিয়ে দেবেন।' —ইবনে হিশাম

কিন্তু আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে বাধ্য করলেন না, আর কাউকে উৎসাহিতও করলেন না। যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারটা তিনি তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। অনন্তর যারা যেতে পারল তারা অগ্রসর হলো।

তাঁর সাথে অগ্রসরমান সাথিরা ভাবছিলেন যে, বিগত খণ্ডযুদ্ধগুলোর ন্যায় এও এক খণ্ডযুদ্ধ হবে, এর অধিক হবে না। তাঁদের মধ্যেকার কারোরই এ ধারণা ছিল না যে, এই দিনটি ইসলামের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে প্রতীত হতে পারে, যদি তাঁরা জানতেন, তাহলে পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে এ যুদ্ধে অগ্রসর হতেন এবং মদিনায় একজন মুসলমানের জন্য এক মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করাটা জায়েজ হতো না। এই কারণে যখন জানা গেল যে, কাফেলা পথ পরিবর্তন করে অন্য পথ ধরেছে, তখন তাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়ে যেতে লাগল।

কাফেলার নায়ক আবু সুফিয়ান সম্ভাব্য বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে গেল এবং সে মক্কাবাসীর কাছে নিজের জীবন ও কাফেলার সম্পদ রক্ষার বিপদ জানিয়ে খবরও পাঠিয়ে দিল। আল্লাহর রসুল এই অস্থায়ী দুঃশীলতা শেষ করে দিলেন এবং সাথিদের সাবধান করে দিলেন যে, মক্কার সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেছে, এখন মক্কার অধিবাসীরা আমাদের মোকাবিলায় উপস্থিত হলে মদিনায় ফিরে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে সিদ্ধ হতে পারে।

অতএব, তিনি যেভাবেই হোক, মুশরিক-পৌত্তলিকদের ধাওয়া করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং পরে আল্লাহ এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বললেন :

'যেভাবে তোমার প্রভু (বদরের অবসরে) তোমাকে হকের সাথে ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন এবং ঈমানদারদের একটি দলের কাছে তা অপছন্দনীয় ছিল তারা সত্যের প্রশ্নে তোমার সাথে ঝগড়া করেছিল এমনকি তারা প্রকাশ্যে সামনে এসে গিয়েছিল, মানে তারা দেখছিল যে তাদের মৃত্যুর উপত্যকায় হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' –আন আনফাল : ৫-৬

যারা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধের বিরোধিতা করছিলেন, তা ভয়ের কারণে নয় ; বরং তার কারণ এটাই ছিল যে, যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটা তাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহর রসুল পুরো অবস্থাটা আঁচ করে নিয়েছিলেন এবং পিছু হটার তুলনায় অগ্রসর হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়াটাই উত্তম কাজ বলে ভেবেছিলেন। অতএব তিনি অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং অনতিবিলম্বেই আশঙ্কার কালো মেঘমালা তাঁর মাথার উপর থেকে সরে গেল এবং সমস্ত লোক অগ্রসর হয়ে ঐ দিকে এগিয়ে চললেন। বদরের বাণিজ্যিক সড়ক অতিক্রম করা কোনো সাধারণ যাত্রা অথবা মনোরঞ্জক কাজ ছিল না।

মদিনা ও বদরের মধ্যে দূরত্ব ছিল ১৬০ কিলোমিটার আর রসুলুল্লাহর কাছে সওয়ারীর জন্য মাত্র ৭০টি উট ছিল। হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে –

'বদরের দিন প্রত্যেক উটের পিঠে তিনজন করে সওয়ারী পালা করে করে আরোহণ করে চলেছিলেন, আবু লুবাবা ও হজরত আলী বিন আবি তালিব রাজিয়াল্লাহু আনহু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। যখন রসুলুল্লাহর পালা এল তখন তাঁরা প্রার্থনা করলেন : 'আমরা হেঁটে যাচ্ছি আপনি সওয়ার থাকুন।' তিনি বললেন, 'তোমরা দু পায়ে হেঁটে চলতে আমার চেয়ে সামর্থ্যবান নও। আর আমি তোমাদের চেয়ে অধিক নিস্পৃহ।' –আহমদ

কাফেলার গতিবিধি জানার জন্য এবং তাদের সাহায্যের জন্য আগত লোকেরা কোথায় লুকিয়ে আছে তা জানার জন্য মুসলমানরা গুপ্তচর ছড়িয়ে দিলেন।

ওদিকে আবু সুফিয়ান কাফেলার বিপদের আশঙ্কা অনুভব করে জমজম বিন আমর গিফারিকে মক্কাবাসীর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাল, যাতে লোক পাঠিয়ে তারা কাফেলাকে রক্ষা করতে পারে।

জমজম পুরো শহর মাথায় করে তুলল। সে তার উটনীর কান কেটে দিল, তার পা কেটে দিল এবং জামা ছিঁড়ে ফেলে, চিৎকার করে বলতে লাগল :

'ওহে কুরাইশবৃন্দ ! সর্বনাশ !! মহা সর্বনাশ !!! আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন কাফেলার পথ রোধ করেছে মুহাম্মদ ও তার সাথিরা, তোমার চলো। সাহায্য করো !!!'

লোক দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেল, আর কুরাইশরা যারা নিজেরা পারল গেল আর যে না পারল সে নিজের পক্ষ থেকে লোক পাঠাল। পুরো মক্কা শহর উত্তেজনায় ফেটে পড়ল এবং তারা পাহাড়-উপত্যকা চিরে অগ্রসর হতে লাগল। ৯৫০ জন যোদ্ধা ৯০০ ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হলো। এই দলে মহিলারাও ছিল, যারা দফ বাজিয়ে তাদের উত্তেজিত করে তুলছিল। এরা উত্তরের পথ ধরে এগিয়ে চলল, যাতে মদিনা থেকে আগত কাফেলাকে রক্ষা করতে পারে। আবু সুফিয়ান সাহায্যের প্রতীক্ষায় যাত্রা বিরতি করেনি ; বরং সে তার চাতুর্যে সফল হয়ে কাফেলাকে বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে সফল হলো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং অন্য মুশরিক-পৌত্তলিকরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বন্দর অভিমুখে রওনা হলো।

উল্লেখ্য, আবু সুফিয়ান মজদী বিন আমর নামক এক বেদুইনের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছে জানতে চাইল যে, পথে কাউকে দেখেছে কি না ? সে বলল যে, আশ্চর্যজনক কোনো কিছু দেখেনি কিন্তু এই টিলাটির কাছে দুটি লোককে তাদের বাহন দুটিকে অবশ্যই বসাতে দেখেছি। সে নেমে পানি খেয়ে চলে গেল। আবু সুফিয়ান ঐ স্থান পর্যন্ত গেল এবং উটনী দুটির পিঠে রাখা বোঁচকাটি তুলে দেখল, যাতে খেজুরের বিচিও পাওয়া গেল। সে বলল : 'আল্লাহর কসম, এ মদিনার খাদ্য ছিল। সে অনুমান করল যে, এরা দু'জন মুহাম্মদের সাথি ছিলেন এবং এদের সৈন্যরা নিকটে কোথাও আছেন। অনন্তর খুব দ্রুত পদক্ষেপে সে তার কাফেলার কাছে এল এবং সমুদ্রতটবর্তী পথ ধরে তার সাথিদের নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

যখন আবু সুফিয়ান দেখল যে, কাফেলা নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে তখন সে বলে পাঠাল তোমরা যে কাফেলার সুরক্ষার জন্য এসেছিলে তা নিরাপদে ফিরে এসেছে এখন তোমরা ফিরে যাও। তা শুনে আবু জেহেল বলল : খোদার কসম ! আমরা বদরে না যাওয়া পর্যন্ত ফিরে আসব না। সেখানে তিন দিন থাকব, উট

জবাই করব খাব, মদ পান করব, মহিলারা সাজসজ্জা করে আমাদের কাছে আসবে, আমাদের সৈন্যদের আরব জাতির বীরত্বগাথা শোনাব, তারপর আমাদের পক্ষ থেকে তারা চিরকালের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।

আবু জেহেল একথা ঘোষণা করে দিল, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক এই আশঙ্কাটাই করছিলেন। এই সমস্ত এলাকায় কুরাইশদের প্রভাব, সম্মান ও বৈভব ইসলামের জন্য বিপজ্জনক বলে প্রতীত হয়েছিল। কেননা কুরাইশরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি করেছিল। মদিনা থেকে ছোট ছোট ইসলামী বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য এর অতিরিক্ত আর কী-ই বা ছিল যে, আল্লাহর কালেমা শ্রেষ্ঠ হোক এবং শিরক বা অনেকেশ্বরবাদের মন্ত্র ধুলোয় মিশে যাক এবং মূর্তিপূজার দাসদাসীরা যেন ইসলামের কোনো লাভ ক্ষতি করতে না পারে।

এই জন্য কাফেলা নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রসুল ফিরে আসার প্রতি মনোযোগ দিলেন না, যাতে এই এলাকাগুলোতে সশস্ত্র বাহিনীর টহলদারির ফলে উক্ত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে এবং মানুষকে প্রভাবিত করা যেতে পারে।

আবু জেহেলের বিরোধিতা কেউই করতে পারল না, ফলে কুরাইশদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকল, এমনকি চলতে চলতে তারা 'উদওয়াতুদদুনিয়া' নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করল।

এভাবে দুপক্ষের সৈন্যরা পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান নিল। কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি কারোরই জানা ছিল না।

রাতের অন্ধকারে তারা নিজ নিজ অবস্থান মজবুত করে তুলতে লাগল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হজরত আলী, হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাজিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রুসৈন্যদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার জন্য পাঠালেন। তারা এক পানি স্রোতের মুখে দুই ব্যক্তিকে পানি ভরতে দেখে তাদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় নামাজ পড়ছিলেন। তারা বলল, আমাদের দুজনকে কুরাইশ সৈন্যদের জন্য পানি সংগ্রহের কাজে লাগানো হয়েছে।

এঁদের কাছে একথা খারাপ লাগল। এঁরা আবু সুফিয়ানের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানতে চাচ্ছিলেন। কেননা মুসলমানরা বাণিজ্যিক কাফেলা অধিকার করার আশা পোষণ করছিলেন। অতএব, এই পানি বাহকদের তাঁরা মারধর করলেন। অবশেষে তারা স্বীকার করল যে, তারা আবু সুফিয়ানের কাফেলার লোক। তখন এঁরা তাদের ছেড়ে দিলেন। এদিকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজ পড়া শেষ হলো। তিনি বললেন, যখন তারা সত্য বলছে তখন তাদের মারছ আর যখন মিথ্যা বলছে তখন ছেড়ে দিচ্ছ। আল্লাহর কসম ! এদের সম্পর্ক

কুরাইশ বাহিনীর সাথে। তারপর তিনি কুরাইশ বাহিনী সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল : কুরাইশ সৈন্যরা ঐ টিলার পিছনে 'উদওয়াতুল কুসওয়া' নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। যখন তিনি তাদের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা বলল, অনেক। জিজ্ঞাসা করলেন, কত জন ? তারা বলল, তা আমরা জানি না। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তারা প্রতিদিন কটা উট জবাই করে ? তারা বলল, একদিন নয়, একদিন দশ। তখন তিনি বললেন, কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা নশো থেকে হাজার। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কুরাইশ নেতাদের মধ্যে কে আছে ? তারা বলল, উতবা বিন রবিআ, শাইবা বিন রবিআ, আবুল বখতারি বিন হিশাম, হাকিম বিন হিজাম, নৌফেল বিন খুআইলিদ, হারিস বিন আমির, তাঈমা বিন আদী, নজর বিন হারিস, জমআ বিন আসওয়াদ, আমর বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খলফ প্রমুখ। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন :

'আজ মক্কা তার কলিজার টুকরো সন্তানগুলোকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করে দিয়েছে।' —ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাক

এখন এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিঃসন্দেহে কঠিন সংঘর্ষ হবে। কুরাইশরা শক্তিমদে মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারা অনতিবিলম্বেই ইসলামের সাথে চলে আসা দীর্ঘ পনেরো বছরের যুদ্ধ-সংঘাতকে শেষ করে দিয়ে শুধুমাত্র মূর্তিপূজার শাসন শক্তি কায়েম করতে চাচ্ছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারদিকে যখন দৃষ্টি ফেরালেন তখন সেই মুহাজিরদের পেলেন, যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। এবার তাঁরা প্রাণ দেয়ার জন্যও প্রস্তুত। আর অন্যদিকে সেই আনসারীরাও ছিলেন, যাঁরা তাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ইসলামের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, যার জন্য তাঁরা চরম ত্যাগ স্বীকারও করেছিলেন এবং তাঁর অনুসারীদের তাঁরা নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অতএব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে বাস্তব পরিস্থিতি অবগত করানোর সিদ্ধান্ত দিলেন, যাতে তাঁরা নিজেদের রণনীতি প্রস্তুত করে নিতে পারেন।

মানুষের সামনে সহসা এমন বাঁক এসে যায়, যেখানে বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজেদের যোগ্যতাবলিকে কেন্দ্রীভূত করতে এবং অতীতের ঘটনাবলিকে সামনে রেখে অত্যন্ত সাবধানতা ও দক্ষতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কেননা এই বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং তার গুরুত্ব নির্ধারণ করা সাধারণ পরীক্ষাবলির তুলনায় অত্যন্ত সুকঠিন হয়ে থাকে। যার নিশ্চিত অবধির সাথে মানুষ অবগত হয় এবং তখন তারা পূর্ণ তৎপরতা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে তার মোকাবিলা করে।

মুসলমানরা যারা এক সাধারণ কাজের জন্য বেরিয়েছিলেন, অনতিবিলম্বেই তাঁরা নিজেদের এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় পেলেন, যার জন্য তাঁদের সমস্ত অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, অতি শীঘ্রই তার উদ্বেগ ও জটিলতা সম্পর্কে তাঁরা পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের ঈমান ও বিশ্বাসের অবস্থা ফিরে এল। অতএব, তাঁরা অতি কঠোর প্রয়াসের সিদ্ধান্ত নিলেন।

আল্লাহর রসুল সকলের সাথে পরামর্শ করলেন, অতএব, হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে নিজের পক্ষ থেকে সহায়তার আশ্বাস দিলেন। তারপর হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু উঠে তাঁর সমর্থন করলেন। তারপর মিকদাদ বিন আমর বললেন : হে আল্লাহর রসুল ! আল্লাহ আপনাকে যে কাজের জন্য আদেশ করেছেন, তা সম্পন্ন করার জন্য আপনি তৎপর হয়ে যান, আমরা আপনার সাথে আছি, আমরা আপনাকে এ কথা কখনো বলব না, বনি ইসরাইলিরা যা মূসাকে বলেছিল যে আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে লড়াই করে আসুন, আমরা এখানে বসে আছি, এ কথা আমরা কখনোই বলব না। বরং আপনি ও আপনার প্রভুও অংশ নিন, আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ করব। কসম, সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি আমাদের সমুদ্রেও ঝাঁপ দিতে বলেন, তাহলে আমরা তাতেও রাজি আছি আপনার গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত।

রসুলুল্লাহ তাঁর কথা শুনে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তারপর, তিনি আনসারদের বললেন, এবার তোমরা পরামর্শ দাও। কেননা, এঁরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিলেন এবং এরা 'বাইয়াতে আকাবা'র সময়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যখন আপনি আমাদের নগরে গিয়ে পৌঁছাবেন তখন আপনি আমাদের নিরাপত্তাধীন হবেন এবং আমরা আপনাকে ঐ রকম নিরাপত্তা দেব, যেমনটি কোনো পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানকে দেয়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশঙ্কা ছিল, না জানি কোনো আনসারী এই ভেবে বসে যে আমরা সেই সময়ে সাহায্য করব যখন মদিনায় কোনো আক্রমণ হবে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন একথা বললেন, তখন সাদ বিন মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল ! আপনার এ ইঙ্গিত আমাদের প্রতি ? তখন তিনি বললেন– হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আমরা আপনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছি, আমরা সাক্ষ্য দিই যে, আপনি যা কিছু এনেছেন তা সর্বৈব সত্য, তা শুনতে এবং আপনার আদেশ পালন করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অতএব যে সংকল্প আপনি নিয়েছেন, তা আপনি করুন। আমরা আপনার সাথে আছি, সেই শক্তির কসম ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যদি আপনি আমাদের

সাথে নিয়ে সমুদ্রেও ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব, আমরা একজনও পিছনে থাকব না। যদি আপনি শত্রুদের সাথে লড়তে চান তাহলে আমরা আপনার সাথে একমত। আমরা দৃঢ়পদ থাকব এবং মোকাবিলায় চূড়ান্ত শক্তির পরীক্ষা দেব, সম্ভব হলে আল্লাহ আমাদের মাধ্যমে সেই বস্তুই দেখিয়ে দেবেন, যা দেখে আপনার চক্ষুও শীতল হয়ে যাবে। আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে অগ্রসর হোন।'

এক বর্ণনায় এই কথাগুলো আছে : 'কদাচিৎ আপনি অন্য কাজে বহির্গত হয়েছিলেন এবং আল্লাহ অন্য একটি অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অনন্তর আল্লাহ আপনাকে যে অনুভব দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী আমল করুন, চাইলে আপনি কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, চাইলে বিচ্ছেদও করতে পারেন। যার সাথে ইচ্ছা শত্রুতা করতে পারেন, যার সাথে ইচ্ছা মিত্রতাও করুন, আমাদের সহায় সম্পদ প্রস্তুত যত ইচ্ছা নিন, যত ইচ্ছা ছেড়ে দিন, আপনার গৃহীত সম্পদের চেয়ে আমাদের কাছে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট সম্পদ হবে উত্তম।'

হজরত সাদের এ বক্তব্য শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ই প্রসন্ন হলেন এবং বললেন : 'অগ্রসর হও এবং প্রসন্ন হও। কেননা আল্লাহ এ দুই দলের মধ্যে একটি দলের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর কসম ! ঐ শত্রুদের বধ্যভূমি আমার চোখের সামনে ভাসছে।'

হুবাব বিন মুনজির রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন : আল্লাহ কি এখানেই অবস্থানের সংকেত দিয়েছেন ? অথবা যুদ্ধক্ষেত্ররূপে এই স্থানকেই যুদ্ধনীতিরূপে গ্রহণ করলেন ? তিনি বললেন : না, এ কেবল আমার সিদ্ধান্ত ও যুদ্ধনীতি। তখন হজরত হুবাব নিবেদন করলেন : হে আল্লাহর রসুল ! এই স্থানটি উপযুক্ত নয় ; বরং আমরা শত্রুদের পানি স্রোতটি অধিকার করে নিই এবং প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে নিয়ে সমস্ত কুঁয়ো বুজিয়ে দিই। অতএব যুদ্ধের সময়ে আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় পানি থাকবে কিন্তু শত্রুদের থাকবে না।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'তুমি ঠিক পরামর্শ দিয়েছ– অতএব, তাঁর আদেশে অর্ধেক রাতের আগেই হুবাব বিন মুনজিরের মতানুসারে শিবিরের স্থান পরিবর্তন করা হলো এবং পানির উৎসগুলো অধিকার করে নেয়া হলো।

মুসলমানরা বড় শান্তিতে রজনী অতিবাহিত করলেন। তাঁদের হৃদয় বড়ই সন্তুষ্ট ছিল। অনন্তর রাতের নিদ্রার ফলে তাঁদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। রাতে হালকা বৃষ্টি হয়েছিল এবং রাতের মৃদু এবং সুগন্ধি বাতাস তাদের হৃদয়-মনকে প্রাণবন্ত ও উৎফুল্ল করে তুলেছিল এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাও তারুণ্যে পূর্ণ হয়ে

উঠেছিল। বর্ষার কারণে কাদা জমে উঠেছিল। ফলে চলাফেরা সহজ হয়ে উঠল। আল্লাহতালা এ অনুগ্রহের কথা এভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

'(স্মরণ করো) যখন সে তোমাদের মেঘে ঢেকে দিচ্ছিল। এ ছিল তাঁর পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ততা ও আত্মবিশ্বাসের সামগ্রী এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানিবর্ষণ করছিল, যাতে তোমরা এর দ্বারা পবিত্র হও এবং শয়তানের অপবিত্রতা থেকে তোমরা মুক্ত হও আর তোমাদের অন্তরকে মজবুত ও পদদ্বয় সুদৃঢ় রাখে।' –আল আনফাল

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছোট সেনাদলকে সংঘবদ্ধ করলেন, তা নিরীক্ষণ করলেন, আদেশ দিলেন এবং আল্লাহ ও আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তারপর তিনি তাঁর শিবিরে ফিরে এলেন। সেখানে তিনি দুআ ও আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনায় লীন হয়ে গেলেন।

হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে ছিলেন। ক্রন্দন ও বিনয়ের কারণে তিনি বেহাল হয়ে পড়েছিলেন, তিনি কেঁদে কেঁদে বলছিলেন :

'হে আল্লাহ ! এই অতি ক্ষুদ্র দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে এ ধরিত্রীতে তোমার নাম নেয়ার মতো আর কেউ থাকবে না।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতাপবান প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করছিলেন :

'হে আল্লাহ ! সেই প্রতিজ্ঞার দ্বারা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যা তুমি আমার সাথে করেছ। হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে সাহায্য করো !'

তিনি তার হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে ধরে রইলেন, এমনকি তাঁর কাঁধের উপর থেকে চাদর সরে যেতে লাগল। আবু বকর তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর বারবার তার চাদরটি ঠিক করে দিতে লাগলেন এবং অত্যন্ত আপ্লুত কণ্ঠে বলতে লাগলেন :

'হে আল্লাহর রসুল ! অনেক হয়েছে, আপনি অনেক অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটি করেছেন, আপনি এবার বিরত হোন। আপনার কাছে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পুরো করবেন।' –মুসলিম, আহমদ

দু'পক্ষই পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল এবং যুদ্ধ শুরু হলো। মুশরিক-পৌত্তলিকদের পক্ষ থেকে সহসা আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ মুসলমানদের জলকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে হতে বলল : 'খোদার কসম ! আমি শত্রুপক্ষের জলকুণ্ডে গিয়ে পানি খেয়ে তারপর দম নেব, অথবা তাকে ভেঙে দেব নতুবা প্রাণ দেব।' হজরত হামজা তাকে অনুসরণ করে গিয়ে এক মারণ মার দিলেন এবং তার পায়ের গোড়ালিতে অস্ত্রাঘাত করলেন। এবার সে তার প্রতিজ্ঞা পুরো করার জন্য ঘেঁষড়াতে ঘেঁষড়াতে অগ্রসর হতে লাগল। হজরত হামজা পুনরায় এক জীবনঘাতি মার দিয়ে তাকে জীবনের পরপারে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর মুশরিক-পৌত্তলিক সৈন্যদের মধ্য থেকে উতবা বিন রবিআ, শাইবা বিন রবিআ ও ওয়ালিদ বিন উতবা এই তিন বীর বেরিয়ে এল। অনন্তর, তাদের মোকাবিলায় আনসারদের মধ্য থেকে তিন বীর রণক্ষেত্রে বেরিয়ে এলে মুশরিক-পৌত্তলিকরা বলল : 'হে মুহাম্মদ ! আমাদের জাতির মধ্যেকার লোক পাঠিয়ে দিন ?' এক রেওয়ায়েতে আছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আনসারদের ফিরিয়ে নিলেন, যাতে এই যুদ্ধে তাঁদেরই বংশের লোকেরা আগে আক্রমণ করে। তিনি বললেন : 'উবাইদা বিন হারিস ! দাঁড়িয়ে যাও, হামজা ! তুমি অগ্রসর হও। আলী ! তুমিও বেরিয়ে এসো।'

অতএব, উবাইদা উতবার সাথে, হামজা শাইবার সাথে এবং আলী ওয়ালিদের সাথে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। হামজা অনতিবিলম্বেই শাইবাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। হজরত আলীও শত্রুকে এক আছাড়ে জীবনের পরপারে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু উতবা ও উবাইদা একে অন্যকে মারাত্মকভাবে আহত করলেন। ইতিমধ্যে হামজা ও আলী অগ্রসর হয়ে উতবাকে আক্রমণ করে তার কাম সেরে দিলেন এবং তাদের সাথিকে তুলে নিয়ে আপন শিবিরে গিয়ে তাঁকে রসুলুল্লাহর চরণে নিবেদন করলেন। উবাইদা তাঁর মাথাটি রসুলুল্লাহর পায়ের কাছে রেখে দিলেন।

এবং বললেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! যদি আবু তালিব আমাকে দেখতেন তাহলে তিনি জ্ঞাত হতেন যে, তার কবিতার পাত্র আমি।

আমরা আপনাকে রক্ষা করব এমনকি এই রক্ষাকর্মে আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত এবং আমরা আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের থেকেও নিস্পৃহ হতে প্রস্তুত।'

এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

এই অপ্রত্যাশিত পরিণামে কাফিররা ক্রোধান্ধ হয়ে উঠল। ফলে তারা পূর্ণ শক্তিতে তীর বর্ষণ করতে লাগল এবং যুদ্ধক্ষেত্র উত্তপ্ত হয়ে উঠল ও তরবারি খাপ থেকে বেরিয়ে হাতে হাতে এসে গেল। মুসলমানরা আহাদ আহাদ, আল্লাহ এক আল্লাহ এক ধ্বনি দিতে লাগলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের আক্রমণ বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ করে দেয়ার আদেশ দিলেন। তারা তখনো পর্যন্ত নিজেদের কাফেলায় একত্রিত হয়ে ছিলেন। তিনি বললেন : শত্রুদের আক্রমণ তীরের মাধ্যমে প্রতিহত করো, তাদের আক্রমণ রোধ করো এবং আদেশপ্রাপ্তির আগে আক্রমণ কোরো না।

যুদ্ধ যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন মুসলমানরা পূর্ণ শক্তিতে জবাবি আক্রমণ চালিয়ে দিলেন, ফলে শত্রুরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মণ্ডপে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সমীপে দুহাত তুলে প্রার্থনা করছিলেন আর কখনো কখনো তাঁর নিজের সৈন্যদের বীরত্ব ও সাহস দেখে

নিচ্ছিলেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, তার মণ্ডপে তিনি কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। যখন জেগে উঠলেন তখন আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন : 'হে আবু বকর ! প্রসন্ন হয়ে যাও, আল্লাহর সাহায্য এসে গিয়েছে, জিবরাইল ঘোড়ায় চড়ে রণক্ষেত্রে রওনা হয়েছেন।'

রণক্ষেত্র ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। দু'পক্ষের সৈন্যরা তুমুল যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। সত্যের সেনানিরা আল্লাহর সহায়তায় লড়াই করে চলেছিলেন এবং অসত্যের চৌকিদারদের গর্ব ও ঔদ্ধত্যকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছিলেন এবং প্রভুত্ব লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্য যদি ফিরিশতা অবতীর্ণ হন এবং মুসলমানদের হৃদয়ে ঈমান, সন্তোষ এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি করে দেন তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আল্লাহর রসুল মুসলিমদের কাছে এসে তাদের যুদ্ধের প্রেরণা দিতে গিয়ে বললেন :

'সেই অস্তিত্বের শপথ, যার অধিকারে মুহাম্মদের জীবন, আজ যে-ই যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপ্রতিফল লাভের আশায় যুদ্ধ করবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করবে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন।'

পরলোকের আশা দেয়া নবীদের হাতিয়ার স্পষ্ট যে, আত্মোৎসর্গীদের আখিরাত ছাড়া দুনিয়ায় কোথায় আরাম পাওয়া যেতে পারে ?

এই প্রেরণা ও প্রলোভন মুসলমানদের অন্তরকে প্রভাবিত করল।

আহমদ-এর বর্ণনায়, মুশরিক-পৌত্তলিকরা যখন নিকটবর্তী হলো তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সৈন্যদের বললেন : 'অগ্রসর হও সেই জান্নাতের প্রতি, যা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে আসমান-জমিনের সমান। হজরত উমাইর আনসারী প্রশ্ন করলেন : 'আল্লাহর রসুল। এমন জান্নাত কি পাওয়া যাবে, যার ব্যাপকতা ধরিত্রী ও আকাশের সমান ?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ'। বললেন : 'বদখ ! বদখ !' (ধন্য, ধন্য)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'বদখ, বদখ, কেন বলছ ?' বলল : 'হে আল্লাহর রসুল ! জান্নাতবাসীদের মধ্যে শামিল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা !' তিনি বললেন : 'তুমি তো জান্নাতে প্রবেশ করে গিয়েছ।'

এ কথা শুনেই তিনি থলে থেকে খেজুর বের করে খেতে লাগলেন, তারপর বললেন, যদি এই খেজুরগুলো খেয়ে নেয়া পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে অনেকক্ষণ লেগে যাবে। অতএব, খেজুরগুলো ফেলে দিলেন এবং এই কবিতাটি পড়তে পড়তে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন :

'পাথেয় ছাড়া আল্লাহর পথে চলেছি আমরা সবে।
আখিরাত আর তাকওয়া মোদের জানি চিরসাথি হবে।।'
আল্লাহর পথে আমরা যেন চির দৃঢ়পদ থাকি।
সবই শেষ হবে তাকওয়া ও নেকি সদা যেন কাছে রাখি।।'

এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকলেন তারপর শহীদ হয়ে গেলেন।

এই সংযমী ঈমানের হাতুড়ির ঘায়ে মুশরিক-পৌত্তলিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেল এবং এবার রসুলুল্লাহ স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তিনি ও তাঁর সাথিরা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হলেন। তখন কুরাইশদের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এবং ভয় ও আতঙ্কে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফরির ঠিকাদারদের মাটিতে মিশে যেতে দেখে বললেন :

'এদের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে।'

কুরাইশরা পরাজিত হলো। কুরআন এই সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বলছেন :

'যখন তোমার প্রভু ফিরিশতাদের প্রতি অহি পাঠাচ্ছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি, তখন তুমি ঐ লোকদের, যারা ঈমান এনেছে তাদের দৃঢ়বদ্ধ রাখো। আমি এখনই কাফিরদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিচ্ছি। অনন্তর তোমরা তাদের ঘাড়ে মারো এবং তাদের প্রতিটি অস্থি সন্ধিতে আঘাত করো।

এ জন্য যে, এরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছে এবং যে কেউ আল্লাহ ও তার রসুলের বিরোধিতা করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহও তাদের কঠিন শাস্তি দেবেন। এই হলো তোমাদের সাজা। এর মজা চাখো আর এও জেনে রাখো যে, কাফিরদের জন্য জাহান্নামের যাতনা রয়েছে।' —আল আনফাল : ১২-১৪

আবু জেহেল তার বাহিনীর পরাজয়োন্মুখ অবস্থা থেকে রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে চিৎকার করে করে বলতে লাগল : 'লাত উজ্জার শপথ, আমরা মুহাম্মদের বাহিনীকে পাহাড়ি উপত্যকায় ধ্বংস করে দিয়ে তারপর ফিরব।'

কিন্তু এই চরম বাস্তবিকতার মুখে আবু জেহেলের এই চিৎকার-চেঁচামেচি কী-ই বা করতে পারত ! তা সত্ত্বেও সেই আবু জেহেল যে ছিল ইসলামের শত্রুদের আদর্শ, সে প্রচণ্ড রোষে পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ হানতে লাগল। সেই সাথে এই কবিতাও সে পাঠ করতে লাগল :

'এই ভয়ানক যুদ্ধ আমার কী-ই বা ক্ষতি করতে পারে ?
বাল্য হতেই এর খেলুড়ে এই কথা কে অস্বীকারে ?
জন্ম আমার যুদ্ধ তরে
করব আমি জীবন ভরে
এই কারণে জন্ম আমার জন্মেছি তাই মা'র জঠরে।।'

কয়েকজন মুশরিক-পৌত্তলিক তাকে ঘিরে রেখেছিল আর তারা বলছিল আব্দুল হাকামের (আবু জেহেল) ত্রিসীমানায় কেউ ঘেঁষতে পারবে না। তাদের মাঝখানে একটি ঘন ঝাড়জঙ্গল ছিল, যা শিগগিরই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু

মুসলমানদের সাহস ও বীরত্বের ব্যাপারটাই ছিল অন্যরকম। তারা বিজয় ও সাফল্যের শুভ সংবাদ লাভ করেছিলেন। আর তারা 'আহাদ' 'আহাদ' ধ্বনি দিচ্ছিলেন।

আব্দুর রহমান বিন আউফ রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি বদরের দিন সেনা পংক্তিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সহসা আমার দৃষ্টি দু'জন আনসার যুবকের উপর পতিত হলো, যারা আমার ডাইনে ও বামে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনন্তর আমার আশঙ্কা হলো দুই যুবকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোক আমাকে না ঘিরে ফেলে। আমি তখনো একথাই ভাবছিলাম, এমন সময় এক যুবক বলল : 'চাচা ! আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিন সে কোন দিকে।' আমি বললাম, 'ভাইপো ! তাকে কী করবে ?' সে বলল : 'আমি আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আবু জেহেলকে পেলে আমি হত্যা করব নতুবা নিজে প্রাণ দেব। কেননা, আমি জানতে পেরেছি ঐ অভিশপ্ত দুষ্ট আমার রসুলকে গালি দেয়।' অন্য যুবকটিও একই কথা বলল।

তাঁদের কথা শুনে আমার শঙ্কা দূর হয়ে গেল এবং আমি ইশারা করলাম ঐ যে আবু জেহেল। একথা শুনতেই তারা শিকরা ও বাজপাখির ন্যায় আবু জেহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাম তামাম করে দিল। এরা দু'জন ছিল আফরার পুত্র। মনে হয় যে, তাকে গুরুতররূপে আহত করে দিয়েছিল এবং তখনই সে মারা পড়েনি ; সে তখন তড়পাচ্ছিল। এরপর মুশরিক-পৌত্তলিকরা পালাতে লাগল, যে যেদিকে পারল সেদিকেই পালাল আর মৃতদেহগুলো এদিক-ওদিক পড়েছিল।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু আবু জেহেলের কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন, দেখলেন সে তখনো মরেনি। তিনি তার গলায় পা দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দিতে চাইলেন। তখন আবু জেহেলের মধ্যে বড়ই উৎকণ্ঠা দেখা দিল এবং জিজ্ঞাসা করল : 'যুদ্ধে কারা জিতেছে।' আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন : 'ওরে আল্লাহর শত্রু ! আল্লাহ কি তোকে অপমানিত করেননি ?' আবু জেহেল বলল : 'আল্লাহ আমাকে কীভাবে আপমানিত করেছেন ? তুমি তোমার জাতির একটি লোককে হত্যা করেছ এতে গর্বের কী আছে ?' তারপর আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি খুব মনোযোগ সহকারে সে দেখল এবং বলল : 'তুই কি মক্কায় অতি হীন আর তুচ্ছ ছিলি না ?'

আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ তার বুকের উপর চড়ে রইলেন, তারপর সে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। —বুখারী, মুসলিম

মক্কার ৭০ জন পৌত্তলিক নেতার ভয়াবহ পরিণতি সংঘটিত হলো অর্থাৎ শোচনীয় মৃত্যবরণ করল। ৭০ জনকে বন্দি করা হলো এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল। তারা জানত এবং জুলুম-অত্যাচারের ভয়াবহ পরিণাম আজ সরাসরি

প্রত্যক্ষ করল। নিজেদের দুষ্কর্ম ও অহঙ্কারকে আজ তারা তিরস্কৃত, অপমানিত ও ভূলুণ্ঠিত হতে দেখল।

মুসলমানরা বড়ই গৌরবজনক বিজয় লাভ করলেন এবং সাফল্য ও বিজয় দেখে তাঁদের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এই বিজয় তাঁদের সুখশান্তি, তাঁদের জীবন ও তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁদের বন্ধনমুক্ত করে তুলেছিল।

'এবং বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্যও করেছিলেন, যখন তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। অনন্তর, আল্লাহর প্রতি ভয় রাখো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারো।' —আলে ইমরান : ১২৩

১৪ মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন, যাদের উপর আল্লাহর অনুকম্পা আচ্ছাদিত হলো এবং তাঁরা ইল্লিয়িনে[১] প্রবেশ করলেন। আনাস বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে প্রমাণিত আছে, হারিস বিন সুরাকা রাজিয়াল্লাহু আনহু এই যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দর্শকদের সাথে ছিলেন। সহসা একটা তীর এসে তাঁর জীবন কেড়ে নিয়ে গেল। তাঁর মা এলেন এবং জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমাকে হারিসার কথা বলুন। যদি সে জান্নাতে যায় তাহলে আমি সন্তুষ্ট নইলে আপনি বলুন, আমি কী মরব ?' এর অর্থ ছিল নৌহা এবং 'মাতম' সম্পর্কিত। এ সময় পর্যন্ত নৌহা (মৃত্যুগাথা এবং শোকালাপ) নিষিদ্ধ ছিল না। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'তার জন্য এক নয়, একাধিক জান্নাত ! সে তো সব চেয়ে উচ্চতর জান্নাতে[২] পৌঁছে গিয়েছে।'

এই যুদ্ধে ভাইয়ে ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে এবং পুত্র ও পিতার মধ্যে মোকাবিলা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত এবং বিশ্বাসই তাদের একে অন্যের শত্রু বানিয়ে দিয়েছিল এবং তরবারি তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করে দিচ্ছিল। আমাদের যুগে কমিউনিস্টরা নিজের স্বদেশীয়দের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং নিজেদের অধিকারের পথে মানবতার সমস্ত মূল্যবোধকে তছনছ করে দিয়েছে। অনন্তর মুসলমান পুত্র যদি তার বিধর্মী পিতার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে যায় আর তার শত্রু হয়ে যায় তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বদরের যুদ্ধ এই উদাহরণাবলিকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। আর তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান আবু জেহেলের সাথে ছিলেন। উতবা বিন রবিআ তো যুদ্ধ শুরুই করে দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পুত্র আবু হুজাইফা রাজিয়াল্লাহু আনহু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাথে ছিলেন। যখন এঁর পিতার

---

১. জান্নাতের উচ্চতর স্থান।

২. ফিরদাউসে আলা।

মৃতদেহ কবরে শোয়ানো হলো তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখে শোকের স্পষ্ট চিহ্ন দেখে বললেন : 'আবু হুজাইফা ! মনে হচ্ছে পিতৃশোকে মুহ্যমান হয়ে উঠেছ ?' তিনি বললেন : 'না আল্লাহর রসুল ! আমার পিতার মরার জন্য আমার শোক হচ্ছে না ; বরং আমি চিন্তা করছিলাম, সেই জ্ঞানী ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটি স্ব-সমাজে একজন শুদ্ধবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। আমার আশা ছিল যে, তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে অবশ্যই আশ্রয় নেবেন। কিন্তু কাফির অবস্থায় এই দশায় তাঁর মৃত্যু হতে দেখে আমার মনটা সন্তাপে ভরে উঠেছে। আমি তো তাঁর গুণের কারণে আরো কিছু আশা রাখতাম। অতঃপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দুআ করলেন। —ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম

আল্লাহর রসুল কাফিরদের মৃতদেহগুলোকে একটি গর্তে দাফন করার আদেশ দিলেন। তারপর তার কিনারে দাঁড়িয়ে বললেন :

'ওহে কবরবাসীরা ! তোমরা তোমাদের নবীর কেমন আত্মীয় স্বজন ছিলে ? তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, আর অন্যেরা আমার অনুসরণ করেছে, তোমরা আমাকে বহিষ্কার করেছ। আর অন্যেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমায় সাথে যুদ্ধ করেছ আর অন্যেরা আমাকে সাহায্য করেছে।' —ইবনে ইসহাক

যখন কবরে মাটি চাপা দিয়ে দেয়া হলো তখন লোকেরা একথা ভেবে ফিরে এল যে, এবার কাফির নেতাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়া গেছে। কিন্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের সাথে দীর্ঘকালীন সংঘর্ষের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। তিনি এই দুষ্টদের হিদায়াত এবং সুপথ প্রদর্শনের প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালালেন, তাদের অত্যধিক বোঝালেন, অবজ্ঞার কুপরিণামের ভয় দেখালেন, কুরআনের আয়াত পাঠ করে করে শোনালেন কিন্তু সব বেকার।

বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তারা গর্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে ডুবে রইল আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে উপহাস করতে লাগল। অনন্তর আল্লাহর রসুল একদিন রাতে কবরের কাছে গেলেন এবং সাহাবিরা তাঁকে এই কথা বলতে শুনলেন :

'ওহে কবরবাসীরা ! ওহে শিবা বিন রবিআ ! ওহে উমাইয়া বিন খলফ ! ওহে আবু জেহেল বিন হিশাম ! তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার মধ্যে সততা কিছু পেয়েছ ? আর আমার প্রভু আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পুরো করেছেন।'

মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করলেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আপনি কি মৃতদের সাথে আলাপ করছেন ?' তিনি বললেন : 'তোমরা যা শুনেছ আমি তাদের সাথে এর অধিক কিছু বলিনি। কিন্তু এরা উত্তর দিতে পারবে না।'

বদরের যুদ্ধ ১৭ রমজান ২ হিজরি সনে সংঘটিত হয়েছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরে তিন দিন যাবৎ অবস্থান করলেন, তারপর

মদিনায় চলে এলেন এবং বন্দিদের ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং মদিনায় পৌছানোর আগে যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন রুয়াহা ও জায়েদ বিন জারিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুকে এই সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

'উসামা বিন জায়েদ বর্ণনা করেন, আমরা বিজয়ের সংবাদ তখন শুনি যখন আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়ার দাফন সম্পন্ন করে তাঁর কবরে মাটি দিয়ে তা সমতল করে দিয়েছিলাম। রুকাইয়ার স্বামী হজরত উসমান বিন আফফান তাঁর অসুস্থতার কারণে মদিনায়ই রয়ে গিয়েছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি অংশ তাঁর জন্যও রেখেছিলেন।' —বাইহাকী

পাঁচ
একটি পর্যালোচনা

আনসারী ও মুহাজিরদের মধ্যে সহানুভূতি ও আন্তরিকতার কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে। এই নবীন সমাজে দারিদ্র্য ও অনাহারের অবস্থা সম্পন্ন দিনগুলোতেও নজরে পড়ত, কিন্তু এই অবস্থার উপর কখনো কখনো সন্তোষ এবং সংযম পর্দা নামিয়ে দিত।

অন্য সময়ে দারিদ্র্য ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। সেই সমস্ত সমস্যাও ছিল, যা এক নতুন রাজ্য গঠন ও নির্মাণে প্রতিবন্ধক হয় এবং এই পরিস্থিতিতে ঐ রাজ্যের বিরোধিতায় চালবাজি ও ষড়যন্ত্র থাকাও অনিবার্য ছিল। ওদিকে নির্মাণকর্তাদের অন্তরেও এ সমস্ত চিন্তাভাবনা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ক্ষতিকারক বস্তুগুলোর মধ্যে এই সমস্ত সমস্যা ও পরিস্থিতির তীব্রতা যেন চারিত্রিক দুর্বলতা, সাহস ও মনোবলহীনতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

বদরের যুদ্ধের আগে এবং তার পরে মুসলমানদের সার্বিক ব্যবহারের উপর আল্লাহর আদেশ সরাসরি কার্যকর ছিল। এসব কথার যৌক্তিকতা যাই হোক না কেন, মুসলমানদেরও পূর্ণরূপে শুদ্ধাচারী হওয়া অনিবার্য ছিল।

যেদিন তাঁরা মক্কার মুশরিকদের সাথে লড়াইয়ের জন্য মদিনা থেকে বহির্গত হয়েছিলেন সেদিন তাঁদের লক্ষ্য ছিল কেবল কাফেলা ও তাদের ধন সম্পদ।

এ কথা ঠিক যে, তাঁদের বাড়িঘর থেকে তাঁদের বের করে দেয়া হয়েছিল সেদিন তাঁদের সহায় সম্পত্তিও কেড়ে নেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন ও সন্তান-সন্ততিও কুরবান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারাও আত্মোৎসর্গের পথে অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত এই চিন্তাধারা অনুযায়ীই চলার কথা ছিল।

অভাব ও দারিদ্র্য যত কষ্ট-যন্ত্রণাই দিক না কেন তাঁদের কাছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধিকারের তুলনায় কাফিরদের নির্মূল করার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া উচিত ছিল।

'এবং (স্মরণ করো) আল্লাহ যখন তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করছিলেন যে দুই দলের মধ্যে একটি তোমাদের হাতে এসে যাবে। তুমি চাচ্ছিলে যে এই বৈভবহীন নিরস্ত্র দলটি তোমার হাতে এসে যাক এবং আল্লাহতালা চাচ্ছিলেন তাঁর অঙ্গীকারের মাধ্যমে হককে হক করে দেখাতে এবং কাফিরদের নির্মূল করে দিতে।' আল আনফাল : ৭

এভাবে বিজয়প্রাপ্তির পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করা এবং তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দুর্বলতা প্রদর্শন করা হলো।

হজরত উবাদা বিন সামিত রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, আমরা রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই। আমি বদরের যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলাম, মুশরিক-পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধ হলো এবং আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করলেন। একটি দল মুশরিকদের ধাওয়া করতে চলে গেল। অন্য দল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জমা করার কাজে নেমে পড়ল, তৃতীয় দল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত রইল। এমনকি রাত হয়ে গেল তারপর সবাই একত্রিত হয়ে গেল এবং সম্পদ জমাকারীরা বলতে লাগল এগুলো আমরাই একত্রিত করেছি, এতে অন্যদের কোনো অধিকার নেই। শত্রুদের পিছু ধাওয়াকারীরা বলল, এতে আমাদের চেয়ে বেশি অধিকার আর কারোর নেই। কেননা আমরাই এগুলো রেখে শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে তাদের পরাজিত করেছি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহরক্ষীরা বলল যে, রসুলুল্লাহর শত্রুদের দ্বারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতির আশঙ্কায় আমরা এই সম্পদের প্রতি মনোযোগী হইনি। তারপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতারণ করলেন :

'হে নবী ! লোক তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে। বলো : এ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের, অনন্তর তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয় রাখো এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখো আর আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশ মান্য করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।' – আল আনফাল : ১

তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আদেশগুলোর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণ করে দিলেন। – আহমদ, হাকিম

এই দুঃখজনক পরিস্থিতি ঐ ব্যাপক দারিদ্র্য এবং দুরবস্থারই পরিণাম ছিল, যা অনসার ও মুহাজিরদেরও সমানভাবে ঘিরে রেখেছিল। যে সময়ে মুসলমানরা বদরের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন সে সময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঐ দারিদ্র্যের দৃশ্য এসেছিল, সে জন্য তিনি সেই করণীয় অবস্থার

উপর খেদ ব্যক্ত করেছিলেন। হৃদয়ে সংবেদনা উপস্থিত হয়েছিল এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলেন যে, তাদের এই দুঃখদায়ক এবং ঈমান বিনষ্টকারী অবস্থা থেকে মুক্ত করে দাও। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিন ৩১৫ জন সাহাবির সাথে রওনা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি এই প্রার্থনা করেন :

'হে আল্লাহ ! এরা ক্ষুধার্ত। এদের আহার দিয়ে তৃপ্ত করো, এরা পদাতিক, এদের বাহন প্রদান করো, এরা নগ্ন, এদের বস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করো।' অনন্তর আল্লাহ বদরের যুদ্ধে বিজয় প্রদান করলেন এবং প্রত্যাবর্তনের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এক বা দুটি বাহন ছিল এবং বস্ত্রও লাভ করেছিলেন এবং সবাই আহারে তৃপ্ত ছিল। – আবু দাউদ, হাকিম, বাইহাকী

অন্ন এবং বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যখন তীব্র বা দীর্ঘ হয়ে যায় তখন মনের উপর মন্দ প্রভাব পড়ে এবং চিন্তা-ভাবনার পরিধি সীমিত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্যাবলি এবং কাঠিন্য যদি জনসাধারণের সামনে উপস্থিত থাকে এবং নিজের জীবিকা উপার্জন তথা নিজের পরিবারের অন্ন-বস্ত্র লাভের জন্য তাদের প্রলোভন এবং লোলুপতায় বাধ্য করে তাহলে এক সীমা পর্যন্ত তা সহনীয় হতে পারে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মুসলমানদের নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত। দারিদ্র্য এবং অভাবের চিন্তাকে ভুলে যাওয়া উচিত এবং যে কোনো বস্তুর বিষয়ে পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। এ হলো সেই শিষ্টতা, যে বিষয়ে আল্লাহ মুসলমানদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গ দিয়ে সুরা আনফাল আরম্ভ করেছেন, যাতে বদরের যুদ্ধের সমীক্ষা রয়েছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সাধারণ লোকদের জন্য নমুনা ও আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকেন, যদি অস্থায়ী কাঠিন্যের কারণে তাদের শিষ্টতা ও নৈতিকতা বিকৃত হয়ে যায় এবং ব্যবহার বিগড়ে যায়, তাহলে জনমত অত্যন্ত দ্রুত নিরাশা এবং অরাজকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের অবরোধ সুকঠিন হয়ে পড়ে। অতএব তারা শারীরিক-মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের নেতারা ধৈর্যবান এবং সহনশীল থাকেন। অতএব তাঁদের অনুসরণ করে জনসাধারণও ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করে।

আল্লাহর নবী বন্দিদের বিষয়ে মুসলমানদের সাথে আলোচনা করলেন। তাঁদের জীবিত রাখার ইচ্ছা কেবল তাদের সম্পদের কারণেই ছিল, যা কিসাসের প্রয়োজনীয়তার উপর বিজয় লাভ করল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আবু বকর, হজরত উমর ও হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুমের সাথে পরামর্শ করলেন। আবু বকর বললেন, 'হে আল্লাহর রসুল ! এরা আপনারই জাতি এবং আত্মীয়-স্বজন। আমার

প্রস্তাব যে এদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হোক, যাতে এই সম্পদ কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি জোগাতে পারে। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাদের হেদায়েত দিয়ে দিয়েছেন আর তারা আমাদের শক্তির কারণ বনে গেছে।'

হজরত উমর বললেন :

'আল্লাহর কসম, আমি আবু বকরের পরামর্শকে উচিতসম্মত মনে করতে পারছি না। আমার প্রস্তাব হলো আমাকে অনুমতি দেয়া হোক যে, আমি অমুক আত্মীয়কে হত্যা করি। আলী তার আপন ভাই আকিলকে হত্যা করুন। এরকমই হামজা তাঁর অমুক আত্মীয়ের মুণ্ডু উড়িয়ে দিন, যাতে আল্লাহ দেখতে পান যে, আমাদের মধ্যে মুশরিক-পৌত্তলিকদের প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই। এরা সবাই পৌত্তলিক দলপতি দম্পতি নায়ক ও নেতা।'

হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাব স্বীকার করে নেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের মুক্ত করে দেন। সকালে আমি রসুলুল্লাহ ও আবু বকরের কাছে গিয়ে দেখলাম, তাঁরা কাঁদছেন। আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : 'হে আল্লাহর রসুল ! আপনি কোন ব্যাপারে কান্নাকাটি করছেন ? যদি কান্নাকাটির কোনো বিষয় থাকে তাহলে আমিও কাঁদব।' তিনি বললেন : 'তোমার সাথিরা রক্তপাত সম্পর্কে যে মত দিয়েছিলেন আমি ঐ কারণে কাঁদছি। আল্লাহর ক্রোধ এই বৃক্ষটির চেয়েও কাছে এসে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ এই আয়াত অবতারণ করলেন : 'কোনো নবীর জন্য এ সম্ভব নয় যে, তার কাছে কয়েদি থাকবে, যতক্ষণ না ধরিত্রীতে (বিরোধী দলকে) তাদের হত্যা করা না হবে। তোমরা দুনিয়ার সুখসামগ্রী চাও আর আল্লাহ আখিরাত চান এবং আল্লাহ প্রভুত্বশালী ও সর্বজ্ঞ।

যদি (এ ব্যাপারে) আল্লাহ আগে থেকেই লিখে না রাখতেন তাহলে তোমরা যা কিছু করেছ, তার জন্য বড়ই শাস্তি দিতেন।' – আল আনফাল : ৬৭-৬৮

কয়েদি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মুক্তির দিন তাদের অতীত কর্মকে উপেক্ষা করা হোক। এরা মক্কার অত্যন্ত জঘন্য সব গোত্রপতি ছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শত্রুতায় বড়ই নিপুণ ছিল। তাদের পদ ও সামাজিক অবস্থান তাদের এমন জঘন্য করে তুলেছিল এবং তারাই সমগ্র মক্কা নগরকে যুদ্ধের আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। তারপর এই অপরাধীরা অধিকারে আসার পর তাদের মুক্তি করে দেয়াটা কীভাবে বৈধ ছিল ?

এদের এই কারণেই কি মুক্তি দেয়া উচিত ছিল যে, তারা মুক্তিপণ হিসেবে যথেষ্ট মাল দিতে পারত ? কাফিরদের অত্যাচার ও হিংস্র আচরণ এবং আল্লাহর প্রতি তাদের শত্রুতাকে ভুলে গিয়ে তাদের ধন সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা

মুসলমানদের জন্য খুবই অশোভনীয় ব্যাপার ছিল। আধুনিক পরিভাষায় তারা যুদ্ধবন্দি নয় ; বরং তারা ছিল যুদ্ধাপরাধী। আল্লাহ তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুতা ও অত্যাচারের কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছেন।

'তুমি কি দেখোনি তাদের, যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরিতে পরিবর্তিত করে নিয়েছে এবং নিজের জাতিকে আগুনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। যে জাহান্নাম আছে তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তা কতই না মন্দ ঠিকানা।' – ইব্রাহিম : ২৮-২৯

কুরআন ও সুন্নাহতে এমন স্পষ্ট আদেশ আছে, যা বন্দিদের দেখাশোনা ও তাদের সহায়তা করতে অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু তা সাধারণ বন্দি অপরাধীদের অনুসারীদের প্রতি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু যারা নিজেদের হিতের জন্য যুদ্ধের দ্বারা বাণিজ্য শুরু করে দেয় এমন বন্দিদের নির্মূল করা অনিবার্য, এই উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে 'ইসখান' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে, যার অর্থ রক্তপাত এবং দমন।

যে রকম জীবন সদাচারী শ্রেণীর দ্বারা প্রগতিশীল হয়, সেরকমই দুষ্ট লোকেরা তার অবনতির কারণ হয়। বৃক্ষের প্রফুল্লিত এবং বিকশিত হওয়ার জন্য যদি প্রতি বছর তার ডালপালা ছেঁটে দেয়া হয় তাহলে জীবনকে শক্ত এবং নীরোগ রাখার জন্যও মূর্খ, বদমাশ ও বিদ্রোহীদের দমন করতে পরোয়ানা চড়ানো উচিত। এই হক এর প্রতিদান সোনা-রুপা, ধন-দৌলতের পাহাড় দিয়ে হতে পারে না। আল্লাহ যখন তাঁর নবী ও তাঁর সাহাবিদের এই শিক্ষা দেন তখন তাঁরা চিন্তা-ভাবনা ও অনুতাপ করার পর তাঁদের ক্ষমা করে দেয়া হলো এবং তাঁর অনুগ্রহে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ব্যবহারের আদেশ দিয়ে দেয়া হলো :

'অনন্তর যা কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তুমি লাভ করেছ তা হালাল ও পবিত্র বিবেচনা করে খাও আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' – আল আনফাল : ৬৯

ছয়
যুদ্ধের পরে

বদরে মুসলমানদের গৌরবদীপ্ত বিজয়ের খবরে সমস্ত আরব হতচকিত হয়ে গেল। মক্কাবাসীরা প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করেনি ; বরং মনে করেছিল এ কোনো উন্মাদের প্রলাপোক্তি। কিন্তু যখন তারা সন্দেহাতীতভাবে পরাজয়বার্তা জেনে গেল, তখন লোক যেন বেহুঁশ ও মরণাপন্ন অবস্থায় পতিত হলো। কিছু লোকের উপর এ ঘটনার এতটা প্রভাব পড়ল যে, তারা সাধারণ জ্ঞানশক্তি হারিয়ে ফেলল।

মক্কাবাসীদের ন্যায় মদিনার পৌত্তলিক ও ইহুদিরাও একথা বিশ্বাস করেনি। কিছু লোক তো এ কথাও বলে বেড়াতে লাগল যে, মুসলমানদের এ বিজয়বার্তা মনগড়া অপপ্রচার মাত্র, কিন্তু বন্দিদের দেখামাত্র তাদের হাতের তোতা উড়ে গেল।

ইসলাম ও তার অনুসারীদের এই প্রভুত্ব, সাফল্য ও বিজয়ের কারণে বিরোধী শক্তিগুলোর আচার-ব্যবহার বদলে গেল এবং চারদিকে তাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। দ্বীপের উত্তরাংশ দিয়ে যাতায়াতকারী কাফেলাগুলো এতই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল যে বিনানুমতিতে এদিক থেকে অতিক্রম করার সাহস কারো থাকল না।

মক্কাবাসীরা শোকতাপ ও কান্নাকাটি থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পর তাদের কাটা ঘায়ে মলম লাগাতে শুরু করল এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যকে একত্রিত করে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করল। এই বিফলতা ছাড়াও তাদের ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি শত্রুতা বেড়ে গেল। ওদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর অত্যাচার আরো বাড়তে লাগল। অতএব, যারা ইসলামের সততায় প্রভাবিত হতো তারা তাকে গোপন রাখত অথবা অপমানিত হয়ে অসহায় জীবনযাপনে বাধ্য হয়ে যেত।

এসবই মক্কায় হচ্ছিল, যেখানে কুফরির রাজত্ব ছিল। কিন্তু মদিনার মুসলমানরা শক্তি ও জনমত লাভ করেছিলেন। সেখানে ইসলামের প্রতি শত্রুতা, দ্বেষ, কপটতার প্ররোচনা ও ধৃষ্টতার রূপ ধারণ করল। অতএব মুশরিক, পৌত্তলিক ও ইহুদিদের মধ্যকার কিছু লোক নামমাত্র ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু অন্তরে তারা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভরে রাখল। এদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উবাই ছিল প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি।

উসামা বিন জায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিরা মুশরিক-পৌত্তলিক ও গ্রন্থধারীদের ক্ষমা করে যেতে লাগলেন– যেমন আল্লাহ তাদের আদেশ দিয়েছিলেন। এবং কষ্টের মধ্যে সুদৃঢ় রইলেন। কুরআন বলেন :

'কিতাবধারীদের মধ্যেকার অধিকাংশই তাদের আন্তরিক ঈর্ষা থেকে এটাই চায় যে, তোমাদের যে কোনোভাবে ঈমান থেকে ফিরিয়ে তোমাদের পুনরায় কাফির বানিয়ে দেবে, যদিও সত্য স্পষ্টরূপে তাদের সামনে এসে গিয়েছে। তুমি ক্ষমা অবলম্বন করো এবং ধৈর্য ধরো আল্লাহর ফয়সালা পর্যন্ত।' – আল বাকারা : ১০৯

যখন বদরের যুদ্ধ সমাপ্ত হয় এবং কুরাইশদের বড় বড় নেতা নিপাত হয়ে যায় এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিরা বন্দিদের নিয়ে বিজয়ীর বেশে মদিনায় প্রবেশ করেন তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার পৌত্তলিক সাথিরা ভাবল যে, অবস্থা বেগতিক আর পুরো নিয়ন্ত্রণটাই তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তখন বাধ্য হয়ে সে এবং তার সাথিরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করল এবং ব্যক্তিগতভাবে তারা ইসলামের সমর্থক বলে গেল।

একদিকে কাফিরদের একটি দল ষড়যন্ত্র ও কপটনীতি অবলম্বন করল তো অন্যদিকে ইহুদিরা ইসলামের বিরুদ্ধে বৈরিতার কথা ঘোষণা করে দিল এবং বদরে কুরাইশদের যে পরাজয় হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ করতে চাইল। শুধু তাই নয় ; বরং ইহুদিদের এক নেতা কাব বিন আশরাফ ইসলামের শত্রুতায় এতটা অগ্রসর হলো যে, সে বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের স্মরণে শোকগাথা রচনা করে কিসাস[১]-এর দাবি জানাল।

এই শত্রুতার কারণে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ঘৃণা সৃষ্টি হলো এবং তা ছড়িয়ে পড়ল।

ইহুদিরা ইসলামী বিজয়কে ছোট করে এবং তাকে গুরুত্বহীন বলে প্রচারের প্রয়াস চালাল। তারপর বদরের যুদ্ধের পর তাদের পক্ষ থেকে বড়ই নিকৃষ্ট অপকর্ম ও অপরাধ প্রকাশ হতে লাগল এবং ইহুদিরা তার মূল্য ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তমূল্যে চুকিয়ে দিল।

মদিনার আশপাশের বেদুইনরা কুফর ও ঈমানের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখত না। তারা তো কেবল জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় নিরত থাকত, তা সে লুট করেই হোক অথবা চুরি ডাকাতি করেই হোক। ইতিহাস বলে যে, হাজিদের কাফেলার সাথে তারা কোনো প্রকারের শ্রদ্ধার ভাবও রাখত না, আর তারা কোনো কিছুর ভয়ও রাখত না। তাদের তো কেবল শক্তি প্রয়োগ করেই দমন করা যেত। যদি সউদির অধিবাসীরা তাদের ঠিক না করত আর তাদের দণ্ড না দিত তাহলে হাজিদের কাফেলা কখনোই সুরক্ষিত থাকত না। অতএব, তারা তাদের জীবিকা ছিনিয়ে নেয়ার আশঙ্কায় মুসলমানদের বিজয়ের ফলে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল এবং ভিতরে ভিতরে তারা মদিনা লুট করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করল। কিন্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আতঙ্ক মাথাচাড়া দেয়ার আগেই ছিন্নভিন্ন করে দিলেন এবং তাঁকে আর কোনো বিরোধের মোকাবিলা করতে হলো না।

সাত
ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ

মুসলমানরা না ইহুদিদের সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও সন্ধি ভঙ্গের কোনো সিদ্ধান্ত নেন আর না তাদের সামনে ইহুদিদের আরব থেকে বের করে দেয়ার কোনো

---

১. রক্তপণ। হত্যার বদলে হত্যা।

পরিকল্পনা করেন ; বরং মুসলমানরা আশা করতেন যে মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে সংঘর্ষ ও একত্ববাদের দৃঢ়তার বিষয়ে ইহুদিরা তাঁদের সাহায্য করবেন। তাঁরা আশা করতেন যে ইহুদিরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রবি করবে এবং প্রাচীন গ্রন্থাবলি ও নবীদের শিক্ষার প্রেম ও ভালোবাসার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা অশিক্ষিত আরবদের কাছে সন্তুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত বলে সিদ্ধ হবে যে তারা আল্লাহর সত্য নবী ছিলেন এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনাও অনিবার্য।

এ পবিত্র আশা ও অনুভূতি কুরআনের সাথে একীভূত ছিল, যা তাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তার উপরেই জোর দিয়ে চলেছিল :

'আর ঐ কাফিররা বলে : তুমি প্রেরিত (রসুল) নও। বলে দাও : আমার এবং তোমাদের মধ্যকার সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সেই, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে।' – আর রা'দ : ৪৩

'আর যাদের আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা তার প্রতি প্রসন্ন যা আমি তোমার উপর অবতারণ করেছি। আর কিছু দল এমনও আছে, যারা কিছু কথা অস্বীকার করে। বলে দাও : আমাকে তো মাত্র আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করি আর তার সাথে কাউকে সাক্ষী না মানি। আমি ওর প্রতিই আহ্বান করছি। আর ওর প্রতিই আমাকে ফিরতে হবে।' – আর রা'দ : ৩৬

কিন্তু ইহুদিরা এই আশার বিপরীত কাজ করল। মদিনার মুসলমানদের সাথে তারা অল্প কিছু দিন মাত্র অতিবাহিত করতে না করতেই হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। যদি তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, যেরকম ঈসাকে করেছিল এবং তাওরাত ছাড়া আর সব কিছুকে তারা মিথ্যা বলে মনে করত এবং নিজেদের উপাসনাস্থলগুলোতে নিজেদের উপাসনায় ব্যস্ত থাকত এবং আল্লাহর নবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-মিথ্যাচার-দোষারোপকে নিজেদের অন্তরে লুকিয়ে রাখত, তাহলে মুসলমানরা তাদের সাথে বিরোধ করতেন না এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ না করে কুফরি অবস্থায় ছেড়ে দিতেন।

কিন্তু যদি মুসলমানরা রাষ্ট্র নির্মাণকাজে নেমে পড়েন আর ইহুদিরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে আর ইসলাম যেখানে শিরকের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ সেখানে যদি তারা তাদের চিন্তাধারা ও ভাব-ভাষার মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারে লিপ্ত থাকে তাহলে এ অনুমতি তাদের কোনো অবস্থাতেই দেয়া হতে পারে না।

মুসলমানরা বদরের যুদ্ধ শেষে তখনো বিজয়োল্লাস করছিলেন, এমন সময় ইহুদিরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধমক দিয়ে বলল, আপনি একথা কখনো মনে জায়গা দেবেন না যে, একটি অনুভবহীন ও অজ্ঞ জাতিকে পরাজিত করে প্রভুত্বলাভ করেছেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমাদের সাথে যখন যুদ্ধ হবে তখন আমরা শিখিয়ে দেব যে যুদ্ধ কাকে বলে।

অতএব, এই ধমকির জবাবে তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী স্বরূপ পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হলো :

'যারা কুফরি করেছে, তাদের বলে দাও যে, অনতিবিলম্বেই তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তোমাদের হাঁকিয়ে দেয়া হবে, আর তা কতই না মন্দ ঠিকানা। তোমাদের জন্য ঐ দুই দলের মধ্যে (বদরের যুদ্ধে) যে সংঘর্ষ হয়েছে তা এক বড় নিশানি। এক দল আল্লাহর পক্ষে যুদ্ধ করছিল আর অন্য দলটি ছিল কাফির। এরা ওদের (মুসলমানদের) স্বচক্ষে দেখছিল যে, এরা তাদের থেকে দূরে। এবং আল্লাহ নিজের সহায়তায় যাকে ইচ্ছা তাকে শক্তি প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে এতে তাদের জন্য বোধের সামগ্রী রয়েছে, যাদের (অন্তর) চক্ষু আছে।' – আলে ইমরান : ১২-১৩

এ আয়াতরাজিতে বদরের যুদ্ধের কথাও স্মরণ করা হয়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে রোষ ও হিংসার প্রথম প্রকাশ ঘটায় বনু কাইনুকার ইহুদিরা, যারা নিজেরাই মদিনায় বসবাস করত। মুসলমানরা সহনশীলতা অবলম্বন করলেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের আশ্রয় নিলেন এবং তাদের কপটনীতি ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এরা তুচ্ছ ঝামেলা পাকানো থেকে শুরু করে গুণ্ডামি করতেও দ্বিধা করল না। একবার এক মুসলমান মহিলা বনু কাইনুকার বাজারে তার অলংকার বেচতে একটি সোনার দোকানে গিয়ে বসেন। সেখানে কিছু ইহুদি গুণ্ডা গিয়ে মুসলমান মহিলার সাথে অশালীন আচরণ করতে লাগল। স্যাকরা ঐ মহিলার নিচ অঙ্গের কাপড় আটকে রাখল। তারপর তিনি যখন উঠতে গেলেন তখন টান পড়ে তার কাপড় খুলে গিয়ে গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল। তা দেখে ইহুদিরা হাততালি দিল এবং হো হো করে হাসতে লাগল। মুসলমান মহিলা যখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেন তখন এক মুসলমান সেখানে পৌছে গেলেন এবং ঐ স্যাকরাকে তার অপকর্মের দণ্ড স্বরূপ হত্যা করলেন। তারপর ইহুদিরাও তাকে শহীদ করে দিল। এভাবে বনু কাইনুকা ও মুসলমানদের মধ্যেকার সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো।

এ হলো দ্বিতীয় হিজরি সনের শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়কার ঘটনা।

ইহুদিরা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৫ দিন যাবৎ অবরোধ করে রইলেন। এরপর তারা ভীতত্রস্ত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলো। তিনি (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব নিলেন এবং তাদের মৃত্যুদণ্ডের সংকল্প নিলেন। কিন্তু বনু কাইনুকাদের সাথে খাজরাজদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। অতএব আব্দুল্লাহ বিন উবাই সুপারিশ করল তাদের সাথে সুব্যবহার করা হোক। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন। আবারও বলল, এবার তিনি (রসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার রং বদলে গেল এবং বললেন, 'আমাকে একা থাকতে দাও' এবং তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন ; এমনকি লোকেরা তাঁর মুখে প্রবল ক্রোধের ছায়া দেখলেন। তারপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন : 'তোমার মুখে চুনকালি পড়ুক।' ইবনে উবাই বলল : 'আল্লাহর কসম, আমি আপনার পিছু ছাড়ব না যতক্ষণ না আপনি তাদের সাথে সুব্যবহারের ঘোষণা না দেবেন। তাদের চারশো কবচ ছাড়া এবং তিনশো কবচধারী বীর রয়েছে, যারা সমস্ত শত্রু থেকে আমাদের সুরক্ষিত রেখেছে। আপনি কি তাদের এক দিনে নির্মূল করে দেবেন ? আল্লাহর কসম ! আমার কালচক্র নানা বিপত্তির আশঙ্কা রয়েছে।' তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'আমি তাদের এই শর্তে ক্ষমা করছি যে, মদিনা থেকে তাদের চলে যেতে হবে এবং আমাদের আশপাশে কোথাও নয়।' অতএব তারা সকলেই মদিনা থেকে পলায়ন করে আজরিয়াত[১] গিয়ে সেখানেই বসতি স্থাপন করল এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সেখানেই বাস করল এবং সেখানেই মরল।

তাদের পক্ষে কি প্রতিবেশীদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করাটা কল্যাণকর ছিল না ? সন্ধিচুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মদিনায় নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে বসবাস করাটা কি উচিত ছিল না ? কিন্তু তারা তা করল না ; বরং অনতিবিলম্বেই তারা শয়তানি ও ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ব্যবহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এই পর্যালোচনা করেছেন :

'তুমি তো দেখছ যে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তারা দৌড়ে গিয়ে তাদের সাথে মিশে যায়, বলে : আমাদের ভয় হয় না জানি কোন বিপত্তি আমাদের উপর এসে পড়ে। অনন্তর, হতে পারে যে অনতিবিলম্বেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন, অথবা তাঁর পক্ষ হতে অন্য কিছু প্রকাশ পেতে পারে আর এ সমস্ত লোক যা কিছু নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে সে জন্য তারা লজ্জিত হয়।' – আল মায়িদা : ৫২

এখন আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করব যে, ইসলাম ও তার নবীর প্রতি ইহুদিদের শত্রুতা, ঘৃণা ও দ্বেষের কী কারণ ছিল ? এবং ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার জন্য পৌত্তলিকদের সাথে তারা কীভাবে একতা স্থাপিত করে রেখেছিল ?

এটাই কি আসল কারণ ছিল না যে, ইসলামের ও ইহুদিদের এ দ্বন্দ্ব যতটা না ছিল ধার্মিক তার চেয়ে বেশি ছিল রাজনৈতিক ? এবং সমস্ত আরব উপদ্বীপে

---

১. সিরিয়া।

কেবল ইসলামের প্রভুত্বশালী ও শাসক হওয়ার ভাবনা এই ভাবুক শত্রুতা ও দ্বেষের আসল কারণ ছিল না ?

মানুষের চিন্তাধারা ও স্বভাব বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করলে তার রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবে। আমরা মক্কা যুগে দেখেছি যে, অগ্নিপূজক ও ঈসায়ীদের দ্বন্দ্বে মুসলমানরা ঈসায়ীদের সমর্থক ছিলেন এবং ইরানের মোকাবিলায় রোমের পরাজয়ে তারা দুঃখিত ছিলেন, যদিও, এরপর ইসলামে ঈসায়ীদের সাথে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, যা এই সমর্থনের বৈধতা সিদ্ধ করতে পারে। কিন্তু এ কেবল এক স্বাভাবিক অনুভব ছিল, যা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষের পক্ষ থেকে আশা করা যায়। মুসলমানদের কাছে সেই পুস্তক ছিল, যা তৌহিদ বা একত্ববাদের আহ্বান ছিল এবং ঈসায়ীদের কাছে তৌহিদ বিষয়ে অনেক গোলমাল ছিল এবং তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করে ফেলেছিল, তা সত্ত্বেও তারা ছিলেন কিতাবধারী এবং তাদের অগ্নিপূজকদের চেয়ে উচ্চ, শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত বলে মনে করা হতো। অতএব স্পষ্টত, মূর্তিপুজোর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সমর্থন ও আন্তরিকতা বাস্তবে ইসলামের প্রতি সমর্থন বা সহানুভূতি ছিল এবং তা ছিল সেই বাস্তবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ঈসাইয়াতও তাদের কাছে নিকটতর ছিল, যেমন ছিল ইসলাম। বেশ কিছু বিষয়ে ইসলাম ঈসাইয়াত থেকে দূরে ছিল, যার ফলে ঈসায়ীদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

মক্কার মুশরিক-পৌত্তলিকরা যখন পারসিকদের প্রভুত্ব ও বিজয় লাভে প্রসন্ন হতো তখন তারা তাদের সহানুভূতির পাত্র ছিল। অতএব তারা এই প্রভুত্বকে সমস্ত আসমানি ধর্মের উপর মূর্তিপুজো বিজয় বলে মনে করত। তা ছাড়া আর কী কারণ ছিল যে, তৌহিদের আহ্বায়ক ইহুদিদের ন্যায় বলে যারা দাবি করত, তারা যেন ইসলামের সাফল্যে জ্বলে পুড়ে মরছিল এবং মূর্তিপূজকদের প্রতি তারা তাদের ভালোবাসা ও সহানুভূতির কোন কথাটি স্পষ্ট করে তুলছিল এবং এই নতুন ধর্মের উপর আরবের মূর্তিপুজোকে প্রভুত্বশালী রাখার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা কিসের দ্যোতক ছিল ?

ইহুদিদের এই ব্যবহারের স্পষ্টত এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক চুকে গিয়েছিল এবং তাদের সামান্যতম আচরণও কোনো অর্থেই আসমানি কিতাবের সাথে কোনো রকমের সম্পর্ক রাখত না। তারা একত্ববাদের ধারণা ও তাওরাতের আদেশের প্রতি সামান্যতম মর্যাদাও প্রদর্শন করত না। কেননা, এ সমস্ত বস্তু তাদের শাসনতান্ত্রিক ভাবনা ও স্বার্থের বিরোধী ছিল। অতএব কুরআন ঈমানের বিষয়ে তাদের ভ্রম প্রকাশ করেছিল :

'আর যখন তাদের বলা হয় যে, আল্লাহ যা কিছু অবতারণ করেছেন তার উপর ঈমান আনো, তখন তারা বলে আমরা তো সেই বস্তুর উপর ঈমান রাখি, যা আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এর বাইরে যা কিছু আছে তা তারা অস্বীকার

করে, যেখানে তাই-ই সত্য আর সেই সততারই সমর্থন দেয়, যা তাদের কাছে আছে। তাদের বলো, যদি তোমরা ঈমানদার হও তাহলে এর আগে আল্লাহর নবীদের কেন তোমরা হত্যা করতে ? এবং মূসা স্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন তা সত্ত্বেও তোমরা তার পরে জালিম হয়ে গো-বৎসকে দেবতা বানিয়ে বসেছিলে।' – আল বাকারা : ৯১-৯২

মনে হয় ইহুদিদের যে গোত্রগুলো আরবে বাস করত, তারা পেটপূজক বান্দাদের এমনই একটি দল ছিল, যারা ধর্মকে অধিক হতেও অধিকতরভাবে আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের হাতিয়ার বানিয়ে রেখেছিল। অতএব, যখনই তাদের এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয়তার উপর আঘাত পড়ত তখন তারা তাদের মধ্যেকার কুফরিকে প্রকাশ করে দিত এবং আল্লাহ ও তার নবীদের অস্বীকার করে বসত।

ইসলাম ও মূর্তিপুজোর মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বে তাদের প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো সুযোগ তারা পেল না, ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো সন্ধি বা সমঝোতার শর্ত ভঙ্গ করতে এবং নানা রকমের চাল চালতে এবং ষড়যন্ত্র করতে তারা পিছপা হলো না। এ কারণে দেশ পরিত্যাগ করা তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মদিনার পবিত্র মাটিকে এই অপবিত্র জঞ্জাল থেকে মুক্ত করা জরুরি ছিল।

মুসলমানরা সেই প্রতিপক্ষের পিছু ধাওয়া করেছে, যারা সন্ধি ও সমঝোতা বিনষ্ট করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে, কুরাইশ ও তার সমর্থকদের পক্ষ নিয়েছে এবং তাদের ক্ষয়-ক্ষতিতে যারা শোক প্রকাশ করেছে। মুসলমানরা এ ধরনের সমস্ত ইহুদি নেতার পিছু ধাওয়া করেছেন এবং তাদের হয় চিরকালের জন্য নির্মূল করে দিয়েছেন নতুবা হুমকি দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন।

এই দুষ্ট ইহুদিদের মধ্যে কাব বিন আশরাফ নামক এক কুখ্যাত কাফির ছিল, সে বদরের যুদ্ধের পর মক্কার মুশরিক-পৌত্তলিকদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করত এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন জ্বালাতে মদিনা থেকে মক্কায় যাত্রা করল। আবু সুফিয়ান একেই জিজ্ঞাসা করেছিল : 'আমি তোমাকে খোদার দোহাই দিয়ে প্রশ্ন করছি, বলো খোদার কাছে আমাদের ধর্ম প্রিয় না মুহাম্মদের ধর্ম ? আমাদের মধ্যে হিদায়েত ও সত্যের নিকটবর্তীকে আমরা আতিথ্যের ইচ্ছায় সবচেয়ে ভালো উটটি জবাই করি আর অতিথিদের পানির স্থলে দুধ দিয়ে আতিথ্য করি, অতএব এর চেয়ে ভালো কথা আর কী হতে পারে ?'

তখন কা'ব উত্তর দিল : 'তোমরা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিদায়েতপ্রাপ্ত।' অনন্তর, আল্লাহতায়ালা এই আয়াত অবতারণ করলেন :

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যাদের কিতাবের একটি অংশ প্রদান করা হয়েছিল ? তারা গিবত ও তাগুত-এর উপর ঈমান আনে আর কাফিরদের বলে যে, এরা ঈমান আনয়নকারীদের চেয়েও সরল পথে রয়েছে।' – আন নিসা : ৫১

কা'ব বিন আশরাফ ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে মদিনায় ফিরে এল এবং সে মুসলমান মহিলাদের নিয়ে প্রেমাবেগপূর্ণ কবিতা রচনা ও প্রচার শুরু করে দিল। অনন্তর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তার রক্ত মুসলমানদের জন্য হালাল হয়ে গেল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের মধ্যে এর কাম তামাম করে দেয়ার জন্য কে প্রস্তুত আছ ?

মুহাম্মদ বিন মুসলিম ও আবু নাইল রাজিয়াল্লাহু আনহুম এই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ঐ ইহুদিদের সাথে মনমনোহর কথাবার্তা বলার আদেশ দিয়ে দিলেন, যাতে সে প্রসন্ন হয়ে যায়। অনন্তর দুজনে কাবের কাছে গিয়ে পৌছালেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন যে, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের কাছে সদকা দাবি করেন এবং ইনি আমাদের বড়ই কষ্ট-উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। আমি আপনার কাছে ঋণ নিতে এসেছি।' কা'ব বলল : 'এখন আর কী হয়েছে ভবিষ্যতে ঐ লোকটি তোমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে।' মুহাম্মদ বিন মুসলিম বললেন : 'আমরা তো এখন তাঁর অনুসারী হয়ে গেছি। এখন তাঁকে ত্যাগ করাটা আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। এখন আমরা চাই যে, আপনি আমাদের কিছু খাদ্যশস্য ঋণস্বরূপ দিন।' কা'ব বলল, 'ঠিক আছে কোনো জিনিস আমার কাছে বন্ধক স্বরূপ রাখো।' তাঁরা বললেন, 'আপনি কী বন্ধক রাখতে চান ?' কা'ব বলল : 'তোমাদের স্ত্রী-কন্যাদের বন্ধক রাখো।' তারা বললেন : 'এটা কীভাবে সম্ভব ! আপনি কী আরবদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর যুবক নন ?' সে বলল : 'তাহলে তোমাদের ছেলেদের বন্ধক রাখো।' এরা বললেন : 'এ তো চিরজীবনের লজ্জা। লোকে আমাদের খোঁটা দিয়ে বলবে যে, তোমরা তো তারাই, যারা এই তিন সের খাদ্যশস্যের জন্য নিজেদের সন্তান বন্ধক রেখেছিলে ! আমরা আমাদের অস্ত্রগুলো আপনার কাছে বন্ধক রাখতে পারি।'

আবু নাইলাও কা'বকে একই কথা বললেন। আবু নাইলা রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন : 'এই ব্যক্তির আগমনের পর আমরা ধন্দে পড়ে গেছি। আমাদের সবাইকে একই কামান দিয়ে দাগছেন আর আমাদের জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। আমাদের সন্তানরা ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আর আমাদের সন্তান-সন্ততিদের অবস্থাও বড়ই করুণ।' কা'ব যে কথা মুহাম্মদ বিন মুসলিমকে বলেছিল তাকেও সেই কথা বলল, অতএব কা'ব হাতিয়ার বন্ধক রেখে খাদ্যশস্য ঋণ দিতে রাজি হয়ে গেল।

তারা চাচ্ছিলেন যে, তাঁদের কাছে অস্ত্র দেখে কা'ব যেন চমকে না ওঠে। এক চাঁদনি রাতে তাঁরা ওয়াদা অনুসারে তাঁর বাড়ির কাছে গিয়ে পৌছালেন। এঁরা কা'বকে যখন আওয়াজ দিলেন তখন তার স্ত্রী বলল : 'এই আওয়াজে আমি রক্তের ফোঁটার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।' কা'ব বলল : 'সম্ভ্রান্ত মানুষ বর্শার

আঘাত দেয়ার জন্য ডাকলেও সেখানে অবশ্যই যাওয়া উচিত।' কা'ব নিচে নেমে এল। তার দেহ থেকে উগ্র সুগন্ধ ভেসে আসছিল। এঁরা তার সাথে কথাবার্তা শুরু করলেন। আবু নাইলা তার মাথার চুলের গন্ধ শুঁকে বললেন : 'আজকের মতো সুগন্ধ আমি আর কখনো শুঁকিনি।' একথা শুনে কা'ব খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। আবু নাইলা পুনরায় তার মাথায় সুগন্ধ শুঁকতে চাইলেন এবং লাফ মেরে তার মাথার চুল ধরে মাথাটা টেনে নামিয়ে বললেন : 'এর মস্তক উড়িয়ে দাও।' সাথে সাথে তার উপর তরবারি বর্ষিত হলো এবং তার শরীরে ধারাল অস্ত্রটি ঢুকে গেল, যে অস্ত্র সে তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের স্থলে বন্ধক রাখতে চেয়েছিল। – ইবনে হিশাম

কা'ব এমন জোরে চিৎকার করে উঠল যে, সে আওয়াজে মানুষের ঘুম ভেঙে গেল এবং কী ঘটেছে তা জানার জন্য আলো জ্বালাল। সকালবেলা ইহুদিরা যখন তাদের নেতার হত্যাকাণ্ডের খবর জানতে পারল তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এভাবে বিষধর সাপেরা তাদের মাথাগুলো চালার মধ্যে লুকিয়ে নিল।

সদুপদেশে যখন কাজ হলো না এবং বার্তা বিফলে গেল তখন 'আমায়ে কলিমি'[১] তে কাজ হলো। ইহুদিরা শিক্ষা পেয়ে গেল অতএব, তারা আর না প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল আর না মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের আর কোনো সাহসও অবশিষ্ট রইল। এবার তারা অবদমিত হয়ে ভাবতে লাগল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার পরিণাম খুব মধুর হবে না।

এভাবে কিছু দিনের জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের পৌত্তলিকদের দমন করার জন্য মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

আট
কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযান

বদরের যুদ্ধে বিজয়ের পর মুসলমানরা না কোনো ধোঁকায় পড়লেন আর না নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযানে পিছপা রইলেন। তাঁরা ভালো মতোই জানতেন যে, মক্কা প্রতিশোধ নিতে পিছপা হবে না, এ ঘটনার পর তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

আবু সুফিয়ান খুবই কম সময়ে এবং ক্ষতিরে প্রভাবশালী কার্যনির্বাহ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করল, যাতে কওমের শক্তি ও সম্মান রক্ষা পায়। অতঃপর সে

---

১. মূসার লাঠি।

মদিনায় গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা নিল, যাতে ক্ষতিপূরণ হতে পারে। কুরাইশদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার হতে পারে এবং মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সইতে হতে পারে।

সে প্রতিজ্ঞা করল, মুহাম্মদের সাথে যতদিন না যুদ্ধ করব ততদিন জানাবত[১] - এর গোসল করব না। আর সে তার প্রতিজ্ঞা পুরো করার কাজে আত্মনিয়োগ করল।

সে ২০০ অশ্বারোহীর একটি বাহিনী নিয়ে প্রস্থান করল এবং মদিনার কাছে বনু নজিরের বসতিতে পৌঁছে সালাম নামক ইহুদির কাছে গিয়ে অবস্থান নিল। মুসলমানদের খবরাখবর নিল এবং দুই নেতা মুসলমানদের আঘাত দেয়ার এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপক পরিকল্পনা করল।

তারপর আবু সুফিয়ান তার শপথ পুরো করার জন্য আরিজ নামক স্থানে হামলা চালিয়ে দিল। নিজেদের ক্ষেতে দুই ব্যক্তি কৃষিকাজে লিপ্ত ছিল, তাদের হত্যা করল। মুসলমানরাও তাদের ধরার জন্য পিছু ধাওয়া করলেন। আবু সুফিয়ান পরিস্থিতি আঁচ করে তাদের বাহনগুলো থেকে জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা সেসব বস্তা খুলে দেখলেন তাতে ছাতু ভরতি। এ কারণে এই সংঘর্ষকে তারা গজওয়া সাউয়িক[২] নামে অভিহিত করলেন। এই ব্যর্থ আক্রমণে কুরাইশরা কোনো মান প্রতিষ্ঠাই লাভ করতে পারল না। অতঃপর আনুকূল পরিস্থিতি না আসা পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, এখন মুসলমানদের সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া যাবে না। কেননা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা তখন দিনরাত মদিনার রাস্তা অতিক্রম করত।

সফওয়ান বিন উমাইয়া কুরাইশদের বলল : 'মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিরা আমাদের কাফেলা যাওয়া-আসার পথ রোধ করেছে, এখন বুঝতে পারছি না কী করা যায়। কেননা, সমুদ্রতট থেকে তারা সরে যেতে মোটেও প্রস্তুত নয়। আর তা ছাড়া তটবর্তী লোকদের সাথে তারা সন্ধি করে নিয়েছে এবং তারা সবাই মুহাম্মদের অনুগামী হয়ে গিয়েছে। এখন আমার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না যে, এখন আমাদের করণীয় কী। যদি ঘরে বসে যাই তাহলে তো তা চিরকাল চলবে না। মক্কায় আমাদের জীবনযাত্রা তো গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও শীতকালে হাবশার বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল।

আসওয়াদ বিন মুত্তালিব তাকে পরামর্শ দিল মদিনার পথ ত্যাগ করে ইরাকের পথ ধরো আর পথ প্রদর্শকরূপে বনু বকর বিন ওয়াইল ও ফুয়াত বিন হাইয়ানকে নাও, যাতে পথ ভুল করে এদিক-ওদিক ঘুরে না মরতে হয়।

---

১. সহবাসের পরে গোসল করাকে জানাবত বলে।

২. সাউয়িক– ছাতু। অর্থাৎ, ছাতুর যুদ্ধ বা ছাতু অভিযান।

অনন্তর এই নতুন পথে সফওয়ান বিন উমাইয়ার নেতৃত্বে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা এগিয়ে চলল কিন্তু নইম বিন আসওয়াদ এই যাত্রীদল ও তাদের যাত্রা পরিকল্পনার খবর নিয়ে মদিনায় পৌঁছে গেলেন। তখনো পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি। অতএব একদিন মদ পানের জন্য শরিক হন এবং মদ খেয়ে নেশাচ্ছন্ন হয়ে তিনি বাণিজ্য কাফেলার সব রহস্য উদঘাটন করে দেন। তারপর হজরত সুলাইত অনতিবিলম্বেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে গিয়ে পরিস্থিতি জানিয়ে দিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ জায়েদ বিন হারিসার নেতৃত্বে শত অশ্বারোহীর একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা কিরদা নামক ঝরনার কাছে ঐ কাফেলাকে ঘিরে ফেললেন এবং সমস্ত মালামাল অধিকার করে নিলেন, যাতে প্রচুর পরিমাণে রুপো ছিল এবং সমস্ত মুশরিক-পৌত্তলিক প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলো। কেবলমাত্র ফুরাত বিন হাইয়ানকে বন্দি করে নিয়ে আসা হলো। তাঁকে মদিনায় নিয়ে আসা হলে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

এই নতুন আঘাতে মক্কাবাসীরা খুবই দুঃখ পেল এবং বদরের যুদ্ধে এর প্রতিশোধ নেয়ার দাবি তীব্রতর হয়ে উঠল এবং পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। এ সমস্ত ঘটনা ৩ হিজরিতে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধের ভূমিকা বলে সিদ্ধ হলো।

হিজরতের পর দু বছরের মধ্যে সামরিক কার্যক্রমের উল্লেখ আমরা যথাসময়ে করব তবে এখানে আমরা কিছু টুকরো ঘটনারও উল্লেখ করব।

ইতিমধ্যে হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যা হজরত হাফসা রাজিয়াল্লাহু আনহা-এর স্বামী হজরত খুনাইস বিন হুজাফা সহমী রাজিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন। ইনি বড়ই সংযমী, সদাচারী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। যখন তাঁর ইদ্দত পুরো হয়ে গেল তখন তাঁর পিতা তাঁর জন্য অন্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। হজরত উমর বলেন, আমি হজরত উসমান বিন আফফান রাজিয়াল্লাহু আনহু-কে আমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিই, তখন তিনি চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন বলে জানালেন। কিছু দিন পর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে একথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন, আমি চিন্তা করে দেখলাম, এ বিয়ে আমার জন্য ঠিক হবে না।

হজরত উমর বলেন, আমি আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি চাইলে আমার কন্যার সাথে আপনাকে বিয়ে দিতে পারি। আবু বকরও নীরব রইলেন এবং তিনি আমাকে কোনো জবাব দিলেন না। অতএব উসমানের তুলনায় আবু বকরের ব্যবহারে আমি বড় বেশি কষ্ট পেলাম।

আমি কিছু দিন নিশ্চেষ্ট রইলাম। এমন সময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়গাম এল হাফসাকে বিবাহের জন্য। অতএব আমি তাঁর সাথে

বিয়ে দিয়ে দিলাম। পরে হজরত আবু বকর আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার নীরবতায় আপনি হয়ত দুঃখ পেয়ে থাকবেন। আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন :

'আপনার নিবেদনের কোনো উত্তর এই কারণেই আমি দিইনি যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা স্মরণ করেছিলেন। অতএব, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপনীয়তা কীভাবে প্রকাশ করতে পারতাম ? তিনি যদি ছেড়ে দিতেন তাহলে আমি গ্রহণ করে নিতাম।' – বুখারী, নাসাঈ, আহমদ

হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে শ্বশুর সম্পর্ক স্থাপন করার পর হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথেও একই সম্পর্ক স্থাপন করা, তাঁর কন্যার বিয়ে হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে দেয়া এবং হজরত রোকাইয়ার রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর পর তাঁর আরেক কন্যা হজরত উম্মে কুলসুমের বিয়ে হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে দেয়া– এ সমস্ত ঘটনা ঐ চার মহান ব্যক্তির সাথে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করতে চাওয়ারই পরিণাম, যাদের দায়িত্বশীলতা ও বীরত্ব ছিল সুপ্রসিদ্ধ এবং তাঁরা তাঁর সাথে জানমালের বাজি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে রমজানের রোজা ফরজ হয়ে গেল আর ঈদুল ফিতর-এর সদকা[১] ফরজ[২] করে দেয়া হলো এবং জাকাতের অন্য নিসাবগুলোর[৩]ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো। এই বদরেই মুসলমানদের কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে পরিবর্তিত করে কাবাকে নিশ্চিত করা হলো। এই পরিবর্তনের ফলে ইহুদিদের রোষ বেড়ে গেল এবং ইসলামের সাথে শত্রুতার মাত্রাও বৃদ্ধি পেল।

এর আগে তাদের আশা ছিল যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অনুকরণ করতে থাকবেন। ইহুদিদের এই নীরবতা ও মিলেমিশে চলার নীতির উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে, তারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে লাভবান হতে চেয়েছিল এবং তাঁর সাথি ও আনসারদের ব্যবহার করতে চেয়েছিল কিন্তু যখন ইসলামের নতুন কিবলা নিশ্চিত হয়ে গেল তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল এবং এই নিরাশা তাদের পুনরায় ইসলামকে উচ্ছেদ করতে প্রস্তুত করিয়ে দিল।

পবিত্র কুরআন এই বিবাদজনিত যুদ্ধের এক চিত্র পেশ করেছে, যা কিবলা পরিবর্তনের সাথে সাথে ইহুদিদের পক্ষ থেকে শুরু করা হয়েছিল :

---

১. সদকা, পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে এ ফিতরা নামে অভিহিত ।

২. ফরজ অনিবার্য বা অবশ্য কর্তব্য।

৩. ফরজ হওয়া সম্পদরাজি পরিমাণ। অনুবাদক

'এখন মূর্খেরা বলবে : এদের (মুসলমানদের) সেই কিবলা, যার অভিমুখী তারা ছিল, কোন বস্তু তা থেকে তাদের ফিরিয়ে দিল ? বলো : পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।' – আল বাকারা : ১৪২

'নিজের চেহারাকে পূর্ব এবং পশ্চিমে ফিরিয়ে নেয়াটাই বেশি পুণ্য ও আনুগত্যের পরিচায়ক নয় ; বরং আনুগত্য ও তাঁরই আনুগত্য ; যারা আল্লাহ তাঁর অন্তিম দ্বীনের উপর ঈমান আনে।' – আল বাকারা : ১৭৭

'এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই, অনন্তর যে দিকেই অভিমুখী হও; তা আল্লাহরই।' –আল বাকারা : ১১৫

আল্লাহ তা'লা স্থান-কাল-পাত্রের প্রভু। কোনো সম্প্রদায়ের একটি কিবলার প্রতি অভিমুখী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ ঐ পরিধিতে নিজেই সীমিত এবং তাঁর প্রভুত্বও সীমিত। মুসলমানদের কিবলা পরিবর্তনের আদেশ বাস্তবে ঐ তথ্যের প্রতিই প্রত্যাবর্তনের বার্তা ছিল, যার নির্মাণ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দ্বারা হয়েছিল। আর সেই তথ্যের অবজ্ঞা থেকে আত্মরক্ষা যা পরবর্তীকালে পথভ্রষ্ট জাতিগুলো বিশেষ করে বনি ইসরাইলিদের পক্ষ থেকে প্রকট হয়েছিল।

নয়
উহুদের যুদ্ধ

বদরের রণক্ষেত্রে পরাজয়ের পর কুরাইশরা এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পায়নি। এর পরের ঘটনাবলি তাদের প্রতিশোধের ভাবনাকে অত্যধিক বাড়িয়ে দিয়েছিল। এক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই মক্কার অধিবাসীরা পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। এর ফলে তাদের পক্ষধারী বন্ধু এবং ইসলামের সমস্ত শত্রু তাদের সাথে একত্র হয়ে গেল।

তিন হাজারেরও বেশি মুশরিক-পৌত্তলিক-মালাউনের একটি বাহিনী প্রবল আক্রোশে শক্তিমদমত্তে মত্ত হয়ে সদর্পে এগিয়ে চলল।

সেনাপতি [illegible]বু সুফিয়ানের সিদ্ধান্তমতে মহিলাদেরও সাথে নেয়া হলো যাতে তারা বীরত্ব ও জাতীয় গৌরব সম্বলিত বীরত্বগাথা গেয়ে যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে, রণক্ষেত্র থেকে পলায়নপরদের লজ্জা দিতে পারে এবং যোদ্ধারা মহিলাদের অপমানের তাড়নায় জীবনপণ করে যুদ্ধ করতে পারে।

অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষের যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল এ যুদ্ধই তা নিবারণ করতে পারত।

অতএব, ৩ হিজরি সনের শাওয়াল মাসের শুরুতে তারা মদিনায় পৌঁছাল এবং উহুদ পর্বতের কাছে শিবির স্থাপন করে চরে বেড়ানোর জন্য ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিল।

সমস্ত মুসলমান রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একত্রিত হলেন বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে পরামর্শ করার জন্য যে, মদিনা থেকে বেরিয়ে যুদ্ধ করা হবে, না মদিনার অলিগলিতে ঘিরে ফেলে তাদের চেপে মারা হবে এবং মহিলারাও কি ছাদের উপর থেকে আক্রমণ করবেন ?

আল্লাহর রসুল পরবর্তী প্রস্তাবের সাথে সহমত ছিলেন এবং বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এর সমর্থনও করলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর কাছেও এটি পছন্দনীয় হলো। কিন্তু যে যুবকরা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ব্যাকুল করে তুলল। তাঁরা বাইরে বেরিয়ে যুদ্ধ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন : 'আমরা এই দিনটার কামনা করতাম এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম। আজ আল্লাহ আমাদের এই অবসর দান করেছেন এবং আমাদের গন্তব্য নিকটতর করে দিয়েছেন।' অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠ মত বাইরে বেরিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে গেল। রসুলুল্লাহ আপন গৃহে ফিরে গেলেন এবং কবচ পরে বাইরে এলেন।

লোকেরা ভাবল, আমরা রসুলুল্লাহ-কে বাধ্য করেছি। অতএব, তারা নিজেদের মত প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিলেন কিন্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন মতের কারণে উদ্বেগ অনুভব করলেন এবং বললেন :

'অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরুবার পর তা ত্যাগ করা কোনো নবীর জন্য বৈধ নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর এবং তার শত্রুদের মধ্যে ফায়সালা না করেন।'

এবং তারপর বললেন :

'আমি তোমাদের পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তোমরা বাইরে বেরিয়ে আসার আগ্রহ প্রকাশ করলে, অতএব আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে যুদ্ধে দৃঢ়তা প্রদর্শন করো এবং আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা মনে রাখো। চলো, অগ্রসর হও।' –হাকিম, বাইহাকী

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাজার সৈন্য নিয়ে বেরুলেন এবং উহুদে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই পথিমধ্যেই প্রায় ৩০০ সৈনিক নিয়ে পৃথক হয়ে গেল এবং বলতে লাগল : 'আমরা শুধু শুধু কেন আমাদের এ অমূল্য জীবন ধ্বংস করি ?' আর বাহানা করল যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অন্যদের মত গ্রহণ করেছেন।

জাবির রাজিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আব্দুল্লাহ বিন হারাম তাকে অনেক করে বোঝালেন এবং তাকে ফিরে আসার পরামর্শ দিলেন এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যদি তাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান থাকে এবং ইসলাম ও রসুলুল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকে তাহলে তাঁর জন্য মদিনা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মদিনাকে রক্ষা করা ফরজ কাজ।

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। অনন্তর, তার এবং তার ফিরে আসা লোকদের বিষয়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হলো :

'এবং যাতে ঐ মুনাফিকদেরও বিভাজিত করে যাদের বলা হয়েছে যে, যাও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা শত্রুদের হটিয়ে দাও। তারা বলল, যদি আমরা জানতাম যে, যুদ্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথি হয়ে যেতাম। ঐ দিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরির অধিক নিকটবর্তী ছিল।' – আলে ইমরান : ১৬৭

মুসলমানরা উহুদ উপত্যকায় এমনভাবে অবস্থান নিলেন যে, তাঁদের পিঠ থাকল পাহাড়ের দিকে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রণনীতি প্রণয়ন করলেন এবং সৈন্যদের পঙ্‌ক্তিবদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত করলেন। ৫০ তীরন্দাজকে পাহাড়ের পিছনে নিযুক্ত করা হলো, যাদের নেতৃত্বের ভার দেয়া হলো আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরের উপর এবং নির্দেশ দেয়া হলো : 'তীর বর্ষণের সাহায্যে শত্রুদের দূরে ঠেলে রাখবে তারা যেন পাহাড়ের পিছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ আমাদের অনুকূলে বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন এখান থেকে কোনো অবস্থায়ই হটে যাবে না, তা পৌত্তলিকরা আমাদের উপর যতই প্রভুত্ব লাভ করুক না কেন।'

এক বর্ণনায় এরকম আছে : 'পিছন দিক থেকে আমাদের সুরক্ষিত রাখবে, যদি আমাদের হত্যা করতেও দেখো তা সত্ত্বেও আমাদের সাহায্য করতে আসবে না এবং যদি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ দেখো তা সত্ত্বেও তাতে অংশ নেবে না। এভাবে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন যে, তীরন্দাজ বাহিনী তাঁর আদেশ অমান্য করবে না। অনন্তর তিনি অগ্রবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলোকে আদেশ দিতে অগ্রসর হলেন এবং বললেন : 'আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করবে না।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং দুটি কবচ পরিধান করে সামনে এলেন (হাকিম, বাইহাকী) এবং বীর ও যোদ্ধাদের চয়ন করতে লাগলেন, যাঁরা অগ্রসর হয়ে তরবারির দ্বারা ভয়ংকর আক্রমণ চালাবেন। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মুশরিক-পৌত্তলিকদের এক-চতুর্থাংশ আর এ বাহিনীর যোদ্ধা তারাই হতে পারতেন, যাঁরা এক একজন হাজার বীরের সমকক্ষ ছিলেন।

হজরত সাবিত রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে এক তরবারি হাতে নিয়ে বললেন : কে এমন আছে যে এই তরবারির হক আদায় করবে ? এ কথা শুনে তা লাভ করার জন্য সেখানে ভিড় জমে গেল। আবু দুজানা বললেন, এর হক আমি আদায় করব। তিনি তরবারি হাতে নিয়ে নিলেন এবং তা দিয়ে মুশরিক-পৌত্তলিকদের ছিন্নভিন্ন করে ছাড়লেন। আবু দুজানা বড়ই বীর এবং সাহসী ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি বড়ই ভয়ংকর হয়ে উঠতেন, মাথায় লাল পাগড়ি বেঁধে নিতেন আর ধীরে ধীরে চলতেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন, এই বীর পুরুষ

তার শাহাদৎ পর্যন্ত লড়তে থাকবেন। যখন আবু দুজানা তরবারি হাতে তুলে নিলেন, তখন মাথায় পাগড়ি বাঁধলেন এবং কবিতার এই ছত্র কয়টি আবৃত্তি করতে করতে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন :

'সেই জন আমি বন্ধুর কাছে করেছি অঙ্গীকার।
মরুভূ-র কাছে ছিলাম আমরা পিছনে উহুদ পাহাড়।
যুদ্ধক্ষেত্রে পিছন সারিতে কখনো রবো না আমি
আল্লাহ ও তাঁর নবীর শত্রু মারতে তুলেছি এ তরবারি ॥'

তারপর দু পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি হলো এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সৈন্যদের শত্রুদের উপর আক্রমণ করার আদেশ দিয়ে দিলেন এবং যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখা গেল, মনে হচ্ছিল তিন হাজার মুশরিক-পৌত্তলিক ত্রিশ হাজার মুসলমানের সাথে মোকাবিলা করছেন। ওদিকে মুসলমানরা বীরত্ব ও বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পেশ করতে লাগলেন।

হজরত হানজালা আবি বিন আমির যখন যুদ্ধের ধ্বনি শুনলেন তখন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সবে বিয়ে হয়েছিল। তিনি তার পত্নী থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এলেন, যেন জিহাদের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হন।

কাম-বাসনার আকাঙ্ক্ষার উপর আত্মোৎসর্গ ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা বিজয় লাভ করল এবং এই মহান সন্তান জানাবতের অবস্থায় শাহাদতের অমৃত সুধা পান করলেন।

মুজাহিদদের পঙ্‌ক্তিতে ঈমানের রুহ ছড়িয়ে পড়ল। অতএব তাঁরা পৌত্তলিক সৈন্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে তরবারি চালাতে লাগলেন।

কুরাইশ নেতা তালহা বিন আবি তালহা যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে ময়দানে অগ্রসর হলো, হজরত জুবাইর বিন আওয়াম রাজিয়াল্লাহু আনহু এক লাফ দিয়ে তার উটের পিঠে চড়ে বসলেন তারপর তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তরবারির আঘাতে মস্তক উড়িয়ে দিলেন।

হজরত আবু দুজানা রাজিয়াল্লাহু আনহু মাথায় লাল পাগড়ি বেঁধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। এক পৌত্তলিক আহত মুসলমানদের হত্যা করে চলেছিল। কা'ব বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখলাম যে, এক মুসলমান মাথায় পাগড়ি বেঁধে ঐ ব্যক্তিকে তাক করে রইলেন। আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম, যদিও আমি মুসলমান ও কাফির উভয়ের মধ্যে শক্তিশালী ছিলাম। আমি অনুভব করলাম যে মুসলমানদের তুলনায় কাফিররা ঢাল-তরবারি ও অস্ত্রশস্ত্রে অনেক বেশি অগ্রসর। আমি তার পরিণামের প্রতীক্ষায় রইলাম এমনকি উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে গেল। মুসলমান কাফিরের ঘাড়ে এমন জোরালো আক্রমণ হানলেন যে, তা বর্ম পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আর সে দুষ্ট দু'টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মুসলমান তার

চেহারা প্রকাশ করে বললেন : 'কা'ব ! এ তোমার কেমন বিচার ! আমি তো আবু দুজানা।'

হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব ক্ষুধার্ত সিংহের মতো আক্রমণ চালিয়ে বনি আব্দুদদারের নেতাদের চিরকালের জন্য নিপাত করে দিলেন।

জুবাইর বিন মুতইমের হাবশি ক্রীতদাস ওহশী বিন হরব বলেন, জুবাইর আমাকে বলল যে, মুহাম্মদের চাচা হামজাকে হত্যা করতে পারলে তোকে মুক্ত করে দেয়া হবে। অতএব কুরাইশরা উহুদের উদ্দেশ্যে রওনা হলে আমি তাদের সাথি হয়ে যাই। আমি হাবশিদের মতোই বর্ষা আক্রমণে নিপুণ ছিলাম এবং নিখুঁত লক্ষে আঘাত হানতে পারতাম। যুদ্ধ শুরু হলে আমি হামজার সন্ধানে নেমে পড়লাম এমনকি আমি তাঁকে দ্রুতগতিসম্পন্ন উটের ন্যায় আক্রমণ করতে দেখলাম। তিনি তাঁর তরবারির আঘাতে লাশের স্তূপ করে চলেছিলেন, কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। আমি তাঁকে তাক করার জন্য একটি বৃক্ষ বা পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম, দেখলাম, সাবা বিন আব্দুল উজ্জা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। যখন হজরত হামজা তাকে দেখে গর্জন করে বললেন : 'ওরে খতনাকারী মহিলার বাচ্চা ! তুই আল্লাহ ও তাঁর রসুলুল্লাহর মোকাবিলা করতে এসেছিস ? একথা বলে তরবারি উঁচিয়ে তিনি এক ভয়ংকর আক্রমণ করলেন আর সাথে সাথে তার মস্তক মাটিতে গড়াগড়ি খেল। ওহশী বর্ণনা করেন, আমি যখন পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম তখন আমি তাঁর নাভি তাক করে বর্শা চালালাম আর তা পার হয়ে চলে গেল। তিনি আমার দিকে অগ্রসর হলেন কিন্তু তিনি আর বাড়তে পারলেন না, বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং ঐ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলো। আমি আমার বর্শাটি নিয়ে তাঁবুতে চলে এলাম। কেননা এরপর আমার আর কোনো কাজ ছিল না। আমি আমার মুক্তির জন্য তাঁকে হত্যা করেছিলাম।

হামজার শাহাদতের ফলে মুসলমানরা বড় আঘাত পেলেন। তা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় সৈন্য তাঁদের বাহিনীতে দৃঢ়পদ রইলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদের পতাকাবাহক ছিলেন ইসলামের মহান আমন্ত্রণকর্তা হজরত মুসআব বিন উমাইর। তিনি যখন শহীদ হয়ে গেলেন তখন আলী বিন আবি তালিব পতাকা তুলে নিলেন এবং মুহাজির ও আনসার এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হতে লাগলেন। এভাবে এই পতাকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের ধ্বনি ছিল– 'আল্লাহু আকবর'।

কুরাইশদের মহিলারা দফ বাজিয়ে নেচে গেয়ে পুরুষদের উত্তেজিত করছিল। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল হিন্দ বিনতে উতবা। সে বনি আব্দুদদারকে পতাকা উর্ধ্বে তুলে রাখার কবিতা পড়ে লজ্জা দিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ বাড়িয়ে দিচ্ছিল :

'আব্দুদদারের বীর পুরুষেরা শোন।
আজ তোমাদের কঠিন এ দিন জেনো ॥
আজ তোমাদের এ দিনের তরে
রাখা হইয়াছে প্রস্তুত করে
একটা শত্রু তোমাদের হাতে রেহাই পায় না যেন ॥'
এই ধরনের কবিতা আবৃত্তি করে তাদের উত্তেজিত করে তোলা হচ্ছিল–
'আমরা হলাম ঐ আকাশের চাঁদ তারকার মেয়ে।
আমরা চলি আকাশ গাঙে সোনার তরী বেয়ে ॥
তোমরা যদি আগ বাড়িয়ে
শত্রু মারো দু'হাত দিয়ে
তবেই তোমরা ধন্য হবে বক্ষে মোদের পেয়ে।
নইলে তোমরা হবে নরাধম সব অধমের চেয়ে ॥'

কুরাইশরা মুসলমানদের বিধ্বস্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করল কিন্তু তারা ব্যর্থ হলো এবং তাদের সাহস, সংকল্প ও দৃঢ়তার সামনে কাফিররা টিকতে পারল না।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এরপর আল্লাহর সাহায্য নেমে এল এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট করে প্রকাশ করলেন। অতএব মুসলমানরা কাফিরদের তাঁদের তরবারির উপর তুলে নিলেন এ কারণে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেল এবং কাফিরদের পরাজয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আমি হিন্দ বিনতে উতবা ও তার সঙ্গী সাথিদের পড়িমরি করে ছুটে পালাতে দেখলাম, এমনকি নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়ার হুঁশটুকুও তাদের থাকল না।

এক ব্যক্তি এমন বাতাবরণে হর্ষ উল্লাস প্রকাশ করছে, যা বিজলি বাতির আলোয় আলোকমান হয়ে তার চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু এমতাবস্থায় খুব সামান্য একটি ত্রুটি পুরো বাতাবরণকে অন্ধকারে পরিবর্তিত করে দিতে পারে।

এই রকমই একটি সাধারণ ত্রুটি যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বদলে দিল।

এক মানবীয় দুর্বলতা বা মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যদের উপর আচ্ছাদিত হয়ে পড়ল। যার কারণে পুরো বাহিনীকে তার কুপরিণাম ভুগতে হলো এবং এক ঝলকেই সমস্ত বীরত্ব ও কার্যক্রম ধুলোয় মিশে গেল, যা অদ্ভুত সাহস ও অসাধারণ ত্যাগের পরে লাভ হয়েছিল।

এর আগেই আমরা পড়েছি যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজের কী তাকিদই না দিয়েছিলেন যে, কোনো অবস্থাতেই পিছনের দলের সুরক্ষায় স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না। কিন্তু তাদের ভৌতিক মোহ এক ঝটকায় সমস্ত

নির্দেশ ও সাবধান বাণীকে ভুলিয়ে দিল। তীরন্দাজরা দেখল যে কুরাইশরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের নাচগান করা মহিলারা উপত্যকায় দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করছে। মুসলমানরা পলায়নপরদের পিছু ধাওয়া করছে আর যে সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী তিন হাজার মুশরিক সেখানে জমা করে রেখেছিল তা ছেড়ে তারা পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা সাথে সাথে সম্পদ লুট করার জন্য ময়দানে নেমে এল।

খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন পৌত্তলিক বাহিনী অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সে মুসলমানদের মাঝের পঙ্‌ক্তিতে প্রবেশ করার কোনো পথই পাচ্ছিল না, যার ফলে সে পরাজয়ের মুখে পড়ে গেল। যখন খালিদ দেখল মুসলমানদের পশ্চাদভাগের সৈন্যরা স্থান ত্যাগ করেছে এবং সংকীর্ণ গিরিপথ সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে, তখন সে তার সাথিদের নিয়ে তুমুল আক্রমণ শুরু করে দিল। পলায়নপর কুরাইশরা এই তাৎক্ষণিক পরিবর্তন দেখে প্রবল বেগে ফিরে এল এবং উমরা বিনতে আলকামা নামক এক মহিলা ভূপাতিত পতাকাটি উর্ধ্বে তুলে ধরল আর সাথে সাথে তাদের সৈন্যরা দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে গেল। সাহাবিরা সামনে পিছনে এমনভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন যেন তারা যাঁতার দুটি পাথরের মধ্যে পিষ্ট হওয়ার মতো অবস্থায় পড়ে গিয়েছেন।

যদিও সাহসী লোকেরা বিপরীত পরিস্থিতিতে নিরাশ হয় না। তা সত্ত্বেও তাঁরা এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করলেন কিন্তু তাঁদের সেনা পঙ্‌ক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল যে জন্য তাঁরা স্বচ্ছন্দে তরবারি চালিয়ে যেতে লাগলেন। সে সময় তাদের উদ্দেশ্য ছিল কোনো রকম আত্মরক্ষা করা এবং অবরোধ থেকে কোনোক্রমে বেরিয়ে আসা। অনেক মুসলমান এই অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করতে গিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। পৌত্তলিকরা রসুলুল্লাহর কাছে পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল। তাদের মধ্য থেকে কেউ একজন পাথর নিক্ষেপ করল। সে আঘাতে তাঁর একটি দাঁত ভেঙে গেল এবং নিচের ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক শোকতপ্ত হয়ে উঠল এবং তার ক্ষতস্থান রক্তাক্ত হলো (আল-বিদায়া)। ওদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে রসুলুল্লাহকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। অতএব, মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কিছু মুসলমান দৌড়ে মদিনা চলে গেলেন আর কিছু লোক দৌড়ে পাহাড়ের উপরে উঠে যেতে লাগলেন। এমতাবস্থায় তার সাথিরা উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলেন এখন কী করা যায়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন : 'আল্লাহর বান্দাগণ ! আমার দিকে এগিয়ে এসো। আল্লাহর বান্দাগণ ! আমার প্রতি অগ্রসর হও ।' একথা শুনে প্রায় ৩০ জন নিবেদিতপ্রাণ সাথি তাঁর কাছে একত্রিত হলেন, কিন্তু মুশরিকরা তাদের দেখে ফেলল এবং তাঁদের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু ও সুহাইল বিন হানিফ রাজিয়াল্লাহু আনহু রসুলুল্লাহকে রক্ষা করতে লাগলেন। এই মুহূর্তে তাঁর হাতে তীর লাগল এবং তিনি বড় দুর্বল হয়ে পড়লেন।

উবাই বিন খলফ জমহী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল। সে সুযোগ পেয়ে তাঁর প্রতি অগ্রসর হয়ে – 'ওরে মিথ্যাবাদী ! কোথায় পালাচ্ছিস ?' বলে তরবারি দিয়ে আক্রমণ চালাল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ইনশা'ল্লাহ আমিই একে হত্যা করব। এবং নিজের বর্শাখানি টেনে নিয়ে তার ঘাড়ে এমন খোঁচা দিলেন যে সে ষাড়ের মতো চিৎকার করতে করতে দৌড়াল এবং সে কিছুক্ষণ পরে অথবা দু-এক দিন পরে মারা পড়ল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে তাঁর অন্য সাহাবিদের আহ্বান করতে করতে পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠলেন। তারপর উপত্যকার দিকে বিচ্ছিন্নভাবে পলায়নপর মুসলমানরা তাঁর কাছে এসে একত্রিত হয়ে গেলেন। এদিকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে রক্ষার জন্য ব্যস্ত লোকদের দেখে বড়ই প্রসন্ন হলেন আর ওদিকে তাঁকে দেখে তাঁদের প্রাণেও প্রাণ ফিরে এল। কেননা তাঁরা মনে করছিলেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন।

মনে হয় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশ্চাতের মিথ্যা সংবাদ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল কিছু মুসলমান উদাসহীন হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, রসুলুল্লাহই যেখানে শহীদ হয়ে গেছেন সেখানে আমরা যুদ্ধ করে কী করব ? হজরত আনাস বিন নজর রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন : 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে শহীদ হয়ে গেছেন সেখানে তোমরা জীবিত থেকে কী করবে ? ওঠো এবং তোমরাও যুদ্ধ করতে করতে জীবন দিয়ে দাও। যা করতে গিয়ে তিনিও জীবন দিয়েছেন ; একথা বলেই তিনি শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

কুরাইশরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের আবরোধ করতে ও তাদের নির্মূল করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাল। বিশ্ব ইতিহাসে এমন ভয়ানক ও কঠিন দিন আর কখনো আসেনি। মুশরিকরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করল আর এদিকে তাঁদের নবীর জীবন রক্ষা করতে গিয়ে বহু মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন। হজরত তালহা তাঁর জন্য ঢাল হয়ে গেলেন আর শত্রুদের বল্লম ও তরবারির আঘাত সয়ে যেতে লাগলেন, তারপর এক সময় তিনি বেদম আহত হয়ে পড়ে গেলেন। হজরত আবু দুজানা রাজিয়াল্লাহু আনহু পিঠ দিয়ে তাঁকে রক্ষা করলেন। তীর এসে তার বুকে বিদ্ধ হতে লাগল, তা সত্ত্বেও তিনি স্থানচ্যুত হলেন না।

মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাছে কেবল সাত মুহাজির ও দুই আনসারী ছিলেন। যখন তাঁকে ঘিরে পৌত্তলিকদের ভিড় জমে গেল তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিলেন : 'কে এমন আছে যে আমার কাছ থেকে এদের হটাতে পারে। তার জন্য জান্নাত।' এ কথা শুনতেই এক আনসার অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

পৌত্তলিকদের ভিড় পুনরায় জমে উঠতেই তিনি পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বললেন : 'কে এমন আছে যে আমার কাছ থেকে এদের হটিয়ে দেয় ? তার জন্য জান্নাত।' এভাবে আনসাররা অগ্রসর হতে লাগলেন এবং শহীদ হতে লাগলেন। এমনকি সাত ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'আমাদের সাথিরা আমাদের সাথে সুবিচার করেনি।' অর্থাৎ একথা তাদের বললেন, যারা পাহারা ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এই ত্যাগ ও কুরবানি জীবন উৎসর্গ করার এক প্রবাহ ছড়িয়ে দিল। অর্থাৎ কুরাইশদের প্রতিশোধের আগুন ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। চারদিক থেকে এসে মুসলমানরা তাঁর চারপাশে পুনরায় একত্রিত হতে লাগলেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শত্রুদের পাহাড় থেকে নামিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং বললেন :

'আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তারের কোনো অধিকার এদের নেই।' এবার সাহাবিরা মুশরিকদের উপর পাথর বর্ষণ শুরু করলেন এবং তাদের নিচে নেমে যেতে বাধ্য করলেন।

এই ভয়ংকর পরাজয়ের অবস্থা হতে আত্মরক্ষা পূর্বেকার সাফল্যের তুলনায় মোটেও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে মোকাবিলায় যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালালেন, যাতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের অধিকারে না যেতে পারে এবং প্রচণ্ড ক্ষতিও স্বীকার করলেন, যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানদের পেরেশান করার কথা চিন্তা না করতে পারে। তিনি তাঁর তূণীর থেকে তীর বের করে সা'দ বিন ওয়াক্কাসকে তুলে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন তীর চালাও, তোমার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোন।[১]

হজরত আবু তালহা আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু বড় নিপুণ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি ঢাল হয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করলেন। যখন তিনি তীর চালাতেন তখন আল্লাহর রসুল মাথা তুলে দেখতেন

---

১. বুখারী।

তীর কোথায় লেগেছে কিন্তু হজরত তালহা নিবেদন করতেন : 'আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন, ওভাবে মাথা তুলবেন না। না জানি শত্রুদের তীর কখন এসে লেগে যায়। আমার বুক আপনার বুকের জন্য ঢাল স্বরূপ।'[১]

আর তিনি বললেন : 'আমার পিতা বড় শক্তিশালী ছিলেন । হে আল্লাহর রসুল আমাকে আপনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলুন, আপনার যা ইচ্ছা আদেশ দিন।'

তীরন্দাজ ঐ মুশরিকদের তিনি তাঁর আশপাশ থেকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হলেন, যারা পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। তারপর বিচ্ছিন্ন মুসলমানরা রসুলুল্লাহর সাথে একত্রিত হবার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

মুসলমানদের অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে পৌছে গেল যে, আত্মরক্ষায় তাকিদ ও ক্রোধের বশে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে এলোপাতাড়ি অস্ত্র চালাতে লাগলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত হুজাইফা রাজিয়াল্লাহু আনহুর পিতা ইয়ামান রাজিয়াল্লাহু আনহু এই দুরবস্থার মধ্যে পড়ে শহীদ হয়ে গেলেন। হুজাইফা চিৎকার করে বলতে লাগলেন : 'উনি আমার পিতা ! উনি আমার পিতা'–কিন্তু সেই ধুন্দুমার অবস্থার মধ্যে কেউ তাঁর কথায় কান দিলেন না।

মুসলমানদের ঐ সময় হুঁশ ফিরে আসে, যখন তারা প্রবল একটি ধাক্কা খেয়েছিলেন। এই ধাক্কার পরে আল্লাহ তাঁদের মনে ধৈর্য ও সন্তোষ সৃষ্টি করে দিলেন। তাঁদের বিশ্বাস তথা ঈমান তাঁদের হৃদয়ে পুনঃস্থাপিত করে দিলেন এবং সাথে সাথে তাঁরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জমা হয়ে গেলেন। ক্লান্তি ও অবসাদে কিছু মানুষের চোখের পাতা ভারি হয়ে এল। তাঁদের উপর যখন আতঙ্কের ছাড়া নেমে এল এবং হাতের তরবারি আলাদা হয়ে গেল তখন ফিরে আসা চেতনা তাদের এক ঝাঁকুনি দিয়ে দিল এবং তাঁরা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁদের উপর এ ছিল আল্লাহর বড় অনুগ্রহ :

'তারপর, এই কষ্ট যন্ত্রণার পর তিনি তোমাদের উপর শান্তি অবতারণ করলেন। তোমাদের মধ্যেকার কিছু লোকের উপর আচ্ছন্নতা বিরাজ করছিল।' –আলে ইমরান : ১৫৪

এই কষ্টদায়ক এবং কঠোরতম দিনের বিপত্তি মুসলমানদের তুলনায় কুরাইশদের কম সইতে হয়নি।

প্রথম আক্রমণে কুরাইশরা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন যুদ্ধের গতি বদলে গেল তখন তারা এই যুদ্ধকে অন্তিম ও নির্ধারক যুদ্ধে পরিবর্তিত করার সংকল্প করল। তখন মুসলমানরা তাদের কাছে লোহার ন্যায়

---

১. বুখারী।

কঠিন বলে সিদ্ধ হলেন, যাদের নির্মূল করা মোটেও সম্ভব ছিল না। অতএব, যতটুকু বিজয় তারা লাভ করেছিলেন তাকেই পর্যাপ্ত জেনে পরাজিত হতে থাকলেন।

এই পরাজয় থেকে মুসলমানরা ভাবলেন যে, কুরাইশরা মদিনা আক্রমণের আকাঙ্ক্ষা রাখে। অনন্তর, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আলী বিন আবি তালিবকে বললেন : 'এদের পিছু ধাওয়া করো আর দেখো এরা কী করে ? যদি এরা ঘোড়া থেকে দূরে থাকে এবং উটের পিঠে সওয়ার হয় তাহলে বুঝতে হবে ওরা মক্কা অভিমুখে চলে যাওয়ার সংকল্প রাখে। আর যদি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয় এবং উটগুলোকে হাঁকিয়ে দেয় তাহলে বুঝবে এরা মদিনা আক্রমণ করতে চায়। সেই সত্তার কসম, যার অধীন আমার জীবন, তারা যদি মদিনা অভিমুখী হয় তাহলে সেখানে গিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।'

হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি তাদের অনুসরণ করে গিয়ে দেখলাম যে, তারা ঘোড়ায় না চড়ে উটের পিঠে চড়ে মক্কা অভিমুখে চলে যাচ্ছে।'[১]

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান যখন প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করে তখন সে পাহাড়ের উপর উঠে চিৎকার করে বলল : 'ঠিক হয়েছে। লড়াই ডোলের সমান, কখনো উপরে কখনো নিচে। এ হলো বদরের জবাব। জয় হুবলের জয়।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ দিলেন এর উত্তরে বলো, 'আল্লাহ মহান। তোমরা আমাদের সমকক্ষ কখনোই হতে পারবে না। আমাদের মৃতদের ঠিকানা জান্নাত আর তোমাদের মৃতদের ঠিকানা জাহান্নাম।'

এরপর আবু সুফিয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলল : 'উমর ! এদিকে এসো।' রসুলুল্লাহ বললেন : 'যাও, দেখো সে কী বলছে ?' হজরত উমর তার কাছে গেলেন।

আবু সুফিয়ান : 'আমি তোমাকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তুমি সত্যি করে বলো, আমরা কী মুহাম্মদকে হত্যা করেছি ?'

হজরত উমর : 'আল্লাহর কসম ! কখনোই নয়, তিনি এখন তোর কথা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছেন।'

আবু সুফিয়ান : 'তুমি আমার কাছে কুমাইয়ার পুত্রের[২] চেয়ে অধিক সত্যবাদী।' তারপর সে তাঁর সাথে বেশ জোরের সাথে বলল : 'আমাদের

---

১. ইবনে হিশাম।

২. এই ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার মিথ্যা গুজব রটিয়ে দিয়েছিল।– অনুবাদক

লোকেরা তোমাদের মৃত সাথিদের নাক-কান কেটে নিয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি তাদের কাজে খুশি ছিলাম না। আমি তাদের এ কাজ করতে আদেশ দিইনি, নিষেধ করিনি।' –আহমদ, বায়হাকী

আবু সুফিয়ান যখন মক্কার উদ্দেশে রওনা হলো তখন সে উচ্চৈঃস্বরে বলে গেল : 'আগামী বছর বদরে তোমাদের সাথে আবারো যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করে গেলাম।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে আদেশ দিয়ে বললেন, বলে দাও : 'আমরা তোমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।'

দশ

পরীক্ষা শিক্ষা দেয়

উহুদের যুদ্ধ অনেক রহস্য, তত্ত্বদর্শিতা ও অনেক মূল্যবান শিক্ষা তার সাথে করে বয়ে নিয়ে এসেছিল। এর বিভিন্ন পর্যায়, বৃত্তান্ত ও পরিণামের বিষয়ে সুদীর্ঘ সব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয়ে যার গভীর প্রভাব পড়েছিল এবং জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত তা তিনি চর্চা করে গিয়েছিলেন।

এ যুদ্ধ ছিল এক পরীক্ষা, যার দ্বারা মনের অন্তর্নিহিত ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিক চেহারা সামনে এসে গিয়েছিল এবং রহস্য উন্মোচন হয়ে গিয়েছিল। ঈমান ও মুনাফেকির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এমনকি ঈমানের বিভিন্ন শ্রেণীও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাদের দুনিয়া ও তার মোহ থেকে নিস্পৃহ বিমুখ থাকার কথা, দুনিয়ার কোনো সহায় সম্পদ তাদের আকৃষ্ট করতে পারে না। কিন্তু যাদের মনে দুনিয়া ও তার সুখ-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ ও মোহ ছিল, তাদের স্বার্থপরতা ও বিষয়-ভাবনা মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। যুদ্ধ শুরুর প্রথম থেকেই আব্দুল্লাহ বিন উবাই ধোঁকা দিয়ে যায় এবং তিনশো লোকের এক বাহিনী নিয়ে সে পৃথক হয়ে যায়। এ ব্যবহার ইসলামের অপমান, এই কঠোর পরিস্থিতিতে তার আচরণ ছিল বিশ্বাসঘাতকতার সমান যা মুনাফেকির স্পষ্ট নিদর্শন।

দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রচার এবং প্রসারকালে তাঁর পতাকাতলে লোকদের ভিড় জমে ওঠে, যাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ, সদাচারী, মুনাফিক, লোভী ইত্যাদি সমস্ত শ্রেণীর মানুষ জমা হয়। এ সবের সমন্বয় আন্দোলনের গতি ও তার পরিণামের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়ে থাকে।

তাদের সর্বপ্রথম হিত এটাই হয় যে, কঠোর এবং ভয়ংকর ঝটকা বা আঘাত খেয়ে যুদ্ধ থেকে অশুদ্ধরা কাট-ছাঁট হয়ে পৃথক হয়ে যায়। ঐহিক প্রজ্ঞার দাবি মতে উহুদের যুদ্ধে এই চয়ন ও পার্থক্য পুরো হয়ে গেল :

'এ কখনোই হবার নয় যে, আল্লাহ ঈমানদারদের ওদের মতো থাকতে দেবেন, যেমনটি তুমি ছিলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে না দেন এবং আল্লাহ তা নন যে, তোমাদের পরোক্ষ খবর দেবেন।' – আলে ইমরান : ১৭৯

কৃপণতা ও দুর্বলতায় পূর্ণ ছিল মুনাফিকদের হৃদয় আর এই বস্তুই জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাদের ঘৃণিত ও অপমানিত করে তুলেছিল। আল্লাহ তাদের মুনাফেকিকে প্রকাশ করে দেয়ার আগেই তা হয়ে গেল। যখন মুনাফিকদের মনের অপবিত্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখনই তাদের ঈমানের আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ল। যুদ্ধের শুরুতেই সাফল্য ও বিজয়ের সাথে বিশুদ্ধ তত্ত্বই এগিয়ে গেল, তারপর মুশরিকদের পুনরাক্রমণ করা আর লড়াইয়ের চরিত্র বদলে যাওয়ায় তাদের সুরক্ষা হেতু এই তত্ত্বই অগ্রসরমান রইল এবং নিজেদের ঈমান ও ইসলামের সাক্ষ্য দিতে থাকল।

যারা রক্তের আখরে ইতিহাস রচনা করেন এবং নিজেদের সাহস ও সংকল্প বলে নিজেদের লক্ষ্য স্থির রাখেন ঐ বীররাই এই যুদ্ধে বীরত্ব দেখালেন এবং এ ক্ষেত্রে ইসলামকে সুরক্ষিত রাখার কর্তব্য পুরো করলেন।

হজরত খায়সামা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে নিবেদন করেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! এ আমার বড় আফসোস যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য আমার হয়নি, যাতে অংশ নেয়ার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমি আমার পুত্র ও আমার মধ্যে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখলাম, তার নাম উঠেছে আর সে শাহাদত লাভ করেছে। আজ রাতে আমি আমার পুত্রকে স্বপ্নে দেখলাম, অতি সুন্দর, অতি রূপবান। সে জান্নাতের বাগিচা ও নহরগুলোতে বিহার ও মনোরঞ্জন করছে এবং সে আমাকে বলছিল : 'আব্বাজি ! আপনিও আসুন, আমরা দুজনে মিলে জান্নাতে বসবাস করি !' আমার প্রভু আমার সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি পুরো করেছেন।

হে আল্লাহর রসুল এখন আমার পুত্রের সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। বৃদ্ধ হয়েছি আমার অস্থি-সন্ধিও দুর্বল হয়ে পড়েছে, এখন আমার আকাঙ্ক্ষা কেবল আমার প্রভুর সাথে মিলন। হে আল্লাহর রসুল। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। আল্লাহ যেন আমার সা'দ-এর সাথে আমাকে শাহাদাত দান করেন।' তিনি খায়সামার জন্য দু'আ করলেন এবং আল্লাহ তা গ্রহণ করলেন এবং উহুদের যুদ্ধে খায়সামা রাজিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে গেলেন।

হজরত আমর বিন জমুহও এই যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি খুব খোঁড়া ছিলেন। তাঁর চার পুত্র ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই রসুলুল্লাহর সাথে থাকতেন। উহুদের যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর পুত্রদের বললেন, আমি তোমাদের সাথে জিহাদে যাব। ছেলেরা বললেন, আপনি অসমর্থ। আল্লাহ আপনাকে বাধ্য করেননি, আপনি বাড়িতেই থাকুন। কিন্তু তিনি শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং নিবেদন করলেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমার ছেলেরা আপনার সাথে যাওয়া থেকে বিরত করছে, আল্লাহর কসম, আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি শাহাদত লাভ করি এবং এরকমই খোঁড়াতে খোঁড়াতে জান্নাতে আনন্দের সাথে ঘোরাফেরা করি।' তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে অসমর্থ করেছেন আর জিহাদ তোমার উপর ফরজ নয়। তারপর তিনি (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পুত্রদের সম্বোধন করে বললেন : 'একে বিরত রেখে তোমাদের কী লাভ ? আল্লাহ তো একে শাহাদত দান করতে পারেন।' অতএব, তিনি জিহাদে গেলেন এবং শাহাদত লাভ করলেন।[১]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই নঈম বিন মালিক নিবেদন করেছিলেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না। সেই অস্তিত্বের শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন- আমি জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করব।'

তিনি প্রশ্ন করলেন : 'তুমি কিসের ভিত্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে ?' নঈম রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন : 'এর ভিত্তিতে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসুল এবং আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখনোই পলায়ন করব না।' আল্লাহর রসুল বললেন : 'তুমি সত্য বলেছ।' তারপর, তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

হজরত আব্দুল্লাহ বিন জহশ রাজিয়াল্লাহু আনহু ঐ দিন এই প্রার্থনা করেন :

'হে আল্লাহ ! আমি তোমার নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমার শত্রুদের মোকাবিলা করব। তারপর তারা আমাকে হত্যা করে আমার পেট চিরুক, নাক-কান কাটুক, তারপর তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো, এমন কেন হলো ? তখন আমি নিবেদন করব, এ কেবল তোমার জন্যই।'[২]

এ হলো ঐ বীরদের প্রতি সাধারণ আলোকপাত, যাঁরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাফিরদের সাথে মোকাবিলা করে গিয়েছেন এবং তাঁদের আহ্বায়কের প্রতি শত্রুদের সমস্ত পদক্ষেপ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে

---

১. ইবনে হিশাম।

২. হাকিম।

দিয়েছেন, তারা আগে বা পরে কোনো রকমের সাফল্যের মুখ দেখেনি, আর মুসলমানদের পশ্চাদপদতায় তারা বিজয়ের মুখও দেখতে পায়নি।

বীরত্ব ও আত্মদানের এই রং আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাসের দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে আছে। যখনই ইসলামের উন্নতি হয় এবং হিংসা ও দমন পীড়ন অত্যাচারের কাল শেষ হয়ে যায় তখন সেই 'সিদ্দিক' ও 'শহীদ'দের অন্তরের অবদমিত শক্তি ঝলসে ওঠে।

এ হলো সেই 'ইলহাম' এর কার্যকারিতা, এ হলো সেই আলোরই রশ্মি এবং এ হলো সেই ইকতিদার (অনুসরণ)-এরই শক্তি।

এ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন কর্ম ও সাধনারই ফল। আর ইনিই হলেন নবী মুহাম্মদ, যিনি সেই অদ্বিতীয়, অপরিচিত সেই মহান সন্তানদের দেখভাল করেছিলেন। তাঁর শুভ হৃদয় তাদের অন্তরে গভীর ভাব বিস্তার করেছিল এবং তাদের মধ্যে ত্যাগ ও আত্মদানের প্রেরণার রুহ ভরে দিয়েছিল। এই মহান নবী উহুদের যুদ্ধে আহতও হন, শরীরও ক্ষত-বিক্ষত হয়, তাঁর আলোকিত মুখে শিরস্ত্রাণের কাঠিও ঢুকে যায়। আবু উবাইদা রাজিয়াল্লাহু আনহু দাঁত দিয়ে ধরে তা টেনে বারও করে দেন, এমনকি তাঁর দুটি দাঁতও বেরিয়ে আসে[১] রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। যতই পানি ঢালা হয় ততই বাড়তে থাকে। তারপর চাটাই পুড়িয়ে তার ছাই লাগিয়ে দিতেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।[২] এভাবে তার দাঁত শহীদ হয়ে গেল, মাথা বিক্ষত হলো, তারপরও তিনি নিরন্তর সচেতন ও জাগরিত রইলেন এবং তাঁর সাথিদের পথ দেখিয়ে চললেন, তারপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

তাঁর পরিবারের লোকও শহীদ হয়ে গেলেন। হজরত হামজা রাজিয়াল্লাহু আনহুর নাভিতে এমনভাবে বর্শা লাগল যে তা পার হয়ে গেল। আবু সুফিয়ানের পত্নী হিন্দা তাঁর পেট চিরে কলিজা বের করে চিবাল কিন্তু তা এতই বিস্বাদ লাগল যে গিলতে পারল না, বাধ্য হয়ে ফেলে দিল।

হজরত হামজা রসুলুল্লাহর অতি প্রিয়জন ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ছিন্নভিন্ন দেহ দেখলেন তখন তিনি শোকাবেগে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন : 'আজকের চেয়ে অধিক শোক আমি আর কখনো পাইনি। এর চেয়ে অধিক ধৈর্যের পরীক্ষা এর আগে আর কখনো আসেনি।'[৩]

---

১. ইবনে হিশাম।
২. বুখারী, মুসলিম।
৩. বুখারী, মুসলিম।

পরন্তু আল্লাহর প্রসন্নতা ও অনুগ্রহ এই দশা থেকে তাকে অনতিবিলম্বেই সন্তাপমুক্ত করে দিল এবং তিনি তাঁর সাহাবিদের দেখাশোনার কাজে নেমে পড়লেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার নির্ণয়ের সামনে অবনমিত হওয়ার নীতি অবলম্বন করলেন।

যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল এবং মুশরিক-পৌত্তলিকরা ফিরে গেল তখন তিনি বললেন : 'তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাও, যাতে আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতে পারি।'

লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি এই দুআ করলেন :[১] 'হে আল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, যে বস্তু তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ তা কখনো নির্মূল হতে পারে না। আর যা তুমি নির্মূল করে দিয়েছ তা কেউ ছড়াতে পারবে না, যাকে তুমি পথভ্রষ্ট করে দিয়েছ তাকে কেউ সুপথে নিয়ে আসতে পারে না, আর যাকে তুমি সুপথ প্রদান করেছ তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, যা তুমি বিরত রেখেছ তা কেউ দিতে পারে না, আর তুমি যাকে দিতে চাও তা থেকে কেউ বিরত রাখতে পারে না। যা তুমি দূর করে দিয়েছ তা কেউ কাছে আনতে পারে না, যাকে তুমি সমীপ করে দিয়েছ তাকে কেউ দূর করে দিতে পারে না। হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের উপর প্রাচুর্য দান করেছ, তুমি অনুকম্পা করেছ, এবার তুমি তোমার অনুগ্রহ ও উপজীবিকার চাদর আচ্ছাদিত করে দাও।

হে আল্লাহ ! আমি স্পষ্টই তোমার কাছ থেকে সেই নিয়ামত প্রার্থনা করি, যাতে পরিবর্তন আসে না ও যা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হে আল্লাহ ! আমি তোমার পক্ষ থেকে অভাব ও অনাহারের দিনে সহায়তা পেয়েছি, ভয়ের দিনে শান্তি এবং সন্তোষের প্রার্থনা জানাই।

হে আল্লাহ ! আমি ঐ মন্দের কবল থেকে তোমার আশ্রয় চাই, যা তুমি আমাদের প্রতি পাঠিয়েছ (তাতে যেন নিবেদিত থাকি।) আর আশ্রয় চাই তা থেকে, তুমি যা বিরত করেছ।

হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা জাগরূক রাখো, আর আমাদের অন্তর ঈমানের সৌন্দর্য দিয়ে সুসজ্জিত করে দাও এবং কুফরি, কপটতা ও অবজ্ঞার প্রতি আমাদের অন্তরে ঘৃণা জন্মে দাও এবং আমাদের সৎপথপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করে নাও।

হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের মুসলমানরূপে উত্থান করো। মুসলমানরূপে জীবিত রাখো এবং আমাদের সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। আমাদের অপমানিত করো না, আমাদের ফিতনাগ্রস্ত হতে দিয়ো না।

---

১. মুসনাদ, হাকিম।

হে আল্লাহ ! তুমি ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমার রসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তোমার পথে বাধা দেয় এবং তাদের প্রতি তোমার ক্রোধ প্রকাশ করো এবং অভিসম্পাত দাও।

হে আল্লাহ ! তুমি ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো, যাদের কিতাব দিয়েছ কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা কুফরি করেছে। হে সত্য উপাস্য !'

মনোযোগ দিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করুন, দেখবেন তাতে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের উপর যে সমীক্ষা করা হয়েছে তা প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গি থেকে ভিন্ন, যেমনটি বদরের যুদ্ধের পর করা হয়েছিল। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা বিজেতাদের ত্রুটি পরাজিতদের চেয়ে বেশি করে ধরা হয়। বদরের যুদ্ধের পর এই আলোচনা করা হয়েছিল।

'তোমরা দুনিয়ার সুখসামগ্রী চাও আর আল্লাহ আখিরাত চান, আর আল্লাহ সর্বময় কর্তা ও প্রাজ্ঞ। যদি (এ প্রসঙ্গে) আল্লাহ প্রথমে না লিখে রাখতেন তাহলে তোমরা যা কিছু করেছ, তার উপর কোনো বড় যাতনা তোমাদের দিতেন।' – আল আনফাল : ৬৭-৬৮

কিন্তু উহুদের যুদ্ধের পর মুসলমানদের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি এভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে :

'তোমাদের মধ্যেকার কিছু লোক দুনিয়া চাইত আর কিছু আখিরাতের আকাঙ্ক্ষী ছিল। তারপর আল্লাহ তোমাদের তা থেকে বিমুখ করলেন তোমাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য, আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন আর আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।' – আলে ইমরান : ১৫৭

মুসলমানদের ভুলের মাসুলরূপে এতটাই যথেষ্ট ছিল যে, তারা পরাজয়ের মুখ দেখেছিলেন। দ্রুত প্রতিশোধের ক্ষেত্রে অপরাধী ও দুষ্কর্মীদের জন্য শিক্ষা এবং উপদেশ দিতে এবং নিজের ত্রুটির আভাস দিতে দেখার অধিক অবসর থাকে। কুরআন খুবই হালকা এবং সূক্ষ্ম তাড়না ও মুসলমানদের শুদ্ধিকরণ এই সমস্ত পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিশ্চিত করেন, যাতে তাদের পরাজয় নিরাশায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু এ মৃদু তিরস্কার এমন ছিল যে, নিরাশা তাদের আচ্ছাদিত করে তুলতে পারেনি, যা তাদের যোগ্যতাকে শিথিল করে দেয় :

'তোমাদের পূর্বে কত না উদাহরণ অতীত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে চলাফেরা করো, তারপর দেখো অবিশ্বাসীদের কী পরিণাম হয়েছে। ভীতত্রস্তদের জন্য পথের দিশা ও উপদেশ। আর তোমরা অলস হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তাহলে তোমরাই প্রভুত্বলাভ করবে।' – আলে ইমরান ১৩৭-১৩৯

তারপর অহি মুসলমানদের সেই শিক্ষা দিল, যা তারা জানত না, অর্থাৎ ধর্ম ও জীবনের নিয়ম-কানুন কী অথবা একথা মনে করো যে, এই নিয়ম-কানুন

ভুলিয়ে দেয়ার পর তাদের স্মরণ করিয়ে দিলে কোনো মুসলমানের আল্লাহর সাথে কতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া উচিত। তাদের জন্য এ অনুচিত, যে সে আত্মপ্রবঞ্চক হয়ে যাক, অথবা বুঝতে থাকুক যে, দুনিয়া তাদের জন্য কী বিছিয়ে দিয়েছে, বা দুনিয়ার পূর্ণ আইন-কানুন তারা নিজেদের অধীনস্ত করে নিয়েছে।

কখনোই নয়। অতি সাবধানতা ও নিরন্তর কর্ম সাধনাই মানুষের নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌছানোর হাতিয়ার। যে সময় কোনো মুসলমান এ কথা বোঝে যে যুগকে তাদের ভাগ্যের অধীন করে দেয়া হয়েছে এবং তা তাদের বিপরীতে যেতে পারে না তথা একথা ভেবে বসে যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য কঠোর পরিশ্রম ছাড়াই লাভ হতে পারে তখন ঐ সময়ে সে বিফলতা বা অসফলতার প্রতি পা বাড়িয়ে দেয় :

'যদি তোমরা আঘাত পেয়ে থাক তাহলে তারাও তো আঘাত পেয়েছে। আর সেই দিন, যা আমি লোকদের মধ্যে পরিবর্তিত করে দিচ্ছি এবং তোমাদের উপর এ দিন এই জন্য আনা হয়েছে, যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের জেনে নেন আর তোমাদের মধ্যে কতিপয়কে শহীদ করে নেন এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না।

এবং (এ জন্যও হয়েছে) যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের শক্তিশালী করেন আর কাফিরদের শক্তি ধ্বংস করেন।

তোমরা কি ভেবে রেখেছ যে, জান্নাতে প্রবেশ করবে যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে বিভাজিত করেননি, যারা জিহাদ (জীবনপণ) করেছে আর যাতে ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের বিভাজিত করেন ?' – আলে ইমরান : ১৪০-১৪২

বুদ্ধিমান লোক মূল্যবান বস্তুকে কম মূল্য ক্রয় করাকে অপমানজনক বলে মনে করেন এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু এমন কখনো হয় না যে, শান্তির সময়ের প্রস্তুতির ভয় ও আতঙ্কের দশায় নষ্ট হয়ে যায়।

মানুষ প্রায়ই তার নিজের দুর্বলতা ও শান্তিপ্রিয়তার কারণে কিছু বস্তুকে সহজ ও সুগম বলে ভাবতে থাকে আর এই কারণেই তাকে ধোঁকা খেতে হয় এবং দুঃখ পেতে হয়।

মুসলমানদের এই পরিস্থিতি থেকে সচেতন থাকা উচিত। যারা মৃত্যু কামনা করত কিন্তু সময় এলে যারা পিছু রয়ে যেত আল্লাহ এদের কীভাবে ভর্ৎসনা করলেন :

আর তোমরা মৃত্যুর, তা তোমাদের সামনে আসার আগেই কামনা করছিলে, অনন্তর তা তোমাদের সামনে এসে গেছে আর তোমরা তাকে দেখে নিয়েছ।' – আলে ইমরান ১৪৩

আল্লাহ তাআলা ওদের প্রতি রোষ ব্যক্ত করেছেন, যারা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর খবর শুনে যুদ্ধ ত্যাগ করেন তারা উদাসীন হয়ে পড়েন এবং তাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। আদর্শ এবং চিন্তাধারার আহ্বায়কদের পদ্ধতি এ হতে পারে না। তারা তত্ত্বের আহ্বায়ক হন, ব্যক্তির নয়।

কল্পনা করুন যে, রসুলে করিম 'দ্বীনে হক'-এর সংরক্ষণ করতে গিয়ে যদি শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে তাঁর সাহাবিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হতো মৃত্যুর মুখেও দৃঢ়পদ থাকা এবং প্রাণপণ যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদেরও শহীদ হয়ে যাওয়া। কখনোই মলিন ও সাহসহীন হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করা নয়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দায়িত্ব ছিল মানুষের চিন্তাচেতনা ও তার অন্তর্নিহিত আলোকিত শক্তিকে আরো প্রকাশমান করে তোলা। যখন তিনি তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য সমাপন করেন এবং এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যান, তখন আলোকিত আত্মার অধিকারী লোকদের পক্ষে পুনরায় অন্ধকারে ফিরে যাওয়াটা কি জায়েজ ছিল, আর সেখান থেকে ফিরে যাওয়াটা যেখানে অসম্ভব ছিল ?

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর একজন নবী ও বান্দারূপে লোকদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, যারা তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং 'হক' (সত্য) এর প্রশ্নে তাঁকে নায়ক বা ইমামরূপে মান্য করে চলতেন।

আল্লাহর এই বান্দারা যদি মৃত্যুবরণও করতেন তা সত্ত্বেও সেই চিরন্তন অস্তিত্বের (আল্লাহর) সাথে মহান সম্পর্ক অবশিষ্ট রয়ে যেত, যার কখনো মৃত্যু হয় না। এ সম্পর্ক কখনোই শেষ হবার নয় :

'আর মুহাম্মদ এক রসুল বৈ তো নন, তাঁর আগেও অনেক রসুল গত হয়ে গেছেন। অনন্তর তিনি যদি মৃত্যুগ্রস্ত হন অথবা তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে কি তোমরা ফিরে যাবে ? আর যে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অনতিবিলম্বেই প্রতিফল দেবেন।' – আলে ইমরান ১৪৪

এই যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাপ্ত পরাজয় তাঁর সাথে শিক্ষা ও উপদেশও নিয়ে এসেছিল, যার প্রতি উক্ত আয়াত ইঙ্গিত দান করেছে। আর একথাও বলে দিয়েছে যে, ভবিষ্যতে তারা এ সমস্ত সমস্যার সমাধান কীভাবে করবে ? এ অস্থায়ী আঘাত মুসলমানদের ঐ লোকদের থেকে পৃথক করে দেয়, যারা নিজেদের হিতের অধীনস্ত হয়ে পড়েছিল এবং যাদের অন্তর পীড়াগ্রস্ত ছিল।

যদি বদরের যুদ্ধ কাফির ও মুশরিকদের অপদস্ত ও অপমানিত করে দিয়ে থাকে তো উহুদের যুদ্ধ মুনাফিকদের সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়, প্রায়শই অনেক ক্ষতিকারক বস্তু লাভজনক সিদ্ধ হয় আর রোগের দ্বারা শরীর সুস্থ হয়ে ওঠে।

এই যুদ্ধে আদেশ অমান্যকারীদের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এটাই লাভ করা যায় যে, আদেশ পালনের গুরুত্ব সর্বাধিক, যে বিষয়ে মুসলমানদের সর্বদাই সাবধান থাকা উচিত। যে দল একই নেতৃত্বাধীন না হয় অথবা যে আহ্বায়কদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ অথবা সিদ্ধান্ত প্রভুত্ব করে তা কোনো সংঘর্ষেই সফল হতে পারে না। শুধু তাই নয় ; বরং কোনো যুদ্ধ বা শান্তিকালীন অবস্থায় নিজে নিজেদের রক্ষাও করতে পারে না।

কাফির মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই বাস্তবতার সাথে পরিচিত। অতএব সাময়িক ব্যবস্থা সর্বদাই সেনা শৃংখলা ও আদেশ পালনের উপর সুস্থাপিত। যখন কোনো রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে যায় তখন সমস্ত দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের সবার আকাঙ্ক্ষা একই আকাঙ্ক্ষায় নীল হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যেকার সমস্ত মতভেদ ও চক্রান্ত শেষ হয়ে যায়।

সৈন্যদের দৃঢ়তা নেতৃত্বের দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত।

যে রকম আদেশের 'ইস্তিম্বাত' (সারবত্তা) প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল এরকমই সে সবের কার্যোন্নয়ন শক্তি ভর্ৎসনা ও দণ্ড চায়। কিন্তু সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যেই আদেশ পালনের আনজাম জামাতের প্রতি উত্তমতর ভূমিকা পালন করে। বিদ্রোহ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবজ্ঞায় তারাই অগ্রণী থাকে, যারা নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী, পরন্তু সে তা পেতে ব্যর্থ হয়। আব্দুল্লাহ বিন উবাই এই স্বার্থপরায়ণতা ও আত্মহিতের জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল যে তার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমগ্র উম্মতের ভবিষ্যৎকে এক অনিশ্চিত অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

যে তীরন্দাজরা আদেশ অমান্য করেছিল তাদের উপর সাময়িক গাফিলতি ও দুর্বলতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি অবদমিত মোহ ও তার নেশাদার আনন্দের মোহ তাদের মধ্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তার যা পরিণাম সে তো আমাদের সামনেই রয়েছে।

অনন্তর যখন যে ঘটনা সংঘটিত হলো যা যুদ্ধের গতি বদলে দিল তখন আল্লাহ এর স্পষ্টীকরণ করে দিলেন যে, এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য দায়ী তারা নিজেরাই। আল্লাহ না কারো হক মেরেছেন আর না প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন :

'আর যখন তোমাদের উপর এক বিপত্তি নেমে এল, যার দ্বিগুণ বিপত্তি তোমরাই এনেছিলে, তখন তোমরা বললে এ বিপত্তি কোথা থেকে এল ? তুমি (হে নবী !) বলে দাও : এ তোমাদের নিজেদের কাছে থেকেই এসেছে, নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণপ্রাপ্ত।' – আলে ইমরান ১৬৫

আল্লাহ তাআলা যে কোনো কাজের জন্যই পূর্ণতাকে প্রধান শর্ত করে রেখেছেন এবং তার স্বীকরণের ভিত্তি সেখানে ঈমান, আত্মদর্শন ও ইখলাসের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এগারো

উহুদের শহীদ

কুরাইশ নেতারা যতটুকু বিজয় লাভ করেছিল, তা থেকেই লাভ উঠিয়ে তারা অনতিবিলম্বেই মক্কা যাত্রা করল। যুদ্ধের শুরুতেই পরাজয় লাভের পর বিজয়ের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না।

মুসলমানরা শহীদদের মৃতদেহ অনুসন্ধানের কাজে নেমে পড়লেন এবং তাঁদের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : কে আছে যে সাদ বিন রবি'র খবর নিয়ে আসতে পারে যে, সে জীবিত আছে না শহীদ হয়ে গেছে ? এক আনসারী অগ্রসর হয়ে বললেন : 'আমি দেখে আসি।' তিনি অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন এবং হজরত সাদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি তখনো বেঁচে আছেন। তিনি তাঁকে রসুলুল্লাহর আদেশ শুনিয়ে বললেন, 'আপনি জীবিত আছেন না শহীদ হয়েছেন তা দেখার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।' সা'দ বললেন, 'আমি এখন মৃত্যুপথযাত্রী। আমার রসুলকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো তার বোলো সাদ বলছিলেন, আল্লাহ আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং তামাম উম্মতের পক্ষ থেকে সুপ্রতিফল দান করুন, যা তিনি কোনো নবীকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দিয়েছেন। আর আমার জাতিকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো আর এই সংবাদ পৌঁছে দিয়ে বোলো, সাদ বিন রবি বলেছেন, যদি আল্লাহর রসুল কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন এবং তা যদি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আল্লাহর কাছে তার কোনো ওজর গ্রাহ্য হবে না।'

উল্লেখকর্তা বলেন, আমি তার মৃত্যু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আল্লাহর রসুলের সমীপে এসে পুরো অবস্থা অবগত করলাম।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদদের সেখানেই দাফন করার আদেশ দিলেন এবং পরিবারের লোকদের কাছে লাশ পাঠানো থেকে বিরত করলেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনাহু বলেন, উহুদের দিন আমার ফুপু আমার পিতাকে সাথে করে এলেন, যাতে তাঁকে আমাদের গোরস্থানে দাফন করা যায়, তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোষণাকর্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন : মৃত ব্যক্তিকে তাঁর বিশ্রাম গৃহে ফিরিয়ে দাও।'[১]

---

১. অর্থাৎ যেখানে যিনি শহীদ হয়েছেন তাঁকে সেখানেই বিশ্রাম করতে দাও।– আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা, আহমদ।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন করে শহীদকে একই কাপড়ে কাফন দিয়ে দাফনের আদেশ দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, এদের মধ্যে কুরআন জানতেন কে কে ?

যখন বলা হতো তখন সবার আগে তাঁকে কবরে নামাতেন আর বলতেন : 'আমি এদের সকলের সাক্ষী। সবাইকে রক্তমাখা অবস্থায় দাফনের আদেশ দিলেন, না তাদের গোসল দেয়া হলো আর না তাদের জানাজা পড়ানো হলো।[১]

যখন তিনি ফিরে এলেন তখন বললেন : 'আমি এদের সকলের জন্য সাক্ষী রইলাম। আল্লাহর পথে যে ব্যক্তিই নিহত হয় তাকে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় ওঠানো হবে, আর তার আহত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। রক্ত তো রক্তেরই আর সুগন্ধ তো কস্তুরিরই।'[২]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে এই যুদ্ধে এতটা গভীর প্রভাব পড়ে যে, তাকে তিনি আজীবন স্মরণ রাখেন। মদিনার কাছে উহুদ পর্বতের নিচে তিনি অত্যধিক ঘনিষ্ঠ সাথিদের মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলেন। যে পবিত্র রুহগুলো দাওয়াতের পথের যাতনা সয়ে গেলেন, আল্লাহর পথে আত্মীয় পরিজনদের উৎসর্গিত করলেন, তাঁরা হিজরতের আগেও যেমন পরেও তেমনই নিজেদের আকিদা ও চিন্তাধারার সাথে একীভূত হয়ে গেলেন। সম্পদ ব্যয় করলেন, তরবারি চালালেন, দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেন এবং অন্যকে বিপদে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন, ভাগ্য তাদের অন্তিম ঠিকানারূপে এই পর্বতকে চয়ন করল। তাঁরা আল্লাহর এই ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট হয়ে চিরবিশ্রামে শায়িত রইলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মুসলিম বীরও নিবেদিত প্রাণদের কীর্তি ও তাদের পরিণামের কথা স্মরণ করে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলতেন : 'উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে আর আমরাও তাকে ভালোবাসি।'[৩]

যখন তাঁর অন্তিমকাল সন্নিকটবর্তী আসে তখন তিনি উহুদের শহীদদের কবরস্থানে যেতেন তাঁদের জন্য প্রার্থনা করতে এবং অন্য লোকদের জন্য তা শিক্ষারূপে তুলে ধরার সংকল্প করলেন।

উকবা বিন আমির রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট বছর পর উহুদের শহীদদের বিষয়ে এভাবে সমবেদনা প্রকাশ করলেন, যেন কেউ বিদায় নিচ্ছেন, তারপর তিনি মঞ্চে উঠে ভাষণ দিলেন :

---

১. বুখারী, নাসায়ী, তিরমিজি।
২. আহমদ, ইবনে হিশাম।
৩. বুখারী, মুসলিম।

'আমি তোমাদের পথপ্রদর্শক, আমি তোমাদের সাক্ষী, হাউজে কাওসারে তোমাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি এখান থেকে তাদের দেখতে পাচ্ছি, আমি তোমাদের উপর এ আশঙ্কা রাখি না যে, তোমরা পুনরায় পৌত্তলিক হয়ে যাবে। কিন্তু আশঙ্কা যে, তোমরা দুনিয়ার মোহজালে ফেঁসে না যাও।'

উকবা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ ছিল আমার আন্তরিক দৃষ্টি, যা রসুলুল্লাহর উপর নিক্ষেপ করি।[১]

মুসলমানরা তাদের শোক এ রোষ তাঁদের মধ্যে অবদমিত করে নিলেন, আর যে শোকের পাহাড় তাদের উপর ভেঙে পড়েছিল তার সামনে উদ্যমহীন হলেন না ; বরং আশপাশের শত্রু ও বিরোধীদের গতিবিধি দেখে পরাজয়ের কারণগুলো মোকাবিলা করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজেদের অবশিষ্ট শক্তিকে ঘাপটি মেরে বসে থাকা শত্রুদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার কাজে লাগিয়ে দিলেন।

উহুদের যুদ্ধের পরাজয় থেকে মুনাফিক ও ইহুদিরা লাভ উঠাতে চাইল এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের শত্রুরা এটিকে একটি উত্তম অবস্থা বলে মনে করল। অতএব, মদিনাকে তারা তাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করল। যারা নিজেদের বিদ্বেষ গোপন রেখেছিল, তারাও সামনে এসে গেল এবং কাফিররা কানাঘুষো করতে লাগল যে, আকাশ তার পাঠানো নবীকে অপমানিত করে দিয়েছে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিস্থিতিকে সামনে রেখে অনতিবিলম্বেই তাঁর সাথিদের নবগঠিত করলেন এবং একটি দলকে কুরাইশদের ধাওয়া করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যাতে মুসলমানদের পরাস্ত দেখে পুনরায় আক্রমণ করার সাহস না পায়।

উহুদের যুদ্ধ শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ শনিবার সংঘটিত হয়েছিল আর এ ছোট দলটি ১৬ শাওয়াল রবিবারে ধাওয়া করতে গেল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সাথে গেলেন, এমনকি হমর উল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন, যেখানে আবু সুফিয়ান নিকটেই ছিল। কুরাইশী সরদার খোলা ময়দানে পৌঁছে বিগত ঘটনাবলি পর্যালোচনা করতে লাগলেন। একে অন্যকে যাচ্ছেতাই করে নিজেদের মনের ঝাল মেটাল, একে অন্যকে নিন্দা করল, অভিযোগ করে বলল– তুমি কোনো কীর্তিই দেখাতে পারোনি, তুমি শত্রুসৈন্যদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেও ছেড়ে দিয়েছ, তুমি রক্তপাত করতে ব্যর্থ হয়েছ, তাদের নেতা বেঁচে গিয়েছেন, তিনি আবার তোমাদের

---

১. বুখারী, মুসলিম, আহমদ, বাইহাকী।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু যখন তারা জানতে পারল যে, মুসলমানরা পুনর্ব্যবস্থিত হয়ে গিয়েছেন এবং যুদ্ধের জন্য আবারো আসছেন, তখন তাদের অবস্থা বিগড়ে গেল।

পৌত্তলিকরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তারা কি ঐ যুদ্ধ থেকে বিরত হবে, যার পরিণাম অজ্ঞাত। যে বিজয় তারা লাভ করেছে এবার হয়ত তারাও হারিয়ে বসবে। না কি তাদের মক্কায় ফিরে যাওয়া উচিত ? এমতাবস্থায় মুসলমানদের নেতৃত্ব উপযুক্ত পদক্ষেপই নিলেন এবং পরাজয়ের গ্লানি কিছুটা কমে গেল।

ওদিকে আবু সুফিয়ান চিন্তা করল মুসলমানদের মনোবলে চির ধরাতে এবং তাঁদের উদ্যমহীন করতে কোনো ব্যক্তিকে বলে পাঠানো হোক যে, কুরাইশরা নিজেদের ক্রুট সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং তারা মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য পুনরাভিযান চালাতে আসছে।

মুসলমানরা হমর উল আসাদ-এ শিবির স্থাপন করলেন। আবু সুফিয়ানের পাঠানো লোকটি এসে গেল এবং সে মদিনায় ফিরে যাবার জন্য তাদের প্ররোচিত করল, যাতে পৌত্তলিকদের সাথে পুনরায় সংঘর্ষ না হয়। কেননা, তাদের পুনরায় যুদ্ধ করার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না।

কিন্তু মুসলমানরা তাদের এই সাবধান বাণীকে স্বীকার করে নিলেন এবং তিন রাত যাবৎ কুরাইশদের প্রতীক্ষায় আলো জ্বালিয়ে অবস্থান করলেন। কিন্তু কুরাইশরা ফিরে যাওয়াই মঙ্গল বলে বিবেচনা করল এবং তারা মক্কার দিকে পালিয়ে গেল আর মুসলমানরা পূর্ণ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপের সাথে মদিনায় প্রব্যাবর্তন করলেন।

এই সফল প্রদর্শনের বিষয়ে আঘাত এবং সন্তাপ সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীরদের বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো, যাতে মুসলমানদের বীরত্ব ও সাহসের কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের দৃঢ়তা ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করা হয়েছে :

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আহ্বান শুনেছে, এরপর যারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, এদের জন্য যা উত্তম কাজ তা হলো, আল্লাহর ভয় রাখা, যা বড় প্রতিদান। এঁরা তাঁরাই, যাঁদের সাথে লোকেরা বলে যে তোমাদের জন্য লোকেরা দল সাজিয়ে রেখেছে, তো তাদের ভয় করো অনন্তর এই বস্তুই তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি কী উত্তম কার্য সাধক।

অনন্তর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও ফজলের সাথে ফিরে এল, তারা সামান্যতম কষ্টও পায়নি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলে এবং আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।' – আলে ইমরান : ১৭২-১৭৪

বারো
উহুদের প্রভাব

ইসলামের বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন অতি আগ্রহী ও সন্ধিপ্রিয় লোকেরা এবার ইসলামের উপর আক্রমণ চালিয়েই বসেছিল। যদিও মুসলমানরা হমর-উল-আসাদ পর্যন্ত পৌত্তলিকদের ধাওয়া করে সামরিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু উহুদের পরাজয় মন্দ প্রভাবই ফেলল।

বেদুইনদের সাহস বেড়ে গেল এবং মদিনা আক্রমণ করে লুটতরাজ করার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল।

ইহুদিরা মুসলমানদের উপহাস করতে শুরু করল, তাদের বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজি ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করল এবং তাদের চরিত্র হননের কাজে নেমে পড়ল।

পরাজয়ের পর জাতির নেতৃত্ব দেয়া ও আঘাত পাওয়ার পর জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অতি কঠিন কাজ, তা সে লোক এ উপত্যকা যত সহজে অতিক্রম করুক অথবা ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এই সংকটের মোকাবিলা করুক না কেন।

হিজরতের চতুর্থ বর্ষ শুরু হয়ে গেল কিন্তু মুসলমানরা উহুদের পরাজয়ের ক্ষত তখনো নিরাময় করতে পারেনি, কিন্তু সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। বেদুইনরা মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল এবং সেখানকার সহায় সম্পদকে লুটের মাল বলে মনে করতে লাগল। মদিনার উপর প্রথম আক্রমণে অগ্রসর হলো বনু আসাদ। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু সালমা বিন আবুল আসাদের নেতৃত্বে ১৫০ জন সৈন্য দিয়ে মোকাবিলায় পাঠালেন, যাতে আক্রমণের আগেই তাদের অবদমিত করা যায়।

হজরত আবু সালমা রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করতে এবং তাদের উট ও বকরিদের হারিয়ে দিতে মোটেও বেগ পেতে হলো না এবং তিনি বিজয়ীর বেশে মদিনায় ফিরে এলেন। হজরত আবু সালমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যাঁরা হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং ঈমান ও জিহাদের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সারিয়া[১] থেকে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় ফিরে আসেন। কেননা, উহুদের যুদ্ধে তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন সে ক্ষতস্থান খুবই

---

১. সারিয়া হলো সেই যুদ্ধাভিযান, যাতে স্বয়ং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অংশগ্রহণ করেননি। – অনুবাদক

বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এবং অনতিবিলম্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। খালিদ বিন সুফিয়ান খুজলি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করল এবং মদিনা আক্রমণের জন্য বিভিন্ন গোত্রকে উত্তেজিত করতে লাগল। অবশেষে বাধ্য হয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিন উনাইস রাজিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন তাকে দমন করার জন্য এবং তিনি ঐ দুষ্টকে হত্যা করলেন।[১] ওদিকে হুজাইল গোত্র তার লোকদের ইশারা করল যে, তোমরা 'গজওয়া রাজি'র মুসলমান বন্দিদের মক্কাবাসীর হাতে তুলে দিতে সহযোগিতা করো।

এই 'গজওয়া রাজি'র[২] ঘটনা এরকম, আজল ও কার গোত্রের কিছু লোক রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নিবেদন করে যে, আপনার প্রচারিত ইসলাম ধর্মের খবর আমাদের কাছে পৌছেছে। আমাদের কাছে এমন কিছু লোক পাঠিয়ে দিল যারা আমাদের কুরআন শিক্ষা দেবেন। তিনি আসিম বিন সাবিত রাজিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। যখন উফফান ও মক্কার মধ্যবর্তী রাজি[৩] নামক স্থানে পৌছালেন তখন দ্বীনের আহ্বানকারীরা বুঝতে পারলেন যে তাদের ধোঁকা দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে হুজাইল গোত্রের সহযোগিতা চাইলেন যাদের বসবাস ছিল একটি ঝরনার কাছে।

বাধ্য হয়ে মুসলমানরা অস্ত্র তুলে নিলেন এবং ধোঁকাবাজ ও তাদের সহযোগী হুজাইলদের সাথে লড়াই করলেন। কিন্তু কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষে প্রায় ১০০ তীরন্দাজের সাথে যুদ্ধ করে কীভাবে জয়লাভ করা সম্ভব ছিল, যেখানে দুশমনদের সহযোগী ছিল ঐ গোত্রের লোকেরা । অনন্তর, আসিম ও তার সাথিদের হত্যা করা হলো এবং তিন সাহাবি হজরত খুবাইব, হজরত আব্দুল্লাহ বিন তারিক ও জায়েদ বিন দাসিন্না রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বন্দি করে নিয়ে গেল। হুজাইল গোত্রের লোকেরা তাদের বেঁধে মক্কায় নিয়ে গিয়ে মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রি করে দিল। মক্কায় বিক্রি করে দেয়ার অর্থ এই ছিল যে, ক্রোধের আগুনে দগ্ধ হওয়া শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের ক্রোধের আগুন প্রশমিত করা, কেননা এরা ছিলেন সেই তিন মহানুভব, যাঁরা বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এঁরা ছিলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান হাতস্বরূপ। হজরত

---

১. আবু দাউদ, বায়হাকী, আহমদ।

২. মূল আরবি পুস্তকে 'গজওয়া রাজি' স্পষ্টই লেখা আছে জানি না এই যুদ্ধকে কেন গজওয়া বলা হলো, যাতে স্বয়ং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত ছিলেন না। আমরা গজওয়াই লিখলাম। যাই হোক এটি রাজি নামক দিঘির কাছে সংঘটিত হয়েছিল এবং এটি সারিয়া ছিল। – অনুবাদক

৩. রাজি– একটি দিঘির নাম।

আব্দুল্লাহ সুযোগ বুঝে পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন এবং পরিণামে তাঁকে হত্যা করা হলো। কিন্তু হজরত খুবাইব ও হজরত জায়েদকে হত্যার জন্য কুরাইশরা কিনে নিল, যাতে প্রতিশোধ নিয়ে পুরনো আগুন প্রশমিত করতে পারে।

সফওয়ান বিন উমাইয়া তার পিতা উমাইয়া বিন খলফের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হজরত জায়েদকে কিনে নিল। যখন তাঁকে হরমের বাইরে নিয়ে আসা হলো তখন কুরাইশদের বহু লোক সেখানে জমা হয়ে গেল, যাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হরবও উপস্থিত ছিল। যখন হজরত জায়েদকে হত্যার জন্য নিয়ে আসা হলো, তখন আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করল : 'ওহে জায়েদ ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম করে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি এটা পছন্দ করো যে, আমরা তোমাকে ছেড়ে দিই আর তোমার বদলে মুহাম্মদকে হত্যা করি আর তুমি তোমার ঘরে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করো।'

জায়েদ : '(অত্যন্ত জোরের সাথে) আল্লাহর কসম, আমি এটাও সহ্য করতে পারব না যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে কোনো কাঁটা ফুটলেও আমি আমার ঘরে নিশ্চিন্তে বসে থাকব।'

আবু সুফিয়ান : আল্লাহর কসম ! মুহাম্মদের সাথিরা মুহাম্মদকে যতটা ভালোবাসে আমি আর কাউকে কারো প্রতি এত ভালোবাসা কখনো দেখিনি। এরপর হজরত জায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হলো।

হজরত খুবাইব রাজিয়াল্লাহু আনহুকে উকবা বিন জাবির ক্রয় করল তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। যখন তাঁকে ফাঁসি দেয়ার জন্য হরম শরিফ থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি দু রাকাত নামাজ পড়ার জন্য সময় চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি পূর্ণ সন্তোষের সাথে যথাযথভাবে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন এবং মুশরিক-পৌত্তলিকদের বললেন :

'আমি এই ভেবে নামাজ দীর্ঘ করিনি যে, তোমরা মনে করবে আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজ দীর্ঘ করছি।'

হজরত খুবাইব হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ফাঁসিতে যাওয়ার আগে দু'রাকাত নামাজ পড়ার নিয়ম প্রচলন করেন। তারপর লোকেরা তাঁকে ফাঁসি কাঠে ঠেলে দিল তখন তিনি বললেন :

'হে আল্লাহ ! আমি তোমার রসুলের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। অনন্তর আমাদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে সে খবর তুমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দিয়ো।' তারপর দু'আ করলেন : 'হে আল্লাহ ! তুমি এদের ঘিরে ফেলে এক এক করে গুনে গুনে মারো আর কাউকে আস্ত রেখো না।'[১]

---

১. ইবনে হিশাম, বুখারী।

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করলেন :

'সত্যের পথে মরতে কখনো পায় নাকো ভয় মুসলমান।
জীবনমৃত্যু খোদার পথে এ কথা জানে যে মুসলমান–
পরোয়া করে না মরতে তারা
পেরিয়ে সাগর মরু ও সাহারা
সব ছুড়ে ফেলে আল্লাহর পথে বক্ষে নিয়ে সে আল কুরআন।
আল্লাহর পথে জীবন দিতে ভয় করে নাকো মুসলমান ॥'

হজরত আসিম ও তার সাথিদের এমন নির্দয়ভাবে হত্যা করার খবর শুনে মুসলমানরা বড় কষ্ট পেলেন এবং তাঁরা খুবই শোকাহতও হলেন। এমন নির্দয়ভাবে মুসলমান বন্দিদের হত্যা করা হবে, এটা ছিল তাঁদের কল্পনাতীত। ইসলামের এই বীর আহ্বায়কদের এমন সময়ে হত্যা করা হলো, যে সময়ে তাঁদের বড় প্রয়োজন ছিল। এই অমানবীয় রীতিতে মুসলমানদের হত্যাকাণ্ড, তাঁদের দ্বীনি ভাইদের মনে অত্যন্ত শোক, ঘৃণা ও রোষ সৃষ্টি করে দিল। কেননা এর অর্থ ছিল সমগ্র আরব মুসলমানদের জীবন ও ধন-মানের শত্রু। তারা কোনো ভয় ও কিসাসের পরোয়া না করে তাঁদের রক্তপাতে মেতে উঠেছে।

যদিও এই ঘটনার পর দূরস্থ গোত্র ও সন্দিগ্ধ ক্ষেত্রগুলোতে প্রতিনিধি পাঠানোর ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করাটা মুসলমানদের জন্য খুবই প্রয়োজনসিদ্ধ হয়ে উঠল। তা সত্ত্বেও দ্বীনি-দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা এ রকম উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতেও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে বাধ্য করল, যে রকম একটি বাণিজ্য বাজারের আকস্মিক দরপতনের কারণে ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয় কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতি আসা পর্যন্ত তা সয়ে নিতে হয়, তারপর, অন্ততপক্ষে তার ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়, ঠিক এই কারণেই তিনি আবু বরা আমির বিন মালিকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং নজদ এলাকায় সেখানকার গোত্রগুলোতে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা চিন্তা করলেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশঙ্কা ব্যক্ত করলেন যে, এই খুনি-লুটেরা বেদুইনদের দিক থেকে আমি বিপদের আশঙ্কা করি। আবু বরা বলল : 'আমি এর জিম্মাদার।'

ইসলামের আহ্বায়করা মদিনা থেকে রওনা হয়ে বীরে মউনা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এঁরা ছিলেন ৭০ জন সুনির্বাচিত সাহাবা, যাদের কুররা[১] বলা হতো। এঁরা দিনের বেলা কাঠ কাটতেন আর রাতের বেলা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল

১. যারা কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। -অনুবাদক

থাকতেন। এভাবে জীবনসংগ্রাম ও আখিরাতের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এঁরা সুব্যবস্থিত জীবনযাপন করতেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁদের ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দিলেন তখন তাঁরা তাঁদের মনের অজান্তে সেই মৃত্যু উপত্যকার দিকে এগিয়ে চললেন, যার চারদিকে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জাল বিছানো রয়েছে।

যখন এ কুররা দল বীরে মউনায় পৌছে গেলেন তখন তারা হরাম বিন মলহা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে রসুলুল্লাহর পত্র দিয়ে এই এলাকার কাফিরদের নেতা আমির বিন তুফাইলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হরাম রাজিয়াল্লাহু আনহু সেই দুষ্টকে রসুলুল্লাহর সেই পত্রটি দিলেন, যাতে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। আমির এ পত্রটি দেখতেও পছন্দ করল না ; বরং এক ব্যক্তিকে ইশারা করল। হজরত হরাম তখনও ঠিকমত সামলেও উঠতে পারেননি সে পিছন থেকে বর্শা হানল, যা তাঁর পিঠের দিক থেকে ঢুকে বুক দিয়ে বেরিয়ে গেল। তাৎক্ষণিক শাহাদত ঐ ব্যক্তি লাভ করলেন, যিনি আজীবন শাহাদত লাভের কামনা করে এসেছিলেন। তারপর তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ থেকে এই কথা ক'টি বেরিয়ে এল :

'কাবার প্রভুর শপথ। আমি সফল হয়েছি।'

আমির তার লোকদের পাঠিয়ে দিল, যাদের সাথে রিঅল, জকওয়ান ও কারা গোত্রের লোকেরাও যোগ দিল এবং তারা একযোগে কুররাদের উপর আক্রমণ চালাল।

কুররা দল যখন দেখলেন তাঁরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখন তাঁরা নিরুপায় হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন কিন্তু তা ব্যর্থ হলো, তারপর এই নির্দয় নিষ্ঠুর বেদুইনরা তাঁদের সবাইকে শহীদ করে দিল।

কুররা দলের মধ্য থেকে মাত্র দু'জন বেঁচে গেলেন, এঁরা হলেন মুনজির বিন মুহাম্মদ ও আমর বিন উমাইয়া জমরী রাজিয়াল্লাহু আনহু। এঁরা কোনো কাজে পশুচারণ ক্ষেত্রের দিকে গিয়েছিলেন এবং মাংসাশী পাখিদের সেখানে চক্কর দিতে এবং তাদের মুখে মাংসখণ্ড দেখে তাঁরা বুঝে নিলেন যে, এর মধ্যে কোনো রহস্য অবশ্যই আছে এবং তাঁরা কাছে গিয়ে দেখলেন তাঁদের সাথিরা শাহাদতের অমৃত সুধা পান করে নীরব-নিস্তব্ধ-নিথর হয়ে রক্তমাখা অবস্থায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁরা পরামর্শ করলেন এখন কী করণীয় ? মুনজির বললেন, কী অভিমত ? আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন : 'আমার মতে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর পাঠিয়ে দেয়া হোক।' মুনজির রাজিয়াল্লাহু আনহু একমত হলেন না। তিনি বললেন : 'খবর তো তিনি পাবেনই কিন্তু শাহাদতের সুযোগ কেন ত্যাগ করি ?' এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বর্বর বেদুইনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শাহাদতের অমৃত সুধা পান করে এ ভুবন ত্যাগ করে গেলেন। আর হজরত আমরকে বন্দি করা হলো। আমির তুফাইল তাঁকে এই বলে স্বাধীন করে দিল যে, আমার মা এক ক্রীতদাসকে স্বাধীন করে দেয়ার জন্য

মানত করেছিলেন সে জন্য আমার মায়ের মানত পুরো করে তোমাকে ছেড়ে দিলাম।

হজরত আমর এই দুঃখজনক ঘটনার সংবাদ নিয়ে অত্যন্ত শোকাহতচিত্তে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় উপস্থিত হলেন। ৭০ জন সুনির্বাচিত সাহাবাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল, উহুদের যুদ্ধে যে আঘাত তাঁরা পেয়েছিলেন সে ক্ষত তখনো শুকোয়নি– এদিকে ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল, মুশরিকরা যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেছিল আর এরই সাথে তারা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ ধরেছিল।

এ ঘটনায় মুসলমানরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হলেন। তাঁরা তাঁদের ক্ষতির জন্য কেবল শোকাহত ছিলেন না ; বরং এ ঘটনা তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে অনেক বেশি উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল যে, মূর্তিপূজকদের কাছ থেকে সুকল্যাণ-সুকামনা-শুভবুদ্ধি ও মহৎ কিছু আশা করা যায় না। শিষ্টতা-ভদ্রতা, সম্মান ও মর্যাদা তাদের কাছ থেকে যেমন আশাও করা যায় না, তেমনি তাদের কাছ থেকে এর অবশিষ্টও কল্পনা করা যায় না।

এ সমস্ত জঘন্য অপকর্ম তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে থাকায় ভদ্রতা-সততা-মনুষ্যত্ব ও মানবতার বিরুদ্ধে তারা নিরন্তর অপরাধ সংঘটিত করে চলেছিল। এই পৌত্তলিক সন্ত্রাসী ও আতঙ্কবাদীরা মুসলমানদের যখন যেভাবে পারল তখন সেভাবে কষ্ট দিয়ে চলল।

মদিনা ফেরার পথে হজরত আমর দুই ব্যক্তিকে বনু আমিরের লোক মনে করে হত্যা করলেন কিন্তু পরে জানা গেল যে, এরা বনু কিলাব-এর লোক ছিলেন, যারা মুসলমানদের সহযোগী-গোত্র ছিলেন। হজরত আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় উপস্থিত হয়ে এ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি সাহাবিদের বললেন :

'তোমাদের সাথিদের হত্যা করা হয়েছে এবং তারা আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন যে আমাদের ভাইদের এ দুঃসংবাদ পৌঁছে দিয়ো যে, আমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছি এবং আমরা এতে সন্তুষ্ট এবং আমাদের প্রভু আমাদের উপর সন্তুষ্ট।'

তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আমর রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন :

'তুমি যে দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, তাদের দিয়ত দেয়া অনিবার্য।'

তারপর তিনি মুসলমান ও ইহুদি সহযোগীদের কাছ থেকে এ দুই ব্যক্তির দিয়ত একত্রিত করার কাজে নেমে পড়লেন।

এ কথা নিঃসন্দেহ যে, আরব উপদ্বীপে মুসলমানদের সাফল্যের ফলে অনেক মানুষই গুমরাহি থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন, অন্যদিকে মুসলমানদের প্রাপ্ত

সাফল্য ও প্রভুত্ব মুসলমানদের শত্রুদের মনে হিংসা-বিদ্বেষ-শত্রুতা বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। মুনাফিক ও বিপথগামী লোকেরা মুসলমানদের সম্পর্কে বলাবলি করতে লাগল যে, এরা ধোঁকার মধ্যে পড়ে আছে :

'স্মরণ করো যখন মুনাফিক ও তাদের সহযোগীরা, যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা এদের দ্বীন তো এদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রেখেছে। যদিও আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা নিরাপদ, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বময় প্রভু ও প্রাজ্ঞ।' – আল আনফাল : ৪৯

পরন্তু এই বিদ্বেষ এবং ঘৃণা বদর যুদ্ধের পরে কিছু দিন যাবৎ অবদমিত ছিল, সম্ভবত এই বিজয় দুর্বল ঈমান ওয়ালাদের এবং বিপথগামীদের এক নতুন দ্বীনের পতাকাতলে একত্রিত হতে বাধ্য করে দিল। কিন্তু, যখন মুসলমানদের পরিস্থিতি বদলে গেল এবং তাদের পরাজয়ের মুখ দেখতে হলো তখন অন্তর্নিহিত শত্রুতা ঘৃণা ও বিদ্বেষ আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল এবং চারদিক থেকে তার লাভা ছুটতে লাগল।

আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি যে, উহুদের যুদ্ধের পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পরিস্থিতি অনুমান করে নিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের শক্তি ও প্রতাপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি শুধরে নেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। এই কারণে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে উঠল। মুশরিকরা উহুদ যুদ্ধের প্রভাব থেকে ফায়দা লুটতে চাচ্ছিল এবং মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। আর মুসলমানরা এই যুদ্ধের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য সদাব্যস্ত ছিলেন।

যদি 'রাজি' ও বীরে মাউনার ঘটনায় মুসলমানরা খুব আঘাত পেয়েছিলেন। এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আরেক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এই কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও এই মহান বীরেরা তাঁদের প্রভুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না। ভবিষ্যতের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে ঈমান কিংবা বিশ্বাসে কোনো রকমের চির ধরেনি এবং তাঁরা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারপর এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ইহুদিরা যখন রসুলুল্লাহর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র রচনা করল তখন তাদের সাজা দেয়ার প্রশ্নে মুসলমানরা এক মুহূর্তের জন্যও পিছু হটলেন না।

তেরো
বনু নজিরের বহিষ্কার

ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের বিবরণ এই রকম : যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমর বিন উমাইয়া কর্তৃক নিহত দুই ব্যক্তির মুক্তিপণ পরিশোধ করার জন্য কিছু ধনরাশি উসুল করার জন্য বনু নজিরের মহল্লায় গেলেন, তখন বনু

নজির তাঁর সাথে বড়ই সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করল এবং সমস্ত রকমের সহযোগিতার কথা বলল। তিনি তাদের অপেক্ষায় একটি প্রাচীরের চালায় বসে পড়লেন। কিন্তু ইহুদিরা তৎক্ষণাৎ ষড়যন্ত্র রচনা করল যে, কোনো ব্যক্তি ছাদের উপর উঠে একটি ভারি পাথর তাঁর উপর ফেলে দেবে, যাতে আমরা সবাই এর থেকে দায়মুক্ত থাকতে পারি।

এদিকে ইহুদিরা এই ষড়যন্ত্র করতে লাগল আর ওদিকে আল্লাহ অহির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জানিয়ে দিলেন। তারপর তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদিনায় চলে এলেন।

যে সাহাবিরা তাঁর সাথি হয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা তাঁর অনুপস্থিতিতে বড়ই দুশ্চিন্ত হয়ে পড়লেন এবং সাথে সাথে তাঁকে খুঁজতে বেরুলেন। মদিনা থেকে আগত এক ব্যক্তি বলল যে, সে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদিনায় প্রবেশ করতে দেখেছে। তারপর তাঁরা অনতিবিলম্বেই মদিনায় পৌঁছে জানতে পারলেন, ইহুদিরা কী ষড়যন্ত্র করেছিল। পরে জানা গেল যে, আমর বিন হাজ্জাশই ছিল এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা, যে ছাদের উপর থেকে তাঁর উপর ভারি পাথর ফেলার পরিকল্পনা করেছিল। অনন্তর এই অপরাধের পরিণাম থেকে তারা না পারল নিজেদের বাঁচাতে আর না পারল নিজেদের জাতিকে রক্ষা করতে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ বিন মুসলিমার মাধ্যমে বনু নজিরের কাছে দশ দিনের মধ্যেই মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশনামা পাঠালেন এবং এরপরে যাদের দেখা যাবে তাদের মুণ্ডুপাত করা হবে।

ইহুদিদের বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, ফলে তারা প্রস্তুতি শুরু করে দিল। আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও অন্যান্য মুনাফিকরা তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিল এবং বলে পাঠাল যে, তোমরা স্ব-স্থানে অনড় থাকো, আমরা মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করব। এতটুকুমাত্র ইঙ্গিত পেতেই ইহুদিদের সাহস বেড়ে গেল এবং তারা যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিল যে, পারলে যা ইচ্ছা করে নেবেন, আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না। তারপর তাদের দুর্গগুলোতে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। আমরা তোমাদের জন্য এক হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছি— আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের এই আশ্বাসে ইহুদিদের সাহস অনেক বেড়ে গিয়েছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং তাদের পক্ষধারী অন্য গোত্রগুলোকেও সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দিলেন, সেই সাথে বনু নজিরকে ঘিরে ফেললেন এবং তাদের বাগ-বাগিচা ও ক্ষেতের ফসল তুলে ফেলার আদেশ দিয়ে দিলেন। তারপর ইহুদিদের হুঁশ ফিরে এল এবং ভীষণ ভীতত্রস্ত হয়ে উঠল। তাদের সহযোগী ও রক্ষাকারীরা দূর থেকে দেখতে লাগল কিন্তু তাদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এল না। আর তাদের

জন্য সুপারিশ করার সাহসও কারো হলো না। অথচ মুসলমানরা সে সময়ে তাঁদের ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটজনক কালটি অতিক্রম করছিলেন। আর তাদের পরিণামের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলাও সম্ভব ছিল না। সমগ্র আরব মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের রক্তপাত করেছিল। ওদিকে ইহুদিরাও শক্তিশালী ছিল এবং তাদের সাথে মোকাবিলা করাটাও অসম্ভব মনে হচ্ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। পরন্তু বীরে মউনাসহ এর আগের ঘটনাবলি মুসলমানদের খুব উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল এবং তাঁদের সাথে নিরন্তর ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে তাঁদের সচেতন করে তুলেছিল এবং অপরাধীদের প্রতি প্রতিশোধের স্পৃহা তাঁদের উদ্দাম করে তুলেছিল। অনন্তর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এখন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তা তার পরিণাম যাই হোক না কেন। কেননা এই দুষ্টরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার পরিকল্পনাও করেছিল।

মুসলমানরা কল্পনাও করতে পারেননি যে এত তাড়াতাড়ি এমন অনুকূল পরিণাম সিদ্ধ হবে। ইহুদিরা ভীতত্রস্ত হয়ে উঠল এবং বিজেতাদের আদেশ মানতে বাধ্য হয়ে গেল, যারা তাদের দেশ ত্যাগের আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর যুদ্ধসামগ্রী ব্যতীত অন্য সমস্ত রকমের জিনিসপত্র, যা তাদের উটের পিঠে চাপিয়ে বহন করা সম্ভব ছিল তা নিয়ে তারা চলে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেল।

এই ঘটনার বিষয়ে সমগ্র সুরা হাশর অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর প্রারম্ভেই ইহুদিদের বহিষ্কারের কথা উল্লেখিত হয়েছে :

'তিনিই, যিনি ঐ লোকদের, যারা কিতাবধারীদের মধ্য থেকে কাফির হয়ে গিয়েছে তাদের বাড়িঘর থেকে আগেই বের করে দিয়েছেন। তোমাদের বিশ্বাস ছিল না যে, তারা বেরিয়ে যাবে, আর তাদেরও বিশ্বাস ছিল না যে, এ তাদের দুর্গগুলো আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে। তারপর আল্লাহ তাদের উপর আতঙ্ক ছেয়ে দিলেন। যা তাদের বিশ্বাসেরও অতীত ছিল, তারপর তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন, এবার তারা স্বহস্তে নিজেদের বাড়িঘরগুলোকে ঈমানদারদের হাতে সঁপে দিতে লাগল। অনন্তর হে চক্ষুষ্মান সম্প্রদায় ! এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।' –আল হাশর : ২

তারপর কুরআন মদিনার মুনাফিকদের ব্যবহারের উপর চপেটাঘাত করল, যারা ইহুদিদের শুধু সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়নি ; বরং তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছিল :

'তুমি কি তাদের দেখোনি যারা মুশরিক, যারা কুফরিকারী ভাইদের সাথেও আছে, আবার কিতাবধারীদের সাথেও আছে, বলে : যদি তোমাদের বের করে দেয়া হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব, আর যদি তোমাদের

সাথে যুদ্ধ করা হয় তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।

প্রকৃত তথ্য হলো, যদি তাদের বের করে দেয়া হয় তাহলে তারা তাদের সাথে বেরিয়ে যাবে না, আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় তাহলে তাদের সহায়তা করবে না আর যদি তাদের সহায়তা করেও, তাহলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে, তারপর তারা আর কোনো সহায়তা পাবে না।' – আল হাশর : ১১-১২।

এ বিজয় মুসলমানরা আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। তারপর মদিনায় তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন, মুনাফিকরা অপমানিত হয়ে গেল এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুইনদের শাস্তি দেয়ার জন্য অবসর পেয়ে গেলেন, যারা উহুদের যুদ্ধের পরে মুসলমানদের আঘাত দিয়েছিল এবং দ্বীনের আহ্বায়কদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল।

এই সন্ত্রাসবাদী বেদুইনদের শাস্তি দেয়ার জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদ-এর বনজঙ্গলগুলো চষে ফেলার জন্য বেরুলেন, যাতে রাজি' ও বীরে মাউনার ঘটনায় শহীদ হয়ে যাওয়া সাথিদের প্রতিশোধ নিতে পারেন এবং এই অশান্তি চিরকালের জন্য নির্মূল করে দিতে পারেন। যাতে আর কখনো তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এর ফলে সন্ত্রাসবাদী বেদুইনরা ভীতত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এই লুটেরা-বেদুইনরা এতই বিক্ষিপ্ত ও ভীতগ্রস্ত হয়ে ওঠে যে, যখনই মুসলমান সৈন্যদের আসার খবর পেত তখনই তারা ভয়ে পাহাড়ি উপত্যকায় পালিয়ে যেত। এই গোত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিল বনু লিহয়ান, বনু মুহারিব ও বনু সালমা বিন গাতফান।

যখন মুসলমানরা এই সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করে দিলেন এবং তাদের শক্তি ধ্বংস করে এই অশান্তি চিরকালের জন্য নির্মূল করে দিলেন, তখন পুনরায় তিনি বড় শত্রুদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন। বছর পুরো হয়ে গিয়েছিল এবং কুরাইশদের সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পুরো করার সময় এসে গিয়েছিল।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথিদের দায়িত্ব ছিল মোকাবিলার জন্য বেরুনো এবং সুফিয়ান ও তার জাতিকে শিক্ষা দেয়া এবং আরো একটি যুদ্ধচক্র চালানো, যাতে যে কোনো একটি দলের পক্ষে ফায়সালা হয়ে যেতে পারে এবং তাদের রক্ষার জন্য জামানত পাওয়া যেতে পারে।

চৌদ্দ

বদরের শেষ অভিযান

আবু সুফিয়ান উহুদের যুদ্ধের পর, ফেরার পথে ওয়াদা করে গিয়েছিল, আগামী বছর বদরে আবার মোকাবিলা হবে ; কিন্তু সে তার ওয়াদা পুরো করেনি। সে মক্কায় তো ফিরে গিয়েছিল, পরন্তু যুদ্ধের পরিণাম নিয়েও চিন্তা করছিল। কিন্তু তখনো সে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে উঠতে পারেনি। সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্য সত্ত্বেও তার জাতি বদরের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং জীবনপণ যুদ্ধ করে উহুদের যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, তবে সে জয় ছিল মুসলমানদের ভুলের খেসারত। এ কারণে আবু সুফিয়ান মাররুজ্জাহরান পর্যন্ত এসে ফিরে গেল।

আবু সুফিয়ান তার জাতিকে বলল, বর্ষা ঋতু ছাড়া আর কোনো ঋতুই যুদ্ধের জন্য অনুকূল নয়, যাতে উটের খাদ্যও মেলে না আমাদের জন্য দুধও মেলে না। কিন্তু এ তো শুকনো মওসুম, সেজন্য আমি ফিরে যাচ্ছি, তোমরাও ফিরে চলো।

এভাবে অনিবার্য যুদ্ধের কবল থেকে কুরাইশরা নিজেদের বাঁচিয়ে নিল।

মুসলমানরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে বদরের একটি ঝরনার কাছে শিবির স্থাপন করলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন, আমরা ওয়াদা পুরো করতে এসেছি, অতএব, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং আট দিন যাবৎ কুরাইশদের জন্য অপেক্ষা করলেন এবং উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলেন।

এ চার হিজরি সনের শাবান মাসের ঘটনা।

পনেরো

দওয়াতুল জুন্দালের সংঘর্ষ

কুরাইশরা যখন মোকাবিলা থেকে আত্মরক্ষা করল তখন তো বিজয় মুসলমানদের পক্ষেই গেল। অতএব, দক্ষিণে তাঁদের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করার পর এবার উত্তরের প্রতি মনোযোগী হলেন।

আরব উপদ্বীপের উত্তরপ্রান্ত ছিল রোম সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী, সেখানকার লুটেরা আরবরা রোম সম্রাট কাইজার ছাড়া কাউকেই ডরাত না এবং কাইজার আরবদের মধ্যে এমন শক্তির উত্থান কল্পনাও করতেন না যাঁরা তাঁর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হতে পারতেন অথবা তাকে উপেক্ষা করতে পারেন। মদিনায় খবর

পৌঁছাল যে দওয়াতুল জুন্দালের[১] পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে কিছু বেদুইন গোত্র ব্যাপকভাবে লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং কাফেলাদের নিরাপত্তার জন্য তারা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই লুটতরাজ এতটা বৃদ্ধি পেল যে এই গোত্রগুলো এবার মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা করল এবং বিরাট এক বাহিনীও গড়ে নিল।

এ খবর পাওয়ামাত্রই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাজার মুসলমানের একটি বাহিনী নিয়ে প্রস্থান করলেন। এ যাত্রায় তিনি বড়ই সাবধানতা অবলম্বন করলেন। দিনের বেলায় গুপ্ত থাকতেন এবং রাতের বেলায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পথ চলতেন। এভাবে চলতে চলতে একদিন রাতে শত্রুসৈন্যদের উপর অকস্মাৎ প্রবল আক্রমণ চালিয়ে দিলেন– যারা মদিনা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। ইয়াসরিব[২] ও দওয়াতুল জুন্দালের দূরত্ব পনেরো দিনের পথ, যা এক দক্ষ পথ প্রদর্শকের সাহায্যে মুসলমানরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অতিক্রম করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী শত্রুদের কাছে পৌঁছেই অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। অতএব, যে সৈন্যরা আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল তারা এই অকস্মাৎ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। আর মুসলমানরা তাদের সহায় সম্পদ ও পশুগুলোকে অধিকার করে নিলেন। এই পশুগুলো ছিল বনু তামীমের।

দওয়াতুল জুন্দালের লোকেরা এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল যে তাদের একটি লোককেও পাওয়া গেল না। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করলেন এবং বিভিন্ন এলাকায় সেনাদল ও অভিযান প্রেরণ করতে থাকলেন।

অবশেষে নিজেদের কাজ শেষ করে মুসলমানরা মদিনায় ফিরে এলেন এবং ৫ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে উত্তরাঞ্চলে আরবদের প্রতি মনোযোগী হলেন।

যে সময়ে ইসলাম বিভিন্ন পর্যায়ে যুগের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের সাথে সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছিল সে সময়ে তার শত্রুরা প্রকাশ্য শত্রুতা ও বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল কিন্তু যখন তা স্থায়িত্ব লাভ করল এবং তার আহ্বায়ক শক্তিশালী হয়ে গেলেন তখন তাঁর শত্রুরা গুপ্ত পন্থা অবলম্বন করল, যেমনটি মুনাফিকরা করেছিল। এবার ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও ধোঁকার আশ্রয় সার্বিকভাবে নেয়া হলো। অন্ধকারের সাহায্য নিয়ে দুর্বল যখন ষড়যন্ত্র রচনা করে তখন সে শক্তিশালী এবং প্রকাশ্য যুদ্ধে পিছপা হয় না ; বরং এরা প্রায়শই ব্যক্তির

---

১. সিরিয়ার নিকটবর্তী এলাকা।

২. মদিনার প্রাচীন নাম।

বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মোকাবিলার পরিবর্তে মিথ্যা অভিযোগ, কুৎসা ও মনগড়া দোষারোপের আশ্রয় নেয়।

অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যুদ্ধে শত্রুর পক্ষ থেকে সেই সমস্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়, যা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মানুষ অবলম্বন করতে লজ্জাবোধ করে।

যখন মদিনায় মুনাফিকরা নিজেদের দ্বেষ-ঈর্ষা বা ঘৃণাকে গুপ্ত করে নিল এবং তাদের উপরে দুর্বলতা ছেয়ে গেল তখন তারা রসুলুল্লাহর দাওয়াতকে অপদস্থ করার জন্য সেই পদ্ধতি অবলম্বনই করল, যা মানব প্রবৃত্তির হীনতা, নীচতা ও শঠতাকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে আলগা করে দেয়। যারা ইসলামের মহত্ত্ব ও গুণের কথা বিশেষভাবে সুবিদিত ছিল তারা একে গুরুত্বহীন করে তোলার জন্য ছিদ্রান্বেষণ ও চুগলখুরির রাস্তা অবলম্বন করল এবং কখনো বা অভিযোগ ও মিথ্যারোপকে হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করল।

মুসলমানরা যতই প্রভুত্বশালী ও সুদৃঢ় হয়ে উঠতে লাগলেন, মুনাফিকদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ-ক্রোধ ততই বাড়তে লাগল। যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন তখন এই দুষ্টের দল তাদের নিরাপত্তা দেয়ার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু যখন তারা ইসলামের কোনো ক্ষতিই করতে পারল না এবং তাদের পরাজিতও করতে পারল না এবং ষড়যন্ত্রকারী সম্প্রদায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন এই মুনাফিকবর্গ মুসলমানদের সাথে এক হয়ে গেল এবং তাদের কুসংকল্পকে আড়াল করার জন্য বাচালতা ও চাটুকারিতার আশ্রয় নিল। এই দুষ্টেরা এই পদ্ধতিতে অনেক ফিতনা[১] সৃষ্টি করল বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে এ বিপত্তি প্রকাশ্যে সামনে এসে গেল এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন যে, এ গোত্রটি যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছে, এর নেতৃত্বে রয়েছে হারিস বিন জিয়াদ এবং এ প্রস্তুতি সে খুব গোপনে নিয়েছে। এ খবর পেতেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সসৈন্যে যাত্রা করলেন, যাতে ফণা তোলার আগেই এই শত্রুদের নিপাত করা যায়।

এবার অসাধারণরূপে সমস্ত মুনাফিক তার সঙ্গ নিল। সম্ভবত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিজয়ের আশাই তাদের সঙ্গী হতে বাধ্য করেছিল। কেননা দ্বীন ইসলাম নয়; বরং পার্থিব সামগ্রী লাভই তাদের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল।

মুসলমানরা মুরাইসি নামক ঝরনার কাছে গিয়ে পৌঁছালেন, যেখানে বনু মুস্তালিকদের আবাদ ছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার আদেশ দিলেন।

---

১. বিপত্তি।

হজরত উমর তাদের আহ্বান করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন : 'লোকসকল ! তোমরা এক আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু স্বীকার করে নাও, তাহলে তোমাদের জীবন-যৌবন-ধনমান সবই সুরক্ষিত থাকবে। তারা এ আহ্বান অস্বীকার করে তীর বর্ষণ শুরু করল।

এবার রসুলুল্লাহ সমস্ত সৈন্যকে একসাথে আক্রমণ করার আদেশ দিলেন, যাতে কোনো মুশরিক-পৌত্তলিক জীবন নিয়ে পালাতে না পারে। এ যুদ্ধে ১০ ব্যক্তি নিহত হলো এবং অবশিষ্টদের বন্দি করে নেয়া হলো। শহীদ হলেন মাত্র একজন মুসলমান, তা-ও ভুলক্রমে। গোত্রের লোকেরা সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের সামনে এনে নিবেদন করল।[১]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরাজিতদের সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করলেন। তারপর গোত্রপতি হারিস যখন তার বন্দিনী কন্যাকে নিতে এল তখন তিনি তাকে সানন্দে ফিরিয়ে দিলেন। পরে তিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তা স্বীকার করে নেয়া হলো। এই আত্মীয়তার পর লোকেরা রসুলুল্লাহর শ্বশুরকুলের লোকদের বন্দি করে রাখাটা পছন্দ করলেন না এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্ত করে দিলেন। হজরত জুবাইয়িরা বিনতে হারিসা রাজিয়াল্লাহু আনহু সবচেয়ে ভাগ্যবতী বলে সিদ্ধ হলেন, যাঁর বিয়ের কারণে বনু মুস্তালিকের ১০০ পরিবার মুক্ত হয়ে গেল।

কিন্তু এই সাফল্য ও বিজয়ের পর মুনাফিকদের গতিবিধি ও ষড়যন্ত্র আরো তীব্র হয়ে উঠল। কিন্তু মুসলমানরা বিজয়ের আনন্দে তা ভুলে গেলেন। হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর এক সেবক মুরাইসির ঝরনা থেকে পানি নিয়ে আসত, তার সাথে একদিন বনু আউফ খাজরাজির এক ক্রীতদাসের ঝগড়া হলো এবং দুজনে সেখানে মারামারি করল। প্রথমজন মুহাজিরদের আহ্বান করল আর দ্বিতীয় জন আনসারদের। যখন এদের ঝগড়াঝাটির কথা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কানে পৌছাল তখন সে ইসলাম বিরোধীদের উস্কে দিয়ে হানাহানি বাঁধিয়ে দেয়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। বলল : 'এই উদ্বাস্তুরা আমাদের দেশে বসেই আমাদের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে—এ একেবারে অসহ্য। আল্লাহর কসম। আমি মদিনায় পৌছে এই নয়াধর্মীদের বের করে দিয়েই তবে ছাড়ব।' তারপর সে তার জাতির লোকদের যাচ্ছেতাই করতে লাগল এবং রসুলুল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের উস্কে দিতে লাগল। হজরত জায়েদ বিন আরকাম তাঁর সেবায় উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা অবগত করালেন। তারপর আব্দুল্লাহ বিন উবাইও তাঁর সেবায় উপস্থিত হয়ে শপথ করে বলতে লাগল, আমি কিছুই বলিনি। আপনাকে মিথ্যা করে লাগানো হয়েছে।

---

১. ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাক।

লোকেরা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে বলল : 'হে আল্লাহর রসুল ! জায়েদ এখনো বালক। সম্ভবত তার ভুল হয়েছে। যা শুনেছে তা হত মনে রাখতে পারেনি।'

কিন্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর বাস্তবিকতা গোপন রইল না। তিনি এ ঘটনায় খুবই দুঃখিত মর্মাহত ও অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি চিন্তা করলেন এর দুষ্প্রভাব নির্মূল করে দেয়ার জন্য লোকদের অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত করে দেয়া যাক। অতএব, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করার আদেশ দিয়ে দিলেন।[১] লোকেরা দিনভর পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তারপরও রাতভর চলল, এমনকি চলতে চলতে সকাল হয়ে গেল, নতুন দিনের সূর্য উঠল, তারপর রোদের তেজ বেড়ে গেলে যাত্রা স্থগিত করা হলো।

তাঁবু ফেলতেই লোক ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রা শুরু করলেন এবং মদিনায় পৌঁছে গেলেন। এবার সুরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ হলো, অহি জায়েদ বিন আরকাম রাজিয়াল্লাহু আনহু কথার সততার সাক্ষ্য দিল :

'বলে : যদি আমরা মদিনায় পৌঁছে যাই তাহলে যে অধিক প্রভুত্বশালী, সে বলে, তার চেয়ে অধিক হীনকে বের করে দেবে, আর প্রভুত্ব তো আল্লাহর জন্য আর তাঁর রসুলের জন্য আর ঈমানদারদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।'– আল মুনাফিকুন : ৮

কে জানত এই সামাজিক প্রত্যাবর্তন অনতিবিলম্বেই এক নিকৃষ্ট ও মনগড়া কাহিনীর জন্ম দেবে আর তা রচিত হবে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের দ্বারা ? তারপর, জনসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেবে এবং তা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়বে ?

ঐ ব্যক্তি তাঁর কথা অস্বীকার করার পর মিথ্যা কসমও খেল। যদি এ কাপুরুষ তথা দুষ্টের মোক্ষলাভের (নাজতা) চিন্তা থাকত তা হলে তার জন্য তা হিতকারী হতো কিন্তু উদারতার বশে তাকে উপেক্ষার কারণে তার নোংরামি ও শত্রুতা আরো বেড়ে গেল। ইসলাম ও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের কার্যকারণের মধ্যে বিশাল কিছু পার্থক্য ছিল। আবু জেহেল এই নতুন ধর্ম গ্রহণকারীদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ করত। সে বড়ই ষড়যন্ত্রকারী, অত্যাচারী ও ভয়ংকর ছিল, তাকে সবাই ভয়

---

১. যদিও এ নিয়মানুযায়ী প্রস্থানের সময় ছিল না কিন্তু এ ছিল এক প্রকাশিত নির্দেশনা যদি লোকেরা সেখানেই অবস্থান করত তাহলে এ ঘটনা তার প্রভাব ফেলত, যার পরিণামে আত্মঘাতী যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে যেত।– অনুবাদক

করত। সে খুনি ও বুনো জন্তুদের সমান। সে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অস্ত্র ধারণ করেছিল এবং প্রতি পদে পদে সে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে গেল, এমনকি এই পথেই তার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল।

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই গুপ্তশত্রু বিচ্ছুর মতো হয়ে অবস্থান করতে লাগল, আর রাতের আঁধারে সহজ-সরল লোকদের সে দংশন করতে লাগল এবং ভ্রান্তি ও আশঙ্কা ছড়াতে লাগল।

সে তার বিপথগামিতার পথে আরো অগ্রসর হলো, সে মানুষের ইজ্জত এবং সম্ভ্রমের প্রতি আক্রমণ চালাল, নিন্দা ও কুৎসার অস্ত্র ধারণ করল এমনকি সতীসাধ্বী ও সদাচারীদেরও কলঙ্কিত না করে ছাড়ল না।

বনি মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ইফক[১]-এর ঘটনার জন্ম হলো এবং আল্লাহ ও তার রসুলের শত্রুরা তা সর্বত্রই ছড়িয়ে দিল, যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন ঢঙে যুদ্ধের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়া যায় এবং তাঁর নিকটতম সাথিদের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে। তারপর মুসলিম জনসাধারণকে শোক এবং সন্তাপের মধ্যে ছটফট করার জন্য ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

আব্দুল্লাহ বিন উবাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুৎসা প্রচারের লক্ষ্যে এমন এক পবিত্র মহিলাকে বেছে নিল, যিনি তখনো বাল্যকাল অতিক্রম করছিলেন, যিনি তখনো ছিলেন এক অপাপবিদ্ধা কিশোরী, পাপবোধ যাঁর মনে তখনো জন্মায়নি, যিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পবিত্রতম জীবন অতিবাহিত করছিলেন। ইনি ছিলেন সেই পরম ভাগ্যবতী মহিলা, যিনি ছিলেন হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা, যাঁকে ইহ-পরকালে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যোগ্যতমা এবং চিরসঙ্গিনী হওয়ার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। জনসাধারণ এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঘটনা শুনল কিন্তু কল্পনাও করতে পারল না যে, এ বিশ্বাসযোগ্য কিছু হতে পারে কিন্তু এরা কি জানত যে, এ ঘটনা কী গভীর মর্মপীড়াদায়ক ও এর মধ্যে কী বিপদ নিহিত আছে ? এখানে সেই সতীসাধ্বী মহিলার বিবরণ নিজের ভাষায় শুনব, যাকে কলঙ্কিত করা হয়েছিল তারপর সে অভিযোগ থেকে তিনি কীভাবে মুক্ত হয়ে গেলেন– এখানে সে ঘটনার বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

---

১. ইফক শব্দের অর্থ হলো মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা।– অনুবাদক

ষোলো

ইফকের ঘটনা

হজরত আয়েশা[১] রাজিয়াল্লাহু আনহা স্বয়ং এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল তিনি যখন কোনো অভিযানে যাত্রা করতেন তখন তিনি তাঁর পত্নীদের নাম নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতেন, যাঁর নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। বনি মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় আমার নাম উঠল এবং আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম।

সে সফরে মোটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মহিলারা অনেক কম খেতেন। আমার উট বসে যেত আর আমি পালকিতে উঠে বসতাম, তারপর কিছু লোক পালকির নিচে ধরে উটের পিঠে তুলে বেঁধে দিত, তারপর রওনা হয়ে যেত। যখন প্রত্যাবর্তনের পথে মদিনার নিকটবর্তী স্থানে রাতের বেলায় শিবির ফেলা হলো তখন কিছু রাত বাকি থাকতেই রওনা হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল, আমি শৌচকর্ম হেতু বাইরে গিয়েছিলাম, ফিরে শিবিরের কাছে পৌঁছে বুঝতে পারলাম আমার গলার মালা ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে, আমি খুঁজতে লাগলাম, ইতিমধ্যে কাফেলা চলে গেল। যারা আমার পালকি উটের পিঠে তুলে দিত তারা মনে করেছিল আমি তাতেই আছি, অতএব, তারা সেটি তুলে দিয়ে উটের পিঠে বেঁধে দিল এবং তারা লেশমাত্রও বুঝল না যে, আমি তাতে নেই এবং উটের নাকাল ধরে তারা রওনা হয়ে গেল।

আমি যখন হার নিয়ে ফিরে আসি তখন তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। অনন্তর বাধ্য হয়ে আমি চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম আমাকে না পেয়ে তারা নিজেরাই খুঁজতে আসবে। তারপর এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সহসা ওদিক থেকে সফওয়ান বিন মুআত্তাল সুলমি এসে পৌঁছালেন। তিনি কোনো কাজে পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন, ফলে লোকদের সাথে যেতে পারেননি। তিনি আমাকে দেখে চিনে নিলেন। কেননা পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই সহসা তাঁর মুখ দিয়ে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন[২] কথাটি বেরিয়ে এল। 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১. হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হজরত আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা ও হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী। তখন তাঁর বয়স ছিল তেরো বছর।-অনুবাদক

২. অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহর নিমিত্তে আর আমাদের তাঁর প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে' – এ কথা দুঃখ এবং কষ্টের সময়ে পাঠ করা হয়। – অনুবাদক

আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী এখানেই রয়ে গেলেন ?' সে সময়ে আমি চাদর মুড়ি দিয়ে ছিলাম।

সফওয়ান বললেন, 'আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আপনি কীভাবে রয়ে গেলেন।' কিন্তু আমি কোনো কথা বললাম না। তিনি উট এনে আমার কাছে বসিয়ে দিয়ে দূরে সরে গেলেন, আমি উটের পিঠে চড়ে বসলাম আর তিনি উটের লাগাম ধরে এগিয়ে চললেন। প্রায় দুপুর বেলা আমরা আমাদের সৈন্যদের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। তাঁরা সেখানে শিবির গেড়ে অবস্থান করছিলেন এবং তখনো জানতেন না যে, আমি পিছনে রয়ে গিয়েছি। এ নিয়ে মিথ্যাচারীরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল ও কলঙ্কিত করল। কিন্তু আমি জানতাম না যে, আমার বিষয়ে কী কথা প্রচারিত হচ্ছে ?

যখন আমরা মদিনায় এলাম তখন আমি নতুন মুসিবতে ফেঁসে গেলাম। এই অবস্থা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। বিষয়টি আমার পিতা ও রসুলুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু কেউ আমাকে কিছুই বললেন না। কিন্তু যে বিষয়টি আমাকে পীড়া দিচ্ছিল তা ছিল, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহানুভূতি ও মনোযোগ তেমনটি ছিল না যেমনটি আমার অসুস্থতার দিনগুলোতে আমি পেতাম। তিনি বাড়ি এসে শুধু এতটুকুই শুধাতেন– তিনি কেমন আছেন। আমার সাথে কোনো কথা বলতেন না। এর ফলে আমি ক্ষুব্ধ হলাম এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে পিত্রালয়ে চলে যাওয়ার অনুমতি নিলাম। তিনি সানন্দে অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমি আমার মায়ের কাছে গিয়েও এ দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না। এভাবে, কুড়ি-বাইশ দিনের মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

আমাদের দেশে অনারবদের ন্যায় নিজেদের বাড়িঘরগুলোতে শৌচালয় বানানো হতো না ; বরং ময়দানে বা ঝোপ জঙ্গলে এ কাজটি সম্পন্ন করা হতো। রাতের বেলায় মহিলারা শৌচকর্ম করতে বাইরে যেত। আমি একদিন রাতে মিসতাহ বিন উসামার মায়ের সাথে শৌচকাজের জন্য বাইরে যাই, পথে হেঁটে গিয়ে তিনি সহসা বলে উঠলেন : 'মিসতাহর সর্বনাশ হোক ?' আমি বললাম : 'তুমি কেমন মা, যে নিজের ছেলেকে গাল দিচ্ছ। তাও আবার সেই ছেলে, যে বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।' তিনি বললেন : 'ওহে আবু বকরের মেয়ে ! তুমি কি তার কথা জানো না ?' তারপর তিনি পুরো কাহিনী শোনালেন। আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'এত কিছু হয়ে গেছে ?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, এত কিছু হয়ে গেছে।'

এ কাহিনী শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। এমনকি শৌচকর্মও ভুলে গেলাম, যে জন্য এসেছিলাম। তারপর সোজা বাড়ি গিয়ে রাতভর কান্নাকাটি করলাম, এমনকি, আমার মনে হচ্ছিল আমার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমি আমার মাকে বললাম : 'লোকে আমাকে নিয়ে এরকম তৈরি করল আর তুমি

আমাকে কিছু বললে না।' তিনি বললেন : 'মা, এ সবে কান দিয়ো না, যে মেয়ে সুন্দরীও হয় আর তাঁর স্বামী তাকে অতীব ভালোবাসে তার সতিনরা তাকে হিংসা করে এবং লোকে নানা কথা বলে।' ঐ দিনই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিলেন কিন্তু আমি কিছুই জানলাম না। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতির পর লোকদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন :

'মুসলমানগণ ! কে এমন আছে যে, এই ব্যক্তির আক্রমণ থেকে আমার মান মর্যাদাকে রক্ষা করে, যে আমার পরিবার-পরিজনদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে লোকসমক্ষে আমাকে হেয় করার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে ? আল্লাহর কসম ! আমি না কখনো আমার পত্নীর মধ্যে মন্দ কিছু দেখেছি আর না কখনো কেউ তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেছে, সে তো আমার অনুপস্থিতিতে কখনো আমার ঘরেও আসেনি।'

হজরত আয়েশা বলেন, 'কুৎসা প্রচারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল খাজরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উবাই, আর মিসতাহ ও হামনা বিনতে জাহাশ তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। হামনার বোন জয়নব বিনতে জাহাশ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী ছিল, আর হামনা আমাকে খুবই হিংসা করত, কিন্তু জয়নবকে আল্লাহ এই অপকর্ম থেকে দূরে রাখুন, তিনি আমার বিষয়ে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই বলেননি, অথচ হামনা একে খুব বাড়িয়ে-চড়িয়ে প্রচার করেছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষণ শুনে উসাইদ বিন হুজাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসুল ! আমাদের গোত্রের কোনো লোক হলে আমি তার মুণ্ডু উড়িয়ে দিই অথবা আমাদের ভাই খাজরাজিদের মধ্যেকার কেউ হলে আদেশ করুন আমি পালনের জন্য প্রস্তুত। একথা শুনে সাইদ বিন উবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন- 'যদিও তিনি এঁর আগে বড়ই পুণ্যাত্মা ছিলেন– বলতে লাগলেন : 'আল্লাহর কসম ! তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি কখনোই তাকে মারতে পারবে না, তুমি তার মুণ্ডুপাত করার কথা এজন্যই বলছ যে, সে খাজরাজ গোত্রের লোক। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তুমি কখনোই একথা বলতে না।'

উসাইদ বিন হুজাইর পাল্টা জবাব দিলেন : 'তুমি মুনাফিক, তুমি একজন মুনাফিককে নিরাপত্তা দিচ্ছ।'

এ কথা বলার পর লোকদের মধ্যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি তা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ারও উপক্রম হলো। রসুলুল্লাহ মিম্বর থেকে নেমে এলেন। তিনি আলী ও উসামা বিন জায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। উসামা আমার বিষয়ে সুবিচার ব্যক্ত করলেন এবং বললেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমি আপনার পত্নীর মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছু দেখিনি। যা কিছু প্রচার করা হচ্ছে তার সবটাই মিথ্যা, এসব মিথ্যাচার।' হজরত

আলী বলেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আপনার স্ত্রী কম নেই, আপনি এর স্থানে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন, আর পূর্ণভাবে অবগত হতে এবং অনুসন্ধান করতে চাইলে সেবিকাকে ডেকে সবকিছু জেনে নিন। সে আপনাকে সবকিছু সাফ সাফ বলে দেবে।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেবিকাকে ডাকলেন, হজরত আলী তাকে জোর আঘাত করে বললেন : 'রসুলুল্লাহকে সত্যি কথাটা বলে দাও।'

সে বলল : 'আল্লাহর কসম ! ওর বিষয়ে আমি ভালোই জানি। আমি আয়েশার মধ্যে মন্দ কিছু দেখি না। যা আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে ত্রুটি এটাই যে, আমি আটা গুলে কোনো কাজে যাওয়ার সময় তাঁকে এর প্রতি খোঁজ রাখতে বলে যাই কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়ে, আর ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়।'

হজরত আয়েশা বলেন, 'একদিন রসুলুল্লাহ আমার কাছে এলেন। সে সময়ে আমার মাতা-পিতাও উপস্থিত ছিলেন, এক আনসারী মহিলাও ছিলেন, যিনি আমার সাথে কান্নাকাটি করছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন এবং প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি করলেন, তারপর বললেন :

'হে আয়েশা ! আমি তোমার দিক থেকে এই কথা জেনেছি তুমি আল্লাহকে ভয় করো আর যদি কোনো পাপ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো তিনি তার বান্দাদের অনুশোচনা গ্রহণ করেন।'

হজরত আয়েশা বলেন, 'যে সময়ে তিনি আমাকে এ কথা বললেন তখন আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে গেল আর চোখে এক ফোঁটা পানিও রইল না। আমি দেখতে থাকলাম আমার মাতা-পিতা কী উত্তর দেন, কিন্তু তাঁরা নীরব রইলেন।'

হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহা আনহু বলেন, 'আল্লাহর কসম ! আমি এর যোগ্য নই যে, আমার বিষয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে। কিন্তু এ বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তাআলা স্বপ্নের মাধ্যমে রসুলুল্লাহকে আমার নির্দোষিতার কথা অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। কিন্তু কুরআনের মাধ্যমে আমার নির্দোষিতার ঘোষণা ছিল আমার কল্পনারও অতীত।

অতঃপর আমি যখন দেখলাম যে, আমার মাতা-পিতা চুপচাপ বসে আছেন তখন আমি তাঁদের বললাম : 'আপনারা কি আল্লাহর রসুলের কথার কোনো জবাব দেবেন না ?' তারা দুজনে বললেন : 'আল্লাহর কসম ! আমরা উদ্বিগ্ন, কী উত্তর দেব আমরা ?' আমি বললাম : 'আল্লাহর কসম ! আমার জানা নেই যে, কোনো পরিবারে এতটা বিশ্বাসহীনতা পাওয়া যায় যতটা আবু বকরের বংশে এসে গিয়েছে।'

তিনি বলেন : 'যখন দু'জনে উদাসীনতা দেখালেন তখন আমি কেঁদে ফেললাম। আর আমি বললাম : 'আল্লাহর কসম ! আমি ঐ বস্তু থেকে কখনোই

তওবা করব না, যে বিষয়ে আপনারা চর্চা করছেন। আমি ভালো মতোই জানি, যদি এই অভিযোগ স্বীকার করে নিই– যদিও আল্লাহ জানেন যে আমি নির্দোষ তাহলে এমন কথা স্বীকার করে নেয়া হবে, যা কখনোই ঘটেনি, আর আমি যদি বলি আমি নির্দোষ তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করবে না।' হজরত আয়েশা বলেন, 'আমি হজরত ইয়াকুব আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু স্মরণ হলো না তখন আমি বললাম : 'ব্যস, আমি ঐ কথাই বলছি, যা হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা বলেছিলেন :

'এখন বৎস তুমি সন্তুষ্ট ! তুমি যা বলছ, তাতে আল্লাহই সহায়ক।' – ইউসুফ : ১৮

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও আপন স্থান ত্যাগও করেননি, সহসা অহির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাঁকে চাদর জড়িয়ে দেয়া হলো এবং তাঁর পবিত্র মস্তকটি বালিশের উপর হেলিয়ে রাখা হলো। এ দেখে আমি মোটেও উদ্বিগ্ন হইনি, কেননা আমি জানতাম যে, আমি নির্দোষ আর আল্লাহ আমার উপর জুলুম করবেন না, পরন্তু সেই সত্তার কসম, যাঁর অধীনে আয়েশার জীবন, ভয়ে আমার পিতা-মাতার এমন অবস্থা হলো যে, আমি আশঙ্কা করলাম, না জানি তাঁরা প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁদের ভয় ছিল যে, না জানি অহি অভিযোগকারীদের পক্ষে অবতীর্ণ হয়ে যায়, তারপর অহির কার্যক্রম শেষ হলো, প্রচণ্ড শীতেও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেলেন, তিনি ঘাম মুছলেন এবং এই কথা বলতে বলতে উঠে বসলেন : 'হে আয়েশা ! তোমার জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে আয়াত অবতারণ করেছেন।' আমি বললাম : 'আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ।' তারপর তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং লোকদের সামনে অভিভাষণ দিলেন এবং এই আয়াতরাজি পাঠ করে শোনালেন :

'যারা মিথ্যা কলঙ্ক রচনা করেছে, তারা তোমাদের মধ্যেকারই একটা দল। একে নিজের দিক থেকে এদের মন্দ মনে কোরো না ; বরং তোমার দিক থেকে ভালোই। তাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যা তারা অর্জন করেছে, আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মিথ্যা কলঙ্কের বড় অংশের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বড় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' –আন নূর : ১১

এ বড়ই বিচিত্র যে শরিয়তি আইনানুসারে শাস্তি তাদের দেয়া হলো, যাদের বিষয়ে 'কজফ'[১] এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে গেল। এদের মধ্যে হাসসান বিন

---

১. মিথ্যা কুৎসা রটনা। –অনুবাদক

সাবিত, মিসতাহ বিন উসামা ও হামনা বিনতে জহশ[১] শামিল ছিলেন। কিন্তু এই কলঙ্ক ও ফিতনা রটনার মূল পরিকল্পনাকারী গুপ্ত কীট আব্দুল্লাহ বিন উবাই দণ্ড থেকে বেঁচে গেল। সে তো অন্যদের ফাঁসিয়ে দিল কিন্তু তা নিজে পিঠ বাঁচিয়ে পার পেয়ে গেল।

সিরাতের পুস্তকরাজিতে ইফক-এর ঘটনা ও বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের উল্লেখ খন্দকের যুদ্ধের পর পাওয়া যায় কিন্তু আমরা ইবনে কাইয়িমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, যিনি এই যুদ্ধকে ৫ হিজরি সনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির অন্যতম বলে গণ্য করেন, কেননা, এ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত তথ্য এঁরই। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা পড়ব যে, সা'দ বিন মুআজ আহজাবের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। কেননা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের গতিবিধি সম্পর্কে এঁর কাছেই অভিযোগ করেছিলেন। অতএব, এ সম্ভব নয় যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান আবার বনু মুস্তালিকের যুদ্ধেও উপস্থিত থাকেন। তবে একথা অনুমান করে নেয়া যায় যে, এ যুদ্ধ ৬ হিজরি সনে সংঘটিত হয়েছিল।

সতেরো
আহজাবের যুদ্ধ

বিচ্ছিন্ন কুফরি শক্তিগুলোর স্থির বিশ্বাস জন্মে গেল যে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে ইসলামকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাদের কামনা তখনই পূর্ণ হতে পারে, যখন চারদিক থেকে সম্মিলিতভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ করা যাবে। আরবের ইহুদিরা এই বাস্তবিকতা সবার আগে অনুভব করল। অতএব, তারা ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনা করল এবং এমন এক বড় সেনাদল গঠন করল যারা মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের নির্মূল করে দেবে।

কয়েক ইহুদি নেতা কুরাইশদের কাছে গিয়ে তাদের যুদ্ধে প্ররোচিত করল এবং তাদের উত্তেজিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে বলল, আমরা তোমাদের পরিপূর্ণরূপে সহযোগিতা করব আর আমরা সবাই মিলে ঐ ব্যক্তিকে নির্মূল করে দেব। কুরাইশরা বিগত বর্ষ যাবৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল, যুদ্ধ তাদের করার কথা

---

১. ইনি রসুলুল্লাহর শ্যালিকা ও জয়নব রাজিয়াল্লাহু আনহা আসমার বোন ছিলেন।— অনুবাদক

ছিলই, যা তাদের কলঙ্কিত কীর্তির কলঙ্ক মোচন করতে পারে এবং তাদের ওয়াদাও পুরো করতে পারে। আর ইহুদি নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে সেই উপেক্ষিত বিষয়ে সমঝোতা চালাচ্ছিল, এ জন্য তাদের আর বিরোধ ভয় বা আশঙ্কার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

এ বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, তওরাত-এর বাহক আলিম ও ধর্মপ্রাণ (!) লোকেরা মক্কায় মূর্তিপূজকদের অত্যন্ত জোরের সাথে বলে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত এবং তাঁকে নির্মূল করাটা ঈশ্বরপ্রাপ্তির একটি সাধন হবে। কেননা, কুরাইশদের ধর্ম তাঁর ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কুফরি ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি কুরআনের শিক্ষার চেয়ে উত্তম। এ কথা শুনে কুরাইশরা খুশিতে ডগমগ করে উঠল। এভাবে সেই হিংসুক ও অত্যাচারীদের তারা ধর্মের ঠিকাদার বানিয়ে দিল। অতএব, ইহুদিরা প্রতিশ্রুতি দিল যে, তোমরা মদিনা আক্রমণ করলে আমরা তোমাদের সহযোগিতা করব।

ইহুদি নেতারা কুরাইশদের পর বনু গাতফান-এর লোকদের এবং এই সমঝোতায় নবীন ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আরো অনেক গোত্রকে শামিল করিয়ে নিল।

এভাবে ইহুদিরা ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করতে ও পৌত্তলিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে সফল হয়ে গেল। ওদিকে মুসলমানরা এই নয়া ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গেলেন এবং তাঁরা অনতিবিলম্বেই নিজেদের দেশ ও ধর্ম রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করলেন। এ নীতি ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অদ্ভুত, যার সাথে আরবরা এর আগে কখনোই পরিচিত ছিল না। তারা তো কেবল প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধের কথা জানত।

এবার মুসলমানরা মদিনার চারিদিকে খন্দক খনন করলেন, যার ফলে দু পক্ষের মধ্যে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল। সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলো। এর আগে ইসলামের বিরুদ্ধে এত বিশালসংখ্যক শত্রু আর কখনো একত্রিত হয়নি। কিনানা, তিহামা, গাতফান ও নজদ এলাকার সমস্ত গোত্র ও কুরাইশের সর্বমোট সংখ্যা হলো দশ হাজার। মুসলমানরা তাঁদের মহিলা ও শিশুদের একটি কেল্লায় সুরক্ষিত রেখে নগর সীমান্তে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লেন যে, তাদের পিঠ রইল 'সালা' পাহাড়ের দিকে। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমান করলেন যে, এত বড় বাহিনীর সাথে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করাটা সুকঠিন হবে ; তাহলে এই প্রবল সেনা-স্রোতের সামনে মুষ্টিমেয় মুসলমানের মোকাবিলা কোন পদ্ধতিতে হবে ? অতএব, এখানে এক অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বিত হলো। রেওয়ায়েতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে,

হজরত সালমান ফারসী রাজিয়াল্লাহ আনহু[১] পরিখা খনন পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাই গ্রহণ করা হয়। অনন্তর, রসুলুল্লাহ পরিখা খননের আদেশ দিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজহাতে মাটি খুঁড়লেন, হাতুড়ি-শাবল-গাঁইতি চালালেন এবং মাটি ও পাথর নিজহাতে সরালেন। এর ফলে সেই শ্রেণীর লোকেরাও কাজে হাত দিলেন, যাঁরা ইতিপূর্বে কখনোই এ কাজ করেননি। মদিনায় এ সময় বড়ই সংবেদনশীল অবস্থা বিরাজ করছিল। বংশ-বর্ণ-নির্বিশেষে আলোকিত হৃদয়ের সমস্ত মানুষ এ কাজে অংশগ্রহণ করলেন, হাতুড়ি-শাবল-গাঁইতি চালালেন, সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের বস্ত্র খুলে রেখে সে কাজ করতে করতে মাটি-বালি-পাথর-ধুলো মেখে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেলেন।

হজরত বরা বিন আজিব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক খননের সময়ে মাটি কাটতেন, যার ফলে তার পবিত্র চেহারা ধুলোমাটি মেখে একাকার হয়ে যেত এবং তার পেট ধুলোমাটির আস্তরণে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তিনি সে সময়ে এই কবিতা পাঠ করতেন :

'খোদার শপথ, আদেশ ছাড়া, পড়তাম না নামাজ কভুও।
তাঁর সুমতি না পেলে গো করতাম না দান তবুও ॥
আল্লাহ তুমি সন্তোষ আর মোদের উপর শান্তি দাও।
যুদ্ধকালে শক্তি সাহস আরো অসীম ধৈর্য দাও ॥
আমাদের পরে এসব লোকেরা করেছে বড়ই অত্যাচার।
ফিতনা-ফাসাদ কোনো কিছুই আমরা তবুও করিনি স্বীকার ॥'

এ কবিতার রচয়িতা ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন রুয়াহা রাজিয়াল্লাহু আনহু। পরিখা খননকারীরা এ কবিতার আবৃত্তি শুনে তো খুশি ও আনন্দিত হতেনই, সেই সাথে শেষ শব্দটি বারবার পাঠ করে নিজেদের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করতেন। আর আল্লাহর রসুলও তাঁদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে জোরে জোরে 'আবাইনা ' আবাইনা[২] বলতেন।

এই পদ্ধতিতে কাজ করতে আমাদের দেশের কুলি মজুরদেরও দেখা যায়। নলকূপ বসানোর সময় বা ভারি কোনো বস্তু ওঠানোর সময় কুলি মজুরদের দোহরা দিয়ে এভাবে কাজ করতে দেখা যায়।

---

১. রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম প্রিয় সাহাবি, ইনি বর্তমান ইরানের অধিবাসী দিলেন। সত্য ধর্মের সন্ধানে বেরিয়ে বহু ধর্মের সাথে পরিচয় লাভ করে সন্তুষ্ট হতে না পেরে অবশেষে রসুলুল্লাহর ধর্মে সন্দেহাতীতভাবে সত্যের সন্ধান পেয়ে তিনি এর জন্য নিজেকে নিবেদিত করেন।– অনুবাদক

২. আমরা স্বীকার করিনি, আমরা স্বীকার করিনি ; অর্থাৎ অত্যাচারীদের শত অত্যাচার সত্ত্বেও আমাদের বিভ্রান্ত করার সকল অপচেষ্টা আমরা রুখে দিয়েছি ।– অনুবাদক

মুশরিক-পৌত্তলিকদের বিজয়ের পর মুসলমানদের যে ফিতনার আশঙ্কা ছিল তা থেকে নিরাপদ থাকার ও ইসলামকে সুরক্ষার জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিরা এই সুকঠিন কাজটি করে চলেছিলেন এবং এই পথে আগত কাঠিন্য ও কষ্ট সয়ে নেয়ায় তাঁদের হৃদয় পূর্ণরূপে তুষ্ট ছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিখা খনন ও মাটি তোলার কাজে অংশগ্রহণকে আধুনিক যুগের কোনো উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সাথে তুলনা করা যায় না, যা আজকালকার নেতা, পাতি-নেতাদের একটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে।

এ যুদ্ধে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহার ও কার্যপদ্ধতি থেকে শ্রম এবং বীরত্বের একটি সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। হজরত বরা বিন আজিব রাজিয়াল্লাহু আনহু হাদিসে উল্লেখ করেন, তাঁর পেটে এমনভাবে ধুলোমাটি জমে যায় যে, তাঁর ত্বক পর্যন্ত ঢেকে যায় এবং তাঁর বুকে-পেটে প্রচুর পশম থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না (বুখারী)। তিনি তাঁর সাথিদের সাথে কর্মব্যস্ত ছিলেন। সাচ্চা বীরত্ব উপমা ও উদ্বোধন সমারোহের ধার কাছ দিয়েও যায় না।

প্রচণ্ড শীত, সেই সাথে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে চলেছিল। মদিনা তখন খরা ও দুর্ভিক্ষের একটি পর্যায় অতিক্রম করছিল, তার উপর শত্রুদের দ্বারা দীর্ঘ আবরোধের একটা বিপদ ছিল। এ ভয় ছিল না যে, এমতাবস্থায় হতাশার শিকার হয়ে তাঁরা দলে দলে নিহত হবেন ; বরং অবরুদ্ধ লোকেরা নিজেদের বাড়িঘরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে পরাজয়ের আশঙ্কা বেড়ে যায়। এই কারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথিদের বাস্তবিক শক্তিকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালালেন, যাতে তাঁদের বিশ্বাস জন্মায় যে, অবস্থায় পরিবর্তন মেঘের ছায়ার সমান, যা অনতিবিলম্বেই সরে যাবে।

এরপর ইসলাম নতুন ঢঙে তার যাত্রা শুরু করবে এবং লোকেরা এতে দলে দলে প্রবেশ করবে। জুলুম অত্যাচার-হিংসার কালো মেঘ সরে যাবে আর ষড়যন্ত্র ও ফিতনার কোনো আশঙ্কা আর থাকবে না।

রাজনীতি ও শাসনকার্যের দাবি হলো কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েও স্বপ্ন আশা জাগিয়ে রাখা।

আমর বিন আউফ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার, সালমান, হুজাইফা, নোমান রাজিয়াল্লাহু আনহু ও ছয়জন আনসারীর কাজের দায়িত্ব একসাথে দেয়া হলো, খনন ভূমির ৪০ গজের একটি টুকরা আমাদের খনন করতে দেয়া হলো, আমরা তা খনন করতে লাগলাম। এমনকি খুঁড়তে খুঁড়তে একটি সাদা পাথরের মুখোমুখি হলাম। সে পাথরে কোপ লেগে আমাদের কোদাল ভেঙে গেল, ফলে আমাদের জন্য তা খনন করা সুকঠিন হয়ে পড়ল। হজরত সালমান ফারসী এই

পাথরের খবর রসুলুল্লাহর কাছে নিয়ে গেলেন। যে পাথর আমাদের কাজ ব্যাহত করেছিল এবং কোদালগুলো অকেজো করে দিয়েছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন, হজরত সালমানের কাছ থেকে কোদাল নিলেন, তারপর পাথরটির উপর এত জোরে আঘাত করলেন যে, তার এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে গেল এবং তা থেকে আগুন ছুটে আলোর চমক দেখা গেল এবং আশপাশ আলোকিত হয়ে উঠল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ধ্বনি দিলেন এবং সমস্ত মুসলমান আবেগময় কণ্ঠে সমস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। তারপর দ্বিতীয় আঘাত দিলেন এবং সেই সাথে তৃতীয় আঘাত, এবার সে পাথর ভেঙে ধুলো হয়ে গেল।

অলৌকিক শক্তির বাহক ঐ ব্যক্তির আঘাতে কঠিন পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ঐ সময় তাঁর পবিত্র চেহারা আত্মবিশ্বাস ও সু-আকাঙ্ক্ষায় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তিনি কোদালের আঘাত ও পাথরের ঘর্ষণের মধ্যে চমৎকৃত আলোর বিষয়ে সাহাবাদের বললেন :

'আলোর প্রথম ঝলকানিতে আমার সামনে হিরা ও কিসরার মহল প্রকাশমান হয়ে উঠল ঠিক কুকুরের দাঁতের মতো, আর জিব্রাইল আমাকে বললেন যে, আমার উম্মত তাদের উপর প্রভুত্ব লাভ করবে। দ্বিতীয় ঝলকানিতে রোমের রাজপ্রাসাদ আমার সামনে বুনো শূকরের দাঁতের মতো প্রকাশমান হয়ে উঠল, আর জিব্রাইল আমাকে বললেন যে, আমার উম্মত তাদের পরাজিত করবে। তৃতীয় ঝলকানিতে আমার সামনে 'আনআ'র মহল কুবুরের কাতের মতো প্রকাশমান হয়ে উঠল, আর জিব্রাইল আমাকে বললেন যে, আমার উম্মত তাদের উপর অধিকার লাভ করবে– তোমরা প্রসন্ন হও। অতএব, মুসলমানরা প্রসন্ন হলেন এবং বলে উঠলেন সমস্ত 'প্রশংসা আল্লাহর' এ মহান প্রতিশ্রুতি সত্য বলে প্রমাণ হবে।' –ইবনে জরীর

ইসলামের সমস্ত শত্রু শক্তি যখন মদিনার চারপাশে এসে একত্রিত হয়ে গেল এবং তাদের চাপ বাড়ল তখন মুসলমানদের মধ্যে কোনো শঙ্কা ও উদ্বেগ দেখা গেল না, তাঁরা এই প্রতিকূল বাতাবরণ সয়ে নিলেন এবং ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধলেন :

'আর যখন ঈমানদাররা সৈন্যদের দেখল তখন বলে উঠল : এ সেই বস্তু, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রসুল আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল সত্য বলেছিলেন। এ তাদের ঈমান ও আত্মসমর্থনকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।' –আল আহজাব : ২২

পরন্তু, যাদের অন্তর দুর্বল ছিল, যারা শ্রম ও শঙ্কার মধ্যে পড়ে ছিল আর যাদের অন্তরে মুনাফেকির রোগ ছিল তারা বিজয়ের প্রশ্নে উপহাস করতে শুরু করল এবং তারা একে ধোঁকা বলে মনে করল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলল যে, এই ব্যক্তি তোমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি ইয়াসরিব

থেকে হিরা ও কিসরার প্রসাদ দেখছেন আর তোমাদের অবস্থা যে তোমরা পরিখা খননে বাধ্য হয়েছ আর এর বাইরে যাওয়ার সাহসও তোমাদের প্রাণে নেই :

'স্মরণ করো, যখন মুশরিক ও সেই লোকেরা, যাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা বলতে লাগল : আল্লাহ ও তাঁর রসুল আমাদের প্রতিশ্রুতি দেননি, ধোঁকা দিয়েছিলেন।' – আল আহজাব : ১২

আহজাবের যুদ্ধ, হানাহানি ও ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ ছিল না ; বরং এ ছিল মানসিক যুদ্ধ। দু পক্ষেরই নিহতরা ছিলেন বিশিষ্ট জন, তা সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাসে এ ছিল একটি ভাগ্য নির্ধারক ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। কেননা, এ মহান বার্তার পরিণাম ঐ ব্যক্তির পরিণামের সমকক্ষ ছিল, যা কোনো পর্বতের চূড়া অতিক্রম করছিল অথবা কোনো রশি ধরে এগিয়ে চলেছিল, এমতাবস্থায় তার যদি সামান্যতমও পদস্খলন হতো অথবা তার আপন স্থান এবং অবস্থান দুর্বল হয়ে যেত তাহলে সেই উচ্চতা থেকে গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যেত এবং তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত এবং তার হাড়-মাংস একাকার হয়ে যেত।

মুসলমানদের অবস্থা ঐ সময়ে ছিল একটি নির্জন দ্বীপের মতো, যাঁদের চারপাশে ঝড়তুফান চলছিল এবং যে কোনো মুহূর্তে তাঁদের সলিল সমাধি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মুশরিক-পৌত্তলিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে রোষ-ক্রোধ ও হিংসায় মত্ত হয়ে হিংস্র জীবজন্তুদের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যাতে তারা কোথাও কোনো দুর্বল মোর্চা দেখতে পায় এবং তাদের ভিতর দিয়ে মদিনায় প্রবেশ করে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে নিজেদের ঘৃণা ও ক্রোধের আগুন প্রশমিত করতে পারে।

মুসলমানরা জানতেন যে, এই অবরোধের পিছনে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। অতএব, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন এবং প্রতিটি আক্রমণকারীকে তীর বর্ষণের মাধ্যমে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন। আর এই বিশাল বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবেন তা সত্ত্বেও তাঁদের অবস্থা বড়ই উদ্বেগজনক ছিল। যেমনটি কুরআনে চিত্রিত হয়েছে :

'যখন তারা তোমাদের উপরের ও নিচের দিক থেকে ধেয়ে এল এবং চোখ রাঙাতে লাগল এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হলো এবং তোমরা দফায় দফায় আল্লাহর বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলে ঐ সময় ঈমানদারদের রক্ষা করা হলো এবং জোরালো আঘাত চালানো হলো।' –আল আহজাব : ১০-১১

কুরাইশ অশ্বারোহীরা এভাবে নিরন্তর অবরোধ ও শিবির গড়ে রাখাটা পছন্দ করল না, কেননা, অবরুদ্ধ রেখে তার পরিণামের প্রতীক্ষায় থাকাটা ছিল তাদের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ। অনন্তর, আমর বিন আব্দে বুদ্দা, ইকরিমা বিন আবু জেহেল ও জিরার বিন খাত্তাব মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মোকাবিলায় বেরিয়ে এল। অগ্রসর হয়ে পরিখার কিনারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বলল, 'আল্লাহর কসম ! এই যুদ্ধ বিধি আরবরা এর আগে আর কখনোই অবলম্বন করেনি।'

এই স্থানে পরিখা চওড়ায় কিছুটা কম ছিল, তারা সেখান থেকে পার হয়ে অপর পারে এসে লড়াইয়ের জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করল। মুসলমানরা বিপদ দেখে অগ্রসর হয়ে তাদের রুখে দিলেন। এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হজরত আলী।

হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু আমর বিন আব্দে বুদ্দাকে আহ্বান করে বললেন : 'ওরে আমর ! তুমি আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিলে যদি কোনো কুরাইশী দুটি বস্তুর জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানায় তাহলে তুমি এ দুয়ের মধ্যেকার একটিকে অবশ্যই স্বীকার করে নেবে।'

আমর বলল : 'আমি তোমাকে আল্লাহ, তাঁর রসুল ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু : 'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ।'

আমর : 'এর কোনো প্রয়োজন আমার নেই।'

আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু : 'তবে আমি তোমাকে যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানাচ্ছি।'

আমর : 'কিন্তু ভাইপো ! আমি তোমার সাথে লড়তে চাই না।'

আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু : 'কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই।'

এ কথা শুনে আমর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং ঘোড়া থেকে নেমে এল। অগ্রসর হয়ে হজরত আলীর উপর আক্রমণ হানল, যা তিনি ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর মস্তকে আঘাত লাগল। হজরত আলী মুহূর্তেই তার উপর আক্রমণ হেনে সে দুষ্টের কাম তামাম করে দিলেন। অন্য মুশরিক-পৌত্তলিকরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

শিশুরা ছাদের উপর থেকে জিহাদের দৃশ্য দেখছিল আর ইসলামী বাহিনীর চালচলন প্রত্যক্ষ করছিল। হজরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরিখার যুদ্ধের সময় আমি মহিলা ও শিশুদের সাথে কেল্লায় অবস্থান করছিলাম আর আমার সাথে আমর বিন আবু সালমাও ছিলেন। আমি তাঁর পিঠে চড়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখতাম। তিনি বলেন, আমি সহসা আমার পিতাকে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে দেখলাম। যখন সন্ধ্যা হলো এবং আমাদের কাছে এলেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'আব্বাজি। আজ আপনি ছোটাছুটি করে কী করছিলেন ?' তিনি বললেন : 'বৎস ! তুমি আমাকে দেখেছিলে ?' আমি বললাম : 'হ্যাঁ।' হজরত জুবাইর অত্যন্ত গর্বের সাথে বললেন : 'আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন।'

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে বনু কুরাইজাদের দিক থেকে খবর এল যে, তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে এবং সংযুক্ত বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছে।

এর বিবরণ এই যে, বনু নজিরের নেতা হুই বিন আখতাব, কুরাইশ ও সমগ্র আরবকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তাদের এক প্রাণঘাতী যুদ্ধ দাঁড় করিয়ে দেয়, এ যুদ্ধ ছিল বড়ই উপদ্রবি। এই ব্যক্তি বনু কুরাইজার নেতা কা'ব এর কাছে এল। কা'ব সেনাদলের আগমনের কারণে নিজেদের দুর্গদ্বার বন্ধ এবং দুর্গের পথে পাহারা বসিয়ে দিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের সাথে প্রতিজ্ঞা পুরো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হুই বিন আখতাব দরজায় দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু কা'ব দ্বার খুললেন না।

হুই : 'ওরে মুখপোড়া, দরজাটা তো খোল।'

কা'ব : 'আরে তুই তো বদমাইশ লোক। আমি মুহাম্মদ এর সাথে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর তা পুরো করব, কেননা, আমরা মুহাম্মদের মধ্যে সততা ও প্রতিজ্ঞানিষ্ঠার অতিরিক্ত কিছু দেখিনি।'

হুই : 'ওরে মুখপোড়া, দরজাটা তো খুলবি !'

কা'ব : 'এ কখনোই হতে পারে না।'

হুই : 'ও বুঝেছি, তোর পাতে ভাগ বসবে বলে তুই দরজা খুলছিস না।'

এ কথা কা'বের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিল, ফলে তিনি দরজা খুলে দিলেন। হুই ভিতরে প্রবেশ করেই বলল, 'ওরে মুখপোড়া, আমি তোর জন্য সুসংবাদ বয়ে এনেছি।'

কা'ব : 'তা কী ?'

হুই : 'আমি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এসেছি। তারা দুমা ও গাতফানদের সৈন্যদের ওখানে রয়েছেন। তারা আমাকে কথা দিয়েছেন মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদের বিনাশ না করে ফিরে যাবেন না।'

কা'ব : 'আল্লাহর কসম ! তুই আমাদের জন্য অমর্যাদা ও অপমানের বার্তা বয়ে এনেছিস। তারা হচ্ছে সেই মেঘের সমান, যারা গর্জায় কিন্তু বর্ষায় না। তুই আমাকে আমার আস্তানায় থাকতে দে। আমি মুহাম্মদের মধ্যে সততা ও প্রতিজ্ঞানিষ্ঠার বাইরে কিছুই দেখিনি।'

অন্য লোকেরা এ সংলাপের মধ্যে অংশগ্রহণ করে বলল, এখন আর মুহাম্মদের সন্ধান করে লাভ নেই, যেমনটি সমঝোতার মধ্যে আছে, তো তাকে তাদের শত্রুদের নির্মূল করতে দাও।

পরন্তু, হুই বিন আখতাব তার দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত ইহুদিকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছিল আর এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার বিষয়টি বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছিল। পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধে তাদের শামিল করতে চাচ্ছিল আর যারা মুসলমানদের সমূলে বিনাশ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধেয়ে এসেছিল। এ দুই ব্যক্তি এই জালিমানা পদ্ধতির বিষয়ে বার্তালাপ করতে থাকল, অবশেষে বনু কুরাইজা সেই সন্ধিপত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে

ফেলল, যাতে তাদের সন্ধির কথা লেখা ছিল। যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের লোকদের বনু কুরাইজাদের আহ্বান সম্পর্কে জানার জন্য পাঠালেন তখন তারা বলল : 'কিসের সন্ধি', কেমন সন্ধি ? আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই বা কে ? তাঁর সাথে আমাদের কোনো সন্ধি নেই।'

হজরত সা'দ বিন মুআজ তাদের সন্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা তাকে উপহাস করল এবং ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা বলতে লাগল। তারা প্রথমে সন্ধির শর্তাবলি এজন্যই পালন করেছিল যে সন্ধি ভঙ্গের কারণে তাদের দুঃখজনক পরিণামের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু যখন তাদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে মুসলমানরা চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে আছে, অতএব, এখন আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতাকে ধরা হবে না, তখন তারা তা ভঙ্গ করে বসল এবং সম্মিলিত আক্রমণকারীদের পক্ষাবলম্বন করল।

যখন মুসলিম বার্তাবাহক এই দুঃখজনক বার্তা নিয়ে ফিরে এলেন তখন মুসলমানরা বড়ই মর্মাহত হলেন। অতএব, তাঁদের মনে ইহুদিদের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও ক্ষোভ জমা হলো, এমনকি তারা মূর্তিপূজকদের চেয়ে অধিক নিন্দিত, ধিকৃত ও হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে প্রতীত হলো এবং তারা নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, এই বিপত্তির মূলেই রয়েছে বনি ইসরাইলের লোকেরা এবং এই ফায়সালার মূল হোতা তারাই। তারা জানতেন যে, এই নির্ণয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো, এই উম্মত ও তাদের দ্বীনকে দুনিয়ার বুক থেকে একেবারেই নির্মূল করে দেয়া আর তাদের ঐ লোকদের হাতে তুলে দেয়া যারা তাদের পুরুষদের হত্যা করে এবং মহিলাদের দাসী ও শিশুদের শ্রমিক বানিয়ে বাজারগুলোতে বিক্রি করে দেবে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বনু কুরাইজার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের খবর পেলেন তখন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন, তা দেখে লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তারপর তাঁর উপর আশা ও বিজয়ের রুহ জাগ্রত হয়ে উঠল এবং তিনি উঠতে উঠতে বললেন, 'মুসলমানগণ ! আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের শুভ সংবাদ।'

তিনি ভাবলেন, মদিনার উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ দিয়ে কিছু গোত্রের সাথে সন্ধি করে নেয়া যাক, যাতে এরা পৌত্তলিক বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং মুসলমানরা অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তিনি বনু গাতফানের নেতৃবৃন্দের সাথে বার্তালাপ করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আউস ও খাজরাজ-এর নেতৃবৃন্দ তা সহ্য করতে পারলেন না এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহানুভূতি ও তাঁর উপকারের কথা স্মরণ করে নিবেদন করলেন : আল্লাহর কসম ! সহায়-সম্পদের কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের তরবারি এর নির্ণয় করে দেবে। এভাবে অবরোধ প্রলম্বিত হলো।

মূসা বিন উকবা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন : 'পৌত্তলিকরা মুসলমানদের প্রতি অবরোধ এত কঠিন করে দিল, যেন তারা কেল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন। প্রায় কুড়ি রাত অবধি অবরোধ চলল। এমনকি এটা অনুভব করা কঠিন হয়ে পড়ল যে, তারা নগর অধিকার করে নিয়েছে কি না। মূসা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'পৌত্তলিকদের একটি দল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাস-ভবনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। অতএব মুসলমানরা তাদের সাথে রাতভর যুদ্ধ করলেন। তারপর যখন আসরের সময় হলো তখন একটি সেনাদল তাঁর বাসভবনের অতি নিকটে এসে পড়ল ফলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথিরা ঠিক মতো নামাজও পড়ে নিতে পারলেন না।'

পৌত্তলিকদের এই দল অনেক রাত পর্যন্ত লড়াই করল। অনন্তর লোকদের বর্ণনা যে, তিনি বলেন : 'তারা আমাদের আসরের নামাজও পড়তে দিল না। আল্লাহ তাআলা যেন তাদের পেট ও অন্তরকে আগুন দিয়ে ভরে দেন।'[১]

পরীক্ষা যখন কঠোর হয়ে উঠল তখন বহুসংখ্যক লোকের মন পীড়াগ্রস্ত হয়ে উঠল এবং নানা রকমের কথাবার্তা বলতে লাগল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো ব্যাপারটি বুঝে নিলেন এবং তাদের সাহস বাড়ানোর জন্য তিনি তাদের শুভ সংবাদ শোনাতে লাগলেন :

'সেই সত্তার শপথ, যাঁর অধীনে আমার জীবন, যে কষ্ট তোমরা সয়ে চলেছ, অবশ্যই তার অবসান হবে। আমার আশা যে, পূর্ণ শান্তির সাথে আমি কাবা পরিক্রমা করব। আল্লাহ কাবার চাবি আমাদের হাতে তুলে দেবেন। কায়সার ও কিসরাকে ধ্বংস করবেন আর আমরা তাদের রাজকোষ আল্লাহর পথে ব্যয় করব।'

সুদৃঢ় এবং সাচ্চা ঈমানদারদের উপর মোকাবিলার বোঝা এসে পড়ে, তাদের দায়িত্ব ছিল শোক, সন্তাপ এবং উদ্বেগ সঞ্চারকারী সমস্ত কিছুকে দাবিয়ে রাখা এবং অশিষ্ট ও দুস্কৃতকারীদের উপর অধিকার লাভ করা এবং ভয় ও অশিষ্টতার লক্ষণগুলোকে নির্মূল করে দিয়ে বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রবাহ সঞ্চার করা। সাধারণত ঘোর পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ধ্যান-ধারণা ও স্বভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

কিছু লোক তিরস্কৃত ও গুরুত্বহীন হয়ে যায় এবং অতি শীঘ্রই তারা পদস্খলিত হয়ে যায়, যেমনটি পানির প্রবাহের সাথে তৃণখণ্ড ভেসে যায়।

---

১. বুখারী, মুসলিম।

কিছু লোক কঠোর হয়ে যায়, অতএব, যখন কোনো ঝড়ঝঞ্ঝা আসে তখন তাদের উপড়ে নিয়ে যায় বা তাদের স্থিরতা সুদৃঢ় থাকতে পারে না।

কিছু লোক এমনও হয়, যারা কষ্ট, কাঠিন্য ও বিপত্তি আসার আগেই তাদের গলায় পা দিয়ে দাবিয়ে দেয় এবং তাদের কণ্ঠে এই শব্দ উচ্চারিত হয় :

'যে জীবন আমি অতীতে ফেলে এসেছি, আমার এর চেয়ে উত্তম জীবন আর কী হতে পারে যে, আমি সর্বদাই অগ্রবর্তী হই।'

কিছু লোক এমনও হয় যে, ভয় এবং বিপত্তির সময়ে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং তারা গড়িমসি করে ছুটে পালিয়ে যায়। যখনই জীবনের দাবি ও স্থায়ী প্রেম তাদের নিজের দিকে আহ্বান করে এবং মোকাবিলার জন্য তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় তখন তারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

আহজাবের যুদ্ধের অবসরে এই কাপুরুষ ও ভীতত্রস্ত দলটি যে আচরণ করে পবিত্র কুরআনে তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে :

'(হে নবী !) বলো : যদি তোমরা মৃত্যু ও হত্যা থেকে পালিয়ে যাও তাহলে এ পলায়ন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না আর এরপরও জীবনের সুখ অতি অল্পই ভোগ করতে পারবে।

বলো : কে আছে যে তোমাদের আল্লাহর কবল থেকে বাঁচাতে পারে যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান, অথবা তোমাদের সাথে অনুগ্রহের ইচ্ছা করেন (তাহলে কে তা রুখতে পারে) এরা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রক্ষাকর্তা বন্ধু এবং সাহায্যকারী পেতে পারে না।' – আল-আহজাব : ১৬-১৭

যখন কুরাইশরা পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করল এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে আক্রমণ করতে চাইল এবং দুর্বল দল দেখে যেখান থেকে মদিনা নগরে আক্রমণ করতে চাইল তখন এই সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুসলমানরা প্রাণ হাতে নিয়ে তাদের মোকাবিলা করলেন, যাতে শত্রুরা বুঝতে পারে যে, অগ্রসর হওয়াটা বড়ই বিপজ্জনক।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মুমিন জননী হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা আহজাবের যুদ্ধের সময় বনু হারিসার কেল্লায় অবস্থান করছিলেন। এটি ছিল মদিনায় সবচেয়ে মজবুত ও সুরক্ষিত কেল্লা। সেই সময়ে তাঁর সাথে সা'দ বিন মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহু -এর মাও ছিলেন। হজরত আয়েশা বলেন, এ পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। সাদ ওদিক থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি অত্যন্ত আঁটো-সাঁটো কবচ পরিহিত ছিলেন, যা থেকে তার হাত বেরিয়ে ছিল এবং হাতে বর্শা নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন আর এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন :

সা'দানা[১] তনয় হমল এসে থামল সে যে কিছুক্ষণ।
যুদ্ধদৃশ্য কেমন লাগে দেখতে চাইল তার মন ॥
মরণ সময় আসল যখন সম্মুখে তার দুহাত তুলে।
কী দ্বিধা তার মৃত্যুকে যে করতে জানে আলিঙ্গন ॥'

তাঁর মা তাঁকে উদ্দীপ্ত করতে বললেন : 'বৎস ! তাড়াতাড়ি করো, তুমি পিছিয়ে পড়ছ।'

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা তাঁর মাকে বললেন : 'সাদ জননী ! কত না ভালো হতো যদি সাদের কবচখানি চওড়া হতো। আমার ভয় হয় যদি তীর লাগে তাহলে ক্ষত খুব গভীর হবে।' তারপর এ যুদ্ধে সাদ বিন মুআজের পায়ে এমনভাবে তীর লাগল যে, তাঁর পায়ের শিরা কেটে গেল।

অনুমান হয়, হজরত সা'দ রাজিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষত অনেক গভীর ছিল, সা'দ মৃত্যুকে ডরাতেন না পরন্তু তাঁর জিহাদের আকাঙ্ক্ষা ঐ সময় পর্যন্ত জাগ্রত ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলাম প্রভুত্বশালী ও সুদৃঢ় হয় এবং শত্রুরা পরাজিত না হয়। অনন্তর, তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন :

'প্রভু ! তুমি যদি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ বাকি রাখো তাহলে তার জন্য আমাকেও বাকি রাখো। কেননা, আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো বস্তু নেই যে, আমি ঐ জাতির সাথে জিহাদ করি, যারা তোমার রসুলকে কষ্ট দিয়েছে, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং পবিত্র হরম থেকে বহিষ্কৃত করেছে। হে আল্লাহ ! যদি তুমি আমাদের আর তাদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে দাও তাহলে এই ক্ষতকে তুমি শাহাদতের সাধন বানিয়ে দাও, আর ঐ সময় পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না, যতদিন না বনু কুরাইজার, কুখ্যাতি ও অপমান দেখে আমার চক্ষুদ্বয় শীতল না হয়।'

হজরত সা'দ রাজিয়াল্লাহু আনহুর দুআর অন্তিম ছত্রটি ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের বিরুদ্ধে সেই ক্রোধকে প্রকট করে, যে আগুন মুসলিমদের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছিল।

প্রতিজ্ঞা ও সন্ধির বিষয়ে বনি ইসরাইলের ইতিহাস বলে যে এরা ধৃষ্টতা ও বেঈমানি থেকে কখনোই বিরত হয়নি আর প্রতিজ্ঞানিষ্ঠ, থেকে থাকলেও তা কেবল ঐ সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ তাদের হিত, স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের সাধন হতো কিন্তু তারা যখনই কোনো অবস্থায় নিজেদের হিতের বিপরীত দেখেছে তখনই তারা তাকে খেজুর বিচির ন্যায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। গাধা চিৎকার ছাড়তে পারে, সাপ

---

১. হমল তনয় সা'দানা তনয় হারিসা তনয় মোকিল তনয় আলিম তনয় জিনাব আল কালবী বোঝানো হয়েছে।

দংশন ত্যাগ করতে পারে কিন্তু ইহুদি বিশ্বাসঘাতকতা ত্যাগ করতে পারে না। কুরআন ইহুদিদের এই ঘৃণিত ও নিন্দিত প্রবৃত্তি থেকে সাবধান করে দিয়েছে এবং বলেছে যে, তাদের স্বভাব তাদের পশুরও অধম করে দিয়েছে :

'নিশ্চয়ই এ ভূমিতে চলাচলকারী সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট জীব আল্লাহর দৃষ্টিতে তারাই যারা কুফরি করেছে, তারপর ঈমান না এনেছে, যাদের সাথে তুমি সন্ধি করেছ, তারপরও তারা প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ভীত হয় না।' – আনফাল : ৫৫-৫৬

হজরত সা'দ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে মসজিদের শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হলো, যাতে কোনো দক্ষ সেবিকা তাঁর পরিচর্যা করতে পারেন।

মুসলমানরা রসুলুল্লাহর কাছে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আপনি কি কিছু বলবেন ! এখন তো প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

তিনি বললেন : 'হে আল্লাহ ! আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন করে নাও, আর আমাদের ভয় দূর করে দাও।'

আব্দুল্লাহ বিন আউফ রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রার্থনা করলেন : 'হে আল্লাহ ! হে কিতাব অবতারণকারী !! হে শীঘ্রই হিসাবহরণকারী !!! এই শত্রুদের তুমি পরাজিত করো। হে আল্লাহ ! তুমি ওদের ব্যর্থ করে দাও !! আর এদের মোকাবিলায় আমাদের বিজয়ী করে দাও !!!' –বুখারী, মুসলিম

'আল্লাহ কোনো অলস এবং অকর্মণ্য ব্যক্তির প্রার্থনা শোনেন না ; বরং সেই প্রাণপাতকারী ও সপ্রচেষ্ট ব্যক্তির প্রার্থনাকে স্বীকৃতি দেন, যে বলে আমার প্রচেষ্টায় বরকত দান করো।' অথবা কোন ধৈর্যশীল ও দৃঢ়পদ ব্যক্তির কথা শোনেন, যে বলে, 'হে আল্লাহ ! আমার প্রচেষ্টাকে সার্থক করে দাও।'

মুসলমানরা ইসলামী বার্তা ও নিজেদের দেশকে রক্ষার জন্য নিজেদের দাবি মতো সবকিছু করেছিলেন। এখন তো অবস্থা এটাই ছিল যে, আল্লাহর অনুগ্রহ নেমে এল এবং উৎপীড়িতেরা সাহায্য লাভ করলেন।

এই কারণে যুদ্ধের পাশা কি এমনভাবে উল্টে যেতে লাগল যে, এর বাস্তবিকতার অনুমান মানুষের কল্পনারও অতীত :

'আর তোমাদের প্রভুর সৈন্যদের শুধুমাত্র তোমাদের প্রভুই জানেন। আর এ তো মানুষের জন্য নিদর্শনস্বরূপ।' – মুদাসসির : ৩১

বেদুইনরা এই অঞ্চলে বড়ই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তারা মদিনার আশপাশে যুদ্ধের জন্য শিবির পেতেছিল। যার আদি অন্ত দুয়ের সাথেই তারা অপরিচিত ছিল। পরন্তু, এরা এজন্যই আসেনি যে, দুরতিক্রম্য পরিখার সামনে গোলমাল আর দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাবে অথবা এই পর্বতগুলোর সামনে,

যেখানে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে ছিলেন এবং তাদের মোকাবিলা না করেই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাচ্ছিল।

অন্তরীক্ষের বাতাবরণ সহসা বদলে গেল আর প্রবল বেগে ঝড় বইতে লাগল। যার ফলে শত্রুদের তাঁবুর দড়িগুলো ছিন্নভিন্ন একাকার হয়ে যেতে লাগল, তাঁবু উড়ে গেল, হাঁড়িপাতিল উলটে গেল। ধুলোবালি উড়ে এসে চোখ-মুখ অন্ধকার করে দিতে লাগল এবং শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়ল।

এই শপথধারী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পৌত্তলিকদের সম্পর্ক স্থায়ী এবং দৃঢ় ছিল না। কেননা, গাতফান ও নজদের গোত্রগুলো লুটতরাজের প্রতি অধিক আকর্ষণ অনুভব করত। যখন তাদের সাথে মদিনায় উৎপাদিত ফসলাদির ভাগীদার বসানোর কথা বলা হলো তখন তারা সাথে সাথে প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু যখন মুসলমানরা তাদের ভাগীদার করে নিতে আপত্তি করল তখন তারা যে বন থেকে এসেছিল সেই বনেই ফিরে গেল।

আর বনু কুরাইজা কী করল ?

তারা সন্ধি ভঙ্গ করল। আর শত্রুদল এই আশায় পৃথক হয়ে রইল যে, স্বয়ং আরবরা নিজেরাই আক্রমণ করবে।

এক ইহুদি মুসলমানদের কোনো এক কেল্লার আশপাশে ঘুরঘুর করছিল। সফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব তাকে দেখতে পেয়ে তার কাম তামাম করে দিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা ইনি ছিলেন মহাবীর হামজা রাজিয়াল্লাহু আনহুর বোন। আবু সুফিয়ান চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কিন্তু আশ্রয়যোগ্য স্থান তার নজরে পড়ল না। সে ভীতত্রস্ত হয়ে উঠল। যদিও কুরাইশ সেনাদল সেখানে মজুদ ছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌত্তলিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ প্রকীর্ণতার কথা ভালোরকম জানতেন। সে জন্য তিনি তাদের মধ্যকার দূরত্ব আরো স্পষ্ট করে বাড়িয়ে দিতে চাইলেন এবং তাকে নিজের হিতের জন্য প্রয়োগ করতে চাইলেন। অতএব, ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী প্রখ্যাত নেতা নইম বিন মাসউদকে রসুলুল্লাহ তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতে বললেন এবং তাঁকে পৌত্তলিকদের ঐক্য বিনাশ করার কাজে নিয়োগ করলেন এবং বলে পাঠালেন :

'আমাদের দৃষ্টিতে তুমি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যদি তুমি কোনো উপায় বের করতে পারো তাহলে অবশ্যই তা কোরো । কেননা, যুদ্ধের আরেক নাম ছলনা বা কৌশল।'

হজরত নইম তাঁর অভিযানে অবতীর্ণ হয়ে সবার আগে বনু কুরাইজার কাছে গেলেন, যাদের সাথে ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই তাঁর সখ্য ছিল। তাদের বোঝালেন।

নইম : 'তুমি তো জানো যে, আমাদের সাথে তোমাদের কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।'

বনু কুরাইজা : 'তুমি ঠিক বলছ, আমরা তোমাদের মধ্যে দোষের কিছু দেখিনি।'

নইম : 'তোমাদের অবস্থান কুরাইশ ও গাতফানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই নগর তোমাদের, আর এখানে তোমাদের সম্পত্তি রয়েছে, তোমাদের পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, সন্তান সবাই এখানে থাকে, তোমরা এদের আর কোথাও পাঠাতে পারো না। কুরাইশ ও গাতফানরা মুহাম্মদ[১] ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, আর তোমরা তাদের সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছ। তাদের নগর, তাদের সম্পত্তি, তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীরা অন্য কোথাও রয়েছে। তোমাদের ও তাদের অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তারা সুযোগ পেলে তা লুফে নেবে এবং নিজেদের নগরে ফিরে যাবে এবং তোমাদের লোকদের দয়ার দৃষ্টির উপর ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, তখন তোমরা এদের মোকাবিলা করার শক্তি ও সাহস নিজেদের মধ্যে আর পাবে না। অতএব, তোমরা শান্ত থাকো আর কুরাইশদের বলো যে, তারা যেন তোমাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে চলে না যায়; বরং তাদের কিছু লোক য়ারগামালরূপে তোমাদের কাছে (জামানত স্বরূপ) রেখে যাক।'

বনু কুরাইজা : 'তোমার কথা খুবই যুক্তিসঙ্গত আর তোমার পরামর্শ একেবারেই ঠিক!'

তারপর, নইম রাজিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশদের কাছে এলেন এবং আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের বললেন :

'আপনার সাথে আমার মিত্রতা ও মুহাম্মদের সাথে শত্রুতার কথা তো সর্বজনবিদিত। আমি এক শুভ চিন্তকের রূপে আপনার কাছে একটি কথা বলতে এসেছি, যা আমি এইমাত্র জানতে পারলাম। কিন্তু আপনারা তা একেবারেই গোপন রাখবেন।'

কুরাইশ : 'ঠিক আছে, আমরা অবশ্যই গোপন রাখব, আপনি বলুন।'

নইম : 'ইহুদিরা নিজেদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বেশ লজ্জায় পড়ে গেছে। তারা মুহাম্মদকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা তাদের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত। আপনি চাইলে আমরা কুরাইশ ও বনু গাতফানদের কয়েকজন লোককে আপনার হাতে তুলে দিই আর আপনি তাদের মুণ্ডু উড়িয়ে দেবেন। মুসলমানরা রাজি হয়ে গেছে। অতএব, তারা যদি আপনাদের একটা লোককেও বন্দি বা জামানতরূপে রাখার কথা বলে, তাহলে আপনারা মোটেও রাজি হবেন না।'

---

১. অবশ্যই, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করতে হবে। – অনুবাদক

এরপর তিনি ঝহিলা গাতফানের কাছে গেলেন আর তাদের বোঝালেন, তোমরা আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং সংসারে সবার চেয়ে প্রিয়জন, তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোনো দোষারোপও করতে পারবে না। নইম বললেন : 'আমার কথা গোপন রেখো, ওরা মেনে নিয়েছে।' তারপর তিনি তাদের সাথে সেই কথা বললেন, যা কুরাইশদের সাথে বলেছিলেন, এবং তাদেরও যথারীতি সচেতন করে দিলেন।

৫ হিজরি সনের শাওয়াল মাসের সেই প্রতীক্ষিত শনিবারের রাত। আবু সুফিয়ান ও বনু গাতফানের নেতারা ইকরিমা বিন আবু জেহেলকে কয়েকজন কুরাইশ ও গাতফানী সওয়ারকে এই বলে পাঠালেন যে, আমরা এখানে পড়ে নাজেহাল হয়ে পড়েছি। অতএব আগামীকাল মুহাম্মদের উপরে আক্রমণ করার ইচ্ছা রয়েছে, তোমরাও প্রস্তুত হয়ে যাও। তারা উত্তর দিল যে, আগামীকাল শনিবার, আর ঐদিন আমরা কোনো কাজ করি না, আমাদের মধ্যে যে-ই এমনটি কাজ করেছে, সে তা নিজেই ভুগেছে। দ্বিতীয়ত আমরা মুহাম্মদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কিছু লোককে য়ারগামালরূপে আমাদের কাছে না পাঠাবে, যাতে আমাদের ভরসা থাকে। আমাদের শঙ্কা যে যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়েছে আর তোমরা জয়লাভ করতে না পারলে নিজেদের নগরের দিকে পালিয়ে যাবে, আর আমাদের একাই এই ব্যক্তির মোকাবিলা করতে হবে, যে সাহস আমাদের নেই।

যখন বার্তাবাহক বনু কুরাইজার উত্তর নিয়ে ফিরে এল তখন কুরাইশ ও গাতফান পরস্পরে বলাবলি করল যে, নইম বিন মাসউদ যা বলেছিলেন, তা তো এক্কেবারেই ঠিক। অতএব তারা বনু কুরাইজার কাছে খবর পাঠাল– 'আল্লাহর কসম ! আমরা আমাদের একজন লোককেও তোমাদের হাতে তুলে দেব না, যদি তোমরা লড়তে চাও তাহলে বেরিয়ে এসো।' যখন বার্তাবাহক ফিরে এসে একথা জানাল তখন বনু কুরাইজা বলল : 'নইম তো ঠিক বলেছিলেন, এরা যুদ্ধ করতে চায় না, এরা সুযোগ বুঝে ফায়দা লুটবে তারপর তারা নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।

এভাবে পৌত্তলিকদের ঐক্য বিনাশে মুসলমানরা সাফল্য লাভ করলেন। তারপর অবরোধ তখনো তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়নি, শত্রুসৈন্যদের মধ্যে হতাশা ও বিশ্বাসহীনতা ছড়িয়ে পড়ল। অথচ এদিকে মুসলমানদের বাহিনী সম্পূর্ণ নিরাপদ ও দৃঢ়পদ রইল, তাদের মধ্যে বীরত্ব, উদ্যম ও সাহসে ভাটা পড়ল না।

তারপর বরফের মতো ঠাণ্ডা এক প্রচণ্ড শীতের রাত এল। লোকেরা শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। তারা সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আপনাপন তাঁবুগুলোর মধ্যে গুটিশুটি মেরে বসেছিল। আর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা ছুটে এসে আশ্রয় খুঁজছিল। অবশেষে শত্রুরা এই অসফল যুদ্ধের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে চিন্তা

করতে লাগল। মনে হয় এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে প্রবাহিত শীতল বাতাস প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর চাবুকের মতো ধেয়ে আসছিল। এর কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীরা দিশেহারা হয়ে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার সৈন্যদের নিরীক্ষা করলেন। তাঁর সাহাবিরা নিজ নিজ স্থানে বড়ই সতর্ক ছিলেন। অলৌকিক সাহায্যের আশায় তাঁদের দৃষ্টি বার বার আকাশের প্রতি নিবদ্ধ হচ্ছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সবকিছু জমে যাচ্ছিল। সেই সাথে ঘন অন্ধকার সাক্ষাৎ যমদূতরূপে প্রচণ্ড ভয়ের সঞ্চার করছিল।

হজরত হুজাইফা বিন ইয়ামান রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা আজহাবের রাতে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হয়ে আপনাপন মোর্চায় বসেছিলাম, আর আবু সুফিয়ান আমাদের উপরের দিকে ছিল আর বনু কুরাইজা ছিল আমাদের থেকে নিচের দিকে। এদের দিক থেকে আমাদের শিশুদের জন্য প্রবল একটা আশঙ্কা ছিল। এর চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত আর কখনো আসেনি। অন্ধকার এমন ঘোর ছিল যে, নিজের হাতটিও দেখা যাচ্ছিল না। আমার কাছে শীত নিরাময়ের জন্য কোনো বস্ত্র ছিল না, কেবল আমার স্ত্রীর একটি শাল ছিল, যা গোঁড়ালি পর্যন্ত আসত। ইতিমধ্যে রসুলুল্লাহ আমার কাছে এলেন, তখন আমি মাটিতে গুটিশুটি মেরে বসে ছিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন : কে ? আমি বললাম : হুজাইফা। জিজ্ঞাসা করলেন : হুজাইফা ? আমি আপন স্থানে আরো মিশে গেলাম এবং বসে বসেই বললাম : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসুল ! তিনি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকেই চয়ন করলেন এবং বললেন, তুমি গিয়ে খবর নিয়ে এসো যে শত্রুরা এখন কী করছে ? যদিও আমি এ কাজে সবচেয়ে অক্ষম আর দুর্বল ছিলাম, আর তিনি আমার জন্য শুভ দুআ করলেন আর আমি রওনা হলাম, সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমার মনে হচ্ছিল, আমি একটি বরফের পুকুরে সাঁতার কাটছি।'

এ ছিল ঈমানের উত্তাপ আর আদেশ পালনের ঋণ যার তাগিদে ব্যক্তি তার অগ্নিবর্ষক চিন্তাধারার দ্বারা কঠোর কঠিন বাতাবরণকেও সহ্য করে নেয়।

হুজাইফা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আমি যাত্রা শুরু করলাম, তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন,' হুজাইফা যেন কিছু ঘটিয়ো না।'

'যখন আমি সেনাদলের নিকট পৌঁছলাম তখন দেখলাম সেখানে আগুন জ্বলছে এবং একজন মোটাতাজা ও রাশভারি ধরনের লোক তার হাত দুটি আগুনের সামনে নাড়াচাড়া করছে একটু উত্তাপের জন্য এবং নিজের কোমরের উপর ফেরাচ্ছে আর বলছে, 'তোমরা যাত্রা শুরু করো। এখানে আশ্রয়ের জায়গা নেই।'

এর আগে আমি আবু সুফিয়ানের সাথে পরিচিত ছিলাম না। আমি আমার ধনুকে তীর চড়ালাম এবং চালাতে চাইলাম কিন্তু রসুলুল্লাহর আদেশের কথা মনে

আসন্তেই বিরত হলাম। যদি আমি তীর নিক্ষেপ করতাম তাহলে তার দফা রফা হয়ে যেত।

আমি দেখলাম যে, ঠাণ্ডা ও হাওয়ার তীব্রতার জন্য আগুন জ্বলতে পারছে না, হাঁড়িপাতিলগুলোও স্বস্থানে নেই এবং তাঁবুগুলোও সুরক্ষিত নেই। তারপর আবু সুফিয়ান বলল : 'কুরাইশ লোকসকল ! এ অবস্থানযোগ্য জায়গা নয়। আমাদের পশুগুলো মারা পড়েছে, বনু কুরাইজা সহযোগিতা করল না এবং তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। বাতাসের তীব্রতার ফলে যে অবস্থা আমাদের হয়েছে তা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ, হাঁড়িপাতিলগুলো উল্টে গিয়েছে, আগুন নিভে গিয়েছে। তাঁবু উপড়ে গিয়েছে আর আমাদের পক্ষে চলাফেরা-ওঠানামা সুকঠিন হয়ে পড়েছে। এখন ফিরে যাওয়াটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল। তারপর সে তার নিজের উটটির পিঠে চড়ে বসল।[১] তার উটটি তখনো বাঁধা ছিল। সে চলার জন্য তাকে প্রহার করতে লাগল। সে অন্ততপক্ষে লাফ মেরে তিনবার নিচে নামল আর যতক্ষণ না সে তার দড়ি খুলল, উট ততক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।'

হজরত হুজাইফা ফিরে এসে পুরো বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিলেন। পরদিন সকালে সূর্যোদয় হলে দেখা গেল মদিনার বাইরের রণক্ষেত্র একেবারেই জনমানবহীন, শত্রুদল রাতেই পালিয়ে গিয়েছিল। অনন্তর, পুনরায় শান্তিলাভ হলো এবং ঈমানদাররা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং বলাবাহুল্য তাঁরা বিজয় লাভ করলেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি দিলেন :

'এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন, তিনি তাঁর সৈন্যদের সম্মানিত করেছেন, তিনি একাই সমস্ত শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন, এখন এর পরে আর কিছু নেই।'[২]

মুসলমানরা সন্তোষ, শান্তি ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যে সেনাদল প্রতিটি উপত্যকা ও এলাকা থেকে মদিনায় লুটতরাজ চালাত এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য একত্রিত হয়েছিল তাদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কথা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল আর এই কঠিন হতেও কঠিনতর পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দৃঢ়তা ও ধৈর্যও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এই কারণেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রত্যক্ষ বিজয়ের পর বললেন :

---

১. এ থেকে আবু সুফিয়ানের দিশেহারা ও ভীতসন্ত্রস্ততার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
২. বুখারী।

'এবার আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাব, যারা আর কখনো আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না।'[১]

আঠারো
বনু কুরাইজার পরিণাম

মদিনার চারদিক থেকে শত্রুসৈন্যরা চলে গেল আর মরুস্থল পুনরায় তার পুরনো চেহারায় ফিরে এল। ঐ সৈন্যরা দুর্ভাগ্য ও ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই পেল না। এখন বনু কুরাইজারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার দণ্ড ভোগ করার জন্য একলা রয়ে গেল। যারা তাদের অন্তরের গোপন অভিসন্ধি প্রকাশ করে দিয়েছিল, এদের সন্ধ্যা সকাল ঐ অপরাধীর সমান অতিবাহিত হতে লাগল, যার অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং সে নিরানন্দচিত্তে কিসাস চুকানোর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

এই ইহুদিদের অন্তর মুসলমানদের প্রতি ক্রোধ, রোষ ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ ছিল। এরা ছিল তারাই, যারা সমগ্র আরবকে মদিনা আক্রমণ করতে ও মুসলমানদের সমূলে বিনাশ করতে তাদের শত্রুদের উত্তেজিত করেছিল। এদের ধোঁকা, প্রতারণা ছলনা, কপটতা ও মুনাফিকির কারণে মুসলমানরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং তাদের আকিদা ও চিন্তাধারার সংঘর্ষে তাদের উপর যে মানসিক আক্রমণ চালানো হলো সে ক্ষত তখনো নিরাময় হয়নি ; বরং তা নিরাময়ও হবে না। সেখানে বনি ইসরাইলের এই শত্রুদের পক্ষে এ কীভাবে সম্ভব ছিল যে, ইসলাম ও তার অনুসারীদের ধ্বংস পরিকল্পনা তাদের সার্থক হবে ?

ইহুদিদের, বিশেষরূপে বনু কুরাইজা সদলবলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পৌত্তলিক ও ইসলামের শত্রুদের সাথে মিশে যাওয়া, মুসলমানদের হত্যা করা ও তাদের লুটতরাজের অংশীদার বানানোর জন্য কী ব্যবস্থা করেছিল ? যেখানে সর্বদাই তারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্ধি বা প্রতিজ্ঞা পূর্তির প্রশ্নে সততা ও গভীর আন্তরিকতাই দেখেছে।

মক্কাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দৌত্যকারী কুখ্যাত ইহুদি নেতা হুই বিন আখতাব এবার বনু কুরাইজার কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় নিল। যে সবাইকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে শত্রুতায় প্ররোচিত করেছিল এবং প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিল যে, মূর্তিগুলো একেশ্বরবাদের চেয়ে উত্তম।

---

১. বুখারী।

মুসলমানরা যখন আক্রমণকারী সৈন্যদের চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দিলেন, যারা শুনতে ও এ আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছে তারা বনু কুরাইজার বসতিতে গিয়ে আসরের নামাজ পড়বে।[১]

সাফল্য ও বিজয়ের আলোকে আলোকিত এই প্রাতের যুদ্ধের ঘোষণা মুসলমানদের উদ্বেলিত করে তুলল। তারা স্পষ্টই বুঝে গিয়েছিলেন যে আল্লাহর গায়েবি সাহায্য ও ফিরিশতাদের মদদ তাঁরা লাভ করেছেন। স্পষ্ট যে, কালকের তুলনায় তাঁদের আজকের অবস্থা কেমন ভিন্ন ছিল ? অনন্তর, আল্লাহর অনুকম্পা ও অনুগ্রহের সাহায্যে তারা জীবন ও সম্মান লাভ করলেন।

আল্লাহ তাঁদের শত্রুদের দলগুলোকে তার বিশ্বশক্তির দ্বারা ছিন্নভিন্ন করে দিলেন এবং সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিলেন। অতএব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিব্রাইলের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বলেছিলেন :

'ফিরিশতারা এখনো অস্ত্র ধারণ করেনি, হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ আপনাকে বনু কুরাইজা অভিমুখে প্রস্থানের আদেশ দিয়েছেন, আমি স্বয়ং তাদের ওখানে যাচ্ছি আর সেখানে গিয়ে তাদের বিচলিত করছি।'[২]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দিলেন এবং তা দ্রুত কার্যকর করার আদেশ দিলেন। তিনি তাঁর সাহাবিদের বললেন :

'আমি তোমাদের বনু কুরাইজার বসতিতে না পৌঁছে আসরের নামাজ না পড়ার আদেশ দিচ্ছি।'

কিন্তু বনু কুরাইজার বসতিতে পৌঁছানোর আগেই সূর্যাস্ত ঘনিয়ে আসতে লাগল। কিছু লোক বললেন, নামাজ ত্যাগ করাটা রসুলুল্লাহর অভিপ্রায় ছিল না। অতএব, তাঁরা নামাজ পড়ে নিলেন। দ্বিতীয় দল বলল : 'আল্লাহর কসম ! আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ মতে কাজ করব, এ কোনো পাপের কাজ হবে না।' অতএব, একটি দল 'ঈমান' এবং 'ইহতিসাব' এর দশায় নামাজ পড়ে নিলেও অন্য দল 'ঈমান' এবং 'ইহতিসাব' এর দশায় নামাজ 'কাজা' করে দিলেন ; এবং রসুলুল্লাহ কোনো দলের প্রতি না হলেন রুষ্ট আর না হলেন অসন্তুষ্ট।[৩]

---

১. ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাক।
২. বুখারী, জুহরী।
৩. বাইহাকী।

এ কথার যুক্তি হলো এই যে, ইসলাম দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। এই শর্তের সাথে উচিত-অনুচিতের 'ইজতিহাদ'[১] সৃষ্টি হয়ে গেল। মানুষ সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক দল 'নসুস'-এর আদেশ অনুসারে বিরত থাকে এবং তা লঙ্ঘন করাটা পছন্দ করে না, আর দ্বিতীয় দল সেই আদেশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন ও তার মর্ম পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করে। তারপর তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মর্মবাণী যখন তার বোধগম্য হয়ে যায় তখন সে ঐ অনুসারে কাজ করে তা সে প্রত্যক্ষরূপে বিরুদ্ধ হোক বা না হোক।

এদের মধ্যেকার প্রত্যেক পক্ষই ঈমান ও ইহতিসাবের দৃষ্টিতে সম্মানিত, তা সে হক পর্যন্ত পৌঁছে যাক কিংবা হক থেকে বিমুখ হয়ে যাক।

উলামাদের একটি দল যুদ্ধাবস্থায় নামাজ নির্দিষ্ট সময় ফরজ হওয়াকে স্বীকার করে না। তাঁদের কাছে যুদ্ধের বাধ্যতার কারণে যখনই সময় পাওয়া যাবে তখনই নামাজ পড়ে নেয়া যাবে। এ হলো ইমাম বুখারী প্রমুখের মত এবং এই মতই আমার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা, বান্দার সাথে সম্পর্কিত 'ওয়াজিবাত' এর সেই ক্রম বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, যা মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য পুরো করে ; বরং এই আপেক্ষিক ক্রমকে অনুধাবন না করে দ্বীন এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

ইসলাম বিভিন্ন শিক্ষা ও কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত যাতে 'ফরাইজ'ও আছে 'নওয়াফিল' আছে।

এ কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, 'ফরজ' ছাড়া আল্লাহ 'নফল'কে কখনোই গ্রহণ করবেন না। যে ব্যক্তি ফরজ পালন না করে নফল নিয়ে টানাটানি করে সে অবশ্যই বিভ্রান্ত, বিপথগ্রস্ত।

ঈমান রক্ষার্থে 'ফরজ' এই রকমই আপেক্ষিক ও গুরুত্বপূর্ণ, যেমন শরীরের জন্য আহার আপেক্ষিক বা প্রয়োজনীয় : যেমন, শরীর বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কেবল খাদ্য প্রাণই যথেষ্ট নয় ; বরং সমস্ত প্রকারের খাদ্যপ্রাণ বা আহারসামগ্রী আবশ্যক। নইলে, শরীর নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং তাকে দুর্বল করে দিয়ে নিঃশেষ করে দেবে, মৃত্যুই হবে যার শেষ পরিণতি।

দ্বীন বা ধর্মের বিষয়টিও এই রকম। দ্বীন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যা জামায়াতের মধ্যে ঐ সময় পর্যন্ত স্থাপিত থাকতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ফরজই এর বিভিন্ন পর্যায়কে অনুসরণ করবে। ফরজই জীবনকে রক্ষা করে এবং তার স্বাস্থ্য বিকাশ এবং উন্নতির নিশ্চয়তা দেয়।

মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, সে তার সময়কে বিভাজিত করে সমস্ত প্রকারের ফরজ আদায়ের কাজে ব্যবহার করে, তা কখনোই এমন হবে না যে, এক ফরজ আদায় করে অন্য ফরজ থেকে বিরত থাকবে। কখনো এই হবে না

---

১. কুরআন ও হাদিসের আলোকে সমস্যার সমাধান খোঁজা।-অনুবাদক

যে, সে তার সময়কে এমনভাবে ব্যবহার করবে যে, সে নিজেকে কেবল নফল আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে এবং ফরজ পালন থেকে দূরে থাকবে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করলেন বনু কুরাইজার প্রস্তুতি ও যুদ্ধ সামগ্রী একত্রিত করার আগেই তাদের উপর চড়াও হওয়াটা হবে সময়ের প্রধান কর্তব্য। অতএব কোনো মুসলমানের পক্ষেই এ কাজে বিলম্ব করা উচিত ছিল না, যা নামাজের জন্য বিলম্বের কারণ হতে পারে।

নামাজের সময়ের সীমাবদ্ধতা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার সামনে পিছলে যায়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশের আলোকে আধুনিক মুসলমানদের ব্যবহার বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। যে অধ্যাপক বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিতে গাফিলতি করে, যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসাকে উন্নতিশীল করার চেষ্টা করে এবং যে কর্মচারী আপন কার্যালয়ে ঠিকমত কাজ না করে তো আল্লাহর কাছে এ সব ফরজ ত্যাগ করার যে কোনো বাহানাই অযৌক্তিক হবে। তা সে এ ফরজ আদায় না করার কারণে ১০০ রাকাত নামাজ পড়ুক অথবা এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করুক অথবা আল্লাহর পবিত্র নাম ৭৩ হাজার বার জপ করুক, যেমনটি জাহিল সুফিরা করে থাকে।

কেননা, নফলের কারণে বিধিবদ্ধ ফরজ থেকে গাফিলতি কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। আর কোনো সম্প্রদায় তখনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, যখন সে অজ্ঞান, অনাহার, অভাব, অস্তব্যস্ততা ও অরাজকতার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে আলস্য বোধ না করে।

জিহাদ এমন এক ফরজ, যার গুরুত্ব কেউ কখনো খাটো করতে পারে না, আর না কোনোই ইবাদত নির্দিষ্ট সময় থেকে তাকে বিরত রাখতে পারে, যেমনটি আপনারা উপরে অধ্যয়ন করেছেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ইসলামী পতাকা তুলে দিয়ে আগে পাঠিয়ে ছিলেন এবং মুসলমানরা তাঁর নেতৃত্বে বনু কুরাইজার চারদিকে একত্রিত হতে লাগলেন। এমনকি যখন মুসলিম সৈন্যরা ইহুদি বসতির একেবারেই নিকটবর্তী হয়ে গেল সেই দুষ্ট গোত্রের বিপথগামিতা, বিদ্রোহ ও শয়তানি তখনো অবশিষ্ট ছিল। মুসলমানদের দেখতেই তারা রসুলুল্লাহ ও তাঁর প্রিয় পত্নীদের প্রকাশ্যে গালাগালি দিতে লাগল।

হজরত আলী ভাবলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুষ্টদের থেকে পৃথক থাকলে ভালো হয়। অতএব তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে তাকে পৃথক হয়ে যেতে বললেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ? আমার বিষয়ে এদের দিক থেকে কষ্টদায়ক কিছু শুনেছ ?' হজরত আলী ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করলেন : হ্যাঁ'। তিনি বললেন : 'তারা যদি আমাকে দেখতে পেত তাহলে কিছু বলত না।'

যখন তিনি তাদের কেল্লার কাছে পৌঁছালেন তখন বললেন : 'ওহে বানরদের ভাইসকল ! 'আল্লাহ্ কি তোমাদের অপমানিত করেননি ? আর তোমাদের উপর কি তাঁর ক্রোধ পতিত হয়নি ?'

তারা উত্তর দিল : 'হে আবুল কাসিম ![১] আপনি তার সাথে অপরিচিত নন।'

এ হলো ইহুদিদের চিরাচরিত স্বভাব যে, যখন তারা আশ্রয় পায় তখন ইতরামির সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আর যখন শক্তিমান হয়ে ওঠে তখন রক্তপাত করে আর যখন বিপদে পড়ে তখন উচ্চাদর্শকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে লাভান্বিত হতে পারে কিন্তু অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, সমঝোতা, সন্ধি বা প্রতিজ্ঞা তো জীবনের সর্বোচ্চ শ্রেণীর বস্তু যার সীমা নেই। কিন্তু তাদের মূর্খতা ও বোধহীনতা তাদের লাভান্বিত করতে পারল না।

মুসলমানরা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন, ফলে তার কবল থেকে জীবন রক্ষা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তারা বুঝে নিল যে, মাথা নত করা বা আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অতএব তাদের হৃদয় ভয় ও নিরাশায় পূর্ণ হয়ে উঠল। বনু কুরাইজার নেতা কা'ব বলল :

'হে ইহুদি গোত্রের লোকসকল ! তোমরা যে বিপত্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছ, তা তোমরা ভালোমতই জানো। আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখছি, যেটা ইচ্ছা তোমরা সেটা মেনে নিতে পারো, যাতে তোমরা এই বিপত্তি থেকে মুক্তি পেতে পারো।'

লোকেরা বলল : 'এ তিন প্রস্তাব কী কী ?'

কা'ব : 'প্রথম প্রস্তাব হলো এই ব্যক্তির উপর ঈমান আনো, কেননা আল্লাহর কসম ! এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুহাম্মদ নিঃসন্দেহে আল্লাহর সেই নবী এবং রসুল, যাঁর উল্লেখ তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতে পেয়েছ। যদি তোমরা ঈমান আনো তাহলে তোমাদের জীবন, তোমাদের সহায়-সম্পদ, মহিলা ও শিশুরাও নিরাপদ হয়ে যাবে।'

বনু কুরাইজা : 'এ আমরা স্বীকার করি না। আমরা তওরাতের আদেশবাণী কখনোই ত্যাগ করতে পারি না এবং এর স্থানে অন্য কোনো কিতাবও আমরা অনুসরণ করব না।'

কা'ব : 'আচ্ছা যদি এ কথা স্বীকার না করো তাহলে তোমরা তোমাদের নারী ও শিশুদের হত্যা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও আর পূর্ণশক্তি নিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর

---

১. রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক ক্ষণজন্মা পুত্রের নাম ছিল কাসিম। সে জন্য কেউ কেউ তাঁকে আবুল কাসিম বা কাসিমের পিতা বলে সম্বোধন করত। এখানেও তাই করা হয়েছে।– অনুবাদক

সাথিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো নির্ণয় করে দেন। যদি তোমরা অসফল হও তাহলে স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য কোনো শোকতাপ থাকবে না, আর যদি সফল হয়ে যাও তাহলে স্ত্রী-সন্তান সবই পাওয়া যাবে।'

বনু কুরাইজা : 'এই বেচারিদের হত্যা করলে তো আমাদের জীবনের আনন্দই শেষ হয়ে যাবে।'

কা'ব : 'এও সম্ভব নয়। আজ শনিবারের রাত, সম্ভব যে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিরা আমাদের দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন, তাঁরা সন্তুষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন এ জন্যই থাকবেন যে, এ দিন ইহুদিদের পবিত্র দিন, তারা আজ আক্রমণ করতে পারে না। অতএব, মুসলমানদের এই নিরুদ্বিগ্নতার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেয়া যাক।'

বনু কুরাইজা : 'কা'ব ! তোমার নিশ্চয় জানা আছে যে, এই দিনটিকে অসম্মান করার কারণে আমাদের পূর্বপুরুষদের বানর ও শূকরে পরিণত করে দেয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তুমি আমাদের এই কাজের আদেশ দিচ্ছ ?'

কা'ব : '(ঝাঁজের সাথে) মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভ করা থেকে আজ পর্যন্ত তোমরা নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারোনি।'

বনু কুরাইজা, বনু নজিরের ন্যায় সমঝোতা করতে চাইল কিন্তু মুসলমানরা নিঃশর্তে বন্দি করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলেন, কেননা, এরা যে ভয়ানক অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে কারণে কোনো উদার ব্যবহার আশা করার যোগ্যতা তাদের আর ছিল না। এখন কেবলমাত্র ন্যায়ের মানদণ্ডই তাদের ফায়সালা করতে পারত, তা সে অনুকূল প্রতিকূল যাই হোক না কেন।

ইহুদিরা আবু লুবাবা বিন আব্দুল রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাথে পরামর্শ করল, এঁর সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আবু লুবাবাকে তারা জিজ্ঞাসা করল, 'মুহাম্মদের ফায়সালা কি আমরা মেনে নেব ?' তিনি উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ, মেনে নাও।' পরন্তু ঘাড়ের দিকে ইশারা করে বললেন, তোমাদের হত্যা করা হবে। আবু লুবাবা রাজিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ অনুভব করলেন, 'আমি রসুলুল্লাহর সাথে খেয়ানত করেছি।' তারপর সেখান থেকে তিনি মসজিদে নববীতে পৌঁছালেন এবং নিজেকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে নিলেন এবং শপথ করলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন ততক্ষণ আমি এখান থেকে যাব না।

আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার বিষয়ে এই আয়াত অবতারণ করলেন :

'আরো কিছু লোক আছে, যারা আপন পাপকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের সম্মিলিত কর্মের মধ্যে কিছু থাকে ভালো আর কিছু মন্দ। আল্লাহ তাদের প্রতি

অনুগ্রহশীল হতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমা ও অনুগ্রহপরায়ণ।' –আত্তওবা : ১০২

২৫ দিন যাবৎ অবরোধ জারি রইল। ইতিমধ্যে, যে ইহুদিরা আহজাবের যুদ্ধের অবসরে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকার করেছিল, তাদের সাথে উদার ব্যবহার করা হলো এবং তাদের যেথা ইচ্ছা চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়া হলো। এভাবে মুসলমানরা হাতে হাতে তাঁদের দায়িত্বশীলতার যথাযথ মূল্য চুকিয়ে দিলেন।

তারপর মুসলমানরা দুর্গদ্বারে আক্রমণ চালিয়ে তাদের কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু আহ্বান করলেন, 'ইসলামী বাহিনীর বন্ধু সকল ! (তাঁর সাথে হজরত জুবাইর বিন আওয়ামও ছিলেন) আল্লাহর কসম ! আমি হজরত হামজার ন্যায় শাহাদতের পিয়াসী। আর এদের কেল্লা অবশ্যই আমরা অধিকার করব।' বনু কুরাইজা বলল : 'হে আল্লাহর রসুল। আমরা সা'দ বিন মুআজের মধ্যস্থতা স্বীকার করছি, তিনি যা ফয়সালা দেবেন, আমরা তাই মেনে নেব।'

ইহুদিরা নিজেদের কেল্লা থেকে বেরিয়ে এল এবং হজরত সা'দ বিন মুআজকে আহ্বান করা হলো, যাতে শপথকারীদের বিষয়ে তিনি তার বিচক্ষণ ফয়সালা শুনিয়ে দিতে পারেন।

হজরত সা'দ আউস গোত্রের নেতা ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বনু কুরাইজার সাথে তাদের শপথের সম্পর্ক ছিল। ইহুদিরা আশান্বিত ছিল যে, এই সম্পর্ক থেকে তারা ফায়দা হাসিল করবে এবং আউসের লোকেরাও আশা করেছিল যে, তাদের নেতা তাদের পুরাতন বন্ধুদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করবেন। অতএব, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফায়সালার জন্য তাদের আহ্বান করলেন তখন তারা সেই তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হলো যেখানে আহজাবের যুদ্ধে আহত হওয়ায় কারণে সা'দ রাজিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থাবস্থায় জীবনযাপন করছিলেন। তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল এবং বলল : 'হে আবু আমর ! আমরা আমাদের সহপ্রতিজ্ঞ লোকদের বিষয়ে সুব্যবহার আশা করি।'

হজরত সা'দ কঠোর কঠিন এই বাস্তবতাকে ভুলতে পারেননি যে, ইসলাম ও তার অনুসারীদের মদিনা ও তার ফল-ফসল, কৃষি, আবাদ, মান প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার উপর আক্রমণকারীদের ধ্বংসকাণ্ড থেকে কোনো পরোক্ষীয় মোজেজাই রক্ষা করেছিল এবং বনু কুরাইজা তাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল, যারা তৌহিদের অনুসারীদের মূলোৎপাটনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিল।

হজরত সা'দ একথা ভুলতে পারেননি যে, বনু কুরাইজা কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আর তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কত নোংরামির সাথে না তাদের স্বাগত জানিয়েছিল। হজরত সা'দ কি তাদের

একথাও স্মরণ করিয়ে দেননি যে, তাদের হাশরও বনু নজিরের সমান হবে তখন তারা বড়ই শয়তানির সাথে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই কারণে যখন তার গোত্রের লোকেরা তার কাছে বড় আশা প্রকাশ করল তখন তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের ভর্ৎসনা করে উত্তর দিলেন : 'সা'দের জন্য এখন সেই সময় এসে গিয়েছে যে সে আল্লাহতাআলার কোনো সুপারিশ কার্যকর হবে না।'

হজরত সা'দ রাজিয়াল্লাহু আনহু রায় দিলেন, তাদের পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক, মহিলা ও শিশুদের বন্দি করা হোক আর তাদের সহায় সম্পদ বিলি-বণ্টন করে দেয়া হোক। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'সা'দ ! তুমি আল্লাহর আদেশানুসারে রায় দিয়েছ, যা সাত আসমানের উপর থেকে এসেছে।' মদিনার কাছে গর্ত খোঁড়া হলো আর ইহুদিদের মৃতদেহ তাতে এক এক করে ফেলে দেয়া হলো, যাতে তারা নিজেদের বেঈমানি, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের মজা চাখতে পারে।

ইহুদিদের যখন তাদের বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তাদের নেতা কা'বকে বলল : 'আপনার বিচারে আমাদের সাথে কী ব্যবহার করা হবে ?'

কা'ব বললেন : 'যে কোনো অবসরে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করো, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, যাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে আর ফিরে আসেনি ? আল্লাহর কসম ! আমাদের পরিণাম মৃত্যুদণ্ডের অতিরিক্ত আর কিছু হবে না।'

এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। এভাবে অতীতের বিশ্বাসঘাতকতা ও দণ্ডনীয় অপরাধের শাস্তি তারা পেয়ে গেল। যদি এদের এই প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম সফল হতো আর নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো তাহলে আরব দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে আগত সৈন্যদের পদতলে মুসলমানরা চিরতরে পিষ্ট হয়ে যেতেন, ইহুদিরা সেই শত্রুদের সাহায্য ও সহযোগিতা করছিল।

প্রায়শ কিছু কিছু নেতার অপকর্ম ও ষড়যন্ত্র পুরো জাতিকেই বিপদগ্রস্ত করে তোলে। বনু কুরাইজার উপর অবতীর্ণ এই বিপত্তি ছিল তাদের কয়েকজন মাত্র নেতার ব্যক্তিগত অপকর্ম ও ষড়যন্ত্রের পরিণাম। যদি হুই বিন আখতাব আর তার মতো নেতারা ইসলামের আশ্রয়ে আশ্রিত থাকত আর তাতে যে লাভ ছিল তাকে যদি পর্যাপ্ত বলে মনে করত তাহলে তাদের জাতিকে এই দুষ্পরিণাম ভুগতে হতো না।

কিন্তু জাতি তাদের নেতাদের অপকর্ম ও ত্রুটির চরম মূল্য নিজেদের রক্ত ও জীবন দিয়ে চুকিয়ে থাকে। আধুনিক যুগে রুশ, জার্মানি ও অন্য অনেক রাষ্ট্র নিজেদের ষড়যন্ত্রকারী ও চতুর নেতাদের ত্রুটির কারণে নিজেদের দেশ থেকে চরম মূল্য দিয়েছে।

এই কারণে কুরআন নেতা ও দলপতিদের নিন্দা করেছে, সাধারণ মানুষ যাদের অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত হয় :

'তুমি কি দেখোনি তাদের যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরিতে পরিবর্তিত করেছে আর নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে ?' – ইব্রাহিম : ২৮

হুই বিন আখতাবকেও নিয়ে আসা হলো, যাতে তার অপকর্মের ফল নিজেই জানতে পারে। বাস্তবে, এই দুষ্ট ছিল এ সমস্ত বিপত্তির মূল হোতা।

সে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি তাকাল এবং বলল, 'আল্লাহর কসম ! আপনার শত্রুতার কারণে আমার এই অবস্থা নয়, অবশ্যই আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন সেই অপমানিত হয়ে থাকে।'

তারপর সে সবার উদ্দেশে বলল :

'লোক সকল ! আল্লাহর ফায়সালায় বিলম্ব হয় না। সমস্ত ফয়সালাই লেখা আছে এবং তা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। এ এক যুদ্ধ ছিল, আল্লাহ যাকে বনি ইসরাইলের উপর অনিবার্য করে দিয়েছিলেন।'

তারপর সে বসে পড়ল এবং আর তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেয়া হলো। এই দৃশ্য এক কবি এভাবে বর্ণনা করলেন :

খোদার কসম ! হুই করেনি কো নির্দোষিতার দাবি।
যার অপমান আল্লাহ করেন তার থাকে নাকো দাবি ॥
প্রবৃত্তির দাসরূপে যারা তুষ্ট করে সে মন।
কুপরিণাম ছায়ার মতো করে গো অনুসরণ ॥
সততার পরে নিবেদিত যারা করে নিজেদের প্রাণ
তাহাদের তরে আদর রয়েছে, আর আছে সম্মান ॥'

এও এক বাস্তবতা যে, কুরাইশদের মধ্যেকার মুশরিক ও ইহুদিদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা অগ্রসর হয়ে মৃত্যুকে স্বাগত জানাল।

বিশ্বে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে, ভ্রান্ত চিন্তন ও মিথ্যা ভাবধারা হেতু লোকেরা তাদের জীবন ও সম্পত্তিকেও উৎসর্গ করে দিয়েছে, কিন্তু এই কুরবানি ও প্রাণ দান অসত্যকে সত্যে পরিণত করতে পারে না, আর অত্যাচারকে ন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

ইসলামের প্রতি ইহুদিদের মনোভাব ও অবস্থান আগেও যা ছিল আজও তাই আছে। ইহুদিরা আমাদের হাজার হাজার ভাইকে হত্যা করেছে, তারপর ফিলিস্তিনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

এ বড় বিচিত্র ব্যাপার যে, ইহুদিরা তাদের সেই হত্যাকারীদের উপেক্ষা করেছে, যারা ইয়োরোপে তাদের জন্য বধ্যভূমি বানিয়েছিল। তাদের কোনো প্রকারের কষ্ট দেয়ার চিন্তাও ছিল না ; বরং সেই মুসলমানদের, যারা বারো শতাব্দী যাবৎ তাদের কোনো মোকাবিলা পর্যন্ত করেনি, তারা তাদের দুর্বল ভেবে নিল এবং ঘৃণিত, অপমানজনক ও উদ্বেগজনক পদ্ধতিতে তাদের পেরেশান করতে লাগল, যার ধারাবাহিকতা ফিলিস্তিনে আজও জারি রয়েছে, যার সমর্থন ও সহযোগিতা পাশ্চাত্য নিরন্তর দিয়ে চলেছে।

আক্রমণকারী দলগুলোর পালিয়ে যাওয়া ও বনু কুরাইজার অবস্থা বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এই আয়াতরাজি অবতীর্ণ হলো :

'আল্লাহ কাফিরদের তাঁর ক্রোধিত দশার প্রতি মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তারা কল্যাণকর কিছুই লাভ করতে পারল না আর যুদ্ধে ঈমানদারদের পক্ষে আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে গেলেন আর আল্লাহ শক্তিমান ও আধিপত্যশালী এবং কিতাবধারীদের মধ্যে থেকে, যারা তাদের (আক্রমণকারীদের) সহযোগিতা করেছিল (আল্লাহ) তাদের কেল্লা থেকে নামিয়ে আনলেন, আর তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন– একটি দলকে তোমরা হত্যা করছ আর একটি দলকে বন্দি করছ। আর তিনি তোমাদের ধরিত্রী ও তার সম্পদরাজিকে উত্তরাধিকার বানিয়ে দিয়েছেন আর ঐ ভূমিরও, যার উপরে তোমরা পদার্পণ করেছ, আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর সামর্থ্যপ্রাপ্ত।' – আল আহজাব : ২৫-২৭

মুসলমানদের পৌত্তলিক ও ইহুদিদের সাথে সংঘর্ষে নিজেদের যে সাথিদের হারানোর বেদনা সইতে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে হজরত সা'দ বিন মুআজও ছিলেন, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করে নিলেন আর সেই আঘাত তাঁর শাহাদতপ্রাপ্তির কারণ বনে গেল, আহজাবের যুদ্ধে যে তীর তাঁকে আঘাত করেছিল। হজরত সা'দ রাজিয়াল্লাহু আনহু বনু কুরাইজার দুস্পরিণাম স্বচক্ষে দেখেছিলেন। ওদিকে মক্কায় পৌত্তলিকরাও ব্যর্থ হয়েছিল, এমনকি তাদের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আক্রমণের পরিবর্তে তারা আক্রান্ত হওয়ার মতো পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

বনু কুরাইজার পরাজয়ের পরে মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যেকার শত্রুতা কিন্তু শেষ হয়ে গেল না। আহজাবের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর আক্রমণকারীদের মধ্যেকার কিছু লোক পালিয়ে খয়বরের কেল্লাগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যেকার অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিল আবু রাফে বিন আবিল হুকাইক। এই ইহুদি মক্কায় পৌত্তলিক কাফিরদের মদিনা আক্রমণে প্ররোচিতকারী হুই বিন আখতাবের সহযোগী ছিল এবং সে আর্থিক সহযোগিতাও দিয়েছিল। সে ইসলাম ও তার অনুসারীদের কষ্ট ও আঘাত দেয়ার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের এই মনোভাবকে এই ভাষায় প্রকাশ করেছেন :

'কোনো ইহুদি কোনো মুসলমানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করেনি যে তাকে হত্যার ইচ্ছা পোষণ না করেছে।'[১]

ইহুদিদের ইসলামের সাথে শত্রুতা ও প্রতিশোধের ভাবনাই তাদের সত্যচ্যুত ও বিমুখ করে দিয়েছিল। অতএব, মুসলমানদের এদের সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত ছিল এবং তাদের কোনো অপচেষ্টা যাতে সফল হতে না পারে সেজন্য সদা

---

১. অর্থাৎ ইহুদি কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করলে সে তাকে হত্যা করার সংকল্প তার নিজের মনে অবশ্যই গুপ্ত রাখত।– অনুবাদক

তৎপর থাকা উচিত ছিল। এই মনোভাব থেকেই মদিনায় ৫ খাজরাজি ব্যক্তি আবু রাফেকে নিপাত করতে চললেন, যাতে তার সহযোগীদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন আতিক রাজিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁদের আমির নিযুক্ত করলেন এবং নির্দেশ দিয়ে দিলেন যেন কোনো মহিলা ও শিশুকে হত্যা করা না হয়।[১]

আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথিদের নিয়ে খয়বর অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন আর সন্ধ্যার মধ্যে ইবনে আবিল হুকাইকের কেল্লা অবধি গিয়ে উপস্থিত হলেন। আব্দুল্লাহ তাঁর সাথিদের বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো আর আমি কেল্লায় ঢোকার কোনো উপায় খুঁজে আসি। হজরত আব্দুল্লাহ বলেন, আমি দেখলাম এক ভৃত্য তার গাধা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার হাতে একটি মশাল ছিল। আমার আশঙ্কা ছিল, হয়ত সে আমাকে চিনে ফেলবে। তারপর কাপড় দিয়ে আমার মাথাটি ভালো করে ঢেকে নিয়ে দ্বারের কাছে এমনভাবে বসে গেলাম যেন কেউ শৌচকর্মে রত আছে।[২]

ভৃত্য যখন ফিরে এল, তখন দরোয়ান বলল : 'দ্বার বন্ধ হওয়ার আগে যে যে ভিতরে যাবে চলে যাও।' তারপর আমি ঢুকে পড়লাম এবং দ্বারের কাছেই পশুদের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম।

আবু রাফে তার পরিবার পরিজনদের সাথে যেই বিছানায় শুয়ে পড়ল, তখন আসল কাজ শুরু হয়ে গেল। যখন রাত গভীর হয়ে এল এবং নীরবতা নেমে এল তখন তার বন্ধুরাও যার যার জায়গায় চলে গেল।

আমি সেখান থেকে বেরুলাম। চাবি রাখার জায়গাটি জেনে নিয়েছিলাম। তারপর খুব আস্তে করে দ্বার খুলে দিলাম। যখন খট করে আওয়াজ হতো তখন সেঁধিয়ে যেতাম। তারপর অট্টালিকার দ্বারগুলো খুলে দিলাম এবং খুব আস্তে করে তাকে ভাঁজ করলাম যাতে লোকেরা আমার কথা জানতে পারলেও আমার কাজ আমি পুরো করে নিতে পারি।

যখন আমি অট্টালিকায় পৌঁছলাম তখন সেখানে আলো নিভে যাওয়ার কারণে অন্ধকার পেয়ে গেলাম, তখন রাফে তার পরিজনদের সাথে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এটা আমি জানতাম না যে, সে কোন দিকটায় শুয়ে আছে। আমি বললাম : আবু রাফে ! আবু রাফে ! সে বলল : 'কে ?' আমি তরবারি চালালাম কিন্তু ফাঁকা গেল। সে খুব জোরে চিৎকার করল।

কিছুক্ষণ পর আমি সহানুভূতির স্বরে বললাম : 'আবু রাফে ! এ কিসের আওয়াজ ?' আবু রাফে বলল, 'এই মাত্র আমার উপর কেউ আঘাত করেছে।' এ

---

১. প্রধান।

২. বুখারী।

কথা শুনতেই আমি পুনরায় অস্ত্রাঘাত করলাম। সে এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে তার পরিজনরা জেগে উঠল। আমি পুনরায় তার কাছে গিয়ে দেখলাম সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, একটু অগ্রসর হয়ে আমি তার কাম তামাম করে দিলাম। আমি ভয়ের চোটে সেখান থেকে অতি দ্রুত ফিরে আসতে লাগলাম। নামতে নামতে সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে যেতেই আমার পায়ের গোড়ালির একটি হাড় ভেঙে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ পা বেঁধে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে মিলিত হলাম।

এঁরা এক দুষ্টকে সফলভাবে দমন করার সুসংবাদ বহন করে মদিনায় এসে পৌছালেন। এভাবে ইসলাম দাওয়াতের পথে আরেক উপত্যকা অতিক্রম করে এল।

এই সকল প্রয়াসের পর কাফিরদের কেল্লাগুলোতে ভূমিকম্প বয়ে গেল। ইসলামের সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেল এবং তার রাজ্যও সুদৃঢ় হয়ে গেল। হিজরতের পঞ্চম বর্ষ অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুসলমানরা এক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, যারা নিজেদের স্থানটি সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিলেন এবং বিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারীদের মজা বুঝিয়ে দিলেন।

ওদিকে কুরাইশ ও তাদের সহযোগীদের স্থির বিশ্বাস জন্মে গেল যে, এখন আর মুসলমানদের মূর্তিপুজোয় ফিরে আসা সম্ভব নয়। এই রকমই ইহুদিরাও ভালোমত বুঝে নিল যে, নতুন দ্বীনের[১] সাথে বিদ্বেষ ও অন্তিম রিসালাতের সাথে শত্রুতা স্বয়ং তাদের ধ্বংসের কারণ বনে গেছে।

এই বছর অর্থাৎ আহজাবের যুদ্ধের পর ৬ হিজরি সন পর্যন্ত, অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়া পর্যন্ত বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেনি। হুজাইল গোত্র মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা করতে চাইল, কিন্তু তা কার্যকর হওয়ার আগেই তাদের নেতা খালিদ বিন সুফিয়ানকে ঠাণ্ডা করে দেয়া হলো। ফলে তাদের আকাঙ্ক্ষা ওখানেই ভূমিসাৎ হয়ে গেল। অন্যদিকে আরব লুটেরা ও ডাকাতরা উরাইনার নেতৃত্বে মদিনায় হানা দিল এবং কিছু উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। খবর পেতেই 'হজরত সালমা বিন আকা' তাদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন : 'ওহে প্রাতের বিপত্তি ! তারপর একাই তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। অন্ততপক্ষে তাদের কাছ থেকে লুট হয়ে যাওয়া কিছু মাল ছাড়িয়ে নিলেন, এরই মধ্যে মুসলিম অশ্বারোহীদের একটি দল এসে পৌছাল, তাদের দেখে পৌত্তলিকরা পালিয়ে গেল।

বুখারীর বর্ণনানুসারে এ ঘটনা হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে ঘটেছিল এবং এ সঠিকও।

---

১. নিজের একটি শিশু সন্তানের সাথে। – অনুবাদক

ইতিমধ্যে রসুলুল্লাহর সাথে উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানের পরিণয় সম্পন্ন হয়ে গেল। ইনি প্রথম স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে এবং উম্মে হাবিবাকে অসহায় অবস্থায় একলা রেখে চলে যায়। স্বামী ওখানেই মারা গিয়েছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মহিলার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য একে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কেননা, ঈমান ও ইসলামের জন্য তিনি পৌত্তলিক পিতা আবু সুফিয়ানকে ত্যাগ করেছিলেন। তারপর মুরতাদ স্বামীকেও ত্যাগ করেন, আর এই অবস্থায়ও তিনি পিতার কাছে যেতে স্বীকার না করে বরং হিজরত করাটাই পছন্দ করলেন। রসুলুল্লাহ হাবশার সম্রাট নজ্জাশীকে তার পক্ষে থেকে উকিল নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর মোহর সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এভাবে তিনি জয়নব বিনতে জাহাশকেও বিয়ে করলেন। এ বিষয়ে আমরা 'বহু বিবাহ ও রসুলুল্লাহর পত্নীগণ' নামক অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে আমর বিন আসের হৃদয় ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। কেননা, রসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাফল্য দেখে উত্তেজিত হয়ে তিনি তাঁর সাথিদের বললেন : 'আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মুহাম্মদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছেন।' তারপর, পরামর্শ দিলেন আমি হাবশা যাত্রা করি এবং সেখানে অবস্থান করে এই সংঘর্ষের পরিণাম প্রত্যক্ষ করি।

আমর বিন আস যখন হাবশায় গিয়ে সম্রাটের দরবারে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি সম্মান দেখালেন তখন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু মনের এই অবস্থার কথা তিনি গুপ্ত রাখলেন। তারপর যখন মক্কা বিজয়ের সময় নিকটবর্তী হলো এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ, যিনি ইসলাম গ্রহণের সংকল্প করেছিলেন তাঁর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। হজরত খালিদ মদিনায় গিয়ে রসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুগামী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমর তাঁকে প্রশ্ন করলেন :

আমর : 'কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা আবু সুলেমান ?'

খালিদ : 'আল্লাহর কসম ! পথ স্পষ্ট হয়ে গেছে, আমি নবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছি, আর কতদিন নীরব থাকব ?'

হজরত আমর খুবই প্রসন্ন হলেন এই ভেবে যে, খালিদের মতো সাহসী সাথি যখন তিনি পেয়ে গেলেন, তখন তিনি মনের কথা প্রকাশ করে দিলেন এবং দু'জনে মুসলমান হয়ে হিজরত করতে গেলেন।

যেমনটি, আমরা আগেই বর্ণনা করেছি, এ দু'জনের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা মক্কা বিজয়ের আগেই ঘটেছিল। কেননা, খালিদ হুদাইবিয়ার সন্ধিতে কুরাইশ বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন, যিনি মুসলমানদের কাবা দর্শনে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
নয়া যুগ

উমরা-এ-হুদাইবিয়া
খায়বরের যুদ্ধ
হাবশার শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন
বেদুইনদের শায়েস্তা
সম্রাটদের সাথে পত্র বিনিময়
উমরাতুল কাজা
মুতার যুদ্ধ
জাতুস সালাসিল স্রোতে
মহান বিজয়
হুনাইনের যুদ্ধ
পরাজয়
পুনর্গঠন ও বিজয়
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ
বিতরণের তত্ত্বদর্শিতা
হাওয়াজিন প্রতিনিধিদের প্রত্যাবর্তন
তায়েফ অবরোধ
মদিনায় প্রত্যাবর্তন
মুনাফিকদের মোর্চা
তাবুকের যুদ্ধ
পশ্চাদবর্তীগণ
মসজিদে জিরার
প্রতিনিধি দলের আগমন
আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর হজ
উম্মিদের প্রতিনিধি দল
গ্রন্থধারীদের প্রতিনিধি দল

এক

উমরা-এ-হুদাইবিয়া

মুসলমানরা যখন তাঁদের দাওয়াতি ইতিহাসের স্পষ্ট এবং নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করলেন তখন তাঁদের মনে মসজিদে হারাম[১] দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করল। মক্কায় যাওয়ার জন্য তো তারা উৎকণ্ঠিত ছিলেনই। কেননা, মক্কা থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছিল, অথবা তাদের আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এ ছাড়া তখনও পর্যন্ত কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই ছিল, যার কোনো নির্ণায়ক পরিণাম সামনে আসেনি। অতএব এই পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে উমরা করা কীভাবে সম্ভব ছিল এবং তারা কীভাবে এই সংকল্প নিয়েছিলেন ?

এর উত্তর হলো এই যে, মুসলমানরা এই ধর্মীয় রীতির দ্বারা ঘোষণা করতে চাইলেন যে, মুসলমানদেরও কাবা শরিফে ইবাদত করার অধিকার রয়েছে, আর মসজিদে হারাম মুশরিক-পৌত্তলিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, তারা যাকে ইচ্ছা দর্শনের অনুমতি দেবে আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখবে। এ তো হজরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই উত্তরাধিকার আর এখানে হজ করা প্রত্যেকটি সেই ব্যক্তির জন্য ফরজ, যার কাছে নবীদের পিতা হজরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লামের শতাব্দী-প্রাচীন এই ঘোষণা পৌঁছে গিয়েছে :

'স্মরণ করো ! যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য এই ঘর (কাবা) প্রতিষ্ঠিত করি (এই কথা বলে) যে, আমার সাথে শরিক কোরো না আর আমার ঘরকে তাওয়াফ-কারীদের এবং উপাসনায় দণ্ডায়মানকারীদের এবং অবনত ও সিজদাকারীদের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো।

এবং লোকদের হজের জন্য আহ্বান করে দাও যে তারা প্রত্যেক পথ ধরে হেঁটে এবং শীর্ণকায় উটনীদের পিঠে আরোহণ করে তোমার কাছে আসুক।'
–আল-হজ : ২৬-২৭

---

১. সম্মানিত মসজিদ অর্থাৎ কাবা। –অনুবাদক

অতএব, মুসলমানদের হজ থেকে বিরত রাখার অধিকার মক্কাবাসীর নেই। তারা মনে করে যে, এ তাদের খাস তালুক, তাহলেই তারা এই ভ্রান্তির উপরে অবস্থান করতে পারে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের উমরার জন্য ইহরাম বাঁধাটা ছিল সন্ধির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং পুরাতন ঝগড়া অশান্তিকে ভুলিয়ে দিয়ে শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা স্বরূপ।

এ কামনা সেই সময়েই সামনে এল, যখন কুরাইশরা মুসলমানদের কষ্ট দিতে দিতে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রতিটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

তারা ইসলামকে পরাজিত ও পরাভূত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেল এবং নিজেদের জান-মাল বাজি রেখে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে গেল কিন্তু ভয়ানক ক্ষতি ও চরম সংকটে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই পেল না। এর বিপরীতে মুসলমানরা দৃঢ়পদ হয়ে গেলেন, তাঁদের প্রবল প্রতাপ আকাশচুম্বী হয়ে উঠল, তাঁদের পতাকা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল, তাঁদের শত্রুরা পরাভূত হলো আর তাঁরা প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয় ; বরং ইবাদতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রওনা হচ্ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল, যেরকম আর সকলেই এই পবিত্র গৃহে ইবাদতের জন্য আসেন ঐ রকমই আমাদেরও অধিকার আছে এবং আমাদের সেখানে ইবাদতের স্বাধীনতা থাকা উচিত, আমাদের এই অধিকার যেন কেড়ে নেয়া না হয় এবং আমাদের যেন এ থেকে বঞ্চিত রাখা না হয়। এই পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমান ও মরুভূমির বেদুইনদের সাথে করে নিলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয় ; বরং উমরা করা। অতএব, উটও সাথে করে নিলেন, যাতে সেখানে তাদের কুরবানি করা যায় এবং মক্কার অনাহারক্লিষ্ট ও হতদরিদ্র মানুষেরা তা খেতে পারে।

যারা আহজাবের দিন মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য চড়াও হয়েছিল, রিসালাত অস্বীকারকারী এই মুশরিক-পৌত্তলিকরা কি এই পবিত্র উদ্দেশ্য অনুভব করতে পারত ? রসুলের প্রতি কোনো মর্যাদাবোধ কি ঐ লোকদের অন্তরে ছিল না ? তাদের অসদুদ্দেশ্য, দুরাচারিতা ও মানসিক নিকৃষ্টত্বের পূর্ণ প্রস্ফুটন তখনও বাকি ছিল।

মদিনার আশপাশে বসবাসরত বেদুইন ও মুনাফিকরা দেখল যে, মক্কাবাসীরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবশ্য-অবশ্যই যুদ্ধ করবে, আর যদি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘোষণানুসারে উমরা করার সংকল্প করেন তাহলে হয় কুরাইশরা নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাবে নতুবা এদের ধ্বংস করে ছাড়বে। অতএব তাদের দৃষ্টিতে এ উমরা ছিল বিপজ্জনক, এ জন্য তারা

নিজেদের রক্ষা করল অথবা পালিয়ে যাওয়াটাই উত্তম বলে বিবেচনা করল এবং এ কথাও ভাবল যে, রসুলুল্লাহ যদি সাফল্য লাভ করেন তাহলে তাঁদের প্রত্যাবর্তনের পর কোনো অসমর্থতা পেশ করা অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে :

'হে নবী ! যে বেদুইনরা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তারা এখন তোমাকে বলবে : আমাদের সহায়-সম্পদ ও পরিজনেরা আমাদের বিরত রেখেছিল, আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলো : কে আছ যে, এখানে তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি, যদি এরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চায় অথবা তোমাদের কোনো উপকার করতে চায় ? আল্লাহ তার খবর রাখেন, যা কিছু তোমরা করো। এমন ছিল না ; বরং তুমি ভেবে নিয়েছিলে যে, রসুল ও তাঁর ঈমানদার সাথিরা নিজেদের বাড়িঘরে আর কখনো ফিরেই আসবে না, আর একথা তোমাদের অন্তরকে আনন্দ দিয়েছে আর তোমরা যা কিছু বুঝেছ এবং তোমরা ছিলে ক্ষতিগ্রস্ত লোক।' – আল ফাতাহ : ১১-১২

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাচ্চা মুসলমানরা ছিলেন, এঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪০০ এবং এ ছিল ৬ হিজরি সনের জিলকদ মাসের ঘটনা। তাঁরা লাব্বাইক লাব্বাইক[১] বলতে বলতে মক্কা থেকে দুমঞ্জিল আগে উসফান নামক জায়গায় গিয়ে যখন পৌছালেন তখন জানতে পারলেন যে, মক্কাবাসীরা কসম খেয়ে বসে আছে যে, তারা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তাদের সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তাদের সেন্যাধ্যক্ষ রয়েছে খালিদ বিন ওয়ালিদ।

চোখের সামনে যুদ্ধের দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগল। মুসলমানদের কখনোই ইচ্ছা ছিল না যে, এই পবিত্র ভূমির পথকে তাঁরা মৃতদেহ ও রক্তে রঞ্জিত করে তুলবেন আর মক্কাবাসীরও এ শোভনীয় ছিল না যে যুদ্ধ করতে তাদের বাধ্য করে। অনন্তর, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

'কুরাইশদের মুখে চুনকালি পড়ুক, যুদ্ধ তাদের অনেক আগেই গ্রাস করে নিয়েছে, যদি তারা আমাকে আরবদের শায়েস্তা করার জন্য ছেড়ে দিত তাহলে তাদের উদ্বেগের কী কারণ ছিল ? আর যদি আমাকে হত্যা করা হতো তাহলে তা হতো তাদের মনঃপূত, আর যদি আল্লাহ আমাকে তাদের উপর প্রভুত্ব দান করেন তাহলে তারা ইসলামে প্রবেশ করবে আর যদি তারা তা স্বীকার না করে তাহলে তারা যুদ্ধ করবে এবং তাদের সে শক্তিও আছে। জানি না, কুরাইশরা কী ভাবছে, আল্লাহর কসম ! সেই বস্তুর জন্য, যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য অবশ্যই জিহাদ করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বিজয় দান করবেন অথবা এই মস্তক ছিন্ন হয়ে যাবে।' –ইবনে ইসহাক

---

১. প্রভু, আমি হাজির আমি হাজির, আমি হাজির। –অনুবাদক

যুদ্ধে প্রবৃত্তিহীনতা সত্ত্বেও দুপক্ষই অগ্রসর হতে লাগল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানি করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করলেন :

'শত্রুদের পথ থেকে বাঁচিয়ে কে আমাদের হুদাইবিয়া পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করবে ?' –ইবনে ইসহাক

এক মুসলমান একটি রাস্তার ঠিকানা বলে দিলেন। তারপর ঐ পথ দিয়ে মুসলমানদের নিয়ে গেলেন এবং উপত্যকার কাছে একটি নরম ভূমিতে পৌঁছে দিলেন, ওখান থেকে মুসলমানরা ডান দিকে ঘুরে গেলেন যাতে মক্কার অবতলভূমি হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থান করতে পারেন।

এ কথা কুরাইশদের কাছে গোপন রইল না। অতএব, তারাও মক্কাভিমুখে ফিরে গেল, যাতে মুসলমানদের মক্কা প্রবেশে বাধা দিতে পারে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন সাথিদের নিয়ে নিশ্চিত পথের দিকে অগ্রসর হলেন কিন্তু তাঁর উটনী বসে পড়ল এবং সেখান থেকে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে রাজি হলো না। লোকেরা বড়ই আশ্চর্য হলেন এবং তখন তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'উটনী বসে পড়েছে।' রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'উট বসেনি, এটা তার অভ্যাসও নয় ; বরং সেই সত্তাই তাকে বিরত করেছেন, যিনি হাতিওয়ালাদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছিলেন। সেই সত্তার শপথ, যাঁর অধিকারে আমার জীবন, কুরাইশরা যদি আমার কাছে প্রার্থনা করে যাতে 'সিলা রহমী'[১] –মর্যাদা রয়েছে তাহলে আমি তা অবশ্যই স্বীকার করব। তারপর লোকদের ঐ স্থানে শিবির স্থাপনের আদেশ দিলেন, যেখানে উটনী তার যাত্রা বিরতি করেছিল। –বুখারী

মুসলমানরা যথাযথভাবে এই আদেশ পালন করলেন এবং ভবিষ্যতে মক্কার প্রবেশদ্বার খুলে দেয়ার আশায় প্রতীক্ষায় রইলেন। তাঁরা তাওয়াফ[২] ও সায়ী[৩] করার পর শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তন করবেন। তাঁর লক্ষ্য প্রাপ্তির পুরো ভরসাই ছিল। তাদের এই শঙ্কা কেনই বা জাগবে, যেখানে তাঁরা রসুলুল্লাহর কাছ থেকে বহুবার এই শুভ বার্তা শুনেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে 'হরম'-এ প্রবেশ করবেন এবং নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করাবেন।

কুরাইশরা মুসলমানদের সাহস দেখে হতোৎসাহিত হয়ে পড়ল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তাদের মক্কা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তা যত ক্ষতি স্বীকারই তাদের করতে হোক না কেন। এর কারণ এটাই ছিল যে, এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং তারা ভেবেছিল, যদি মুসলমানরা নির্দ্বিধায় মক্কা

---

১. নিজের নিকটতম আত্মীয়দের সহায়তা করা ও তাদের উপকার করা। – অনুবাদক

২. পরিক্রমা।

৩. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানো। অনুবাদক।

শহরে প্রবেশ করেন তাহলে জনসাধারণের মন থেকে তাঁদের প্রতি সম্মান ও সমস্ত রবদবা শেষ হয়ে যাবে। অন্যদিকে কুরাইশরা ভালোমতই জানত যে, যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ বিষয়ে কোনো প্রকারের তর্কাতর্কি নিজেদের লোকজন ও সহযোগীদের সামনে ছিল নিতান্তই নিরর্থক। এ ঘটনার সমাপ্তি এমন কোনো পরিণাম ডেকে আনতে পারত, যা তাদের অস্তিত্বই বিনাশ করে দিত। অতএব, মধ্যপন্থী লোকেরা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বার্তালাপ শুরু করলেন, যাতে এই বিপত্তি থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় বের করা যেতে পারে।

অনন্তর, সবার আগে বুদাইল বিন আরাকা খুজাই তার গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছেন ?'

রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমরা এখানে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি ; বরং আমরা উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছি।' এঁরা ফিরে গিয়ে বললেন :

'হে কুরাইশ লোকসকল ! তোমরা মুহাম্মদের বিষয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করছ ! তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি ; বরং কাবা দর্শনের জন্য এসেছেন।'

লোকেরা অভিযোগ করে বলল :

'যদিও তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি, কিন্তু মক্কা শহরে গায়ের জোরে প্রবেশ করতে পারবেন না। অতএব, আপনি তাঁর হয়ে ওকালতি করবেন না।'

তারপর কুরাইশরা মকরিজ বিন হাফসাকে প্রেরণ করল। তিনিও বুদাইলের মতো রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তর নিয়ে ফিরে এলেন।

তারপর লোকেরা হাবশি দলপতি হুলাইস বিন আলকামাকে পাঠিয়ে দিল, তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখেই রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন 'কুরবানির পশুগুলোকে দাঁড় করিয়ে দাও।' তিনি দেখলেন যে, কুরবানির পশুগুলোকে আদর করা হচ্ছে। –ইবনে ইসহাক

হুলাইস কুরবানির পশুদের দেখে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ না করেই ফিরে গেলেন এবং কুরাইশদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পুরো অবস্থাই বর্ণনা করলেন।

কুরাইশ : 'ওরে বেদুইন ! তুই বস। তুই কিছু বুঝিস নে।'

হুলাইস : '(ক্রুদ্ধস্বরে) ওরে কুরাইশ লোকসকল ! আমরা তোমাদের সাথে এই প্রতিজ্ঞা করিনি যে, যে ব্যক্তি কাবা দর্শনের জন্য এসেছেন আমরা তাঁকে বাধা দেব। সেই সত্তার কসম ! যাঁর অধিকারে হুলাইসের জীবন, যদি তোমরা মুহাম্মদকে বাইতুল্লাহ দর্শনে বাধা দাও তাহলে আমি সমস্ত হাবশিকে নিয়ে তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাব।'

কুরাইশ : 'আচ্ছা তুমি অযথা রুষ্ট হয়ো না। আমরা তাই করব, যাতে তুমি রাজি হয়ে যাও।' তারপর তারা উরওয়া বিন মাসউদ সকফীকে পাঠিয়ে দিল। উরওয়া চাচ্ছিলেন না যে, তিনি বার্তালাপ করতে যান এবং ফিরে এসে কুরাইশদের কাছ থেকে কষ্টদায়ক কথাবার্তা শোনেন। অতএব তিনি কুরাইশদের বললেন :

'কুরাইশ লোকসকল ! আমি দেখছি যে, যাকেই তোমরা পাঠাচ্ছ সে ফিরে এলেই তোমরা তাকে গালমন্দ ও যাচ্ছেতাই করছ। তোমরা জান যে, আমি তোমাদের পিতৃতুল্য আর তোমরা আমার সন্তানতুল্য। বর্তমান পরিস্থিতি আমি খুব ভালোমতই বুঝে নিয়েছি। আমার জাতি যদি আমার কথা শুনতে রাজি থাকে তাহলে আমি মুহাম্মদের সাথে বার্তালাপ করতে পারি।'

কুরাইশ : 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার সম্পর্কে আমাদের কোনো কু-ধারণা নেই।' উরওয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন :

উরওয়া : 'মুহাম্মদ ! আপনি কি এরকম কথা কখনো শুনেছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার জাতিকে ধ্বংস করেছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে ? কুরাইশরা আপনার মোকাবিলায় সপরিবারে এসেছে। তারা লোহা ও চামড়ার বর্ম পরিধান করে এসেছে আর চরম প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তারা আপনাদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। আল্লাহর কসম ! যারা আপনার সাথে এসেছে তারা বিভিন্ন গোত্রের লোকজন, মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তারা আপনাকে একলা ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে।'

হজরত আবু বকর, যিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসে ছিলেন, উরওয়ার এ কথা শুনে হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না এবং উপহাস করে বললেন, 'ওরে মূর্খ ! আমরা কী তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব ?'

উরওয়া : 'মুহাম্মদ ! এই ব্যক্তিটি কে ?

রসুলুল্লাহ : 'ইনি আবু কাহাফার পুত্র।'

উরওয়া : 'আবু বকর ! তোমার উপর যদি আমার কৃতজ্ঞতাবোধ না থাকত যার প্রতিদান আমি আজো দিতে পারিনি, তাহলে তোমার কথার উত্তর আমি অবশ্যই দিতাম।'

উরওয়া পুনরায় বার্তা শুরু করলেন। তিনি কথা বলতে বলতে বারবার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দাড়িতে হাত দিচ্ছিলেন। মুগিরা বিন শু'বা (উরওয়ার ভাইপো) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে দেহরক্ষীরূপে তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পৌত্তলিক চাচার এ আচরণ সইতে না পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন :

মুগিরা : 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারা থেকে হাতটা সরিয়ে নাও, নইলে তোমরা কাম তামাম করে দেব।'

উরওয়া : (ক্ষিপ্ত হয়ে) 'মুহাম্মদ এই ব্যক্তিটি কে ?'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : (মুচকি হেসে) 'এ তোমার ভাইপো মুগিরা।'

উরওয়া মুগিরাকে চিনতে পেরে বললেন : 'তুই কত বড় শত্রু ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ? তুই তোর কালকের অপরাধের কথা ভুলে গেছিস ?'[১]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উরওয়ার সমস্ত আশঙ্কা দূর করতে গিয়ে বললেন : 'আমরা তো কেবল বাইতুল্লাহ দর্শনের জন্য এসেছি, যেমনটি অন্য লোকেরাও করেন। অতএব, তোমরা এতে বাধা দিয়ো না।'

উরওয়া ফিরে গিয়ে সাহাবিদের আত্মনিবেদন ও তাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন :

'আল্লাহর কসম ! আমি কোনো সম্রাটকেও তার জাতির কাছে এতটা মর্যাদা ও সম্মানিত হতে দেখিনি, যেমনটি দেখেছি মুহাম্মদের প্রতি তাঁর সাথিদের সম্মান প্রদর্শন করতে। আমি এমন মানুষদের দেখেছি, যাদের কোনো অবস্থাতেই অবনমিত করা সম্ভব নয়। অতএব, তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে পুনর্বিবেচনা করো।

এই সমস্ত বার্তায় কুরাইশদের পক্ষ থেকে যারা অংশ নিয়েছিল তারা কুরাইশদের আচরণকে বিন্দুমাত্রও সমর্থন করল না ; বরং তারা মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহানুভূতি নিয়েই ফিরে এসেছিল এবং তারা তাদের ইবাদত ও কুরবানির অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিল। এরা একবাক্যে ঘোষণা করল যে, কুরাইশরা হিংসাগ্রস্ত ও হঠকারী ; সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাঁকে উপেক্ষা করছে। পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা তাদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করে দিয়েছে আর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মুসলমানদের এ সম্মানিত শহরে প্রবেশ করতে দেবে না, তা তার পরিণাম যাই হোক না কেন। এ দিকে মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ না করে কোনো সম্মানিত সমাধান খুঁজে বের করার কোশেশ করতে লাগলেন। এদিকে কিছু নাদান যুদ্ধের আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে চাইল কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও ভাবাবেগকে অনেক কষ্টে রুদ্ধ করে রাখলেন এবং তাঁরা সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সম্পূর্ণ শান্ত রয়ে গেলেন।

ইবনে আব্বাস বলেন, কুরাইশরা ৪০-৫০ জন লোক পাঠাল, তারা রসুলুল্লাহর সৈন্যদের লক্ষ রাখতে লাগল এবং সেখানেই চক্কর দিতে লাগল এবং

---

১. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুগিরা রাজিয়াল্লাহু আনহু কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। উরওয়া তাদের উত্তরাধিকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে এই বিপত্তি ঠাণ্ডা করেছিলেন। –লেখক

কোনো মুসলমানকে হাতে পেলে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় থাকল। কিন্তু এক পর্যায়ে তারা নিজেরাই মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে গেল এবং তাদের রসুলুল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হলো কিন্তু তিনি তাদের ক্ষমা করে দিলেন, যদিও তারা মুসলমানদের উপর তীর ও পাথর বর্ষণ করেছিল।

কুরাইশদের সংকীর্ণ-হৃদয়তা ও মুসলমানদের উদার হৃদয়তার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হলো :

'যখন কাফিররা নিজেদের হৃদয়ে পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করল, সে পক্ষ অজ্ঞানতার, অনন্তর, আল্লাহ তাঁর রসুলের উপর ঈমান গ্রহণকারীদের উপর নিজের বিশেষ শান্তি অবতারণ করলেন এবং তাঁদের পরহেজগারির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখলেন এবং তাঁরা এরই অধিকারী ছিলেন ও এরই যোগ্য এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।' – আল ফাতহ : ২৬

মুসলমানদের উপর শান্তি অবতারণের প্রত্যক্ষ উদাহরণ হলো এই যে, কুরাইশ প্রতিনিধিরা দিন রাত রসুলুল্লাহর কাছে আসছিলেন কিন্তু তাঁদের কোনো ভয় ছিল না, এর বিপরীতে মুসলমানদের বার্তাবাহকদের হত্যা করার আশঙ্কা থাকত। যদি হাবশিরা না বাঁচাতেন তাহলে খররাশ বিন উমাইয়া খুজাই রাজিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হতো।

কুরাইশরা তাঁর উটের কুঁচ কেটে দিয়েছিল। তিনি সেই আবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। যদিও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কুরাইশদের কাছে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, 'মুসলমানরা যুদ্ধ করতে আসেননি ; বরং ইবাদত করতে এসেছেন।'

বার্তাবাহক, প্রতিনিধিবৃন্দ এবং রাজদূতদের সংরক্ষণ ও আশ্রয়দান সভ্যতার একটি স্বাভাবিক রীতি, কিন্তু কুরাইশরা রোষ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিজেদের বোধবুদ্ধিও হারিয়ে ফেলেছিল।

মানুষ যখন বুদ্ধি ও বিবেকহারা হয়ে যায় তখন সে আত্মহত্যা করতেও পিছপা হয় না। মক্কার নেতৃবৃন্দ বিপথগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সে জন্য মুসলমানদের সাথে হঠকারিতার দুষ্পরিণামের কোনো চিন্তাই তাদের ছিল না। এর পরিণামে তাদের শুধু জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতিই নয় ; বরং মক্কা নগরের মর্যাদা, সম্মান ও পবিত্রতাও বিনষ্ট হতে পারত :

'আর যদি কাফিররা তোমার সাথে যুদ্ধ করত আর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে তা সত্ত্বেও তারা না পেত কোনো বন্ধু আর না পেত কোনো সাহায্যকারী।

এ হলো আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চলে আসছে এবং তোমরা কখনোই আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন হতে দেখবে না।' – আল ফাতহ : ২২-২৩

পরন্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি সমাধানে সাবধানতা অবলম্বন করলেন এবং মক্কাবাসীকে এ বিষয়ে সন্তুষ্ট করার পুনঃপ্রচেষ্টা চালালেন

যে তাঁদের কাবা দর্শনের সুযোগ দেয়া হোক এবং কুরবানি ও উমরা করে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হোক।

অনন্তর, রসুলুল্লাহ তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুকে কুরাইশদের কাছে পাঠাতে চাইলেন কিন্তু হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অপারগতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন : 'আল্লাহর রসুল ! আপনার জানা আছে যে, মক্কাবাসীরা আমার প্রতি কতটা রুষ্ট এবং তারা আমার কত বড় শত্রু ? মক্কায় আমার গোত্রের এমন কেউ নেই যে, আমাকে বাঁচাতে পারে। আপনি যদি উসমানকে পাঠান তাহলে ঠিক হয়, সেখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরাও আছেন।'

অনন্তর, হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আবান ইবনে সাইদ নামক এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং কুরাইশদের কাছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তা পৌঁছে দিলেন এবং মুসলমানরা মক্কায় কেন এসেছেন তার বাস্তব অবস্থাটি বর্ণনা করলেন। কিন্তু তারা একবাক্যে সকলেই জানিয়ে দিল যে, চাইলে আপনি তাওয়াফ করতে পারেন, অন্যেরা নয়।

হজরত উসমান জবাব দিলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছাড়া আমি কখনোই তাওয়াফ করব না।

উল্লেখ্য, মক্কাবাসীরা মুসলমান নারী-পুরুষদের বন্দি করে রেখেছিল। মক্কার বাইরে আটকে থাকা মুসলমানদের জন্য তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতির কারণে তারা খুবই হয়রান হয়ে পড়েছিলেন।

দেখতে দেখতে ইসলাম অনেক পরিবারে ছড়িয়ে পড়েছিল, ঐ বন্দিরা ইসলাম গ্রহণ করে সত্যকে স্পষ্টরূপে স্বীকার করার আশায় দিন গুনছিলেন আর ভাবছিলেন কুফরির কবল থেকে এঁরা কবে মুক্তি পাবেন।

অনুমিত হয় উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু ঐ বিবশ মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করে অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের সুবার্তা শুনিয়েছিলেন। কুরাইশরা দেখল যে, হজরত উসমান সীমা লঙ্ঘন করেছেন। অতএব, তারা তাঁকে রাজনৈতিকভাবে বন্দি[১] করার আদেশ দিল, এর পরিণামস্বরূপ মুসলমানদের মধ্যে হজরত উসমান হত্যার গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

---

১. এ ধরনের বন্দিকে এ যুগে রাজবন্দি বলা হয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে বন্দি। ইংরেজিতে একে বলা হয় Hostage যদিও এটা ছিল কুরাইশদের পক্ষে অনৈতিক। কেননা সভ্য দুনিয়ায় দূতকে হত্যা বা বন্দি করার কোনো রীতি নেই। সে যুগেও ছিল না। এ দৃষ্টান্ত অভিশপ্ত পৌত্তলিকদের নীতিহীনতাই প্রকাশ করে। সকল যুগের, সকল পৌত্তলিকের চরিত্র ও রীতি একই রকম। এ দৃষ্টান্ত পৌত্তলিকতার অন্যতম অভিশাপ। —অনুবাদক

এ খবর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছালে তিনি বললেন, উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত হব না। অতএব, তিনি এক ঘন সবুজ বৃক্ষের ছায়ায় লোকদের কাছ থেকে বাইয়াত নিতে শুরু করলেন। সাহাবা কিরাম এই প্রতিজ্ঞা বা বাইয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন আর বলছিলেন, দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ কাফিরদের সাথে জিহাদ করব এবং যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাব না।[১]

হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার দিন আমাদের বলেছিলেন : 'এই ধরিত্রীতে বসবাসকারীদের মধ্যে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ। ঐ সময়ে আমাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০, আজ যদি আমার চোখে আলো থাকত তাহলে ঐ বৃক্ষের স্থানটি তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।'[২]

হজরত জাবির রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, হাতিবের এক ক্রীতদাস রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এল এবং বলতে লাগল হাতিব অবশ্যই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'তুমি মিথ্যা বলছ, সে কখনোই জাহান্নামে যাবে না, সে তো বদরের যুদ্ধ ও উমরাএ হুদাইবিয়ায় শরিক ছিল।'[৩]

এই বাইয়াত ইতিহাসে বাইয়াতে রিজওয়ান নামে চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন :

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন (হে মুহাম্মদ !) তারা এক বৃক্ষের নিচে তোমার সাথে বাইয়াত করছিল, তারপর তিনি ঐ ঈমানদারদের উপর শান্তিবর্ষণ করলেন আর প্রতিদানে তাদের বিজয় দান করলেন, যা অনতিবিলম্বেই লাভ হতে চলেছিল।' – আল ফাতহ : ১৮

এই বৃক্ষ কেটে দেয়া হলো এবং তার স্থানও শেষ করে দেয়া হলো এবং এটাই ঠিক হলো, নইলে, ঐ স্থানে গম্বুজ অথবা গুমটি বানিয়ে দেয়া হতো আর লোকে তার দিকে দলে দলে ছুটে যেত। জনসাধারণ ঐ চিহ্ন ও অংশবিশেষের সাথে অনতিবিলম্বেই সম্বদ্ধ হয়ে যেত।

তারিক বিন আবদুর রহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, একবার আমি হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পথিমধ্যে কিছু লোককে নামাজ পড়তে দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কোন মসজিদ ? লোকেরা জবাব দিল, এ

---

১. ইবনে ইসহাক।
২. বুখারী।
৩. মুসলিম।

হলো সেই বৃক্ষের স্থান, যেখানে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইয়াতে রিজওয়ান সম্পন্ন করেছিলেন। সইদ বিন মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে পুরো ঘটনাই বর্ণনা করি। তখন তিনি বললেন, আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি ঐ বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলতেন, যখন আমি পরবর্তী বছরে সেখানে আসি তখন আমি তাকে ভুলে যাই এবং তাকে স্মরণ রাখতে পারিনি। তারপর সইদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন : 'হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি ঐ বৃক্ষের সাথে অপরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন অথচ তোমরা তা কীভাবে চিনে নিলে ? তার মানে ওর সম্পর্কে তোমরা বেশি জান !'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাত অন্য হাতে মারছিলেন আর বলছিলেন : 'এ উসমানের জন্য।'

কুরাইশরা হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বেশিদিন অবরুদ্ধ রাখতে পারল না। কেননা, তাদের শঙ্কা ছিল যে, উসমানকে কষ্ট দিলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। কেননা, তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে, তারা সুহাইল বিন আমরকে পাঠাল দ্রুত সন্ধিবার্তা দিয়ে।

এই সন্ধিতে তাদের আগ্রহ এটাই ছিল যে, মুসলমানরা এ বছর চলে যান। তারপর অন্য যে কোনো সময়ে হজ ও জিয়ারতের জন্য আসতে পারবেন, যাতে, সমস্ত আরব উপদ্বীপে কুরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কোনো আঁচড় না পড়ে।

রসুলুল্লাহ কুরাইশ প্রতিনিধিকে স্বাগত জানালেন। কেননা, তিনি সন্ধির জন্য বড়ই উৎসুক ছিলেন। যদিও তিনি তরবারির শক্তিতেও ফায়সালা করতে সামর্থ্য রাখতেন এবং বিরোধীপক্ষকেও তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্যও করতে পারতেন। সুহাইল বার্তা শোনালেন, তারপর শর্তাবলিও প্রস্তুত করলেন, যার ভিত্তিতে সন্ধি করতে চাচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ সহমত ব্যক্ত করলেন। এখন কেবলমাত্র এই সন্ধিপত্র সুরক্ষিত রাখা ছিল, যাতে দুপক্ষের স্বাক্ষর হতে বাকি ছিল।

শত্রু এবং মিত্রদের সাথে রসুলুল্লাহর আচরণের রীতি দেখে মুসলমানরা বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি শত্রুদের সাথে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করলেন, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা উচিত ছিল, আর আপন সাথিদের সাথে তিনি এমন আচরণ করলেন, যাতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। এই প্রস্তাবিত সন্ধির বিষয়ে তিনি তাঁর সাথিদের পরামর্শও নিলেন না। অথচ বিগত যুদ্ধ ও সন্ধিগুলোর বিষয়ে তিনি তাদের সাথে যথারীতি পরামর্শ করতেন। প্রায়শই তিনি যথেষ্ট অরুচির সাথে তাঁদের পরামর্শ মতো কাজ করেছেন কিন্তু আজকের এ মামলাটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ তিনি সেই বস্তুই স্বীকার করে নিচ্ছিলেন, যা তাঁর সাথিরা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না :

আমি আমার 'ইসলাম ও রাজনৈতিক দমন পীড়ন' নামক অন্য একটি গ্রন্থে উমরা-এ-হুদায়বিয়ার উপর আলোচনা প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করেছি এবং বলেছি যে, এসব বিষয়কে তিনি জনসাধারণের উপর ন্যস্ত করেননি ; বরং ইলহামের আলোকেই তিনি বিষয়টির স্পষ্টীকরণ ও সঠিক নিষ্পত্তি গ্রহণ করেছেন।

যে আল্লাহ উটনীকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত করেছিলেন, তিনি ইসলামী বাহিনীকে যুদ্ধের অনুমতি কীভাবে দিতে পারতেন ? যেখানে তিনি সন্ধির শর্তাবলিতে বিজয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন !

ইমাম জুহরী বর্ণনা করেন, যখন সন্ধি হয়ে গেল এবং তা লিপিবদ্ধ হতে বাকি রইল তখন হজরত উমর তা সইতে পারলেন না এবং তিনি হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'হে আবু বকর ! তিনি কি আল্লাহর রসুল নন ?'

আবু বকর : 'কেন নন ? নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রসুল।'

উমর : 'আমরা কি মুসলমান নই ?'

আবু বকর : 'হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই মুসলমান।'

উমর : 'তারা কি মুশরিক-পৌত্তলিক নয় ?'

আবু বকর : 'নিঃসন্দেহে তারা মুশরিক-পৌত্তলিক।'

উমর : 'তাহলে আমরা আমাদের ধর্মের এ অপমান কীভাবে সইতে পারি ?'

আবু বকর : 'উমর ! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালন করো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রসুল।'

অতঃপর তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং সেখানেও একই কথাবার্তা বললেন।

হজরত উমর : 'আপনি কি আল্লাহর রসুল নন ?'

রসুলুল্লাহ : 'কেন নয় ? আমি অবশ্যই আল্লাহর রসুল।'

হজরত উমর : 'আমরা কি মুসলমান নই ?'

রসুলুল্লাহ : 'নিঃসন্দেহে আমরা মুসলমান।'

হজরত উমর : 'তারা কি মুশরিক-পৌত্তলিক নয় ?'

রসুলুল্লাহ : 'এতে কি কোনো সন্দেহ আছে ?'

হজরত উমর : 'তাহলে এ অপমান আমরা কেন সইব ?'

রসুলুল্লাহ : 'আমি আল্লাহর বান্দা ও রসুল, আমি তাঁর আদেশের অন্যথা করতে পারি না। আর তিনি আমাদের কখনোই ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।'[১]

---

১. আহমদ।

তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আলীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, সবার আগে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম[১] লেখো।

সুহাইল বললেন, আমি কেবল 'বিসমিকাল্লাহুম্মা'-র সাথেই পরিচিত, কেবল এটাই লিখুন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ঠিক আছে, এটাই লেখো। এরপর লেখো :

'এ হলো সেই সন্ধিপত্র, যাতে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইল বিন আমরের সাথে করেছেন।'

সুহাইল : 'আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রসুল বলেই স্বীকার করতাম তাহলে কেনই বা অপনাকে বাইতুল্লাহ যেতে বাধা দিতাম আর আপনার সাথে কেনই বা যুদ্ধ করতাম ? আপনি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ না লিখে আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ লিখুন।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'আচ্ছা লেখো, এ হলো সেই প্রতিজ্ঞাপত্র, যাতে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সুহাইল বিন আমরের সাথে সন্ধি করছেন, দুজনেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ১০ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, দু'পক্ষই শান্তি অবলম্বন করবে এবং একে অন্যের উপর আক্রমণ চালাবে না। কুরাইশদের যে ব্যক্তি পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে মদিনা যাবে, তাকে ফেরত দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের ত্যাগ করে কুরাইশদের কাছে আশ্রিত হবে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।

আমাদের মধ্যে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত থাকবে, এই সময়কালের মধ্যে না কেউ অস্ত্র ওঠাবে আর না কেউ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে। কোনো ব্যক্তি বা গোত্র মুহাম্মদের সাথে সমাঝোতায় আসতে চাইলে তারও অনুমতি দেয়া হলো।

আপনি এ বছর ফিরে যান এবং মক্কায় প্রবেশ করবেন না, আগামী বছর আমরা মক্কা থেকে বাইরে চলে গেলে আপনারা মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে কেবলমাত্র তিন দিন অবস্থান করবেন আর আপনাদের সাথে খাপে ভরা তরবারি ব্যতীত অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারবে না।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো সন্ধিপত্র লেখাচ্ছিলেন, এমন সময় স্বয়ং সুহাইলের পুত্র আবু জুন্দল বেড়ি পরিহিত অবস্থায় বন্দিদের থেকে বেরিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হলেন, যিনি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বংশীয় লোকদের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতিত হয়ে চলেছিলেন। এ সময়ও তিনি লোহার বেড়ি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন।

---

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আরম্ভ– যিনি অসীম দয়ালু, অতীব কৃপাবান। অর্থাৎ হে আল্লাহ ! তোমার নামে শুরু।

মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। কেননা, রসুলুল্লাহ তাঁদের স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি মক্কা বিজয় সম্পন্ন করে শহরে প্রবেশ করে কাবা দর্শন করছেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন যে, প্রত্যাবর্তন, সন্ধি এবং সমঝোতার কথা হচ্ছে এবং সুহাইলের পুত্রকে তার হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে তখন তাঁদের বড়ই কষ্ট হলো এবং ধৈর্যচ্যুতির উপক্রম হলো।

সুহাইল তার পুত্রকে দেখে তার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগলেন এবং রসুলুল্লাহকে বললেন, এই ব্যক্তির আগমনের পূর্বেই আপনার সাথে আমার সন্ধির শর্তাবলি নিশ্চিত হয়ে গেছে। অতএব, একে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'তুমি ঠিক বলেছ একথা শুনে সুহাইল তার পুত্রকে টেনে-হিঁচড়ে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। আবু জুন্দল রাজিয়াল্লাহু আনহু নিদারুণ আর্তকণ্ঠে মুসলমানদের আহ্বান করে চিৎকার করে বললেন :

'হে ইসলামের অনুসারীগণ ! আফসোস ! আমি মুশরিক-পৌত্তলিকদের হাতে বন্দি হতে চলেছি ! এরা আমাকে ধর্মচ্যুত করে ছাড়বে।'

এ কথা শুনে লোকদের দুঃখকষ্ট-যন্ত্রণা খুবই বেড়ে গেল। আল্লাহর রসুল আবু জুন্দলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :

'হে আবু জুন্দল ! ধৈর্য ধারণ করো আর আল্লাহর প্রতি আশা রাখো যে, তিনি তোমার দুর্বল সাথিদের জন্য মুক্তির কোনো উপায় বের করে দেবেন। আমরা শত্রুদের সাথে সন্ধি করে ফেলেছি, আর তারা আমাদের আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিয়েছে, আর আমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারি না।'

সন্ধি কার্যকর হয়ে গেল। বনু খুজাআরা মুসলমানদের সাথে সহ-প্রতিজ্ঞ হয়ে গেলেন। আর বনু বকররা কুরাইশদের সাথে সহ-প্রতিজ্ঞ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল এবং সন্ধির শর্তও নির্দিষ্ট হয়ে গেল।[১]

এ সমস্ত শর্তাবলি আপাতদৃষ্টিতে দেখলে ভ্রমে পতিত হতে হয় এই ভেবে যে, মুসলমানদের অবদমিত করা হয়েছে এবং কুরাইশদের অহঙ্কার, ঘৃণা, ঔদ্ধত্য ও অজ্ঞানতাপূর্ণ ধ্যান-ধারণার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে এবং তাদের প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। অতএব, সাহাবিরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে রসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'হে আল্লাহর রসুল ! এই শর্তে কীভাবে সন্ধি করা যেতে পারে যে, মুসলমানদের কেউ কুরাইশদের কাছে চলে গেলে ফিরিয়ে দেবে না অথচ তাদের কেউ আমাদের কাছে এলে ফিরিয়ে দিতে হবে ?'[২]

---

১. ইবনে ইসহাক, আহমেদ।

২. বুখারী।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শর্তের ব্যাখ্যা এভাবে করলেন, যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে কাফির অবস্থায় তাদের কাছে চলে যাবে, তার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ এই অপবিত্রতা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করুন। কিন্তু যে দুর্বল মুসলমানরা এখনো পর্যন্ত কুরাইশদের ওখানে রয়ে গেছে, স্বয়ং কুরাইশরাই তাদের জন্য পেরেশান হয়ে যাবে, যেমনটি এর আগেও তারা হয়েছিল এবং এর দ্বারা অন্তত মুসলমানরাই লাভবান হবেন।

এবং এটাই কি প্রকৃত সত্য ছিল না যে, রসুল ও তাঁর সাথিরা দুর্বল ছিলেন এবং আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন এবং তাদের সামনেই কুরাইশদের অপমানিত করে দিয়েছেন। মুসলমানদের আরো একবার আশার আলো নিভে গেল এবং তাঁদের উপর হতাশার কালো মেঘ ছেয়ে গেল। তাদের মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছিল, অথচ তাঁরা তা না করে ফিরে চলেছিলেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ এ কথা স্পষ্ট করতে গিয়ে বললেন, তোমরা পরবর্তীতে প্রবেশ করবে, যেমনটি তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তোমাদের তো একথা বলা হয়নি যে, তোমরা এই বছরেই প্রবেশ করবে।

এই সন্ধির ফলে মুসলমানদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল এবং তারা শোকার্ত ও উদ্যমহীন হয়ে পড়লেন। সন্ধি স্বাক্ষর হয়ে যাওয়ার পর রসুলুল্লাহ সাহাবিদের কুরবানি করার আদেশ দিলেন, যাতে উমরা খুলে যায় এবং মদিনায় ফিরতে পারেন, তিনি মস্তক মুণ্ডনেরও আদেশ দিলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিলেন না, এমনকি, তিনি তিনবার আদেশ দিলেন। যখন তিনি এই অবস্থা দেখলেন, তখন মুমিন জননী উম্মে সালমা রাজিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলেন এবং পুরো বৃত্তান্ত শোনালেন। মুমিন জননী হজরত উম্মে সালমা রাজিয়াল্লাহু আনহা পরামর্শ দিলেন যে, যদি আপনার কুরবানি করতে হয় তাহলে আপনি নিজেই তা করে ফেলুন এবং মস্তকও মুণ্ডন করুন, তখন লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনাকে অনুসরণ করবেন।

অনন্তর, তিনি বাইরে এলেন এবং কাউকে কোনো কথা না বলেই কুরবানি করলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করলেন। এ দৃশ্য দেখে মুসলমানদের অবাধ্যতা দূর হয়ে গেল, তাদের হুঁশ ফিরে এল এবং আদেশ অমান্যতার বিপদ অনুভূত হলো। তাঁরা তৎক্ষণাৎ কুরবানি করার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করলেন এবং একে অন্যের মস্তক মুণ্ডনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাদের অবস্থা দেখে মনে হলো লোকাধিক্যের কারণে তাঁরা একে অন্যের মস্তক ছিন্ন করে ফেলবেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে সু বা কু যে উদ্দেশ্য কাজ করছিল, অতি শীঘ্রই তার ভালো বা মন্দ পরিণাম বেরিয়ে আসতে লাগল। এই সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর বেশি দিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুশরিক-পৌত্তলিকদের কঠোর ব্যবস্থাগুলো তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর বলে সিদ্ধ হতে লাগল। অনন্তর, তারা লৈখিক

ও মৌখিকভাবে তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বারবার অভিযোগ জানাতে লাগল। অথচ ঐ সমস্ত শর্ত তারা নিজেরাই আরোপ করেছিল অথবা তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্য যা তাদের করতে বাধ্য করেছিল।

মুসলমানরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকৃত সন্ধির সুপারিশগুলো সচকিত হয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর দূরদর্শিতার প্রাচুর্য দেখে তাঁদের চোখ ঝলসে উঠতে লাগল এবং তাঁদের অন্তর ও বাইরে থেকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা বেরিয়ে আসতে লাগল।

এই সন্ধি সম্পাদিত হওয়ামাত্রই সমগ্র আরবদেশে কুফরি ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। কুরাইশদের নতুন দ্বীনের বিরোধী ও শত্রু এবং কুফরির ঠিকাদার বলে মনে করা হতো। যখন মুসলমানদের সাথে সন্ধির খবর ছড়িয়ে পড়ল তখন মুনাফিকদের বিপত্তিকর কার্যক্রমও ঠাণ্ডা হয়ে পড়তে লাগল, যারা কুফরি কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেত এবং মূর্তিপূজক গোত্রগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকত। কুফরি ব্যবস্থা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল যে, তাদের স্বার্থবাদী নীতি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তারা ব্যবসায়িক বিষয়গুলোও নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখতে শুরু করেছিল, ফলে তারা মিত্র এবং সহযোগী গোত্রগুলোর সাথে সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হচ্ছিল। অথচ অন্যদিকে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রম অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছিল এবং বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, ইসলামে প্রবেশ করা ইত্যাদি পথ খুব সুগম হয়ে উঠেছিল।

বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বিজয়ের সন্ধি বলে অভিহিত করেন ; বরং ইমাম জুহরী বলেন, এমন মহিমান্বিত বিজয় মুসলমানরা এর আগে আর কখনো লাভ করেননি। যেখানে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে মানুষ একে অন্যের সাথে মিলিত হতে পারতেন না, সেখানে এই সন্ধির কারণে এ অবস্থার অবসান ঘটল এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিস্থিতি আর থাকল না, সর্বত্রই একটা শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি হলো। যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন, তারা এবার ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে তা পালন করতে লাগলেন। পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও উত্তেজনার অবসান ঘটল। যার মধ্যে সামান্যতম বোধবুদ্ধিও ছিল তারা অতি সহজেই ইসলামে প্রবেশ করল, যার প্রভাবে হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত এতসংখ্যক মানুষ মুসলমান হলো যে, শুরু থেকে ঐ সময় পর্যন্ত আর হয়নি।

ইবনে হিশাম বলেন, ইমাম জুহরীর কথার সত্যতার প্রমাণ এটাই যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত মাত্র ১৪০০ মুসলমান তাঁর সাথে ছিলেন কিন্তু মক্কা বিজয়ের সময় ছিলেন ১০,০০০।

মক্কার উৎপীড়িতদের মধ্যে আবুল বসির উবাইদ বিন উসাইদও অন্যতম ছিলেন। মুশরিক-পৌত্তলিকদের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে তিনি মুসলমানদের সাথে বসবাসের জন্য মদিনায় পৌঁছালেন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁকে ধরে আনার জন্য দু'জন লোক পাঠাল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

'হে আবুল বসির ! আমরা এদের সাথে যে সন্ধি করেছি তা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে এবং আমরা আমাদের দ্বীনের প্রশ্নে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে অভ্যস্ত নই, আল্লাহ তোমার এবং তোমার নির্যাতিত সাথিদের জন্য নিশ্চয়ই কোনো পথ বের করে দেবেন। অতএব, তোমার জাতির কাছে ফিরে যাওয়াটাই তোমার জন্য উত্তম।'

আবুল বসির : '(শোকার্ত ও অসহায়ভাবে) হে আল্লাহর রসুল ! আপনি কি আমাকে মুশরিক-পৌত্তলিকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ? যারা আমাকে ধর্মচ্যুত করতে চাচ্ছে !'

তাঁর বারবার আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও তিনি আর কিছুই বললেন না এবং তাঁকে দুই পৌত্তলিকের হাতে তুলে দিলেন আর তারা তাকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

আবুল বসির তাঁর ভয়ংকর পরিণামের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত হলেন না। তিনি পথিমধ্যে এক কুরাইশের তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করলেন আর অন্যজন প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে রসুলুল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা অবগত করাল। এরপর আবু বসিরও গলায় তরবারি ঝুলিয়ে রসুলুল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলেন :

'হে আল্লাহর রসুল ! আপনি তো প্রতিশ্রুতি পূরণ করে আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আর আমি আমার ধর্মকে বিপত্তির কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করেছি।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'উৎপীড়িতের সাথে আরো কিছু লোক ছুটে গেলে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে।'[১]

আবুল বসির বুঝে গেলেন যে, মদিনায় থাকার কোনো সুযোগ নেই এবং মক্কায় তো শান্তির কোনো প্রশ্নই নেই। অতএব, তিনি লোহিত সাগরের তীরে 'ঈজ' নামক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এই স্থান অতিক্রম করে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করত। মক্কার উৎপীড়িত মুসলমানরা একথা জানতে পারলেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাও অবগত হলেন, তখন তারা গোপনে মদিনায় গিয়ে আবুল বসিরের ওখানে একত্রিত হতে লাগলেন

---

১. বুখারী।

এবং দেখতে দেখতে এদের সংখ্যা ৩০-এ পৌঁছে গেল। এদের অন্যতম ছিলেন সুহাইল বিন আমরের পুত্র আবু জুন্দলও।

এই উৎপীড়িত মুসলমানরা ছোট একটা সেনাদলের রূপ পরিগ্রহ করলেন এবং কুরাইশদের জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ করে তুললেন। তারা কাফিরদের দেখামাত্রই হত্যা করতেন আর ব্যবসায়ীদের ধনসম্পদ লুট করে নিতেন।

কুরাইশরা নিরুপায় হয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে এই বলে দূত প্রেরণ করল যে, আমরা এদের আপনার কাছে ডেকে নেয়ার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। আর কোনো ব্যক্তি আমাদের এখান থেকে আপনার কাছে চলে গেলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি আর জানাব না। এভাবে সেই শর্তের প্রতি কুরাইশরা আপনা-আপনিই বিরক্ত হয়ে গেল, যাকে মুসলমানরা অপছন্দ করতেন।

আবুল বসির, আবু জুন্দল ও তাঁর সাথিদের এই ঘটনায় বড় ইনকিলাবি শিক্ষা নিহিত আছে। এই শত্রুদের নিকৃষ্ট অপকর্ম ও বর্বর আচরণের বিরুদ্ধে এ হলো আকিদার যুদ্ধের এক কাহিনী। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ঈমান তাদের অন্তরের কত গভীরে স্থান করে নিয়েছিল এবং ইখলাস[১] তাদের বুককে কীভাবে পূর্ণ করে তুলেছিল। তারা 'সেই রুহানী'[২] সহযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, যা রসুলুল্লাহর সঙ্গ ও মুসলিম সমাজ থেকে প্রাপ্তব্য ছিল কিন্তু এর পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব[৩]-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকায় ও তারই ভিত্তিতে জীবনাচার পরিচালিত হওয়ায় তারা চিন্তা ও কর্মে সমভাবে আলোকমান ছিলেন। অতএব, এঁরা সত্যের পথে অত্যাচার ও বর্বরতার বিরুদ্ধে এবং কাফির শত্রুদের বিরুদ্ধে জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক আদর্শ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

হজরত আবুল বসির রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে আর উপস্থিত হতে পারেননি। মদিনায় ফিরে আসার আদেশ তিনি তখন পেয়েছিলেন, যখন তাঁর জীবনের অন্তিম সময় তাঁর শিয়রে উপস্থিত হয়েছিল। হজরত মূসা বিন উকবা হতে বর্ণিত হয়েছে, আবুল বসিরের সাথিরা এক বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ চালালেন, যাতে আবুল আস, রসুলুল্লাহর জামাইও ছিলেন, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি আবুল আসকে বাদ দিয়ে সবাইকে বন্দি করলেন, আবুল আস তাঁর পত্নী হজরত জয়নবের কাছে গেলেন এবং এই দুর্ঘটনার কথা জানালেন, সেই সাথে সেই সহায় সম্পত্তির কথাও বললেন, যা লুট হয়ে গিয়েছিল। হজরত জয়নব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ কথা জানালেন, তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন :

---

১. গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ বিশ্বাস

২. আত্মিক।

৩. কুরআন।

'আমরা কিছু লোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছি। আবুল আস আমাদের জামাই এবং সে আমাদের ভালো একজন জামাই। সে কুরাইশদের কিছু লোকের সাথে সিরিয়া থেকে প্রত্যাগমন করছিল, আবু জুন্দল ও আবুল বসির তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেয় এবং তাদের সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। আমার কন্যা জয়নব আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে যে, আমি তাকে আশ্রয় দিই। অনন্তর, মুসলমাগণ ! তোমরা আবুল আস ও তার সাথিদের ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছ ?'

মুসলমানরা বলল : 'আমরা প্রস্তুত আল্লাহর রসুল !'

একথা ধীরে ধীরে আবু জুন্দল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতএব, তিনি সমস্ত বন্দিকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাদের সমস্ত সহায় সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন, এমনকি সামান্য একটি দড়ির টুকরা পর্যন্তও বাদ গেল না।

এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি পত্র আবুল বসিরের কাছে পৌঁছে গেল, যাতে তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, ঐ স্থানটি ত্যাগ করে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করো। সেই সময়ে আবুল বসিরের জীবনের অন্তিম ক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল এবং রসুলুল্লাহর সম্মানিত পত্রখানি বুকের উপর রেখে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং আবু জুন্দল তাঁকে ঐ অবস্থায় দাফন করলেন।

আবুল আস সমস্ত মালপত্র নিয়ে মক্কায় ফিরে এসে তাদের মালিকদের তা বুঝিয়ে দিলেন এবং যখন তা সম্পন্ন হয়ে গেল তখন তিনি প্রশ্ন করলেন :

'কুরাইশ লোকসকল ! আর কারো জিনিস কি বাকি আছে, যা আমি ফিরিয়ে দিইনি ?'

লোকেরা বলল : 'না। আল্লাহ তোমাকে প্রতিফল দান করুন। আমরা তোমাকে একজন সৎ ও প্রতিজ্ঞানিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পেয়েছি।'

আবুল আস : 'আল্লাহর কসম ! আমি মক্কায় ফিরে আসার আগে এজন্যই ইসলাম গ্রহণ করিনি, যাতে তোমরা মনে করতে পারতে যে, তোমাদের সম্পদ ফিরিয়ে না দেয়ার জন্য আমি নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছি। অনন্তর, এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল।'

এরপর আবুল আস মদিনায় চলে এলেন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর পত্নী জয়নব রাজিয়াল্লাহু আনহাকে ফিরিয়ে দিলেন। কেননা, ধর্ম বিরোধের কারণে দু'জনে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন ; কিন্তু পুনরায় বিয়ে পড়ানো হয়নি।

সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর যে মহিলারা মুসলমান হয়ে মদিনায় এসে পৌঁছান, মুসলমানরা তাঁদের অভিভাবকদের কাছে তাঁদের ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার

করলেন। এর কারণ হয় এটাই ছিল যে, তাঁদের দৃষ্টিতে সন্ধি ছিল কেবল পুরুষদের জন্য নতুবা এই নও-মুসলিম মহিলাদের বিষয়ে তাদের শংকা ছিল যে, তাঁরা কষ্ট-যাতনার মোকাবিলা করতে পারবেন না। কেননা, আবু জুন্দল ও আবুল বসিরের ন্যায়, কাফিরদের জীবন বিপন্ন করে তোলার ক্ষমতা তাঁদের মধ্যে ছিল না।

কারণ যাই হোক না কেন, মুসলমান মহিলাদের মক্কায় ফিরিয়ে দেয়া হলো না এবং মুসলমানদের এ দায়িত্ব নিশ্চিত করে দেয়া হলো যে, তাঁরা যেন তাঁদের মুশরিক-পত্নীদের ফিরিয়ে না নেন ; বরং তাদের ক্ষতি পূরণের জন্য পর্যাপ্ত ধন দিয়ে দিন, যাতে তারা অন্যত্র বিয়ে শাদি করতে পারে।

আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে আপনাপন পত্নীদের গ্রহণ করাটা হবে অতি উত্তম কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

'হে ঈমান গ্রহণকারীগণ ! যখন তোমাদের কাছে ঈমান গ্রহণকারিণী স্ত্রীরা হিজরত করে আসে তখন তাদের পরীক্ষা করে নাও– আল্লাহ তাদের ঈমানকে ভালোমতই জানেন–তারপর যদি তারা তোমাদের কাছে ঈমানদার বলে প্রতীত হয় তাহলে তাদের কাফিরদের দিকে আর ফিরিয়ে দিয়ো না। তারা না তাদের ('কাফিরদের') জন্য হালাল আর না তারা তাদের 'স্ত্রীদের' জন্য হালাল।' – আল মুমতাহিনা ১০

এই আয়াত আদেশ ও অনুজ্ঞার সাথে সেই মানসিক স্বাধীনতা ও সম্মানজনক নৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিও ইঙ্গিত করে, যা থেকে এক মহিলা ইসলামী সমাজে লাভান্বিত হন। এ ঘটনা যদি আধুনিক যুগে সংঘটিত হতো তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনমত বড়ই বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করত যে, এর অনুসন্ধান কে করবে ? পরীক্ষক নারী হবে না পুরুষ হবে ? যদি সে পুরুষ হয় তাহলে সে বৃদ্ধ না যুবক হবে ? অথবা স্ত্রীর পরীক্ষা সামনে হবে না পর্দার পিছন থেকে ?

দুই
খয়বরের যুদ্ধ

এখন মুসলমানদের সামনে কিছু নতুন শত্রু অবশিষ্ট রয়ে গেল। একে তো সেই বেদুইন, যারা পাহাড়ি এলাকা ও টিলাগুলোতে বিভ্রান্তের মতো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল, এরা কত না বুদ্ধিহীন ছিল। যেখানেই এরা সবুজ উপত্যকা পেল সেখান থেকে তারা আরো দূরে আরো পিছনে রয়ে গেল, ঈমান ও পরলোকের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ ছিল না।

অন্যদিকে রয়ে গেল বনি ইসরাইলিরা, যারা নবুয়তকে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে ভেবে রেখেছিল। তারা নিরন্তর মুসলমানদের পিছনে লেগে রইল এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করে চলল। তওরাত থেকে প্রাপ্ত কিছু ছিলকা তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল, তারা মুসলমানদের সাথে লম্বা-চওড়া বাহাস করত আর সর্বদাই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেত যেন তাদের মুখ থেকে কোনো স্বীকারাত্মক বাক্য না বেরিয়ে যায়। তারপর তারা ফাসাদ ছড়িয়ে দিত তা সে তার লক্ষ তারা নিজেরাই বনে যাক না কেন। যেমনটি বিগত পৃষ্ঠাগুলোত উল্লিখিত হয়েছে। তাদের চরিত্রে ঘৃণা, তিরস্কার, অহংকার, হঠকারিতা ইত্যাদি বিচিত্র 'গুণ'-এর সমাবেশ লক্ষ করা যেত। যদিও মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে তাদের শরীরে কষাঘাত বর্ষিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভ্রান্তি সৃষ্টিতে এবং তা খণ্ডন করার নীতি থেকে তারা লেশমাত্রও পিছু হটতে প্রস্তুত ছিল না।

ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মূর্খ বেদুইন ও কিতাবধারী ইহুদিরা সহমত হয়ে গেল। অনন্তর, যখন আক্রমণকারী দল মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হলো এবং বনু কুরাইজাদের নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষময় পরিণাম ভুগতে হলো তখনও খয়বরের ইহুদিরা নীরব থাকতে পারল না এবং মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থির করার পরিবর্তে তারা 'গাতফান' ও আশপাশের বেদুইনদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে লাগল, যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এক নতুন মোর্চা গঠনের পথ সুগম হয়ে যায় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। তারপর ৬ হিজরি সনের শেষে 'উমরা-এ-হুদাইবিয়া' থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৭ হিজরি সনের প্রথম মাস মুহররমে খয়বর অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করা হলো, যাতে ইহুদিদের সমস্ত শক্তি ও দম্ভ চূর্ণ করে দেয়া যেতে পারে।

মুসলমানরা ইহুদি ও বনু গাতফানদের সংযুক্ত মোর্চার মোকাবিলা থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে সুকৌশলে গাতফান গোত্রকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিলেন। তাদের মধ্যে ভ্রম সৃষ্টি করা হলো যে, মুসলিম বাহিনী তাদের প্রতিই অগ্রসর হচ্ছেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, বনু গতফানরা যখন জানতে পারল যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বরে শিবির স্থাপন করেছেন তখন তারা ইহুদিদের কাছে সাহায্যের জন্য যাত্রা করল, যখন এক মনজিল পথ অতিক্রম করল তখন তারা ভ্রমে পতিত হলো যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের ছেড়ে তাদের দমন করার সংকল্প করে নিয়েছেন। অতএব, তারা তৎক্ষণাৎ ফিরে গেল এবং আপনাপন পরিবার-পরিজনদের নিয়ে রসুলুল্লাহকে খয়বরের ইহুদিদের দমন করার জন্য ছেড়ে চলে গেল।

এভাবে খয়বরের ইহুদিদের তাদের মুশরিক-পৌত্তলিক সহযোগীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার নীতি সফল হয়ে গেল। যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বরের দুর্গগুলোর কাছে পৌছালেন তখন সাহাবিদের সেখানে অবস্থানের জন্য আদেশ দিলেন এবং এই দু'আটি পাঠ করলেন :

'হে আল্লাহ ! আকাশমণ্ডলী ও তার সমস্ত বস্তুর প্রভু, যাদের উপর তিনি ছায়া হয়ে বিরাজ করছেন, ধরিত্রী ও তার সমস্ত বস্তুর প্রভু, যাকে তিনি উর্ধ্বে তুলে দিয়েছেন, শয়তান ও তার সমস্ত বস্তুর প্রভু, যাদের তিনি বিপথগামী করতে পারেন, হাওয়া ও তার সমস্ত বস্তুর প্রভু, যা সে উড়িয়ে নিয়ে ফেরে। আমরা তোমার কাছে এই লোকালয় ও তার নিবাসীদের আর এর সমস্ত বস্তুর জন্য কল্যাণ কামনা করছি আর তোমার দ্বারা এর অনিষ্টতা থেকে এর অধিবাসীদের শর থেকে আর এর সমস্ত বস্তুর শর বা আঘাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১]

তারপর তিনি আদেশ দিলেন : 'আল্লাহর নামে অগ্রসর হও।'

অনুমান হয় যে, ইহুদিরা মনে করছিল মুসলমান সৈন্যরা বনু গাতফানদের ওদিকে যাচ্ছে। অতএব, তারা নিশ্চিন্ত হয়ে কোদাল-ফাওড়া ইত্যাদি নিয়ে ফসল ক্ষেতের দিকে যেতে লাগল, কিন্তু মুসলমান সৈন্যদের নিজেদের দিকে অগ্রসর হতে দেখে তারা দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে চিৎকার করতে লাগল : 'মুহাম্মদ সসৈন্য এসে পড়েছেন।'

ইহুদিরা মুসলিমদের পদ্ধতি অনুসরণ করে খোলা ময়দানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পছন্দ করত না। তারা এই প্রকারের যুদ্ধের বিরোধী ছিল। তারা কেবল দেয়ালের আড়াল থেকে গোলাগুলি ও তীরবর্ষণ করতে অভ্যস্ত ছিল।

এ কী ভৌতিক মোহ ! যা জীবনের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা ও মৃত্যুভয়েরই পরিণাম ছিল ?

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন যে, তারা দুর্গগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে তখন তিনি তাদের আতঙ্কিতও ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে বললেন :

'আল্লাহু আকবর' ! খয়বর ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করি তখন ভীতসন্ত্রস্ত লোকদের প্রাতঃকাল বড়ই খারাপ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।[২]

দুষ্কর্মী লোকালয়গুলো অতি শীঘ্রই অথবা অনতিবিলম্বেই ধ্বংস হয়ে যায়। হাদিসে আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যখন কোনো

---

১. ইবনে হিশাম।

২. বুখারী।

লোকালয়ে সুদ ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা নিজেদের আল্লাহর প্রকোপ বর্ষণের জন্য হালাল করে দেয়।'[১]

ইহুদিদের এখানে এ সমস্ত অপকর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজও পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে এরা সুদখোর মহাজনরূপেই পরিচিত। এরা অপকর্ম ও নির্লজ্জতার আহ্বায়ক। এদের মহিলারা কোনো অপরিচিত পুরুষের সাথে একান্ত বাসকে মন্দকাজ বলে মনে করে না। তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা নৈতিকতা ও সুশীলতার সাথে ভালোমতই পরিচিত কিন্তু এদের সংখ্যা নামমাত্র :

'আর মূসার জাতির মধ্যে একটি দল এমনও আছে, যারা হক অনুসারে পথ প্রদর্শন করে আর সেই অনুসারে ইনসাফ করে।' – আল আরাফ : ১৫৯

পরন্তু স্পষ্ট যে, এই ন্যূনতা সত্ত্বেও এ সবের আধিক্য কোনো জাতির ভাগ্য ও তার পরিণামকে নিশ্চিত করে দেয়।

মুসলমানরা ইহুদিদের সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে দিলেন এবং একের পর এক দুর্গের পতন ঘটিয়ে আপন প্রভুত্বকে সুদৃঢ় করে চললেন। ইহুদিরা আত্মরক্ষার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাল। কেননা, খয়বর এলাকাটি সবচেয়ে বেশি উর্বর ও সবুজ বনানীতে পূর্ণ ছিল এবং রক্ষার দৃষ্টিতে তা ছিল অদ্বিতীয় একটি এলাকা।

একদিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দেব, যে আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাকে ভালোবাসেন। লোকেরা এই প্রতীক্ষায় রাত অতিবাহিত করলেন যে, এই সৌভাগ্য কে লাভ করেন ?

সকালবেলা লোকেরা এই আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পতাকা তাঁকেই প্রদান করলেন। হজরত আলী নিবেদন করলেন :

'হে আল্লাহর রসুল ! আমি ততক্ষণ যাবৎ যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না তারা বিধ্বস্ত হয়।'

তিনি বললেন : 'দাঁড়াও ! প্রথমে তাদের দুর্গে প্রবেশ করবে, তারপর তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে এবং আল্লাহর বিধান অবগত করাবে। আল্লাহর কসম ! যদি তোমার মাধ্যমে একটি লোককেও আল্লাহ হেদায়েত দান করেন তাহলে তোমার জন্য তা হবে লাল উটের চেয়েও উত্তম।[২]

---

১. হাকিম।

২. বুখারী, মুসলিম।

রসুলুল্লাহর এই উপদেশের অভিপ্রায় এটাই ছিল যে, গনিমতের মাল বা ভৌতিক লাভালাভ থেকে মুসলমানরা যেন বিমুখ থাকেন। কেননা, পরাজিত করার পর ইহুদিদের দিক থেকে প্রচুর সম্পদ লাভের সম্ভাবনা ছিল। তা সত্ত্বেও যদি তারা হিদায়াত লাভ করত তাহলে মুসলিম সৈনিকেরা যে সুফল লাভ করতেন তা হতো সে সম্পদের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান।

ইহুদিরা যদি ঐশ্বরিক আদেশ মেনে নিত এবং তাদের হীন অপকর্ম ও ঘৃণ্য আচরণ ও ষড়যন্ত্রের পথ ত্যাগ করত তাহলে অন্যেরা যেমন তা থেকে রেহাই পেত তেমনি নিজেরাও শান্তি পেত। কিন্তু তারা যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনো পথ অবলম্বন করল না। অনন্তর, হজরত আলী অত্যন্ত জোরালো আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। যার ফলে কেল্লা ধ্বংস হলো এবং মুসলমানরা তা অধিকার করে নিলেন।

ইহুদিদের মযহাব নামক এক প্রসিদ্ধ পালোয়ান নিজ বংশের গৌরব গাথা আবৃত্তি করতে করতে মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হলো :

'খয়বরবাসী ভালোই জানেন মযহাব আমি জিন্দাবীর।
শত্রুর কাছে কখনো আমি আনত করি না আমার শির ॥
কখনো আমি বর্শা চালাই, কখনো চালাই এ তরবার।
ক্রুদ্ধ হলে ব্যাঘ্র মারি অস্ত্র চালাই সু-ক্ষুরধার ॥'

এক বর্ণনায় আছে, হজরত আলী বিন আবি তালিব তাকে নিপাত করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদ বিন মুসলিমা তাকে হত্যা করেন। মুহাম্মদ বিন মুসলিমার ভাই অবরুদ্ধ থাকার সময়ে উপর থেকে যাঁতার একটি পাটা তাঁর উপর ফেলে দেয়া হয় এবং তিনি তাতেই শহীদ হয়ে যান। মুহাম্মদ বিন মুসলিমা মযহাবকে হত্যা করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন। মাজহাব নিহত হওয়ার পর তার ভাই ইয়াসির সামনে এল। এদিক থেকে তার মোকাবিলায় হজরত জুবাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হলেন। জুবাইরের জননী হজরত সফিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহা সেই মহিলাদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য ইসলামী বাহিনীর সাথে এসেছিলেন। তাঁর শংকা হলো যে, তাঁর পুত্র শহীদ হয়ে যাবেন। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'ভয় পেয়ো না, ইনশাআল্লাহ তোমার পুত্র তাকে হত্যা করবে।' তারপর জুবাইর ইয়াসিরকে খতম করলেন।

ইহুদিরা নিরুপায় হয়ে অন্য দুর্গগুলোতে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল কিন্তু মুসলমানরা আক্রমণের গতি বাড়িয়ে দিলেন। তাঁরা এই যুদ্ধ থেকে অনতিবিলম্বেই নিবৃত্ত হতে চাচ্ছিলেন। কেননা, খাদ্যসামগ্রীর সমস্যা শোচনীয় আকার ধারণ করেছিল। সেজন্য সেখানে বেশি দিন অবস্থান করাটা সুকঠিন হয়ে পড়েছিল। অধিকাংশ মুসলমান ক্ষুধার তীব্রতা ও দূষিত পানির প্রভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেউ একজন রসুলুল্লাহকে জানিয়ে দিল যে, ইহুদিরা এই অবরোধের

ফলে মোটেও উদ্বিগ্ন হবে না। কেননা, পানির একটি গুপ্ত স্রোত তাদের অধিকারে রয়েছে, তারা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে এসে পানি নিয়ে আবার দুর্গমধ্যে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনন্তর, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পানি স্রোত অবরোধ করার আদেশ দিলেন, যাতে পানির অভাবে জোরবার হয়ে তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়ে যায়। এবার ইহুদিরা বাধ্য হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল এবং ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই যুদ্ধে কেল্লা ধ্বংস করতে গিয়ে মুসলমানদের অনেক মূল্য দিতে হলো। এর নাম ছিল 'কিলা এ-জুবাইর' বা জুবাইর দুর্গ আর এটি ছিল নতাত এলাকার সর্বশেষ দুর্গ, যা মুসলমানরা অধিকার করে নিলেন। এর আগে তারা 'নাইম', 'সা'ব', 'বতীহ' ও 'সলালিম' নামক দুর্গগুলো অধিকার করে নিয়েছিলেন।

আর এক সারি দুর্গ অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল, যেগুলোর আক্রমণ করার সঙ্কল্প নেয়া হলো। অতএব, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সাম্বান' নামক দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সেখানে অতি ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দুর্গ থেকে আজবল নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে বেরিয়ে এল। হুবাব বিন মুনজির রাজিয়াল্লাহু আনহু তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার উপর এক প্রবল আক্রমণ চালিয়ে তার ডান হাত বাহু থেকে পৃথক করে দিলেন। তরবারি হাত থেকে পড়ে গেল এবং সে প্রাণপণ ছুটতে লাগল। হজরত হুবাব এক লাফে তার কাম তামাম করে দিলেন। এরপর অন্য এক ইহুদি বেরিয়ে এল। এক মুসলমান মুজাহিদ তার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু ইহুদি তাঁকে হত্যা করল। এ দৃশ্য দেখেই আবু দুজানা রাজিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হয়ে এই শত্রুর কাম তামাম করে দিয়ে তার সাথিকে হত্যার প্রতিশোধ নিলেন। তারপর মুসলমানরা জয়ধ্বনি দিলেন এবং দুর্গের উপর প্রবল বিক্রমে আক্রমণ হানলেন, তাঁদের সামনে ছিলেন আবু দুজানা ; অনন্তর, কিছু সময় পরেই কেল্লা ফতেহ হয়ে গেল এবং মুসলমানরা তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। দুর্গমধ্যে সকল প্রকারের জিনিসপত্র, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল।

অবরুদ্ধ কিছু লোক পালিয়ে 'বুজাত কেল্লা'য় আশ্রয় গ্রহণ করল এবং অন্য ইহুদিদের সাথে যোগ দিল। মুসলমানরা তাদের উপরও আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। দু'পক্ষ থেকেই তীরবর্ষণ চলল। এই যুদ্ধে রসুলুল্লাহর আঙুল আহত হয়েছিল, পরন্তু, মুসলমানরা শত্রুদের উপর প্রাণপণ আক্রমণ চালালেন এবং পরিণামে এই কেল্লার উপরেও মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো এবং সেখানকার সমস্ত সম্পদ হস্তগত হলো। এরপর মুসলমানরা মানজানিক[১] লাগানোর সংকল্প করলেন,

---

১. এ হলো ধনুকাকৃতির এক বিশেষ যন্ত্র, এর দ্বারা দুর্গের উপর বড় বড় পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করা হতো, এর ফলে কেল্লা প্রাচীর ভেঙে পড়ত। – অনুবাদক

যাতে কেল্লা বিধ্বস্ত করে দেয়া যেতে পারে, আর এতে আশ্রয় গ্রহণকারী দুষ্ট ও বদমাইশ ইহুদিদের চরম শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। ইহুদিরা নিজেদের ধ্বংস নিশ্চিত বলে বুঝে নিল এবং আত্মসমর্পণ ছাড়া তারা আর কোনো উপায় খুঁজে পেল না। অতঃপর ইবনে আবিল হুকাইক সন্ধিবার্তার জন্য উপস্থিত হলো। তিনি শর্ত নিরূপণ করলেন যে, সমস্ত ইহুদি খয়বর ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যাবে আর উটের পিঠে যতটা মাল-সামান চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে চলে যাবে, অবশিষ্ট সম্পদ হবে মুসলমানদের। তারা কোনো বস্তু লুকোতে কিংবা গায়েব করতে পারবে না, যদি এর বিপরীত হয় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসুল এ ব্যাপারে দায়মুক্ত।[১]

অনন্তর, সন্ধির শর্ত নিরূপিত হওয়ার পর যাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা প্রমাণিত হলো, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। অবশিষ্ট ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করল। পরে তারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রার্থনা করল যে, আমাদের এখানেই বসবাসের অনুমতি দেয়া হোক, আমরা আমাদের অর্ধেক উৎপাদন রাজস্ব স্বরূপ আপনাকে আদায় করব। তিনি তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন কিন্তু এই সুবিধা চিরকালের জন্য দিলেন না ; বরং স্পষ্টীকরণ করে দিলেন যে, আমরা যখন ইচ্ছা তখনই তোমাদের বের করে দেব।

যুদ্ধকালে একটি ঘটনা ঘটে। এক নিকষ কালো হাবশি ক্রীতদাস তার মালিকের ছাগল চরাত। সে যখন দেখল যে খয়বরের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন সে তাদের জিজ্ঞাসা করল 'কী ব্যাপার ?' তারা বলল যে, আমরা সেই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করব, যিনি নিজেকে নবী বলে পরিচয় দিচ্ছেন। ক্রীতদাসের হৃদয়ে নবুয়ত ও নবীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাস-সম্মান-মর্যাদায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে তার ছাগলের পালসহ রসুলুল্লাহর সমীপে এসে উপস্থিত হলো এবং জিজ্ঞাসা করল : 'আপনি কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছেন ?'

রসুলুল্লাহ : 'আমি ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনোই উপাস্য নেই আর আমি আল্লাহর রসুল আর তাকে ছাড়া আর কারো উপাসনা কোরো না।'

ক্রীতদাস : 'যদি আমি সাক্ষ্য দিই এবং ঈমান গ্রহণ করি তাহলে বিনিময়ে আমি কী লাভ করব ?'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'তুমি জান্নাত লাভ করবে যদি ঈমানের ওপরে তোমার মৃত্যু হয়।'

---

১. বাইহাকী, আবু দাউদ।

অনন্তর সে ইসলাম গ্রহণ করল, তারপর বলল- 'হে আল্লাহর নবী ! এ সমস্ত ছাগল আমার কাছে আমানতস্বরূপ রয়েছে, এগুলো আমি কী করব ?'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'এগুলোকে কাঁকর মেরে তাড়িয়ে দাও, আল্লাহ অবশ্যই এ আমানত পৌঁছে দেবেন।'

তারপর সে তাই-ই করল। ছাগলের পাল তাদের মালিকের কাছে পৌঁছে গেল, ইহুদিও অনুমান করল যে, তার ক্রীতদাস মুসলমান হয়ে গেছেন।

এরপর আল্লাহর রসুল উঠে দাঁড়ালেন। এদিকে যুদ্ধের জন্য সবাই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হলো, তুমুল যুদ্ধ হলো এবং এই হাবশি ক্রীতদাসও অন্য মুসলমানদের সাথে শহীদ হয়ে গেলেন। তার মৃতদেহ শিবিরে নিয়ে আসা হলো। লোকেরা দেখলেন যে, রসুলুল্লাহ মৃতদেহ রাখা তাঁবুতে গেলেন এবং তাঁর সাথিদের সম্বোধন করে বললেন :

'আল্লাহ এই ক্রীতদাসকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন আর একে কল্যাণের ক্ষমতা দান করেছেন, আমি এর শিয়রদেশে দুটি হুর দেখতে পাচ্ছি, যদিও সে আল্লাহর উদ্দেশে একটি সিজদাও করতে পারেনি।'

এই যুদ্ধে রসুলুল্লাহ মহিলাদেরও সাথে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, খয়বরের যুদ্ধে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মহিলারাও ছিলেন। তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাদের কিছু প্রদান করেছিলেন কিন্তু তাদের জন্য কোনো অংশ নিশ্চিত করেননি।

ইমাম আহমদ হাশরিজ বিন জিয়াদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি তাঁর দাদি থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর দাদি বলেন, খয়বরের যুদ্ধে আমরাও রসুলুল্লাহর সাথে ছিলাম, আমি ছয় মহিলার মধ্যে ছোট ছিলাম। যখন রসুলুল্লাহ তাঁর সাথে আমাদের যাওয়ার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি আমাদের ডাকলেন। আমরা তার চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কার আদেশে আর কেন বেরিয়েছ ?' আমরা উত্তর দিলাম, 'আমরা তীর উঠিয়ে দিই, ছাতু খাওয়াই, আহতদের জন্য আমাদের কাছে ওষুধও রয়েছে, আমরা তাদের পরিচর্যাও করি এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর পথে সহায়তাও করি।' তিনি বললেন : 'তোমরা ফিরে চলে যাও।'

তিনি বলেন, খয়বর বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পুরুষদের সমান অংশ নির্দিষ্ট করেন। হাশরিজ তাঁর দাদিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'দাদিমা খায়বর যুদ্ধে অংশ নিতে কোন বস্তু আপনাদের আকৃষ্ট করেছিল ?' তিনি বলেন, 'খেজুর।'

ইবনে কাসিরের মতে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পুরুষদের সমান করে ভূমির উৎপাদন বণ্টন করেন, কিন্তু ভূমিতে পুরুষদের সমান অংশ দেয়াটা উচিত নয়। তবে এ রায় সঠিক।

আবু দাউদের হাদিসে আছে যে, বনু গিফার গোত্রের মহিলারা বলল : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমরা এই অভিযানে আপনার সাথে অংশ নিতে চাই, আমরা আহতদের পরিচর্যা করব আর মুসলমানদের যথাসাধ্য সাহায্য করব।' তিনি বললেন : 'আল্লাহর বরকত সম্মিলিত হবে।'

ইহুদি নেতা হুই বিন আখতাবের কন্যা সফিয়াও খয়বরের বন্দিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি কোনো এক সাহাবির অংশে পড়েন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফিরিয়ে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন এবং পরে তাকে বিয়ে করলেন এবং তার উপযুক্ত মোহর নির্দিষ্ট করে দিলেন।[১]

বিজয়ের পর তিনি কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করলেন। একদিন সালামের পত্নী তাকে রান্না করা ছাগলের গোশত তার সেবায় উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিল। সে রানের গোশতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। কেননা, সে জানত যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অংশটি পছন্দ করেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিভে ঠেকানো মাত্রই থেমে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বললেন : 'এ হাড্ডিতে বিনাশ, এতে বিষ মেশানো আছে।' তার সাথে বিশর বিন বরা রাজিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন, তিনি কিছুটা গোশত খেয়ে ফেলেছিলেন।

মহিলাকে ডাকা হলে সে তার অপরাধ স্বীকার করে নিল। সে বলল : 'আমি ভেবেছিলাম আপনি যদি সত্য নবী হন তাহলে আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই তা জানিয়ে দেবেন আর যদি আপনার রাজা হওয়ার খাহেশ থাকে তাহলে আমরা আপনার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যাব।' তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু বিশর বিন বরার শরীরে বিষ ঢুকে গিয়েছিল, সেই যন্ত্রণায় তাঁর প্রাণান্ত হয়ে গেল।[২] অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ঐ মহিলাকে কিসাস-এ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। আর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, অতএব তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল।

খয়বরের ইহুদিরা চাষবাস করার জন্য রয়ে গেল কিন্তু মুসলমানদের প্রতি তাদের জন্মজাত ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাদের বড়ই অপরাধপ্রবণ করে তুলেছিল। তারা আনসারদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল এবং হজরত উমর বিন খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে তারা তার পুত্র হজরত আব্দুল্লাহর দুই হাত ভেঙে দিয়েছিল। হজরত উমর যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন তখন তিনি ভাষণ দিলেন যে :

'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বরের ইহুদিদের সাথে এই শর্তে সমঝোতা করেছিলেন যে, আমরা যখন চাইব, তখনই এখান থেকে তাদের

---

১. বুখারী, মুসলিম।

২. ইবনে হিশাম, বুখারী, মুসলিম।

বের করে দেব। তারা আব্দুল্লাহ বিন উমরের উপর আক্রমণ করে তার দুই হাত ভেঙে দিয়েছে। এর আগে তারা এক আনসারীকে হত্যা করেছে, যা তোমাদের জানা আছে। অতএব, খয়বরবাসীদের যাদের যা কিছু দেনা-পাওনা আছে তা চুকিয়ে নাও, অনতিবিলম্বেই আমরা তাদের বের করে দিচ্ছি।' তারপর তিনি তাদের তাড়িয়ে বের করে দিলেন।

নিঃসন্দেহে খয়বরে ইহুদিদের যে পরাজয় হলো তা পুরো আরব উপদ্বীপে তাদের সামরিক ক্ষমতাকে ধূলিসাৎ করে দিল। অতএব, ফদক-এর ইহুদিরাও আশ্রয় প্রার্থনা করল।

'ওয়াদি আল কুরা'র ইহুদিদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া হলো আর বলা হলো যে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জান মাল সমস্ত কিছুই সুরক্ষিত থাকবে এবং তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর জিম্মায় চলে যাবে। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। তাদের ইসলাম প্রত্যাখ্যানের পরিণামস্বরূপ একটা সংঘর্ষ হলো এবং পরদিন প্রাতেই তারা বাধ্য হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করল।

তাইমার ইহুদিরাও আত্মসমর্পণ করল।

এখন সেই সমস্ত এলাকাতেও ইসলামের কিরণমালা ছড়িয়ে পড়ল, যেখানে কখনো বা ইহুদিদের প্রভুত্ব ছিল আর কেউ বা মুক্ত স্বাধীন জীবন অতিবাহিত করত।

এই সমস্ত যুদ্ধ ও দেশ ত্যাগের ঘটনা থেকে এ রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায় যে, ধরিত্রীর প্রকৃত প্রভু আল্লাহ এবং তিনি যাকে চান তাকেই এর উত্তরাধিকার বানিয়ে দেন। তিনি অকারণে তা এক সম্প্রদায়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য সম্প্রদায়কে দেন না ; বরং যে জাতি নিয়ামত পেয়ে বিগড়ে যায় তাকে বঞ্চিত করে দিয়ে সেই নিয়ামত সেই জাতিকেই দেয়া হয়, যারা তার গুণজ্ঞ ও আল্লাহর প্রতি সকৃতজ্ঞ।

যে জাতি দম্ভ ও অহঙ্কারগ্রস্ত হয়ে যায় আর ইতরামি করতে শুরু করে সে তার অধিকার, ক্ষমতা, প্রভুত্ব সবকিছু হারিয়ে ফেলে, যাতে তারা অন্যের দাসত্বে চলে যায় এবং অন্য জাতি তাদের উপর নিজেদের ইচ্ছামত কার্যক্রম চালায়।

এই বিধান বনি ইসরাইলিদের উপর বড় কঠোরভাবে কার্যকর হলো। যখন তারা 'তওরাত'-এর আদেশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল আর নিজেরা প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ল তারপর একই বিধান মুসলমানদের উপর কার্যকর হলো যখন তারা নিজেদের হিদায়েতের শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে দিল এবং বিপথগামিতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল :

'আর তোমার প্রভুর গ্রেফতার এমনই হয়, যখন তিনি কোনো অত্যাচারী লোকালয়কে গ্রেফতার করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর গ্রেফতার বড় দুঃখদায়ী ও সুকঠোর।' – হুদ : ১০২

প্রতিষ্ঠা ও পতন এবং উন্নতি ও অবনতির নামই জীবন। মানবেতিহাসের ধারাবাহিকতার উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, অপারগতা ও নেতৃত্বের স্থান থেকে কোনো জাতি সেই সময়েই বিচ্যুত হয়, যখন তাকে ছিনিয়ে নেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অন্য কোনো জাতি তার মধ্যে সৃষ্টি করে নেয়।

ক্ষমতাধর জাতির উদাহরণ সমুদ্রবক্ষে উৎপন্ন হওয়া উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মতো, তা কখনো বা ফুলে-ফেঁপে ওঠে আর কখনো বা ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়ে এবং সমুদ্রতটে পৌছাতে পৌছাতেই তা দুর্বল ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু একথা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, সে পুনরায় জোয়ারের সাথে প্রবল বেগে ছুটে আসবে এবং আগের মতোই উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। তারপর, যখন তা থেকে শক্তির সাধন পৃথক হয়ে যাবে তখন সে পুনরায় পতনগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

আল্লাহ বনি ইসরাইলকে উন্নতি দান করেন এবং তারা মর্যাদা ও শাসনকার্যের প্রভু হয়ে ওঠেন, তারপর সেই সম্মান ও শাসনক্ষমতা কেড়ে নেয়া হলো, যাতে ইসলাম নবোত্থিত হয়ে তাদের উপর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে যায়। এই পরিবর্তন সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্যই সাধিত হলো।

ইসলামের বিরুদ্ধে মূর্তিপূজক ও ইহুদিরা কেন মোর্চাবদ্ধ হলো ? কাদের হিতের জন্য এই সমস্ত যুদ্ধ করা হলো ? বনি ইসরাইলিরা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম ও সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করত। এই কারণেই তারা ইসলামের কঠোর বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু আল্লাহর ফায়সালার মধ্যে আরো অন্য কিছু ছিল। তিনি এক নতুন উম্মতকে সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের আহ্বায়ক বানাতে চাচ্ছিলেন। কেননা, সমগ্র বিশ্ব ফিতনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের সভ্যতার অভ্যন্তর হতে পচা দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। যখন বেদুইন ও ইহুদিরা সম্মিলিতভাবে এই ইনকিলাব[১]কে রোধ করতে চাচ্ছিল আর প্রাচীন ঘৃণা ও ধনসম্পদের প্রতি মোহ ও অন্ধ আনুগত্যের কারণে এই পরিবর্তনকে রুখতে চাইল তখন এরা স্পষ্টতই অপরাধী বনে গেল, কেননা এরা তুফানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

ইহুদিদের যদি আর এক বছর বহিষ্কার করা না হতো তাহলে আরব উপদ্বীপ জোটবদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই পেত না এবং তাদের অস্তিত্ব থেকেও কখনো কোনো লাভই হতো না। কিছু দান এবং ফল-ফসল ইত্যাদি তো পাওয়াই যেত কিন্তু এর আধিক্যের সাথে ফিতনা ও ফাসাদও মিশে যেত, যা বনি ইসরাইলিদের একটি চিরন্তন বিশেষত্ব। তাদের সুদের কারবার, দুষ্কর্ম, নির্লজ্জতা ও প্রত্যেক ধর্মের উপর আস্থার মিথ্যা দাবি দুনিয়াকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। কিন্তু ইসলাম এসব বস্তু হতে অনেক দূরে অবস্থান নেয়, প্রারম্ভিক কাল থেকেই সে ঈমান ও

---

১. মহাপরিবর্তন বা মহাবিপ্লব।

আত্মশুদ্ধির আহ্বায়ক। বাস্তবিকতা, সততা, হিত এবং কল্যাণের আত্মা হওয়ার কারণে ইসলামের হক হলো যে, সে-ই বিজয়ী হবে এবং দুনিয়ায় দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে।

যখন মুসলিম উম্মত শৈথিল্য, পতন ও ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হলো, যার শিকার ইহুদিরা প্রথম যুগে হয়েছিল, তখন এই উম্মতকেও তাদের মতোই অবদমিত ও অপমানিত করে দেয়া হলো এবং আজ তারা বিভ্রান্তের মতো এদিকে ওদিকে টক্কর খেয়ে খেয়ে ফিরছে। এই হলো কওমের উত্থান ও পতনের রহস্য এবং তাদের প্রভাব, রবদবা এবং অপমান তথা হীনতার রহস্য এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

তিন
হাবশার শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন

খয়বর বিজয়, জাফর বিন আবু তালিব রাজিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথিদের হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের প্রত্যাবর্তনে বড়ই খুশি হয়েছিলেন। মক্কায় তাঁদের দ্বীন যখন অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় পড়েছিল তখন তাঁরা আপনাপন মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন আর আজ তাঁরা এই অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন, যখন ইসলাম বিজয়ী ও প্রভুত্বশালী হয়ে উঠেছে আর যার শাসনব্যবস্থা আরবের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন তাদের কারো দমন-পীড়ন অত্যাচার-হিংসা ও আতঙ্কের ভয় ছিল না।

এঁরা যখন মদিনায় প্রবেশ করলেন তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'আল্লাহর কসম ! আমি জানি না, আমি খয়বর বিজয়ের জন্য বেশি আনন্দিত না জাফরের আগমনে বেশি আনন্দিত ?'

হজরত জাফর ও তাঁর সাথিরা মক্কার বাইরে দশ-বারো বছর অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে কুরআনের বড় একটি অংশ অবতীর্ণ হয়েছিল, কাফিরদের সাথে অনেক সংঘর্ষ হয়েছিল এবং গণহিজরতের পূর্বে এবং পরেও বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কিছু মুসলমান হাবশার এই মুহাজিরদের নিচু মান সম্পন্ন বলে ভাবতে লাগলেন। কেননা, তারা উপরোক্ত কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছিলেন। হজরত আবু মুসা আশআরীও হজরত জাফরের সাথে এসেছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন : 'কিছু লোক আমাদের বলছিলেন আমরা হিজরতের কারণে তোমাদের চেয়ে বেশি অগ্রগণ্য।' হজরত আসমা বিনতে উমাইস রাজিয়াল্লাহু আনহা হজরত হাফসাকে দেখতে এলেন। আসমা ঐ মুহাজিরদের অন্যতম ছিলেন,

যাঁরা হাবশায় সম্রাট নাজ্জাশির ওখানে হিজরত করেছিলেন। ইতিমধ্যে হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু এসে পড়লেন। তিনি আসমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : 'ইনি কে ?' কন্যা বললেন : 'আসমা বিনতে উমাইস।'

উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু : 'কে হাবশা গমনকারিণী ? সাগর পাড়ে আশ্রয় গ্রহণকারিণী।'

আসমা রাজিয়াল্লাহু আনহা : 'হ্যাঁ'।

উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু : 'আমরা মদিনায় হিজরত করার কারণে তোমাদের ছাড়িয়ে গেছি। অতএব, আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী।'

আসমা রাজিয়াল্লাহু আনহা : (ক্রুদ্ধ হয়ে) 'কখনোই নয় ! আপনারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তকে আহার করাতেন, আপনাদের মধ্যেকার অজ্ঞদের উপদেশ দান করতেন কিন্তু আমরা হাবশার মতো দূরবর্তী এলাকায় অবস্থান করতাম আর এ দূরত্ব ছিল কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের জন্যই। আল্লাহর কসম ! আমি ঐ সময় পর্যন্ত পানাহার করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর রসুলের কাছে আপনার বক্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন না করব। আল্লাহর কসম ! আমি মিথ্যাও বলব না আর এর অন্যথাও করব না।'

অনন্তর তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! উমর এ ধরনের কথাবার্তা বলছিলেন।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'তুমি কী উত্তর দিয়েছ ?'

আসমা : 'আমি এই সমস্ত কথাবার্তা বলেছি।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'সে তোমার চেয়ে আমার অধিক সমীপবর্তী নয়। সে এবং তার সাথিরা একবার হিজরত লাভ করেছে আর তোমরা জাহাজিরা দু'বার হিজরত লাভ করেছ।'[১]

অত্যল্পকাল মধ্যেই এই মুহাজিররাও কুরআনের জ্ঞান লাভ করলেন এবং জিহাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা আপনাপন কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ঘটালেন এবং তাঁরা তাদের সমকক্ষতা লাভ করলেন, যারা তাকওয়া[২] ও ইহসান[৩]-এ অগ্রবর্তী হয়ে গিয়েছিলেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবীয়দের সাথে খয়বরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাঁদেরও অংশ দিলেন, এর অতিরিক্ত অন্য কিছু দেননি।

---

১. বুখারী, মুসলিম।

২. আল্লাহ ভীতি বা সংযম।

৩. উপকার বা কৃতজ্ঞতা।

কেননা, আল্লাহ খয়বরের ভূমি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ঐ সমস্ত লোকের প্রতিদানস্বরূপ প্রদান করেছিলেন, যারা মক্কাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন এবং রিজওয়ান বৃক্ষের ছায়াতলে মৃত্যুর বাইয়াত[১] গ্রহণ করেছিলেন।

চার
বেদুইনদের শায়েস্তা

ইহুদিদের দণ্ডবিধানের পরপরই মুসলমানরা মূর্তিপূজক বেদুইনদের শায়েস্তা করার প্রতি মনোযোগী হলেন। প্রথমেই আমরা ইঙ্গিত করেছি যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বেদুইনরা উদ্যমহীন হয়ে পড়েছিল। গতকাল পর্যন্তও তারা সংগঠিত হয়ে দারুল ইসলামকে অবরুদ্ধ করে রাখতে পারত কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। বনি ইসরাইলিরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং মক্কাবাসীরা আত্মসমর্পণ করেছিল। অতএব এখন মুসলমানদের পক্ষে একের পর এক গোত্রকে শায়েস্তা করার পথ সুগম হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা তাদের অরাজকতা, সন্ত্রাস ও উগ্রবাদিতার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে কখনোই ব্যর্থ হয়নি। বেদুইনরা বড়ই কঠোর প্রকৃতির লোক। আমাদের এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, গত শতাব্দী পর্যন্ত বেদুইনরা হাজিদের কাফেলা লুট করত আর সামান্য অর্থ সম্পদের বিনিময়ে তাদের হত্যা করত।

ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল এবং ভৌতিক-নৈতিকভাবেও তাদের উচ্চে তোলার প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু যখন কুররার পুরো একটি দলকে তারা শহীদ করে দিল তখন ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে তাদের দমন করল এবং সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তাদের ফিতনা ও উপদ্রবকে নির্মূল করে দিল।

৭ হিজরি সনের সফর মাসে মুসলমানরা যখন খয়বর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাদের প্রথম কাজ হলো নজদের জঙ্গলগুলোতে সেনা দল প্রেরণ করা, এমনকি, 'উমরাতুল কাজা'র জন্য তাঁরা মক্কাভিমুখেও যাত্রা করেন, যার প্রতিশ্রুতি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে দেয়া হয়েছিল।

আমরা এই সমস্ত সারিয়া বা সেনাভিযানের বিষয়ে বিতর্কে যেতে চাই না। কেননা, এর দ্বারা একদিকে তো মুসলমানদের সামরিক শক্তির রবদবা বৃদ্ধি পেয়েছিল আর অন্যদিকে শত্রুদের বিষদাঁতও ভেঙে গিয়েছিল।

---

১. প্রতিজ্ঞা।

এই সমস্ত সারিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শান্তি স্থাপন করা ও মদিনায় লুটতরাজের ধারাবাহিকতা বন্ধ করা। আর এও ছিল যে দ্বীনের আহ্বায়কদের মাধ্যমে রিসালাতের শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে এবং নিরাপদে দুনিয়ার দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে দেয়া এবং কেউ যেন তাদের সাথে বেঈমানি ও বিশ্বাসঘাতকতার শক্তি ও সাহস না রাখতে পারে।

এই সমস্ত কবিলা বা গোত্রীয় ব্যবস্থা আমাদের দেশের জায়গিরদারি ব্যবস্থার মতো ছিল। লোকালয়ের নেতা বা দলপতি একটি আওয়াজ দিয়ে হাজার হাজার মানুষ জমা করতে পারত। এমন বাতাবরণে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বার্তা ছিল একেবারেই নিরর্থক। এভাবে প্রথম যুগের গোত্রপতিরা আশপাশের লোক কুটুম্ব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখত, যাতে গোত্রপতি বা নেতাদের ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ বা সন্ধিতে একে অন্যের সহযোগিতা করতে পারে।

এই দলপতিদের মধ্যে যখন লোকদের সমর্থন বেশি হয়ে যায় তখন এই মূর্খরা লুটতরাজ ও মারামারিতে মেতে ওঠে। যেমনটি দুরাইদা বিন সাম্মা তাঁর কবিতায় বলেন :

'প্রতিশোধের ভাবনাতে হয় মোদের প্রতি আক্রমণ।
রক্ত পিয়ে পিপাসা মেটায় তখন বাজে তরবারি ঝনন-ঝন ॥
দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মোদের পরে দেখায় বল।
প্রতিশোধের ভাবনাতে বা রক্তে রাঙা ধরণীতল ॥
এমনি করেই আমরা হয়েছি পরস্পরের বিরাগভাজন।
দুয়ের মাঝে এমনি করেই যুগকে করেছি সুবন্টন ॥
এমনি করেই দিন চলে যায় যুগের পাতা হয় গো শেষ।
সেই যুগেরই আধেক পথে থাকে শুধুই জীবন রেশ ॥'

এমতাবস্থায় কি আপনি ভাবতে পারেন যে, যুগের এই বাতাবরণে জানমাল ও চিন্তাধারা নিরাপদ থাকতে পারে আর দ্বীনের আহ্বায়করা সেই পরিস্থিতির উর্ধ্বে থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যেতে পারেন ?

শান্তি এবং সুব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রয়াস চালানো এবং ঈমান ও আকিদার জন্য কাউকে বাধ্য করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

প্রথমোক্তটির উদ্দেশ্য হলো সমাজ থেকে ফিতনা-ফাসাদ-উপদ্রব দূর করা, যাতে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে এবং সমস্ত কিছু সুরক্ষিত থাকতে পারে এবং তাদের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। পরন্তু দ্বিতীয়োক্তটির সম্পর্ক তরবারি ও চাবুকের সাথে সেই শক্তির বলে নিশ্চিত কোনো আকিদা[১] মানতে লোকদের বাধ্য করা।

---

১. বিশ্বাস, ধারণা বা চিন্তাধারা।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেনাদল পাঠিয়ে দিতেন তখন তাঁরা সাথে করে আল্লাহর কালামও নিয়ে যেতেন, যাতে সেখানে তা পঠিত হতে পারে :

'(হে নবী !) বলে দাও : লোকসকল ! আমি তো মাত্র তোমাদের জন্য এক প্রত্যক্ষ সচেতনকারী। অনন্তর, যারা ঈমান এনেছে এবং অনুকূল কর্ম করেছে, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানিত জীবিকা রয়েছে, আর যারা আমার আয়াত সম্পর্কে আমাদের পরাজিত করার লক্ষ্যে বৈরী ভাব থেকে দৌড়-ঝাঁপ করেছে তারা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।' –আল হজ : ৪৯-৫১

আল্লাহর আয়াতরাজিকে অক্ষম করার প্রচেষ্টা বিপজ্জনক অপরাধ। এই অপরাধ মৌখিক হলে চিন্তার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু এখানে তো স্বতন্ত্র বিবাদের মোড়কে মিথ্যাচারকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো হতো এবং এ অপরাধ প্রভুত্ব কায়েমের তথা শাসিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতো :

'আর যখন আমার পক্ষ হতে প্রত্যক্ষ আয়াতরাজি শোনানো হয় তখন তোমরা কাফিরদের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পাও। এমনও মনে হয় যে, তারা এখনই সেই লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, যারা আমার পক্ষ থেকে তাদের আয়াত শোনায়।' – আল হজ : ৭২

এই ন্যায় ভিত্তির উপর মুসলমানরা আরব উপদ্বীপে প্রচার-প্রসারের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই তারা প্রচারকার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনন্তর, এ কাজে তাঁরা পূর্ণ সাফল্য লাভ করলেন। তাঁদের যুগে অনেক গোত্র ইসলামে প্রবেশ করলেন কিন্তু এর বিপরীতে কুরাইশদের সময়ে কোনো গোত্র প্রবেশ করল না। এদিকে পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি ইসলামের প্রভুত্বশালী হয়ে ওঠা এবং মক্কা বিজয়ের ভূমিকা বনে গেল।

আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রতি আহ্বান রসুলুল্লাহকে অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে পারল না, সেই কর্মকাণ্ড ছিল অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে মানবজাতির কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেয়া এবং আরব জগতের বাইরে বৃহত্তর বিশ্বে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়া।

এখন প্রকাশমান দ্বীনকে আরো উচ্চে তুলে ধরার কাজ ছিল, যাতে তার কিরণমালা তার সুদূর ক্ষেত্রগুলো পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে যারা সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিপথগামিতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল :

'আর এই কুরআন আমার পক্ষ হতে অবতারণ করা হয়েছে, যাতে আমি এ থেকে তোমাকে এবং যে কারো কাছে পৌঁছে দিয়ে সবাইকে সচেতন করে দিই। বাস্তবিকই কি তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যও রয়েছে ? বলো :

আমি তো এই সাক্ষ্য দিই না। বলো, তিনি তো একমাত্র উপাস্য আর তোমরা যে শিরক করছ আমি তো তাতে বিরক্ত।' – আল আনআম : ১৯

এবার খ্রিস্টান ও অগ্নি উপাসকদের প্রতি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন ছিল, যাতে তাদের কাছে একত্ববাদের বার্তা পৌঁছে দেয়া যায়, তাদের সামনে ইসলাম তুলে ধরা যায় এবং আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করার দাবি করা যেতে পারে।

পাঁচ
সম্রাটদের সাথে পত্র বিনিময়

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের বিশাল এলাকার উপর পারসিকদের আধিপত্য ছিল, আর উত্তর প্রান্তে ছিল রোমকদের আধিপত্য এবং এ দুই প্রান্তে শাসক গোষ্ঠীর ধর্ম আপনাপন গোত্রে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই ধরনের ভিত্তি বৌদ্ধিক স্বাধীনতার উপর রাখাটা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তা সত্ত্বেও মজুসিয়াত[১] পারস্য অধিকৃত এলাকার উপর তার প্রভুত্ব কায়েম করেছিল আর ঈসাইয়াত[২] রোম অধিকৃত ক্ষেত্রের উপর প্রভুত্ব কায়েম করেছিল। এই সমস্ত এলাকার আমিররা সরকারি তরফ থেকে নিযুক্ত হতেন এবং তাদেরই আদেশে পদচ্যুত হতেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করলেন যে এই সমস্ত সরকার ও তাদের অধীনস্ত আমিরদের কাছে ইসলামের বার্তা পাঠাবেন এবং তাদের কাছে পত্র মারফত ইসলামের দাওয়াত পেশ করবেন।

হজরত আনাস হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কায়সার, কিসরা ও নাজ্জাশীর[৩] সম্রাটকে আল্লাহর প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত হাদিয়া বিন খলিফার মাধ্যমে রোম সম্রাট কায়সারের কাছে তাঁর পত্র প্রেরণ করলেন। নতুন ও বিচিত্র কোনো দাওয়াত নিয়ে কায়সারের কাছে উপস্থিত হওয়াটা মোটেও সাধারণ কোনো ব্যাপার ছিল না, যদিও রোমকদের দৃষ্টিতে এই দাওয়াত 'সেই আরাবি'র পক্ষ থেকে ছিল যিনি তাঁর ছায়াতলে জীবন আতিবাহিত করছিলেন।

এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যক্তিকে চয়ন করলেন, যিনি পূর্ণ ঈমানের সাথে এই দায়িত্বটি পালন

---

১. অগ্নিপুজো।

২. খ্রিস্ট ধর্ম।

৩. ইনি সে নাজ্জাশী নন তিনি যার জানাজা পড়েছিলেন। – অনুবাদক

করতে পারেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সম্ভাব্য পরিণামের পরোয়া না করেন।

হজরত ইবনে হিব্বান থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

'জান্নাত-প্রত্যাশী এমন ব্যক্তি কে আছে যে, আমার পত্র নিয়ে রোম সম্রাটের কাছে যাবে ?'

এক ব্যক্তি : 'তা সে স্বীকার করুক বা না করুক ?'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'হ্যাঁ, সে স্বীকার করুক বা না করুক।'

এ কথা শুনে হজরত দাহিয়া পবিত্র পত্রটি নিয়ে রোম অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন এবং তিনি হিরাক্লিয়াসের সাথে সেই সময়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন যখন রোম সম্রাট পারসিকদের পরাজিত করে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' দর্শন তথা উপাসনায় লীন ছিলেন।

রোম সম্রাট পত্র নিয়ে পাঠ করতে শুরু করলেন। তাতে লেখা ছিল :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম[১]

এই পত্র মুহাম্মদ (যিনি আল্লাহর বান্দা ও রসুল)-এর পক্ষ হতে হিরাক্লিয়াসের প্রতি– যিনি রোমের সবচেয়ে বড় মানুষ। তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যিনি সৎ পথের অনুসরণ করেন। অনন্তর, আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তুমি ইসলামকে স্বীকার করে নাও, শান্তিতে থাকবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি তুমি বিমুখ হও তাহলে এই কিষানদের কষ্ট এবং দণ্ডও তোমার শিরে পতিত হবে। হে গ্রন্থধারী ! এসো এমন একটি বিষয়ের প্রতি, যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমভাবে মান্য ও সিদ্ধ : এ হলো– আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা কোরো না এবং আল্লাহর সাথে কাউকে অংশী বানিয়ো না, আর নিজেদের মধ্যে অন্যকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু বানিয়ো না। অনন্তর, তারা যদি এ থেকে বিমুখ হয় তাহলে বলে দাও : সাক্ষী থাকো যে, আমরা আল্লাহর আদেশ পালনকারী হয়েছি।' – আলে ইমরান : ৬৪[২]

হিরাক্লিয়াসের দরবারিরা এ পত্রের গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করল এবং যখন তিনি পত্র পাঠ করে শোনালেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন তখন তারা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

আমাদের দৃষ্টিতে হিরাক্লিয়াস একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মের সাথে তাঁর সম্পর্ক যথার্থ ছিল, যা তাঁর রাজনৈতিক প্রভুত্ব অটুট রাখে এবং তাঁর

---

১. পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, যিনি অসীম দয়ালু, অতীব কৃপাবান।

২. বুখারী, মুসলিম।

শক্তি ক্রমবর্ধমান থাকে। তিনি তাঁর শাসনক্ষমতা এমন এক সময়ে হস্তগত রেখেছিলেন যখন হজরত ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়ে গির্জাগুলোর মধ্যেকার মতভেদ ও বিতর্ক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ঈসায়ীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে সফল রাখার প্রচেষ্টা চালান এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন শত্রুতাহীন গির্জাগুলোকে একই কেন্দ্রের অধীন রাখার প্রচেষ্টা চালান কিন্তু ব্যর্থ হন এবং মিশর ও সিরিয়ার পাদরিরা তাঁর বিরুদ্ধে চলে যান। অনন্তর ধর্ম ও অহি সম্পর্কিত বিষয়ে বার্তালাপ করাটা তাঁর জন্য সমস্যা ছিল না। বিভিন্ন ধ্যান-ধারণাকে রাজহিতের স্বার্থে ব্যবহার করাটা ছিল তাঁর একটা অভ্যাস। তিনি তাঁর মনের গভীরে পরস্পরবিরোধী ধ্যান-ধারণা পুষে রাখা নিজের জন্য অসম্মান বা অনাদর বলে মনে করতেন।

এমনও হতে পারে যে, তিনি ত্রি-ঈশ্বরবাদের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে একেশ্বরবাদের প্রতি আগমনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তা স্থাপিত হয়ে যায়, কেননা, এর ফলে শাসনকার্যে মতভেদ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যেত, যে শাসনকার্য ছিল তার কাছে প্রাণের মতোই প্রিয়।

রাজনৈতিক চাতুরতার আশ্রয় নিয়ে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস হজরত দাহিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুকে ধোঁকা দিতে চাইলেন। তিনি তাঁর সামনে স্বীকার করলেন যে, তিনি মুসলমান। তারপর উপহার উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে সসম্মানে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন।

হজরত দাহিয়া এই সমাচার নিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হলে তিনি বললেন : 'আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে, সে মুসলমান নয়' এবং তিনি সে সমস্ত উপহারাদি গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার আদেশ দিলেন।

রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্ত আরব আমির বা রাজাদের কাছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহর বার্তা প্রেরণ করেন এবং একত্ববাদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান তখন তারা যে উত্তর দেন তা স্বয়ং রোম সম্রাটের উত্তরের চেয়ে কঠোর এবং কঠিন ছিল।

দামিসকের আমির রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র পাঠ করেন, যাতে লেখা ছিল :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহাম্মদ আল্লাহর রসুলের পক্ষ হতে হারিস বিন আবি শিমর গাসসানীর নামে। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর যে সৎ পথের অনুসরণ করে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর আদেশ মেনে চলে। আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, যিনি এক, যাঁর কোনো অংশী নেই, তাঁর প্রতি ঈমান আনো, তাহলে তোমার শাসন অবশিষ্ট থাকবে।'

পত্র পাঠ শেষ করে তিনি সক্রোধে পত্রটিকে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন : 'কে আছে এমন বীরপুরুষ, যে আমার শাসন ছিনিয়ে নিতে পারে ?' এবং তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

হারিস নিজে সম্রাট ছিলেন না যিনি এতটা দম্ভ দেখাচ্ছিলেন। তিনি তো রোমকদের ক্ষুদ্র একজন প্রাদেশিক শাসকমাত্র ছিলেন। তিনি তাদেরই স্বার্থ রক্ষা করতেন এবং তাদেরই ইচ্ছা পুরো করতেন এবং তাদেরই ছায়ায় জীবন নির্বাহ করতেন। তাঁর পদমর্যাদা ছিল আমাদের যুগের প্রাচ্যের এমন কোনো দেশের মতো, সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থে যাদের পালন পোষণ করেন, যাতে তারা তাকে দুর্বল জাতির উপর শাসন-শোষণের একটা মাধ্যম বানিয়ে রাখতে পারেন। পরন্তু, তাঁর পক্ষ থেকে উপহার প্রেরণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি একজন শিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

রোমের অন্য এক রাজ্য বুসরার শাসনকর্তার কাছেও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র প্রেরণ করেছিলেন। পত্রবাহক ছিলেন হারিস বিন উমাইর আজদী। পথিমধ্যেই শুরহবিল বিন আমর গাসসানীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি কি মুহাম্মদের পত্রবাহক ?' হজরত হারিস বলেন : 'হ্যাঁ।' তখন সুরহবিল তাকে হত্যার আদেশ দিয়ে দিয়েছিলেন।

এ খবর যখন মদিনায় পৌঁছাল তখন মদিনার মুসলমানরা বড় আঘাত পেলেন। তাদের সামনে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রোমের পক্ষ থেকে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে বড় কঠিন প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মুকৌকিস রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রের সাথে না সদ্ব্যবহার করেন আর না দুর্ব্যবহার করেন। তিনি যখন হজরত হাতিব রাজিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রশ্ন করেন : 'যদি তিনি সাচ্চা নবী হন তাহলে তিনি তাঁর কওমের বিরুদ্ধে বদদুআ[১] কেন করেননি, যেখানে তারা তার বিরোধিতা করেছে এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেছে ?' হজরত হাতিব বললেন : 'যখন হজরত ঈসাকে তার জাতির লোকেরা হত্যার সংকল্প করে তখন তিনি তাদের অভিশম্পাত দেননি কেন, তাহলে তো তারা ধ্বংস হয়ে যেত ?'

মুকৌকিস বললেন : 'নিঃসন্দেহে আপনি প্রাজ্ঞ এবং আপনি একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছেই এসেছেন।' তারপর তিনি রসুলুল্লাহর পত্রের এই জবাব দিলেন :

'এই পত্র মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর নামে কিবতিদের দলপতি মুকৌকিসের পক্ষ হতে। শান্তি বর্ষিত হোক আপনার প্রতি। অনন্তর, আমি আপনার পত্রের

---

১. অথবা অভিশম্পাত কেন দেননি ? অনুবাদক

মর্মবাণী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমি বিশ্বাস রাখি যে, একজন নবীর আগমন অবশিষ্ট রয়ে গেছে এবং আমার মতে, তিনি সিরিয়ায় আত্মপ্রকাশ করবেন। আমি আপনার পত্রবাহককে আদর-সৎকার করেছি। কিবতিদের নিকট মর্যাদাশালিনী দু'জন দাসীসহ কিছু বস্ত্র ও আরোহণের জন্য কয়েকটি খচ্চর উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওয়াস সালাম।'

এই সমস্ত উপহার নিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী-ই বা করতেন ? তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণার প্রতি সম্মান জানিয়ে উপহার গ্রহণ করলেন। যদিও তার চিন্তাধারা এটাই ছিল যে, ঈমানই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার এবং প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত বস্তু।

মুকৌকিস ও হজরত হাতিবের মধ্যেকার কথোপকথন এখানে বর্ণনা করাটা আমরা উচিত বলে বিবেচনা করছি, যাতে পাঠক অবগত হতে পারেন যে ইনি বোধ-বিবেচনা, প্রতিভা, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বিচারে কতটা শানিত ছিলেন।

হজরত হাতিব রাজাকে সম্বোধন করে বললেন :

'এই নবী লোকদের আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, এ বিষয়ে কুরাইশরা সবচেয়ে কঠোর, ইহুদিরা সবচেয়ে বৈরী এবং ঈসায়ীরা সবচেয়ে নিকটবর্তী সিদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহর কসম ! হজরত মূসা কর্তৃক হজরত ঈসার আগমনের সুসংবাদ প্রদান যেমন, হজরত ঈসা কর্তৃক হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমনের সু-সংবাদও তেমনই। দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর আমাদের কুরআনের প্রতি আহ্বান ঐ রকমই, যেমনটি আপনারা তওরাতের অনুসারীদের বাইবেলের প্রতি করেন। যে জাতি যে নবীকে পায় সে জাতি সেই নবীরই উম্মত হয়, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সেই নবীর আদেশ পালন করা এবং হে নৃপতি ! আপনিও সেই লোকদের অন্যতম, যারা নবীর যুগ লাভ করেছেন আমরা আপনাকে ঈসার ধর্ম থেকে বিরত করছি না ; বরং হজরত মসিহর অনুসরণের উপদেশ দিচ্ছি।'

এই সারগর্ভ দাওয়াতের যে প্রভাবই পড়ুক, তা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি।

এসব ছিল ঈসায়ীদের নামে তাঁর পত্র ও তাঁর উত্তর। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজুসিয়াতের নেতৃবৃন্দের কাছেও তার প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন এবং তাদেরও একেশ্বরবাদের বার্তা পাঠালেন এবং সেই ধর্মের বিষয়ে তাদের সাথে বার্তালাপও করলেন যে, যদি তারা এর অনুসরণ করেন তাহলে বিপথগামিতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে হিদায়েতের আলোয় এসে যাবেন।

তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের উত্তর পাওয়া গেল– কেউ কঠোরতা দেখাল, কেউ নমনীয়তা প্রদর্শন করল, কেউ বা কুফরিকে আঁকড়ে রইল আর কেউ বা ইসলাম গ্রহণ করল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরানের সম্রাট পারভেজের কাছে যে পত্র লেখেন তা ছিল এই রকম :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহাম্মদ রসুলুল্লাহর পক্ষ হতে ইরানের সম্রাট কিসরার নামে। শান্তি বর্ষিত হোক সেই ব্যক্তির উপর, যে হিদায়াতের পথ স্বীকার করে, তার অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনে। সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশী নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল।

আমি তোমাকে প্রভাবশালী মহান আল্লাহর আদেশানুসারে এই ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছি। আমাকে সকল মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে রসুলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে ঐ ব্যক্তিকে নিরস্ত করি, যার হৃদয় জীবিত এবং আল্লাহর ইচ্ছা কাফিরদের উপর পুরো হোক। ইসলাম গ্রহণ করলে সুরক্ষিত থাকবে আর তুমি যদি বিমুখতা প্রদর্শন করো তাহলে সমস্ত মজুসির পাপ তোমার উপর পতিত হবে।'

কিন্তু কিসরা পত্রপাঠ মাত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং পত্র ছিঁড়ে ফেলল। কদাচিত, নিজের দুর্ভাগ্যের কারণে সে যে পরাজয় বরণ করেছিল তার কারণ এই প্রয়াস (পত্র), নিজের উচ্চ স্থান ও মর্যাদানুসারে অশিষ্টতা এবং দুঃসাহস বলে মনে করেছিল, কেননা, রোম তাকে ভয়ংকরভাবে পরাজিত করেছিল এবং এবার আরবরা তাকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে চলেছিলেন। যে বিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন।

কিসরা তৎক্ষণাৎ ইয়েমেনের শাসনকর্তাকে লিখলেন যে, অনতিবিলম্বেই দুই শক্তিশালী ব্যক্তিকে হিজাজ পাঠিয়ে দাও, যাতে তারা আমার কাছে পত্র লেখার মতো দুঃসাহসী ব্যক্তিটিকে ধরে এনে আমার সামনে পেশ করে।

পারভেজ বড়ই মূর্খ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। রাজ্যের নেশায় সে মদমত্ত হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক মূর্তিপুজোর সাথে যখন ধর্মীয় মূর্তিপুজো একাকার হয়ে যায় তখন তার উপরে অন্ধকারের একটা স্থূল আবরণ পড়ে যায়। এই উন্মাদ, নির্বুদ্ধি ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তির উপর শাসন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলি এতটাই আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছিল যে, অন্য ব্যক্তি ও অন্য বস্তুর প্রতি তার সামান্যতম শালীনতা ও মর্যাদাবোধও হারিয়ে বসেছিল। এমনকি, নিজের জাতি ও তাঁর নিকটতম ব্যক্তি ও আত্মীয়দেরও তিনি মন্দ বলে ভাবতে থাকেন এবং তার সীমা এতটা ছাড়িয়ে গেল যে তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের পুত্র শেরবিয়াকেও পর্যন্ত হত্যা করলেন।

কিসরার খবর যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন : 'আল্লাহ কিসরার শাসনকে ছিন্নভিন্ন করে

দিয়েছেন।'[১] মজার কথা হলো এই যে, ইয়েমেনের শাসনকর্তার কাছে যখন কিসরার আদেশ পৌঁছাল তখন তিনি তা তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করলেন এবং দুই ব্যক্তিকে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন রসুলুল্লাহকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার জন্য।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর থেকে তাদের শক্তিশালী ও সুন্দর এবং ভেতর থেকে তাদের অন্তঃসারশূন্য দেখলেন। যেমন, আমাদের যুগের সাজুগুজু করা মহিলাদের দেখা যায়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন বিশাল গোঁফওয়ালা দুই ব্যক্তি, তাদের কপোল চিকন এবং দাড়িবিহীন। তখন তিনি ঘৃণায় তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন :[২] 'এ দুই ব্যক্তি এভাবে কেন এসেছে ?' তারা বলল : 'আমাদের প্রভু আমাদের আদেশ দিয়েছেন।' প্রভু অর্থাৎ কিসরা।

সম্রাটকে পূজ্য বলে মনে করাটা এক সুপ্রাচীন গুমরাহি।[৩] যখন ইসলাম এল তখন 'ইলাহ'[৪] এর বাস্তবিকতা বদলে গেল আর এ শব্দ আল্লাহর জন্য বিশিষ্ট হয়ে রয়ে গেল। কিন্তু আধুনিক যুগে পুনরায় সেই পুরাতন গুমরাহির লক্ষণ আজকের জালালতুলমালিক বনে গেছে এবং সে তার কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ীও নয়, যে ইচ্ছামত ঐশ্বরিক বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যাতে মনগড়া আদেশাবলিকে কায়েম করে দেয় এবং সে ও তার পরিবার নিজের শাসনকে ছড়িয়ে দেয় যাতে তার সামনে তার জাতি সর্বদাই কুঁকড়ে থাকে।

যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনলেন তখন তিনি সোজা তাদের শাসনকর্তার কাছে চলে যেতে আদেশ দিলেন এবং বললেন যে, আমার প্রতিপালক তাদের প্রভুকে রাতারাতি বিনাশ করে দিয়েছেন। রসুলুল্লাহ এই দুজনের আগেই কিসরার পরাজয়ের খবর জানতে পেরেছিলেন। এই ঘটনার পরে ইয়েমেনের শাসনকর্তা ও ঐ ব্যক্তিদের মন ইসলামের প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত হয়ে গেল এবং দক্ষিণ প্রান্তের ঈসায়ী ও মজুসিদের মধ্যে ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহরাইনের শাসনকর্তার কাছেও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখলেন এবং মজুসিয়াত ত্যাগ করার উপদেশ দিলেন। হজরত আলী বিন হাজরামি তাঁর পত্র নিয়ে বাহরাইনের শাসনকর্তা মুনিজির বিন শাওয়ার সমীপে উপস্থিত হলেন। শাসনকর্তা সুশীল

---

১. বুখারী।
২. ইবনে জরির।
৩. বিপথগামিতা।
৪. উপাস্য।

স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন, ফলে তিনি ইসলামের দাওয়াতকে সোৎসাহে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর দিল ইসলামের জন্য উন্মোচিত হয়ে গেল।

হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন এবং ছোট একটি ভাষণও দিলেন :

'হে মুনজির ! তুমি জাগতিক বিষয়ে বড়ই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আখিরাতের বিষয়ে তুমি অজ্ঞ ও বোধবুদ্ধিহীন হয়ো না। মজুসিয়াত নিকৃষ্টতর ধর্ম। এতে না আছে আরবের প্রতি মর্যাদা আর না আছে গ্রন্থধারীদের সমতুল্য জ্ঞান। এর অনুসারীরা সেই মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যাদের নাম শুনলেই লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। আর তারা সেই বস্তু ভক্ষণ করে, যাকে সুশীল প্রকৃতি ঘৃণা করে। তারা সেই আগুনকে পুজো করে কিয়ামতের দিন যা তাদের ভক্ষণ করবে। হে মুনজির ! তুমি বুদ্ধিহীন ও নাদান নও, ঠিকমত ভেবে দেখো। যে ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলেন না তাঁর অনুসরণ করতে ও তাকে সত্যবাদী বলতে তোমার সংকোচ কিসে ? যে ব্যক্তি কখনো খিয়ানত করেননি তাকে আমির বলে মেনে নিতে এবং যিনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে তোমার দ্বিধা কোথায় ? যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই এবং নিঃসন্দেহে তিনি এমনই হন, তাহলে তুমি অনুধাবন করো যে, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী ও তাঁর রসুল এবং রসুলও এমনই যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁর আদেশকে কখনোই বলে না যে ভালো হতো যদি এমন আদেশ না দেয়া হতো। এরকমই যখন তিনি কোনো কাজকে বিরত করেন তখন কেউ বলে না যে ভালো হতো যদি এই কাজটি করার আদেশ পাওয়া যেত এবং যাকে যে সীমা পর্যন্ত ক্ষমা করা হয়েছে তার অধিক ক্ষমা করতেন অথবা যে কাজের যে দণ্ড নিশ্চিত করা হয়েছে তা যদি কম করা হতো, এ জন্য যে তাঁর প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা ও আদেশ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে ব্যক্তির ইচ্ছার অনুসারী।'

অনন্তর মুনজির শাওয়া ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার জাতিকেও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। কিছু লোক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করল কিছু লোক মজুসি বা অগ্নিপূজক রয়ে গেল ও কিছু লোক ইহুদি রয়ে গেল। যখন তিনি আল্লাহর রসুলের কাছে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ চাইলেন, তখন তিনি লিখলেন যে, 'যারা ইহুদি ও অগ্নিপূজক হয়ে থাকবে তাদের উপর জিজিয়া অনিবার্য।'

ইসলামী ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বকে কল্যাণ ও সুকর্ম দিয়ে পূর্ণ করে দিতে চায়। অতএব এর প্রসারের বিষয়ে খুবই ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করা উচিত। আরবরা তাদেরই মধ্যেকার এক ব্যক্তির উপর অহি অবতারণকে অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখেছিল এবং বিরোধ ও অস্বীকৃতির উপর দৃঢ়বদ্ধ ছিল :

'আর এরা যখন তোমাকে দেখে তখন উপহাস করে (বলে) কি সেই যাকে আল্লাহ রসুল করে রেখেছেন ?' – আল ফুরকান : ৪১

এরপর, রোমক ও অগ্নিপূজকদের বিরোধ ও অস্বীকৃতির কী দশা হবে ? যেখানে তারা আরবদের মান-মর্যাদা স্থান, সভ্যতা তথা রাজনীতিকে হীন ও তুচ্ছ বলে মনে করত। তারা কি অস্বীকৃতি ও উপহাস করা থেকে তাদের চেয়ে কিছুমাত্রও পিছনে থাকবে ?

পরন্তু চিন্তাধারা অনুযায়ী বর্তমানের সংকীর্ণ ও সীমিত আলোকে বিষয়টি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিত না। তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা তথা প্রভুত্বশালী হওয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখত। তারা পথের বাধা, কাল্পনিক কষ্টদুঃখ ও বিপদাপদকে হীন বলে মনে করত এবং পথের উপর বড় বড় শিলা পাথরকে বালির স্তূপের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিত না।

কার্ল মার্কস যদি বর্তমানের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়তেন যখন তার অনুসারীদের জেলে পোরা হচ্ছিল, তাহলে তারা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ত এবং তাঁর ও তাঁর চিন্তাধারার কণ্ঠ রোধ হয়ে যেত। পরন্তু তিনি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করে চললেন যে, কোনো না কোনো দিন রাষ্ট্রনায়করা তাঁর চিন্তাধারা অনুধাবন করবেন। যদি মিথ্যা এবং ভ্রান্ত চিন্তাধারার অনুসারীদের এই অবস্থা হতে পারে তাহলে এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয় যে, অহি দ্বারা সুশোভিত এই বার্তা বাহকের সম্রাট এবং শাসনকর্তাদের সাথে পত্র বিনিময় করার সময় এই বিশ্বাস অবশ্যই থাকে যে, তাঁর দ্বারা বহনকৃত এ হক (সত্য) একদিন না একদিন প্রভুত্বশালী হবেই–এই আশাই রসুলুল্লাহর মনকে আলোকিত করে রেখেছিল। যখন তিনি একদিকে জঙ্গলের বেদুইনদের সৎপথে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, আর অন্যদিকে অন্য জাতি তাদের নেতৃবৃন্দ ও অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের এই বিষয়ে প্রস্তুত করিয়ে নিচ্ছিলেন যে তারা এই নব ধর্মকে অনুধাবন করুন এবং তাকে অনুসরণ করুন।

যে ভ্রান্তি ও উগ্রতা নজদের বেদুইনদের বুদ্ধিহীন করে রেখেছিল ঠিক সেই ভ্রান্তি ও উগ্রতাই পারসিকদের সম্রাট কিসরার মস্তিষ্ক বিকৃত করে রেখেছিল।

সম্রাট ও ভিখারির জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার মধ্যে কী পার্থক্য থাকে ? চিকিৎসক তো একইভাবে তাদের উপর ওষুধ প্রয়োগ করবেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানবজাতিকে তাদের হৃদয় এবং মনকে রোগ মুক্ত করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালালেন এবং সবাইকে সেই উপকারের কথা বললেন, যা থেকে আরোগ্য হতে পারে এবং তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হতে পারে :

'এবং আমি অবতারণ করেছি সেই কুরআন, যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ (স্বরূপ) কিন্তু অত্যাচারীদের তাতে নিকৃষ্টতাই বৃদ্ধি পায়।' –বনি ইসরাইল : ৮২

অতএব, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁর উপচারগৃহে সাদা-কালো, প্রভু-ভৃত্য সকল প্রকার রোগীকে একত্রিত করেন তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রায়শ এমনও হয় যে, সম্রাট নিরাময়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছেন আর তার আশপাশের সেবক, চাকর, নোকর, সৈন্য, ভৃত্য, বৈভব সকলের সামনে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে, কিন্তু সমস্ত চোখ এই দৃশ্য থেকে ধোঁকা খেতে পারে না। উপচারক বা চিকিৎসকের তো রোগীর দুর্বল শরীরটাই প্রয়োজন। নবীগণ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লোকদের দেখেন যে, তারা অজ্ঞান, তাদের জ্ঞান বা শিক্ষা লাভ করা উচিত। বুদ্ধিহীনদের হিদায়াতের পথ অবলম্বন করা উচিত। তাদের আশপাশের জগৎ তাদের দায়িত্বশীলতাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। নইলে হিদায়াত ও গুমরাহি হিসেবে তাদের প্রতিদান আরো সুকঠিন হয়ে ওঠে।

পরন্তু বাতিল বা অসত্যের সমর্থক শক্তি বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না, কিন্তু এতটা দীর্ঘ অবশ্যই হয়ে যায়, যতটা নিদ্রাহীন ব্যক্তির জন্য রাতের পর রাত সুদীর্ঘ হয়ে যায়। তারপর একদিন সূর্যোদয় হয় এবং আল্লাহ অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে দেন।

এটাই কারণ, যখন ইয়েমেনের শাসনকর্তার রাজদূত মদিনায় আসেন তখন রসুলুল্লাহ তাদের বলেছিলেন যে, তোমার কর্তাকে গিয়ে জানিয়ে দাও যে, আমার ধর্ম আর আমার প্রভুত্ব কিসরাকে ডুবিয়ে দেবে এবং তার পায়ের তলার মাটির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এবং তাকে বলে দাও যে, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে সুরক্ষিত থাকবে এবং আমি তাকে তার জাতির শাসক বানিয়ে দেব।

তিনি (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় বসে বাধ্যকে শাসক বানিয়ে দিচ্ছিলেন আর অবাধ্যকে পদচ্যুত করে দিচ্ছিলেন। একথা কি এটাই প্রমাণ করে না যে, তাঁর সম্পর্ক জগতের প্রতিপালক বা সৃষ্টিকর্তার সাথে সমৃদ্ধ ছিল আর তিনি এই ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রবাহক ও দূতিয়ালির খবর মক্কার মুশরিক-পৌত্তলিকদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তারা তার পরিণামের প্রতীক্ষায় রইল। প্রারম্ভেই তারা যখন কিসরার দুর্ব্যবহারের খবর জানতে পারল তখন তারা খুব খুশি হলো এবং পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, তোমরা এই ব্যক্তির বাকি যন্ত্রণার কবল থেকে বেঁচে যাবে, কিসরার সম্রাট তার

মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ অপবাদ মক্কা ও তায়েফের অলি-গলিতেও ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুদিন পরেই কিসরাকে অপমান সইতে হলো এবং ইসলাম মানুষের হৃদয় ও দেশগুলোকে শাসন করার জন্য অবশিষ্ট রয়ে গেল। খবর এল যে, রসুলুল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রচারকরা কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন এমনকি ইয়েমেন, আম্মান ও বাহরাইন ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছে। একথা শুনে পৌত্তলিকদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো এবং বিভিন্ন গোত্র নিজেদের সমর্পিত করতে ও আদেশ পালন করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিল। বিশেষ করে আল্লাহর অহির সামনে কুফরি প্রতিদিন অসহায় ও সংকুচিত হয়ে পড়তে লাগল, যদিও অনেক গোত্র অজ্ঞানতাকে আঁকড়ে ধরে রইল :

'বরং আমি এদের এবং এদের পূর্বপুরুষদের জীবনোপকরণ দিয়েছি এমনকি আয়ু তাদের দীর্ঘ হয়েছে। অনন্তর এরা কি দেখে না যে আমি ভূমিকে তার কিনারা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। তাহলে এরা কি বিজয়ী ? বলে দাও। আমি তো কেবল অহির দ্বারা তোমাদের সচেতন করি। আর উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান ও সচেতন করলেও বোবা তা শোনে না।' – আল আম্বিয়া : ৪৪-৪৫

ছয়
উমরাতুল কাজা

হিজরতের সপ্তম বর্ষ শেষ হতে চলেছিল। এবার মুসলমানদের মক্কায় গিয়ে উমরা করার সময় এসে গিয়েছিল, গত বছর যা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁরা এক বছর অপেক্ষা করেছিলেন, পরন্তু ইতিমধ্যে দ্বীনের দাওয়াতের প্রচেষ্টা তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পুরো করে দিয়েছিল, এবার তাঁরা পুনরায় কুরবানির পশু নিয়ে মক্কাভিমুখে প্রস্থান করলেন এবং সঙ্গে নিয়ে চললেন প্রকাশ্য এবং স্থায়ী বিজয়ের শুভ সূচনাবলি।

মক্কাবাসী এ দৃশ্য দেখল না, তারা হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুসারে মক্কা ছেড়ে পাহাড়ি উপত্যকার দিকে চলে গেল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিরা ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করলেন। কুরাইশরা গুজব ছড়িয়ে দিল যে, মুসলমানরা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে এবং ভ্রান্তি ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

'হজরত ইবনে আব্বাস হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, সেই লোকেরা দারুণ নদওয়ার নিকট পঙ্‌ক্তিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে তাঁকে এবং তাঁর সাথিদের দেখতে পান। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করলেন এবং

নিজের চাদর বগল থেকে বের করে নিয়ে ডান হাত বার করে নিয়ে বললেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করুন, যিনি আজ এই লোকদের শক্তি প্রদর্শন করিয়েছেন।' তারপর তিনি রুকনকে চুম্বন করলেন এবং ধীরে ধীরে দৌড়াতে লাগলেন। তাঁর সাথে সাথে তাঁর সাহাবিরাও চুম্বন করে দৌড়াতে লাগলেন। এমনকি কাবা শরিফ তাঁদের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল। এই তীব্রতার সাথে তাওয়াফ বা পরিক্রমার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের শক্তি প্রদর্শন করা এবং তাদের প্রতি আরোপিত দুর্বলতার অপরাধকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। তারপর এ তরিকা, নিয়ম বা পদ্ধতি সুন্নতে পরিণত হলো।

ইবনে হিশাম-এ আছে, রসুলুল্লাহ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন আব্দুল্লাহ বিন রুওয়াহা রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটনীর লাগাম ধরে এই বীরত্বগাথা আবৃত্তি করছিলেন :

'কাফিরের দল : সরে যাও সবে নবীর এ পথ থেকে।
কল্যাণ যত আছে জেনো তাঁর নামের মহিমা মেখে ॥
প্রভু আমার ! বিশ্বাস রাখি এই বাক্যের প্রতি।
'তাঁর আদেশ পালন করে তোমাকেই প্রণতি ॥'

মুসলমানরা মক্কায় তিনদিন অবস্থান করলেন। তারপর কুরাইশদের কিছু লোক এসে তাঁদের নির্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিল এবং বলল যে, আপনি অনতিবিলম্বেই মক্কা ত্যাগ করুন। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'তোমরা যদি সময় দাও তাহলে তোমাদের মধ্যে পরিণয় ও বিবাহ ভোজের দাওয়াত দিই এবং তোমাদের সম্মিলিত করে নিই।' – ইবনে হিশাম

তারা জবাব দিল :

'আপনার বিবাহ ভোজের প্রয়োজন আমাদের নেই, আপনি অনতিবিলম্বেই মক্কা ত্যাগ করুন।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস, মাইমুনা বিনতে হারিস, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের খালার সাথে তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। এই বিয়ে মক্কায় হলো কিন্তু সোহাগ রাত কাটালেন 'সরিফ' নামক স্থানে। এই উমরা বিষয়ে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হলো :

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর রসুলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যাতে প্রজ্ঞা ছিল। তুমি মসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে– যদি আল্লাহ চান নিশ্চিন্তে-মস্তক মুণ্ডন করে এবং সারিবদ্ধভাবে নির্ভয়ে, এটাই হলো, যা তিনি জানতেন। তোমরা জানতে না। অনন্তর তিনি এর অতিরিক্ত আর একটি বিজয় অনতিবিলম্বেই দান করবেন।' – আল ফাতহ : ২৭

সাত

মুতার যুদ্ধ

বুসরার শাসনকর্তা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রবাহককে হত্যা করে ভয়ানক অপরাধ করেছিল, এর চেয়ে ভয়ংকর অপরাধ আর কী হতে পারত ? অনন্তর এ ঘটনায় মুসলমানরা খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। শুরহবিল বিন আমর রসুলুল্লাহর দূতের মুণ্ডুপাত করে সেই অপকর্ম করেছিল, যা আজ পর্যন্ত করতে কেউ-ই সাহস পায়নি। দূত অবাধ্য। তাকে কখনোই বধ করা হতো না, এই কারণে এই ঘটনা মুসলমানদের অপমানবোধ করতে বাধ্য করল। অতএব তাঁরা কিসাস নেয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিলেন এবং ঐ শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, যে রোমকদের খুশি করার জন্য এই ঘৃণ্য অপকর্মের দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

মুসলমানরা ৩০০০ সৈন্যের এক বাহিনী সংগঠিত করলেন, যা তাদের দৃষ্টিতে একটি বিশাল বাহিনী ছিল। মদিনাবাসী এই বাহিনীকে বিদায় জানাতে চললেন। তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ যেন তোমাদের ভালো রাখেন এবং সফলভাবে ফিরিয়ে আনেন।' আব্দুল্লাহ বিন রুওয়াহ এঁদের বিদায় সম্ভাষণের জবাবে কবিতার এই ছত্র কয়টি পাঠ করলেন :

'ফিরতে আমি চাই নাকো সেই কঠোর কঠিন যুদ্ধ হতে।
বরং আমি তুষ্ট হব আল্লাহতা'আলার মাগফিরাতে ॥
খোদার পথে আমি হলাম সেই আঘাতের প্রত্যাশী।
দেহের মাঝে প্রবেশ করুক বর্শা কঠিন আরো অসি ॥
অথবা এই বর্শাখানি প্রবেশ করুক শত্রু-বুকে।
অথবা সে প্রবেশ করুক আমার বুকের জিগর-মুখে।
লোকে যখন করবে ভ্রমণ এই অধমের কবর হতে।
বলবে তারা, ধন্য এজন, ধন্য সেনা খোদার পথে ॥'

রসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাহিনীর কয়েকজন সেনাপতি নিযুক্ত করলেন, জায়েদ বিন হারিসা রাজিয়াল্লাহুকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং আদেশ দিলেন, যদি তিনি শহীদ হয়ে যান তাহলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন হজরত জাফর বিন আবি তালিব রাজিয়াল্লাহু আনহু এবং যদি ইনিও শহীদ হয়ে যান তাহলে সেনাপতি হবেন হজরত আব্দুল্লাহ বিন রুওয়াহা রাজিয়াল্লাহু আনহু। – বুখারী

বাহিনী সিরিয়া অভিমুখে প্রস্থান করল।

সৈন্যদের আগমন সংবাদ রোমকদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলমানদের কীর্তি ও তাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে অনেক কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। অতএব, শত্রুরা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করল।

মুসলমানরা মআন নামক স্থানে গিয়ে জানতে পারলেন যে, লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে রোমক বাহিনী প্রতীক্ষায় রয়েছে, যাতে আরব খ্রিস্টানরাও অংশ নিয়েছে।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এমন বিশাল বাহিনীর উপর আক্রমণের পরিণাম অতি ভয়ানক হতে পারত। অতএব, ইসলামী বাহিনী মআন নামক স্থানে দুদিন অবস্থান করেন এবং পরামর্শ করলেন কী করা উচিত। কয়েকজনের অভিমত ছিল যে, শত্রুসৈন্যদের সংখ্যার কথা রসুলুল্লাহকে জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হোক এবং তার আদেশ মতো কাজ করা হোক।

আব্দুল্লাহ বিন রুওয়াহা সইতে না পেরে বললেন :

'আমার সঙ্গী সাথিরা ! যার সন্ধানে তোমরা বেরিয়েছিলে তাকে কি তোমরা অপছন্দ করছ ? আমরা তো শাহাদতের অভিলাষী, আমরা শত্রুদের সাথে সংখ্যা, শক্তি বা বাহুল্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ করি না ; বরং আমরা ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধ করি, যা আল্লাহ আমাদের প্রদান করেছেন। অতএব, ওঠো এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। দুই কল্যাণের মধ্যে থেকে অবশ্যই আমরা একটি কল্যাণ লাভ করব– হয় কাফিরদের উপর প্রভুত্ব না হয় শাহাদত।'

এই আবেগদীপ্ত বাক্য সবাইকে এত গভীরভাবে প্রভাবিত করল যে, মুসলমানদের সমস্ত শঙ্কা দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন, তা সে যুদ্ধের পরিণাম যাই হোক না কেন।

হজরত আব্দুল্লাহ বিন রুআহা অত্যন্ত উদ্যমী ও মধুরভাষী কবি ছিলেন। চলার পথেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শাহাদাত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, অতএব তিনি মনে প্রাণে এর জন্য ব্যাকুল ছিলেন। সে সময়ে যুদ্ধনীতি অন্য কিছু হতে পারত, কিন্তু শাহাদতের কথা শুনতেই মুসলমানদের হৃদয় আখিরাতের মোহে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তারপর তাদের মনে এল যে, আগের যুদ্ধগুলোতে শত্রুসৈন্য অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন। অতএব, তাঁরা একাগ্রচিত্ত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

হজরত আবু হুরাইরাহ যিনি এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, বর্ণনা করেন, আমি মুতার যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, মুশরিকরা নিকটবর্তী হলে আমি তাদের যে অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের প্রস্তুতি, রেশমি কাপড় চোপড় ও সোনার অলংকারে সজ্জিত দেখেছিলাম, তেমনটি আর কখনো দেখিনি। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সাবিত বিন আরকম রাজিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেন : আবু হুরাইরাহ ! সেনাদলকে দেখেছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ।

হজরত আবু হুরাইরাহ হুদাইবিয়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হজরত সাবিত তাঁকে বলেন : তুমি তো বদরের যুদ্ধে আমাদের সাথে ছিলে না। আমরা কখনোই সংখ্যাধিক্যের জোরে বিজয় লাভ করিনি।

দু'পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি হলো। আমরা যদি আশা করি যে তিন হাজার বীর প্রকাশ্য ময়দানে মোকাবিলা করে আর তাদের চেয়েও সত্তর গুণ[১] বেশি সৈন্যের উপর ভারি প্রতীত হবে তাহলে তা হবে নিরর্থক কথা।

হজরত জায়েদ বিন হারিসা রসুলুল্লাহর পতাকা উত্তোলন করে যুদ্ধ শুরু করলেন কিন্তু তিনি শত্রুদের শরাঘাতে শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর পতাকা তুলে নিলেন জাফর বিন আবি তালিব এবং তিনি সিংহবিক্রমে আক্রমণ শুরু করলেন।

আবু দাউদ এক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন, যেন আমি আজো হজরত জাফরকে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি তাঁর ঘোড়ায় কুঁচ কেটে দিয়ে শত্রুদের সাথে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করছেন, তারপর, শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধের সময় তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন :

'কত না নিকট স্বর্গ মোদের পবিত্র সে শান্তিদায়ক।
'তাহার শীতল পানীয়রাজি মধুর অতি তৃপ্তিদায়ক।
গজব আজি নিকট অতি অস্বীকারী রোমককুলের।
আজকে তাদের দিন এসেছে মাসুল দিতে অতীত ভুলের॥
তাদের যারা বংশাবলি বড়ই দূরে মোদের থেকে।
আমরা তাদের করব নিধন খোদার বাণী নিয়ে মুখে॥'

কথিত আছে যে, কোনো এক রোমকের তরবারির প্রবল আঘাতে তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

এক বর্ণনায় আছে যে, যুদ্ধ করতে করতে তাঁর ডান হাতটি কেটে পড়ে যায়, তখন বাম হাতে পতাকা সামলে নেন, সে হাতও কেটে পড়ে গেলে পতাকা কোলে করে নেন। তারপর তিনি শহীদ হয়ে যান।

হজরত জাফর মাত্র ৩৩ বছর বয়সে শাহাদতবরণ করেন।

তাঁর শাহাদতপ্রাপ্তির পর হজরত আব্দুল্লাহ বিন রুওয়াহা পতাকা তুলে নিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে চাপ খুব বেড়ে গিয়েছে এবং অবরোধ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তখন তিনি কিছুটা সংকোচবোধ করলেন, তারপর তাঁর দুই সাথির শাহাদতপ্রাপ্তি থেকে তাঁর মন সন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি এই কবিতার এই ছত্রগুলো আবৃত্তি করতে লাগলেন :

---

১. সম্ভবত, সংখ্যার আধিক্য বোঝানোর জন্য সত্তরগুণ কথাটি লেখা হয়েছে কিন্তু সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে সৈন্য ছিল ৩৩ গুণ বেশি অর্থাৎ একজন মুসলিম সৈন্যের মোকাবিলায় ৩৩ জন শত্রুসৈন্য ছিল। – অনুবাদক

'ওরে মন যদি তোর মৃত্যু না হয় মৃত্যু আমার হবেই হবে।
মৃত্যুর সেই হামাম গৃহে প্রবেশ জানিস হবেই হবে ॥
যে কামনা করেছিলি সেই অবসর পেয়েই গেলি।
বন্ধুদের মতোই আমার সেই শাহাদত হাসিল হবে ॥'

এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন আর তার চাচাত ভাই তাঁকে এক টুকরো গোশত দিলেন যে, এটি খেয়ে নাও। যাতে শক্তিলাভ করো। কয়েক দিন যাবৎ তো অভুক্ত ছিলে। আব্দুল্লাহ গোশতের সেই টুকরোটি চিবোচ্ছিলেন। এদিকে যুদ্ধের হাহাকারের প্রতি তাঁর মনোযোগ চলে গেল এবং সাথে সাথে গোশতের টুকরোটি ফেলে দিয়ে বললেন : 'ওরে প্রবৃত্তি ! লোক জিহাদ করছে আর তুই দুনিয়ার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে আছিস ?'

তিনি তৎক্ষণাৎ তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

এই তিন বীরকেশরীর শাহাদত লাভের পর সাবিত বিন আকরিদ পতাকা তুলে ধরলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'মুসলমানরা ! কাউকে সেনাপতি নির্বাচনে সহমত হয়ে যাও।' লোকেরা বলল- 'আপনিই সেনাপতি হোন।'

তিনি জবাব দিলেন : 'আমি এর যোগ্য নই।' অতঃপর হজরত খালিদ বিন অলিদের সৈন্যপত্যে সবাই একমত হয়ে গেলেন।

হজরত সাবিত নেতৃত্ব স্বীকার করতে আপত্তি করলেন, এর কারণ কার্পণ্য নয় ; বরং তাঁর ধারণা ছিল যে আমাদের মধ্যে সুযোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন। এই ভয়ানক বাহিনীর সামনে ইসলামী পতাকা ভূপাতিত হতে না দেয়াটা হজরত সাবিতের বীরত্ব ও সাহসের প্রমাণ, কতই না ভালো হতো, যদি লোকেরা বুঝত যে, কোনো যোগ্যতার কে পাত্র এবং তারা যদি তার মর্যাদা বুঝত ! কোনো অক্ষম, দুর্বল অযোগ্য ব্যক্তির উপর তো জাতির দায়িত্বের বোঝা অর্পণ করা উচিত নয়।

হজরত খালিদ পতাকা তুলে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন এবং এই ভয়ানক ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

পরাজয়ের যুদ্ধ বড়ই কষ্টদায়ক, বিপজ্জনক ও ভয়ানক হয়ে থাকে ; বিশেষভাবে সেই সময়, যখন হজরত খালিদ রোমকদের এই নীতি থেকে সচেতন করতে চাচ্ছিলেন না। বুখারী স্বয়ং খালিদ বিন অলিদ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, 'মুতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছিল।'

হজরত খালিদ এমন যুদ্ধনীতি অবলম্বন করলেন যে, রোমকরা অধিক হতেও অধিকতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং ইসলামী বাহিনীকে প্রকাশ্য যুদ্ধ আর করতে হলো না। হজরত খালিদ আপন নীতিতে মুসলমানদের এই অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে নিলেন এবং বৃহৎ শক্তির সাথে এই প্রথম যুদ্ধে তাঁর কীর্তিকে আর কেউ ম্লান

করতে পারল না। অদ্ভুত ব্যাপার যে, রোমকরা এই যুদ্ধবিধি থেকে নাজেহাল হয়ে পড়ল এবং তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। শুধু তাই নয়, তাদের কিছু দলকে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হলো। হজরত খালিদ রাজিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের এই ফলাফল পর্যাপ্ত বিবেচনা করে তার সাথিদের নিয়ে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

হজরত আনাস বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রণক্ষেত্র থেকে কোনো সংবাদ আসার আগেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়েদ জাফর ও আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং বললেন :

'জায়েদ আপন হাতে পতাকা তুলে নিল এবং সেও শহীদ হয়ে গেল, তারপর ইবনে রওয়াহা অগ্রসর হয়ে তাকে তুলে নিল এবং সেও শহীদ হয়ে গেল।'

একথা বলতে বলতে তার আঁখি দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল– 'তারপর আল্লাহর তরবারিগুলোর মধ্যে থেকে একটি তরবারি তাকে তুলে নিল, তারপর আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করলেন।' – বুখারী

ইবনে ইসহাক রসুলুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন :

'তারা সবাই জান্নাতবাসী হয়েছে এবং সকলেই সোনার সিংহাসনে বিরাজ করছে। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার সিংহাসনটি কিছু দোলায়মান অবস্থায় দেখলাম।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'এর কারণ কী ?'

বললেন : 'প্রথম দু'জন তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছিল, তারপর আব্দুল্লাহর কিছুটা সংকোচ হলো পরে সেও আগ্রসর হয়েছিল।'

এই যুদ্ধে যে বস্তু সংকোচ ও শঙ্কার উপর আচ্ছাদিত ছিল তা ছিল এই অনুভব যে মুসলমানদের বীরত্ব ও সাহস সেই সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল, যার সাথে সমকালীন জাতি সুপরিচিত ছিল। এই শ্রেষ্ঠ ধ্যান-ধারণাই তাঁদের বড় বড় রাষ্ট্রের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, যারা ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চালিয়ে এসেছিল এবং যাদের মোকাবিলায় কেউ-ই টিকতে পারেনি এবং সমকালে তারা ভিজে বিড়াল বনে গেছে।

মৃত্যুর প্রতি ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা কেবল লড়াকু পুরুষদেরই বিশেষত্ব ছিল না ; বরং এই প্রভুত্বপ্রাপ্ত নির্ণায়ক শক্তি পুরুষদের অতিরিক্ত শিশুদের মধ্যেও পাওয়া যেত এবং সমগ্র উম্মতই একটি ত্যাগী জিহাদি উম্মত ছিল। উদাহরণত, ইসলামী বাহিনী যখন মুতা থেকে মদিনায় ফিরে এল তখন শিশুরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ভর্ৎসনা করল যে, 'পলাতকের দল আল্লাহর পথ থেকে পালিয়ে এসেছ।'

এই বীর শিশুরা হজরত খালিদ ও তাঁর সাথিদের প্রত্যাবর্তনকে পলায়ন বলে মনে করত, যা তাদের বিবেচনায় নিন্দনীয় ছিল। কত না শক্তিশালী ছিল সেই প্রজন্ম, যাদের দীক্ষা ঈমান ও ইসলামের ছায়ায় হয়েছিল। এই মহান শিশুদের

রূপে ইসলামের বার্তা সাফল্যের কোন সীমা পর্যন্ত না পৌঁছে গেল ? কারা ছিলেন তাদের মাতা-পিতা আর কারা তাদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন ? আর তাদের মায়েরা তাদের কোন বীরত্বের গাথা শুনিয়েছিলেন ?

আজকের যুগের মুসলিম জাতি একথা জানতে ও শুনতে বড়ই উৎসুক। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে যাওয়া সেনাপতিদের বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করে সাহাবিদের বললেন :

'এ কথায় তাদের প্রসন্নতা ছিল না যে, তারা আমাদের কাছে থাকুক।' – বুখারী।

তাঁরা, যাঁর শরণ নিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় এবং দুনিয়া ও তার সমস্ত বস্তুর চেয়ে সুখদায়ক স্থান। কিন্তু তাঁদের পরিবার-পরিজন দুনিয়াতেই রয়ে গিয়েছিল, যারা আল্লাহর অভিভাবকত্ব ও পোষণের মধ্যে ছিল এবং আল্লাহ তাঁদের সবচেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ অভিভাবক ও সহায়ক। জাফরের পুত্র আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমার পিতার মৃত্যুর তিন দিন পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে এলেন এবং বললেন :

'আজকের পর থেকে আমার ভাইয়ের জন্য আর কখনো কেঁদো না ! আর আমার ভাইপোদের ডাকো।'

আব্দুল্লাহ বলেন : 'আমাদের ডাকা হলো, আমরা সে সময়ে মুরগির বাচ্চার মতো খুব ছোট দিলাম। তিনি আদেশ দিলেন, 'নাপিত ডাকো।' সে আমাদের মস্ত ক মুণ্ডন করে দিল, তারপর আল্লাহর রসুল হেসে বললেন : 'মুহাম্মদ তো আমার চাচা আবু তালিবের মতোই এবং আব্দুল্লাহর রূপ, স্বভাব এবং ব্যবহার আমার মতোই।'

তারপর আমার হাত ধরে বললেন :

'হে আল্লাহ ! তুমি জাফরের পরিবারের উত্তরাধিকার হয়ে যাও এবং আব্দুল্লাহর ব্যবসায়ে প্রাচুর্য দান কর', এ কথা তিনি তিনবার বললেন। আব্দুল্লাহ বলেন, আমাদের মা এলেন এবং আমাদের অনাথ অবস্থার জন্য কান্নাকাটি করলেন এবং বড়ই উদ্বিগ্ন হলেন। তখন আল্লাহর রসুল বললেন :

'সন্তান-সন্ততিদের জন্য তুমি ভয় পাচ্ছ, যেখানে আমি দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের অভিভাবক ?' – আহমদ

'মুতার যুদ্ধের ফলাফল থেকে মুসলমানদের প্রতিশোধের আগুন নিভে গিয়েছিল। কেননা উত্তর আরবের ঈসায়ীরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রোমকদের কাছ থেকে সহায়তা নিয়েছিল এবং এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা হারিস বিন উমাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছিলেন এবং আরব ঈসায়ীদের অত্যাচার ও আতঙ্ক থেকে তারা মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা,

এর ফলে তাদের মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল এবং তাঁরা জানতে পারল যে ইসলামের রাজদূত ও পত্রবাহকদের সাথে দুর্ব্যবহার করে মোটেও নিরাপদ থাকা যাবে না এবং মুসলমানদের গতিবিধি এক নতুন এবং ব্যাপক ক্ষেত্রের দিকে মোড় নিল।

আট
জাতুস সালাসিল স্রোতের কাছে

মুতার যুদ্ধ ৮ হিজরি সনের জমাদিউস সানি মাসে সংঘটিত হয়। এরপর মুসলমানরা একটু শান্তিতে থাকতে পারলেন না, কেননা সিরিয়া এলাকায় শত্রুদের ভিড় জমে উঠতে থাকে। অনন্তর হজরত আমর বিন আস রাজিয়াল্লাহু আনহু-কে সেখানকার শত্রুদের গতিবিধি ও উগ্রবাদিতাকে দমন করার জন্য পাঠানো হলো কিন্তু শত্রুদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার কারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অতিরিক্ত সাহায্য প্রার্থনা করা হলো এবং সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা জাতুস সালাসিল নামক জলস্রোতের কাছে অবস্থান করতে লাগলেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজিরদের একটি বাহিনী হজরত আবু উবাইদা বিন জররাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আমর বিন আস রাজিয়াল্লাহু আনহু-কে সাহায্যের জন্য পাঠালেন। যাতে হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের পাঠানোর সময়ে তাগিদ দিয়ে দিলেন যে, তোমরা যেন পরস্পরে মতভেদ সৃষ্টি করো না।

এরা যখন সেখানে পৌছালেন তখন আমর বিন আস হজরত আবু উবাইদাকে বললেন : 'আপনারা আমাদের সাহায্যার্থে এসেছেন, অতএব আমি নেতা।'

আবু উবাইদা : 'না ! আমি আমার সেনাদলের নেতা, আর আপনি আপনার সেনাদলের।'

আমর বিন আস : 'আপনি আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছেন।'

আবু উবাইদা অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও দুনিয়াবি বিষয়ে একজন উদাসীন মানুষ ছিলেন। তিনি বললেন : 'আমর ! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রস্থানের সময়ে তাগিদ দিয়েছিলেন যে, তোমরা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি কোরো না। যদি আপনি আমাকে অবজ্ঞা করেন তা সত্ত্বেও আমি আপনার আদেশ পালন করব।'

অতএব, তিনি আমর বিন আসের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলেন। হজরত আমর বিন আস নামাজ পড়লেন এবং পুরো বাহিনীর নেতৃত্ব আপন হাতে তুলে নিলেন।

হজরত আমর বিন আস রোমের সহযোগী গোত্রগুলোকে ধাওয়া করলেন এবং বল্লী, উজরা, বিলকাইন ও তয়-এর এলাকাগুলোতে ঢুকে পড়লেন। মুসলমানরা যেখানেই যেতেন সেখানেই তাদের বলা হতো যে, অমুক স্থানে অমুক গোত্রগুলো ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে কিন্তু যখনই মুসলমানদের আগমনের খবর পেত তখনই তারা পালিয়ে যেত। এই গোত্রগুলোর মধ্যেকার কেবলমাত্র একটি গোত্রের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ হলো। তারা পরাজিত হয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

যদিও হজরত আমর এই বেদুইনদের যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছিলেন এবং তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এর পরেও মুসলমানদের আর কোনো ভয়ানক যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হলো না। এই ধরনের সংঘর্ষের পরিণামে মুসলমানদের প্রতাপ সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং তাদের কীর্তিতে যে কালিমা লিপ্ত হয়েছিল তা সাফ হয়ে গেল।

এই অভিযানে এক প্রচণ্ড শীতের রাতে হজরত আমর বিন আসের স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। তিনি এই ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে, স্নান করলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, ফলে তিনি তায়াম্মুম করে নামাজ পড়লেন। কিছু সাহাবি ভ্রমে পতিত হলেন, অনন্তর, তারা মদিনায় এসে রসুলুল্লাহকে সে কথা জানিয়ে দিয়ে বললেন যে আমর জানাবত[১]-এর অবস্থায় নামাজ পড়েছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

আমর ! তুমি কি তোমার সাথিদের অপবিত্রাবস্থায় নামাজ পড়িয়েছ ? হজরত আমর এ প্রশ্নের জবাবে পুরো ঘটনা ও প্রেক্ষাপট জানিয়ে দিলেন, যে কারণে তিনি স্নান করেননি। অতি তীব্র ঠাণ্ডার কারণে তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। এবং আল্লাহ এ প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি পেশ করলেন :

'এবং নিজে নিজেকে হত্যা কোরো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াময়।' –আন নিসা : ২৯

এ কথা শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন এবং তাঁকে আর কিছু বললেন না। – আবু দাউদ, দারকুতনী, হাকিম, বাইহাকী

এ ব্যাপারে হজরত আমরের ইজতিহাদ সঠিক ছিল। কেননা, পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে 'তায়াম্মুম' জায়েজ আছে।

---

১. অপবিত্রতা।

নয়

মহান বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মুসলমানরা ইসলামের প্রচার প্রসারে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। রুচিকর এবং অরুচিকর বিষয়গুলোর প্রশ্নে কুরাইশদের সাথে তাঁদের সন্ধি হয়েছিল, যার ফলে জনসাধারণ আলোকিত বিষয়ে শিক্ষালাভের এবং তা অনুধাবনের অবসর পেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কুরাইশরা নিজেদের নীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তারা এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিকে গুরুত্ব দেয়ার পক্ষপাতী ছিল না, যারা সমগ্র আরব উপদ্বীপের কায়া পাল্টে দিয়েছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বে তাকে এক নতুনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

এই নির্বুদ্ধিতা ও বিবেকহীনতা বড় বড় হঠকারিতা ও মূর্খতার চূড়ান্ত পরিচয় দিল। যার ফলে হুদায়বিয়ার সন্ধি নিরর্থক হয়ে পড়ল। এর ব্যাখ্যা হলো যে, কুরাইশরা তাদের সহযোগী বনু বকর গোত্রের সাথে যোগ দিয়ে খুজাআদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিল। খুজাআরা ছিল মুসলমানদের সহযোগী। তাদের কিছু লোককে তারা হত্যা করল। বনু খুজাআরা হরম-এ আশ্রয় নিল। কেননা, তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না কিন্তু এই উপদ্রবিরা হরমকেও মানল না এবং বনু বকররা সেখানেও তাদের লোকদের হত্যা করল। কুরাইশরা বরাবর বনু বকরদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল এবং হিংসা ও উত্তেজনায় ঘৃতাহুতি দিল।

বনু খুজাআ হরম-এ আশ্রয় গ্রহণ করে, যেখানে উপদ্রব ও হিংসা বৈধ নয়। অতএব বনু বকরের নেতা নৌফেল বিন মাবিয়াকে খুজাআরা বলল : 'হে বনু বকর ! আজ কেউ নেই, তুমি প্রাণ ভরে প্রতিশোধ নিয়ে নাও।'

বনু খুজাআরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি আমর বিন সালিম খুজাইকে মদিনায় রসুলুল্লাহর সেবায় পুরো পরিস্থিতি অবগত করিয়ে সাহায্যের জন্য পাঠালেন। যখন তিনি মদিনায় পৌঁছালেন তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে শিষ্য পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। আমর গিয়েই তাঁর সামনে কবিতার এই ছত্রগুলো আবৃত্তি করলেন :

'হে মোর প্রভু ! এসেছি আমি মুহাম্মদের কাছে।
স্মরণ করাতে এসেছি মোদের যে প্রতিজ্ঞা আছে ॥
আমার পিতা ও তার পিতা আবদে মুত্তালিব।
যে প্রতিজ্ঞা রহিয়া গিয়াছে আজো আমাদের মাঝে ॥
আপনি মোদের সন্তান সম, আমরা পিতার সম।
আজ্ঞা পালিতে কখনো আমরা করি নিকো বেশি কম ॥
আল্লাহতা'লা সামর্থ্য দিন আজ আমাদের তরে।

আপনি মোদের রক্ষা করুন মহা সাফল্য ভরে ॥
মহান নবীও সঙ্গে আসুন মহান কান্তিমান।
চতুর্দশীর চাঁদের মতো মহান আলোকমান ॥
যুদ্ধ করুন উপদ্রবি আততায়ীদের সাথে।
তাদের তিনি নিধন করুন হউন প্রকাশমান ॥
উপদ্রবি ও উগ্রবাদীরা অপমান যদি করে।
মুখমণ্ডল হতে যেন সে আলোকধারা ঝরে ॥
মর্যাদা ও গৌরব লাভে হন সম্মানিত।
শত্রুবাহিনী ভেসে যায় যেন সাগর ফেনার মতো ॥
সন্ধি ভঙ্গ করেছে কোরেশ ভেঙেছে প্রতিশ্রুতি।
মিথ্যুক তারা বিশ্বাসঘাতী ভঙ্গ করেছে নীতি ॥
'কদা'য় তারা হত্যা করেছে আমাদের লোকজনে।
ভেবেছিল তারা সেই কথা যেন না বলি কাহারো সনে ॥
ভেবেছিল তারা কোনো সাহায্য না চাই যেন কভু।
অস্ত্র আঘাতে নিঃশেষ যদি করে দেয় তারা তবু ॥
কুনিকৃষ্ট শত্রুর দল সংখ্যায় ছিল কম।
ঘুমের মধ্যে হত্যা করছে যেন সাক্ষাৎ যম ॥
দতী'র স্রোতে লোকজন ছিল নিদ্রায় অচেতন।
নিরস্ত্রজনে হত্যা করেছে হয়ে নিশঙ্ক মন ॥
ছোট ও বড় সুগভীর ঘুমে অচেতন ছিল সবে।
রুকু সিজদায় রত ছিল যারা তাদেরও ছাড়েনি তারা।
ফরিয়াদ করে দুই হাত তুলে মরে গেছে তারা সবে ॥

কবিতার রূপে এই শোকাবেগপূর্ণ সাহায্যের প্রার্থনা শোনার পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'হে আমর বিন সালিম ! তোমাদের সাহায্য করা হবে।' – ইবনে হিশাম

যথাসময়ে কুরাইশরা তাদের ভুল বুঝতে পারল। ফলে আবু সুফিয়ান মদিনায় গেল চুক্তি নবায়ন করার জন্য।

মদিনায় পৌঁছে সে সোজা চলে গেল তার কন্যা ও রসুলুল্লাহর পত্নী উম্মে হাবিবা রাজিয়াল্লাহু আনহার কাছে। বিছানায় বসতে চাইলে তিনি তা গুটিয়ে নিলেন। আবু সুফিয়ান বলল : 'হতভাগী ! তুই আমাকে বিছানায় বসার যোগ্য মনে করলি না ?'

উম্মে হাবিবা : 'এ বিছানা রসুলুল্লাহর ! আর তুমি হলে অপবিত্র পৌত্তলিক।'

আবু সুফিয়ান : '(ক্রুদ্ধ হয়ে) আমার অগোচরে তুই অধঃপাতে গেছিস।' তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেথায় উপস্থিত হলে সে তার আগমনের উদ্দেশ্য জানাল কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। – ইবনে হিশাম

এরপর সে হজরত আবু বকরের কাছে এ ব্যাপারে সুপারিশ করানোর জন্য গেলে তিনি তা করতে রাজি হলেন না। তারপর সে হজরত উমরের সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি উত্তর দিলেন : 'আমি ? এবং তোমার জন্য সুপারিশ করব ? যদি আমি একজন সাথিকেও না পাই তা সত্ত্বেও আমি একাই জিহাদ করব।'

তারপর সে হজরত আলীর সেবায় উপস্থিত হলো কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন :

'আল্লাহর কসম ! এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সিদ্ধান্তের বিষয়ে কথা বলার সাহস কারো নেই' এবং তিনি তাকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান ফিরে গিয়ে কুরাইশদের কাছে নিজের দৌত্যের ব্যর্থতার কথা জানিয়ে দিল আর এদিকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সাহাবিদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আদেশ দিয়ে দিলেন এবং বিশেষভাবে তাগিদ দিয়ে দিলেন যে, আমাদের বাহিনী মক্কায় প্রবেশের আগে কোনো অবস্থাতেই এ খবর যেন বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে। – ইবনে ইসহাক

আদেশমাত্রই মুসলমানরা প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, মক্কাবাসীদের সাথে এবার নির্ণায়ক যুদ্ধের সময় এসে গিয়েছে।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে আর এক বিকট সমস্যা সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথম দিককার মুসলমানদের মধ্যে এক সাহাবি পত্র মারফত কুরাইশদের জানিয়ে দিলেন যে, হজরত মুহাম্মদ তোমাদের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন।

আপনারা এইমাত্র অধ্যয়ন করলেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধনীতি গোপন রাখার কতটা অভিলাষী ছিলেন। এই নীতি অবলম্বনের ফলে কি সাফল্য তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আসত না ? এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতি কমের চেয়েও কম হতো না ? বরং বিনা রক্তপাতে তাঁরা কুরাইশদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারতেন।

কুরাইশদের কাছে পত্র প্রেরণের অর্থ এটাই ছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা এবং তাদের মোকাবিলার সাধন ও অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করতে বলা।

হজরত আলী বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, জুবাইর ও মিকদাদ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে নিরন্তর চলার আদেশ দিয়ে বলে দিলেন যে, রৌজা-এ-খাখ নামক স্থানে এক উষ্ট্রারোহিনী মহিলাকে পাবে, তার কাছে মক্কার মুশরিকদের নামে পাঠানো একটি পত্র আছে, সেটি কেড়ে নিয়ে এসো। তিনি বলেন, আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে অনবরত চলতে চলতে 'রৌজা-এ-খাখ-এ' পৌঁছে সেই মহিলাকে ঘিরে ফেললাম। আমরা তার কাছে পত্রটি চাইলে সে বলল, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম, পত্র দিয়ে দাও নইলে তোমাকে

বিবস্ত্র করে খুঁজে বের করব। সে তখন তার চুলের খোঁপার মধ্য থেকে পত্রটি বের করে দিল এবং আমরা সেটি নিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় উপস্থিত হয়ে গেলাম। পত্রটি খুলে দেখা গেল যে সেটি হজরত হাতিব বিন আবি বলতার পক্ষ হতে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের নামে লেখা, যাতে রসুলুল্লাহর সামরিক প্রস্তুতির খবর জানানো হয়েছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন :

'হাতিব !' কী ব্যাপার ?'

হাতিব : 'হে আল্লাহর রসুল ! এ বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি করবেন না। কুরাইশদের সাথে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই, কেবল সহযোগিতার সম্বন্ধ রয়েছে। আমার পরিবার-পরিজন এখনো মক্কায় রয়েছে। যাদের পৃষ্ঠপোষক ও দেখাশোনার কেউ নেই। এর বিপরীতে মুহাজিরদের আত্মীয়স্বজনরা রয়েছেন যে জন্য তাঁদের পরিজনরা সুরক্ষিত। সেজন্য আমি চিন্তা করলাম যে তাদের কোনো উপকার করি, যাতে আমার পরিজনদের তারা নিরাপত্তা দেয়। আল্লাহর কসম ! আমি মুরতাদ[১] হয়ে যাইনি এবং কুফরির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এ কাজ আমি কখনোই করিনি।'

রসুলুল্লাহ : 'এ ঠিক বলেছে।'

হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমাকে আদেশ দিন, এ মুনাফিকের মুণ্ডু উড়িয়ে দিই।'

রসুলুল্লাহ : 'এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং আল্লাহ বদরিদের ক্ষমা দিয়েছেন, অতএব, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।'

আল্লাহ এই আয়াত অবতারণ করলেন :

'হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও অথচ তোমাদের কাছে আগত সত্যকে তারা অস্বীকার করেছে। তারা রসুলকে ও তোমাদেরও বহিষ্কার করেছে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টির জন্য আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাকো, তাহলে কেন তাদের প্রতি গোপন বন্ধুত্বের জন্য বার্তা প্রেরণ করছ ? তোমরা যা গোপন করো এবং প্রকাশ করো তা আমি ভালোই জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমনটি করে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।' —আল মুমতাহিনা : ১

হজরত হাতিব এই ব্যবহারের কারণে পথচ্যুত হলেন।

---

১. ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীকে মুরতাদ বলা হয়। মুরতাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ধর্মত্যাগ হলেও তার ভাবার্থ হলো ইসলাম ধর্মত্যাগী ঘৃণিত অভিশপ্ত ব্যক্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যার যোগ্য অপরাধী। —অনুবাদক

মুশরিক-পৌত্তলিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা তাঁর জন্য শোভনীয় ছিল না। কেননা, তারা কুফরিকে আঁকড়ে ধরে ছিল এবং হিংসায় বনু বকরকে সহযোগিতা করেছিল এবং তারা মুসলমানদের সাথে যে আচরণ করেছিল হাতিব অন্যদের তুলনায় তা ভালোই জানতেন।

প্রায়শই কোনো কোনো মহান ব্যক্তি এমন সব ভুলত্রুটি করে বসেন যার কারণে তিনি ছোট হয়ে যান। পরন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তিনি অনবধানবশত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন না ; বরং মার্জনা করে দেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত হাতিব-এর এ মানসিক অবস্থাটা বুঝতেন। তিনি জানতেন যে, তিনি ভুল কারণ দর্শাননি। মুসলমানরা একটি বড় যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চলেছিলেন, যাতে পরাজিত হওয়াটাও অসম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় পুরাতন বন্ধুত্ব কাজে আসতে পারত। পরন্তু হাতিবের কোনো আত্মীয়স্বজন সেখানে ছিল না। অতএব তাঁর ভবিষ্যৎ সুরক্ষা হেতু তিনি বন্ধুত্বের হাত বাড়ানোর কোশেশ করেন।

পরন্তু হাতিবের ধ্যান-ধারণা ভুল ছিল। পৌত্তলিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার আত্মীয়তা ও বংশগত সম্পর্কের কোনো পরোয়া করেনি, তা সত্ত্বেও তাদের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম রাখাটা কীভাবে শোভনীয় ছিল ? আমরা তো আল্লাহর জন্য তাদের সাথে শত্রুতা করেছি আর আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে, এই যুদ্ধে নিজেদের জানমাল নিঃসঙ্কোচে উৎসর্গ করে দেব।

পৌত্তলিকদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়াটা যদি বৈধও হতো তা সত্ত্বেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করাটা কেন হবে না বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল এবং যার কারণে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারত ?

অতীত আত্মত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত হাতিবকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। রসুলুল্লাহ মুসলমানদের আদেশ দিলেন যে, তার গুণের কথা স্মরণ রাখো। এই মহান উৎসাহ ও উদার হৃদয়ের দ্বারা ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সেই ব্যক্তির গুণাবলিকে ভুলে যেয়ো না যে অকস্মাৎ কোনো ভুল করে ফেলেছে, যেখানে আজীবন সে সৎকর্মই করে এসেছে।

আবু সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তনের পর মক্কায় ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর পরিবার পরিজন ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং রসুলুল্লাহর সসৈন্যে মক্কায় আগমনকালে পথিমধ্যেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

একইভাবে আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব ও আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়ারও আবওয়া নামক স্থানে রসুলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এই

দুজন মক্কায় তাঁকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল ; পরন্তু তিনি তাদের অতীত অপকর্মকে উপেক্ষা করলেন, তা সত্ত্বেও তাদের উপস্থিতির অনুমতি দিলেন না।

হজরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানকে পরামর্শ দিলেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে সেই কথাই বলো, যা ইউসুফের (আ) ভাইয়েরা ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন অর্থাৎ তারা বলেছিলেন :

'আল্লাহর কসম ! আমাদের মোকাবিলায় আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেন আর নিশ্চয়ই অপরাধী আমরাই ছিলাম।' –ইউসুফ : ৯১

কেননা এর চেয়ে ভালো উত্তর আর হয় না। অতএব, এমনটিই করা হলো এবং রহমতে আলম[১] রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে উত্তর এল :

'আজ তোমাদের প্রতি আমার আর কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি সর্বাপেক্ষা করুণাময়।' –ইউসুফ : ৯২

আবু সুফিয়ান তার প্রশংসায় কবিতার এই ছত্র কয়টি আবৃত্তি করল :

'শপথ তোমার জীবন প্রতি যখন আমরা সবে।
উচ্চে তুলেছি পতাকা আমরা এই কথা মনে ভেবে ॥
লাত আমাদের মহাদেবতা তার সম কেউ নেই।
মুহাম্মদের উপরে মোদের মহান বিজয় হবে ॥
তখন আমরা আঁধার রাত্রে হারিয়ে পথের দিশা।
হাহাকার করে ফিরেছি আমরা বুকে নিয়ে মরু তৃষা ॥
হা বিভ্রান্ত ! বেকুল পথিক ॥
কত দুর্ভাগা আমি
অবশেষে আমি তোমার কাছেই পেয়েছি পথের দিশা ॥
পথের দিশা দেখালেন যিনি তিনি আমাদেরই জন।
এতদিন তাকে ইচ্ছা করে পায় নাই খুঁজে মন ॥
আমরা তাঁকে বেদনা দিয়েছি, করেছি বহিষ্কার।
আজকে তাঁকে নিকটে পেয়ে ধন্য জীবন ধন্য মন ॥

রসুলুল্লাহ একথা শুনে বুক চাপড়ে বললেন :

'তুমিই আমাকে সবচেয়ে বেশি ব্যথা দিয়েছ আর সবচেয়ে বেশি অপমান করেছ।'[২]

---

১. জগতের অনুগ্রহ।
২. ইবনে জরির, হাকিম।

ইসলামী বাহিনী বন-জঙ্গল-মরুভূমি-পাহাড়-উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করে এগিয়ে চলল। তারপর মাররুজ জাহরানে পৌঁছে 'ঈশা'র নামাজ পড়ে সেখানে শিবির স্থাপন করা হলো। আগুন জ্বালানো হলো।

দশ সহস্রাধিক সৈন্য ছিল। ফলে সমগ্র এলাকা আলোকময় হয়ে উঠল। মক্কাবাসীরা এ খবর জানত না। হজরত আব্বাস ভাবলেন, এমতাবস্থায় যুদ্ধ হলে সমূহ প্রাণহানির আশঙ্কা আর এতে কোনো লাভও হবে না।

তিনি উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে লাগলেন, যাতে কুরাইশদের সাথে সন্ধির ব্যবস্থা করা যায় এবং তাঁরা রসুলুল্লাহর শরণ গ্রহণ করলেন।

সংযোগবশত মক্কার তিন নেতা পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য গোপনে খোঁজখবর নিতে শুরু করল, যখন তারা উপত্যকার কাছে এসে পৌঁছাল তখন আলোর সমুদ্র দেখে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান বলল : আমি আজকের মতো এত আগুন আর কখনো দেখিনি। আর এত বড় সেনাদলও দেখিনি।

বুদাইল বিন ওয়ারাকা : 'আল্লাহর কসম ! এ খুজাআদের আগুন, যারা যুদ্ধ করতে এসেছে।'

আবু সুফিয়ান : 'খুজাআরা এত আগুন জ্বালাতেও পারবে না, আর এত সৈন্য একত্রিতও করতে পারবে না।'

মুসলমানরা তাদের পূর্ব নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ; যাতে সমস্ত বিষয় তাদের নখদর্পণে থাকতে পারে এবং কুরাইশদের বিভ্রান্ত করা যেতে পারে এবং আত্মসমর্পণ ছাড়া তারা যেন আর কোনো উপায় খুঁজে না পায়। তারা কুরাইশদের এই তিন ব্যক্তির পদধ্বনি শুনতে পেলেন, যাদের মধ্যে হাকিম বিন হিজামও ছিল। অতএব, তাঁরা তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহর কাছে নিয়ে চললেন। হজরত আব্বাস এই বন্দিদের পিছু পিছু ঘোষণা করতে করতে চললেন যে, এরা আমার আশ্রিত। যখন এদের রসুলুল্লাহর সমীপে হাজির করা হলো তখন রাতের মধ্যেই ইসলামের জন্য তাদের হৃদয় উন্মোচিত হয়ে গেল, কিন্তু আবু সুফিয়ান একটু দেরি করল এবং সকাল হতেই সে ইসলাম গ্রহণ করল।

এঁরা যখন কুরাইশদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন তখন রসুলুল্লাহ ঘোষণা করে দিলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ, যে মসজিদুল হারামে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ আর যে দ্বার বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরে আশ্রয় নেবে, সেও নিরাপদ। —ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাক

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের অহংবোধের ভাবনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাকে এভাবে সম্মানিত করলেন, এতে কারোরই ক্ষয়ক্ষতির কোনো আশঙ্কা ছিল না। এতে কোনো পরিশ্রম, শ্রান্তি, ক্লান্তি ও

অবসাদও ছিল না, আর এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কাছে টানার মধ্যে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও ছিল না। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তপাত বা যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য আবু সুফিয়ানের সাথে এই নীতি অবলম্বন করলেন এবং হজরত আব্বাসকে বললেন, আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড় করিয়ে ইসলামী বাহিনীর শৌর্য প্রতাপকে স্বচক্ষে দেখিয়ে দাও, যাতে মোকাবিলার লেশমাত্র আকাঙ্ক্ষাও তার মধ্যে অবশিষ্ট না থাকে।

হজরত আব্বাস বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মতো আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলাম এবং ইসলামী বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল আগমনকে প্রত্যক্ষ করালাম। প্রত্যেকটি গোত্র স্ব-স্ব, আপনাপন পতাকা উত্তোলন করে অগ্রসর হতে লাগল। যখনই কোনো গোত্র বেরিয়ে আসত তখনই আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করত : 'এরা কারা ?'

আমি বলতাম : 'এরা সুলাইম গোত্রের সৈনিক।'

আবু সুফিয়ান : 'সুলাইমদের সাথে আমার কাজ কী ?' তারপর অন্য গোত্র বেরিয়ে এলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল : 'আব্বাস ! এরা কোন গোত্রের লোক।' আমি বললাম : 'এরা মুজাইনা গোত্রের লোক।' 'সে বলল : 'মুজাইনাদের সাথে আমার কী দরকার ?' এমনকি, একের পর এক গোত্র বেরিয়ে আসতে লাগল আর সে প্রত্যেকের বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল আর আমি যখনই তার উত্তর দিচ্ছিলাম, তখন সে বলছিল এদের সাথে আমার কী প্রয়োজন ? এমনকি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সবুজ বাহিনী নিয়ে যখন অগ্রসর হলেন– যাদের মধ্যে আনসার মুহাজির উভয়ই সম্মিলিত ছিল এবং প্রত্যেকেই লৌহবর্ম পরে ছিলেন। তাদের দেখে ভীতত্রস্ত হয়ে আবু সুফিয়ান প্রশ্ন করল : 'সুবহানাল্লাহ ! (আল্লাহ পবিত্র) এরা কারা ?'

আমি বললাম : 'এরা মুহাজির ও আনসার এবং এঁদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসুল।'

আবু সুফিয়ান : 'এর আগে এরা এত শক্তির অধিকারী ছিল না। আল্লাহর কসম ! হে আবুল ফজল ! তোমার ভাইপোর শাসন বড়ই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।'

আব্বাস : 'হে আবু সুফিয়ান ! এ তো নবুয়তের চমৎকারিত্ব।'

আবু সুফিয়ান : 'তাহলে তো দারুণ ব্যাপার !'

আবু সুফিয়ান মক্কায় অত্যন্ত বিস্ময় বিমুগ্ধাবস্থায় প্রবেশ করল। সে অনুভব করল যে, তার পেছন ধরে যে তুফান প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে তা পথের খড়কুটোগুলো পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কেউ তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না।

মক্কাবাসীরা দূর থেকে এই গৌরবোজ্জ্বল বাহিনীকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসতে দেখল। তারা তাদের নেতৃবর্গের প্রতি আদেশের প্রতীক্ষা নিয়ে তাকিয়ে রইল, সহসা উচ্চৈঃস্বরে আবু সুফিয়ানের কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল :

বৃন্দ ! এ মুহাম্মদের বাহিনী তোমাদের প্রতি তুফানের বেগে ধেয়ে
ত র আগে এত বড় বাহিনী আর কখনোই দেখোনি। অনন্তর আবু
সু । হে যে আশ্রয় নেবে সে নিরাপত্তা পাবে।'

প ী হিন্দ বিনতে উৎবা উপস্থিত ছিল। যখন সে তার স্বামী-প্রবরের মুখ
এঃ ওয়াজ শুনল সে তখন প্রবল বিক্ষোভে আবু সুফিয়ানের গোঁফ ধরে
তে টা তে চিৎকার করে বলল :

'এই কাপুরুষকে তোমরা ধোলাই লাগাও। এ জাতিকে ভুলপথে চালিত
ক ছে।'

আবু সুফিয়ান তার পত্নীর এই আচরণের কোনো গুরুত্ব দিল না। সে আরো তাকে শাসিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল : 'ওরে মুখপোড়া, তুই বিভ্রান্ত হোস না ! সে এত বড় বাহিনী নিয়ে আসছে আর এত বড় বাহিনী তুমি কখনো দেখোনি। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ থাকবে।'

লোকেরা বলল : 'তোর নাশ হোক, তোর ঘরে ঢুকে আমাদের কী লাভ হবে ?'

আবু সুফিয়ান কারো কথায় কান না দিয়ে নিরন্তর চিৎকার করতে লাগল : 'আর আপনাপন ঘরে যে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ, যে কাবাঘরে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।' তারপর লোকেরা আপনাপন বাড়িঘর ও কাবাঘরের দিকে ছুটতে লাগল।

দেখতে না দেখতেই উম্মুল কুরা[১]র অলি গলিতে নীরবতা নেমে এল। লোকেরা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে চলে গেল। লোকেরা দ্বার বন্ধ করে দিয়ে তার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল এবং মসজিদুল হারামে গিয়ে একত্রিত হয়ে গেল এবং 'কী হয় কী হয়' ভাব নিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইল।

যখন এ বিজয়ী বাহিনী প্রবল উচ্ছ্বাসে নগরে প্রবেশ করছিল তখন রসুলুল্লাহ তাঁর উটের উপর বসে ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তিনি মাথাটি ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, তা উটনীর কুঁজ স্পর্শ করবে। বিনয় ও নম্রতায় তিনি আপ্লুত হয়ে যাচ্ছিলেন। তার দাড়ি কুঁজের মধ্যবর্তী স্থানে ঘিঁষড়ে যাচ্ছিল।[২]

বিজয়ের সেই আদর্শ মক্কায় প্রবেশ করছিল, যার একটিমাত্র ইঙ্গিতেই মক্কায় কোনো বস্তুর নামগন্ধমাত্রও অবশিষ্ট থাকতে পারত না। এই স্পষ্ট বিজয়ের নায়কের মনে অতীত যুদ্ধের স্মৃতিগুলো ভেসে উঠছিল। কীভাবে তাঁকে আপন মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল ? আর আজ বিজয়ীর বেশে কীভাবে সেখানে প্রবেশ করছিলেন ? কী সম্মানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল আজকের প্রাতঃ, যা

---

১. কেন্দ্রীয় বসতি অর্থাৎ মক্কা।

২. ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম।

আল্লাহ তাঁকে প্রদান করেছিলেন ? এই সমস্ত যত নিয়ামতের কথাই তার স্মরণে আসছিল কুঁজের প্রতি তার শির ততই আনত হয়ে পড়ছিল। আর কিছু লোকের বুকের মধ্যে অন্য ধরনের ভাবনাও উছলে উঠছিল।

আউস গোত্রের নেতা হজরত সাদ বিন উবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহুর মক্কাবাসীদের শত্রুতার কথা স্মরণে আসতে লাগল এবং তাদের অত্যাচার ও দুরাচারিতার কথা তাঁর মনে প্রবলভাবে জেগে উঠতে লাগল। তারপর তাঁর মনে একথাও জেগে উঠল যে, আজ আমরা শক্তি লাভ করেছি তারপর তার মুখ থেকে নিঃসঙ্কোচে উচ্চারিত হলো : 'আজ যুদ্ধের দিন কাবা আজ হালাল করে দেয়া হবে, আল্লাহ আজ কুরাইশদের অপমানিত করেছেন।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা জানতে পেরে বললেন :

'না, বরং আল্লাহ আজ কাবাকে মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রদান করেছেন এবং কুরাইশদের সম্মানিত করেছেন।'

তারপর আদেশ দিলেন সাদ বিন উবাদার হাত থেকে পতাকা নিয়ে কায়েস বিন সাদ রাজিয়াল্লাহু আনহু-কে দেয়া হোক, যাতে লোকদের মধ্যে তিনি শক্তি না পান।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার উপরি অংশে প্রবেশ করলেন (বুখারী) এবং অন্য সেনাধিপতিদের আদেশ দিলেন, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে তোমরা কেবল তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে। (ইবনে হিশাম) অনন্তর, সমস্ত গোত্র মক্কায় অন্যান্য দিক থেকে প্রবেশ করল।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ মক্কায় নিচু অংশ দিয়ে প্রবেশ করলেন। ওদিকে কুরাইশদের কিছু লোক মজুদ ছিল যারা কোনো অবস্থাতেই আত্মসমর্পণে রাজি ছিল না। অতএব, তারা খন্দমা নামক স্থানে গিয়ে একত্রিত হলো। যাদের নেতৃত্বে ছিল ইকরিমা বিন আবু জেহেল, সহল বিন আমর ও সফওয়ান বিন উমাইয়া। কিন্তু এ মহান বাস্তবিকতা তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিল এবং হজরত খালিদকে দেখে তারা গড়িমসি করে পালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে এক মজার ঘটনা ঘটে যায়। বনু বকর গোত্রের হিমাস বিন খালিদ নামক এক ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র জমা করছিল। তার পত্নী তাকে ঐভাবে অস্ত্র সাজাতে দেখে প্রশ্ন করল : 'এসব কী জন্য ?' সে বলল : 'মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।' একদিন তার পত্নী বলল : 'আল্লাহর কসম ! মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদের সামনে কিছুই টিকতে পারবে না।' হিমাস বলল : 'আল্লাহর কসম ! আমার আশা যে আমি কোনো না কোনোভাবে তোমার আশা পুরো করে দেব।' তারপর এই কবিতাটি আবৃত্তি করল :

'সবাই যদিও পরাজয় মানে তবুও একথা জেনো।
তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পরোয়া করি না কোনো ॥
সকল অস্ত্র রয়েছে এখানে ভালা বল্লম তীর।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র থাকতে এ হাতে নত করব না শির ॥'

যখন বিজয়ের দিন এগিয়ে এল তখন এই হিমাসই ইকরিমা ও তার সাথিদের সাথে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। সে যখন দেখল যে মুশরিক পৌত্তলিকরা হজরত খালিদের বাহিনীর সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে তখন সেও পালিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তখন তার পত্নী তাকে ব্যঙ্গ করে বলল : 'কেমন বীরকেশরী ! কোথায় গেল তোমার প্রতিজ্ঞা ? গলা ছেড়ে যে বীরত্বগাথা গাইতে তা এখন কোথায় গেল ?' তখন সে লজ্জিত হয়ে কবিতার এই ছত্র কয়টি আবৃত্তি করল :

'সেই ভয়ানক দৃশ্য যদি দেখতে তুমি গো হায়।
কী হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে সেই সে খন্দমায়॥
যুদ্ধ হতে পালিয়ে গিয়েছে ইকরিমা-সফওয়ান।
মহান প্রতাপে যুদ্ধ করছে বিজয়ী মুসলমান॥
আমর তনয় সোহেল সেখানে হয়ে যে নিঃসহায়।
নীরবে দাঁড়িয়ে আপনার মনে করছিল হায় হায়॥
কিছুই করার ছিল না তার হয়ে সে ম্রিয়মাণ।
মুসলমানের অস্ত্র তাহাকে করছিল আহ্বান॥
তুফানের বেগে অস্ত্র তাদের চলছিল ঝনঝন।
করছিল তারা আমাদের 'পরে ভীষণ আক্রমণ॥
অস্ত্র আঘাতে পড়ছিল ঝরে বাহু ও মুণ্ডু কত।
জঞ্জাল যত সাফ হচ্ছিল তৃণ খণ্ডের মতো॥
যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু হাহাকার কত আর্তের ধ্বনি।
কত না ভয়াল আওয়াজ সেখানে আসলাম আমি শুনি॥
কতশত নর হাহাকার করে হিসাব নাইকো তার।
খোদার বাহিনী পরাজিত করে এমন সাধ্য কার ??'

মক্কা শান্ত হয়ে গেল। তাদের নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীরা মাথা ঝুঁকিয়ে দিল। তার অলি গলিতে আল্লাহর কলেমা বুলন্দ হয়ে উঠল এবং আল্লাহর রসুল কাবা গৃহ তওয়াফ করার জন্য অগ্রসর হলেন।

তিনি সমস্ত মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দিলেন এবং তাঁর ধনুক দিয়ে তাদের ওলট পালট করে দিলেন। সেসব প্রাণহীন মূর্তিরাজি মুখ থুবড়ে অসহায় হয়ে পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ আগেও এ সমস্ত মূর্তি প্রভুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল আর তারা এখন মাটি ও পাথরের ঢিবিতে পরিণত হলো। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের ভাঙছিলেন আর পবিত্র কুরআনের এই আয়াত আবৃত্তি করছিলেন :

'সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত। বাস্তবিকই মিথ্যা অপসৃত হওয়ার যোগ্য।'
—বুখারী, মুসলিম

তারপর তিনি মূল কাবাগৃহ খোলার আদেশ দিলেন। তার চারদিকে ছিল শুধু চিত্র আর চিত্র। যাতে হজরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল আলাইহিমুস সালামের দুই চিত্রও শোভা পাচ্ছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিক-পৌত্তলিকদের প্রতি রোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম ! এরা দু'জনে কখনোই তীরের মাধ্যমে শুভাশুভের সন্ধান করতেন না।[১] আর এভাবে তিনি সমস্ত চিত্রাবলি ধ্বংস করে দিলেন।[২] এভাবে যখন কাবাগৃহ অপবিত্র মূর্তিরাজির কবল থেকে চিরকালের জন্য পাক-পবিত্র হয়ে গেল তখন তিনি কুরাইশদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন, যারা পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাদের পরিণামের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারপর তিনি চৌকাঠের দুটি পট ধরলেন এবং বললেন :

'এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণ করেছেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন আর অন্য সমস্ত দলকে একাই পরাজিত করেছেন।'

তারপর বললেন :

'হে কুরাইশবৃন্দ ! তোমরা কি জানো, আজ আমি তোমাদের সাথে কী ব্যবহার করব ?'

তারা তৎক্ষণাৎ বলল :

'আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠতম ভাই, শ্রেষ্ঠতম সন্তান।'

তিনি বললেন :

'আমি তোমাদের সেই উত্তর দেব, যা ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের দিয়েছিলেন :

তোমাদের বিরুদ্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত।'[৩]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাগৃহে যখন মূর্তি ধ্বংস করছিলেন সে সময়ে ফুজালা বিন উমাইর তাঁকে হত্যা করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি তার উপর পড়তেই তিনি তৎক্ষণাৎ তার মনের ইচ্ছাকে বুঝে নিলেন কিন্তু যে বিজয় আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন এবং তিনি তার প্রতি এতটাই কৃতজ্ঞ ও উন্মুক্ত ছিলেন যে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না ; বরং ঐ ব্যক্তিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'মনে

---

১. বুখারী।
২. আহমদ।
৩. ইবনে ইসহাক।

মনে তুমি কী আকাঙ্ক্ষা পুষে রেখেছ ?' সে বলল : 'কিছু না, আমি আল্লাহকে স্মরণ করছিলাম।' একথা শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন এবং বললেন : 'আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।' তিনি তার সাথে অত্যন্ত দয়াশীল আচরণ করলেন এবং তার বুকের উপর নিজের হাত রাখলেন। সেই ব্যক্তি এই কথা বলতে বলতে চলে গেল যে, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই আমার বুকের উপর তাঁর হাত রাখলেন তখন আমার হৃদয় তাঁর প্রতি ভালোবাসায় এতটাই পূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর চেয়ে প্রিয় আমার আর কেউ ছিল না।' –ইবনে হিশাম

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হজরত ফুজালার এক রমণীর সাথে প্রেম ছিল। যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে তার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তখন সে তাকে বলল : 'এসো ফুজালা ! বসো আমরা একান্তে দুটি আবেগের কথা কই।' তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে চলে গেলেন :

'বলল সে মোরে এসো ফুজাইল আমরা দুজনে বসে।
প্রাণ-আবেগের কিছু কথা কই দুইজনে কেঁদে হেসে ॥
আমি বলিলাম, আমি বান্ধবী আজকের মতো যাই।
ইসলাম আর আল্লাহ হতে এই অনুমতি নাই ॥
তুমি দেখতে যদি গো মুহাম্মদের সেই বিদায়ের ক্ষণ।
তাহলে কিছুই লাগত না ভালো চাইত না কিছু মন ॥
প্রাণহীন যতো মূর্তিকে তিনি করিলেন চুরমার।
সেইখানে সব ভোঁতা হয়ে গেল দুই ধারী তরবার ॥
তুমি দেখতে যদি গো আল্লাহর দ্বীন কত না প্রকাশমান।
তার জন্য চিরনিবেদিত ধন্য মুসলমান ॥
শিরক আজিকে অসহায় বড় হারিয়েছে তার কায়া।
উপরে তার ছেয়ে গেছে আজ চির নিরাশার ছায়া ॥'

হজরত বিলাল কাবা গৃহের ছাদের উপর উঠে নামাজের জন্য আজান দিলেন। মক্কাবাসীরা এই নতুন আওয়াজ বড়ই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল, যেন তারা নিদ্রাবস্থায় রয়েছে। এ আওয়াজ অন্তরীক্ষে গুঞ্জরিত হয়ে শয়তানের অন্তরকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। এই আওয়াজ শোনার পর তাদের সামনে আর দুটি মাত্র পথ অবশিষ্ট ছিল– হয় পালিয়ে যাওয়া নতুবা ঈমান আনা।

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ধ্বনি অন্তরীক্ষে রাগ উৎপন্ন করছিল।

এ উদাত্ত কণ্ঠের আওয়াজ মানুষকে তার জীবনের প্রধান লক্ষ ও মৃত্যুর পরে প্রত্যাবর্তনের স্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, যা তাদের বনের পশুর সমান করে তুলেছিল। অসামাজিক ধ্যান-ধারণা তাদের কীভাবে না আচ্ছাদিত করে

রেখেছিল। অন্য একটি লোক নিরাশা ও হতাশার কারণ হয়ে তাদের ধ্বংস করে ফেলছিল তো অন্যদিকে তাদের আনন্দের আধিক্য তাদের বিপথগামী করছিল এবং মানবতা পথহারা হয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরছিল।

সত্যের আওয়াজ তাদের স্থূল পর্দার পিছন থেকে বেরিয়ে আসছিল, যাতে তাদের অন্তরে একথা চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা ও বন্ধন থেকে একটাই মাত্র অস্ত্র তাদের মুক্ত করতে পারে তা হলো এই তকবির অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা :

'আশহাদু আল্লা ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আল্লা ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্।'

-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।

-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।

সমস্ত অংশীদার অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। বহুকাল যাবৎ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে তাদের পক্ষ থেকে মঙ্গল ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা করে এসেছে, যারা নিজেদের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা-যোগ্যতা-সামর্থ্য কিছুই রাখত না এবং এতদিন তারা সেই সমস্ত কাল্পনিক অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস রেখে এসেছিল, যারা নিজেদের উপর থেকে একটি মাছি তাড়ানোর ক্ষমতাও রাখত না।

এই সমস্ত ভ্রান্তি ও অপকর্মের জন্য কিসের দৌড়ঝাঁপ ? যদি কোনো মুশরিক-পৌত্তলিক আল্লাহর গুণ ও বিশেষত্বের মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার করে নেয় অথবা অন্য উপাস্যদের প্রভু বলে ভেবে বসে থাকে তাহলে মুসলমানরা এক আল্লাহ ছাড়া যে আর কাউকে প্রভু বলে স্বীকার করবে না– এটাই তো ধ্রুব সত্য– এবং তারা তো তার মধ্যেই সর্বান্তকরণে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

বিশুদ্ধ একত্ববাদ সেই উদ্দেশ্যের শত্রু, যাকে মুশরিক-পৌত্তলিকরা অবলম্বন করেছে।

পরন্তু, আদর্শ কে ? এই পথের পথ প্রদর্শক কে হবেন ? অগ্রবর্তী দলের কাজ কে সামলাবেন ? মুআজ্জিন সাথে সাথে তাঁর উত্তর দিচ্ছেন :

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল।'

এই পবিত্র ব্যক্তির জীবনীতেই সেই ব্যক্তির জন্য পূর্ণ আদর্শ রয়েছে, যে অনুকূল জীবন কাটাতে চায়। মুহাম্মদ সেই মানুষ, যিনি তাঁর পাকিজা সুন্নত বা পবিত্র রীতিনীতির দ্বারা সেই লোকদের জন্য অনুপম জীবনাচার রেখে গিয়েছেন, যারা সত্যকে স্বীকার করে এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করে।

মুআজ্জিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানায় যে, তোমরা মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট হও এবং নিজের প্রকৃত প্রভুর প্রসন্নতার প্রতি ধাবিত হও এবং নিজের

স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করো। অনন্তর তিনি প্রথমে সেই লোকদের ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেন :

হাইয়া আলাস সালাহ

হাইয়া আলাস সালাহ

–এসো নামাজের প্রতি। –এসো নামাজের প্রতি।

হাহাকার ও কোলাহলদীর্ণ এ সংসারে এই নামাজই পূর্ণ চিন্তাভাবনার অবসর প্রদান করে। মানুষ যখনই সত্যপথ থেকে বিচলিত হয়ে যায় তখন ঐ মুহূর্তটিই তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে, যখনই কামনা তাকে উত্তেজিত করে তখনই তাকে অত্যন্ত বিনয়াবনতভাবে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করে দেয় এবং এই মুহূর্তটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আলোকপ্রাপ্তির এক উপযুক্ত ক্ষণ।

মানুষ অজ্ঞান, সে প্রতি মুহূর্তেই কোনো ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, যিনি তাকে সুপথ দেখাতে থাকেন, যাতে সে বিপথগামী না হয়, তাকে শক্তি প্রদান করে, যাতে সে শক্তিহীন ও অসহায় না হয়ে যায়। তারপর সবশেষে, মুআজ্জিন মানুষকে সমস্ত বিষয়ে অসফলতা ও নিরাশা থেকে বাঁচার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরিণামই হলো অসফলতা, অর্থহীন কর্মক্ষেত্রেই কেবল অসফলতার প্রশ্ন ওঠে। কেননা যে ব্যর্থ, তার উক্ত কার্যাবলি বা উদ্দেশ্যও ব্যর্থ। মুআজ্জিন এই ঘোষণাই করেন অর্থাৎ এ অসফলতা থেকে তাকে সচেতন করেন :

হাইয়া আলাল ফালাহ

হাইয়া আলাল ফালাহ

-এসো কল্যাণ ও সাফল্যের প্রতি।

-এসো কল্যাণ ও সাফল্যের প্রতি।

মানুষ যখন মহৎ উদ্দেশ্য ও সঠিক কাজের জন্য অগ্রসর হয় তখন সে সফল থাকে, তা সে কাজ বিশুদ্ধ ভৌতিক কাজই হোক না কেন। আল্লাহ কি তাঁর নবীকে এই শিক্ষা দেননি যে, নামাজ ও আত্মত্যাগের পরে জীবনের সমস্ত কাজই সে কেবল আল্লাহর জন্য করবে :

'বলে দাও : আমার নামাজ, আমার আত্মত্যাগ, আমার জীবন, আমার মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগৎ সংসারের প্রভু। তাঁর কোনো অংশী নেই। আমার উপর এই আদেশ হয়েছে, আর আমি সবার আগে আত্মসমর্পণকারী।'
– আল আনআম : ১৬৩

এ সেই সময়ে সম্ভব, যখন আল্লাহর অতিরিক্ত সমস্ত অভিপ্রেত উদ্দেশ্যহীন হয় আর সর্বদাই তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদকে অবলম্বন করার জন্যই মুআজ্জিন পুনঃ অভিপ্রেত ও নিশ্চিত কার্যপ্রণালির প্রতি আকৃষ্ট করতে গিয়ে বলেন :

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ।
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ । আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই ।

আজানের এ বাণী সংস্কার-বার্তার দ্যোতক । এই কারণে হাদিসে আছে যে, মুসলমান আজান শোনার পর এই দু'আ পাঠ করবে :

'হে নামাজের মহিমান্বিত প্রভু ! মুহাম্মদকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করো, যে অঙ্গীকার তুমি তাঁর সাথে করেছ, আর নিশ্চয়ই তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না ।' – বুখারী

মক্কা বিজয়ের দিন আমাদের সেই মহা পুরুষদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যাঁরা এ মহান বিজয় দেখতে পাননি । কাবার ছাদের উপর থেকে দেয়া হজরত বিলালের কণ্ঠের আজান তাঁরা শুনতে পাননি, মূর্তিদের ভূলুণ্ঠিত, ভূপাতিত ও বিধ্বংস হতে দেখেননি এর পূজারিদের অস্ত্র সমর্পণের দৃশ্য দেখতে এবং তাদের দলে দলে ইসলামে প্রবেশের দৃশ্য দেখতে পাননি । কুফর ও ইসলামের মধ্যে দীর্ঘ সংঘর্ষের কালে হয় তারা মৃত্যুমুখে পতিত হন নতুবা শহীদ হয়ে যান । পরন্তু আজ যে মহান বিজয় লাভ হলো এতে তাঁদেরও অংশ রয়েছে এবং আল্লাহর সমীপে তাঁরা পূর্ণ প্রতিফল লাভ করবেন– যিনি অন্যায় করেন না ।

সত্য এবং অসত্যের মধ্যেকার এই সংঘর্ষে প্রত্যেক সৈনিকের অন্তিম পরিণাম পর্যন্ত বেঁচে থাকার প্রয়োজনও নেই । প্রথম ধাপেই মৃত্যু হতে পারে অথবা অস্থায়ী পরাজয়কালে শহীদও হয়ে যেতে পারেন, যেমন হজরত হামজা ও তাঁর সাথিরা হয়েছিলেন ।

কুরআন সত্যের আহ্বায়কদের বলেন যে, দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে । সেখানে মুমিন ও কাফিরদের সম্পূর্ণরূপে প্রতিফল দেয়া হবে :

'অনন্তর (হে নবী) ! তুমি ধৈর্য সহকারে কাজ করো । নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য । তারপর যে দুষ্পরিণামের ধমকি আমি এদের দিচ্ছি তার মধ্য থেকে কিছু তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছি, অথবা (এর আগে) আমি তোমাকে উঠিয়ে নিই, এদের তো আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে ।' – আল মুমিন : ৭৭

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন এবং পুরো মাস সেখানে নামাজ কসর[১] পড়তে থাকেন এবং ১৫-এর বেশি রোজা কাজা করেন ।[২] (অর্থাৎ সে সময়ে সফর বা যাত্রার কারণে ত্যাগ

---

১. সংক্ষিপ্ত নামাজ, অর্থাৎ চার রাকাতের স্থলে দু'রাকাত নামাজ ।– অনুবাদক

২. মক্কায় নামাজ কসর করা প্রমাণিত । বুখারী শরিফে আছে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ১৯ দিন থাকেন এবং দু'রাকাত করে নামাজ পড়তে থাকেন । এরকমই রোজা না রাখাও প্রমাণিত । – অনুবাদক

করেন, পরে তা পুরো করে দেন)। তিনি রোজা অবস্থায় মদিনা থেকে প্রস্থান করেন কিন্তু তিনি ও তাঁর সাথিরা পথিমধ্যে রোজা শেষ করে দিয়েছিলেন।

পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে লোকেরা ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করতে লাগল। নারী-শিশু-বৃদ্ধ-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই এল এবং যথাসাধ্য আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশ পালনের বাইয়াত গ্রহণ করল। আল্লাহর রসুল মহিলাদের বাইয়াত হাতে হাত দিয়ে না করিয়ে মৌখিকভাবে করলেন। হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন : 'না ! আল্লাহর কসম ! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই কোনো মহিলার হাত স্পর্শ করে বাইয়াত নেননি।'

এভাবে মক্কায় ইসলাম প্রবেশ করল। যদিও তখনো কিছু লোক কুফরি ও অজ্ঞানতাকে আঁকড়ে রইল এবং মূর্তির সাথে তারা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি হলো না। এদের কালচক্রের হাতেই ছেড়ে দেয়া হলো যে, ধীরে ধীরে তাদের অজ্ঞতা বিদূরিত হয়ে যাবে এবং তাদের মহৎ হৃদয় ইসলামের অমৃত সুধা পান করে চিরঞ্জীবিতায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

যে হুকুমত কেবল পূর্তিপুজোর না হয়ে তার পৃষ্ঠপোষকও সমর্থকও ছিল ; বরং তার সমর্থনে যুদ্ধও করত, তা এখন শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তার অবশিষ্ট ছাই ভস্মগুলোকে স্বয়ং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

মক্কা বিজয় ছিল অকস্মাৎ আক্রমণের পরিণাম। মুসলমানরা তাঁদের যুদ্ধনীতি থেকে কুরাইশদের বে-খবর রাখার কাজে সফল হয়ে গেলেন, এমনকি, তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে অবদমিত করে রাখলেন এবং তাদের অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করলেন। তারা না তরবারির কারসাজি দেখতে পারল আর না বাইরের সাহায্য লাভ করতে পারল। যখন তাদের চোখ খুলে গেল তখন তারা তাদের সামনে সুসজ্জিত ইসলামী বাহিনীকে দেখল, এমনকি কিছু লোক ভাবতে লাগল যে, সাফল্য ইসলামী পতাকার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, তা থেকে তা আর পৃথক হতে পারবে না।

এ গ্রন্থের অনুবাদক মুহাম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস আজানের মর্মবাণী এভাবে কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন :

আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান
এক ও একক সত্য তিনি নাইকো কিছুই তাঁর সমান ॥
সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নাই।
তাঁর উপাসনা আমরা করি, মহান তিনি সর্বদাই ॥
সাক্ষ্য দিচ্ছি খোদার রসুল আমার রসুল মুহাম্মদ।
দুই জাহানের মহান নেতা বিশ্ব নিখিল প্রেমাস্পদ ॥
যে-ই যেথা আছ সকলেই এসো এই নামাজের পথে।
ইহ-পরকালে শান্তি পাইবে প্রেরণা পাইবে প্রাণ ॥

সাফল্য আর সত্যের পথে দলে দলে এসো সবে।
খোদার রহম পরম শান্তি গ্রহণ করো গো সবে ॥
নিদ্রা হতেও নামাজ শ্রেষ্ঠ শোনো হে মুমিনগণ।
পরম শান্তি গ্রহণ করবে এই করো সবে পণ ॥
আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ মহান জানিও সর্বদাই।
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই গো কোথাও নাই ॥

দশ
হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কার আশপাশের বড় গোত্রগুলো 'মক্কা বিজয়'-এর বিষয়ে বড় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল। তাদের মধ্যে 'বনু হাওয়াজিন' ছিল সবার আগে। এদের শহর ছিল তায়েফ, যাকে মক্কা ও মদিনার পরে সবচেয়ে বড় শহর বলে গণ্য করা হতো।

এই গোত্রগুলোর নেতারা হাওয়াজিন দলপতি মালিক বিন আউফের কাছে একত্রিত হলো এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, এই বিজয়ের পর সুব্যবস্থিত হওয়ার আগেই মুসলমানদের নির্মূল করে ফেলতে হবে এবং মূর্তিপুজোর যে চিহ্নগুলো আজও অবশিষ্ট আছে সেগুলোকে ধ্বংস করার আগেই মুসলমানদের উপর আকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে।

মালিক বিন আউফ বীর এবং সাহসী হওয়ার সাথে সাথে দুর্বল রায় ও ভুল পরামর্শদাতা ছিল। অনন্তর যুদ্ধে যাওয়ার আগে সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের আদেশ দিল যে, নিজেদের পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ সাথে নিয়ে চলো, যাতে তোমরা এদের সুরক্ষার কারণে পালাতে না পারো এবং প্রাণপণ যুদ্ধ করতে পারো।

দুরাইদ বিন সাম্মা নামক এক ব্যক্তি– যে বড়ই সাহসী ও অভিজ্ঞ ছিল, সে আপত্তি উত্থাপন করল এবং বলল, যদি পায়ের তলার মাটি সরে যায় তাহলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। রণক্ষেত্রে কেবল বর্শা ও তরবারিই কাজ দেয়। যদি পরাজয় হয় তাহলে পরিবার পরিজন ও সহায় সম্পদের কারণে আরো বেশি অপমান সইতে হবে।

মালিক এই আপত্তিকে কোনো গুরুত্বই দিল না, সে তার আগের সিদ্ধান্তেই অটল রইল।

মুসলমানরা যখন তাঁদের শত্রুদের সমরায়োজনের কথা জানতে পারলেন তখন তাঁরা গুপ্তচর পাঠালেন। আবু দাউদ হতে উদ্ধৃত হয়েছে, এক ব্যক্তি

রসুলুল্লাহর সেবায় উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল : 'আমি আপনার কাছ থেকে প্রস্থান করে অমুক পাহাড়ে গিয়ে দেখলাম বনু হাওয়াজিন তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও সহায় সম্পদ নিয়ে সসৈন্যে হুনাইনে অবস্থান করছে। এ কথা শুনে রসুলুল্লাহ মুচকি হাসলেন এবং বললেন :

'আল্লাহ চাহে তো এ সমস্ত বস্তু মুসলমানদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদে পরিণত হবে।' – আবু দাউদ

খুব সহজে মক্কা বিজয় হয়। মুসলমানদের ধারণা ছিল যে কুফর এখন শেষ বিদায়ের যাত্রী। অতএব, উল্লেখযোগ্য কোনো বাধা আসবে না। এদিকে ইসলামে সদ্য প্রবেশকারী নবীন মুসলমানরা ভাবছিলেন, কোনো বাধাই ইসলামের পথে বাধা হতে পারবে না। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সহকারে মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করলেন কিন্তু তারা নিয়মমাফিক প্রস্তুতি নিতে পারেননি। মুসলমানরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। পরন্তু, আজকের সংখ্যা এত বেশি ছিল, যা আগে আর কখনো দেখা যায়নি। সুতরাং তারা কীভাবে পরাজিত হতে পারতেন ? উল্লেখ্য যে, আবু বকর মুসলিম বাহিনীর দিকে যখন তাকালেন তখন বললেন : আজ আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠের কারণে পরাজিত হতে পারি না।

সে সময়ে মক্কাসহ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার।

এগারো
পরাজয়

আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের বলে মুসলমান সৈন্যরা হুনাইন উপত্যকায় পৌঁছালেন। মালিক বিন আউফ ও তার সাথিরা আগেই উপত্যকা অধিকার করে অবস্থান করছিল এবং সেখানকার সুরক্ষিত স্থানগুলোতে মুসলমানদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিল।

অগ্রবর্তী বাহিনী উপত্যকা অভিমুখে এগিয়ে চলেছিল। উপত্যকার গুপ্ত শত্রুদের বিষয়ে তারা কিছুই জানত না। উপত্যকার নিম্নবর্তী এলাকাগুলো ঢালু ছিল। অতএব, লোকেরা সে পথ অতিক্রম করলেই আক্রমণ হওয়ামাত্রই তাদের পদস্খলন ঘটবে।

মুসলমান সেনারা উপত্যকায় একত্রিত হওয়ামাত্রই শত্রুরা সুরক্ষিত স্থানগুলো থেকে তাদের প্রতি সহসা তীরবর্ষণ শুরু করল। যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তখন সকাল বিলম্বিত হয়, এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে অগ্রবর্তী দল বড়ই

বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, অর্থাৎ অন্ধকার ও বাস্তব পরিস্থিতি অবগত না হওয়ার কারণে তাদের পিছু হটে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

ভয়ের এই লহর অতি দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ল এবং সুরক্ষিত পঙ্‌ক্তিগুলোকেও ছিন্নভিন্ন করে দিল।

মালিক বিন আউফের সেনানীরা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রবল বেগে আক্রমণ চালিয়ে দিল এবং তাদের অশ্বারোহী বাহিনী মুসলমানদের অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে খেদিয়ে দিল। পরিণামস্বরূপ মুসলমানরা পরাজিত হয়ে এভাবে পালিয়ে গেল যে তারা একে অন্যকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার সময়ও পেল না।

মক্কার নেতৃবৃন্দ এই পরাজয় দেখে বড়ই খুশি হলো। কিছু লোক পুনরায় কুফরিতে ফিরে গেল। আবু সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ বলে উঠল : 'এদের পরাজয় সমুদ্রের আগে ফিরবে না।' তার এ ধরনের কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা কুফরি যুগের সেই তীর, যা থেকে সে শুভাশুভের সিদ্ধান্ত নিত সেই তীর তার তূণীরেই রয়ে গিয়েছিল।

জলদ বিন জুনাইদ বলল : 'ঠিক আছ, সমস্ত নেশা আজ ছুটে গেছে।' সফওয়ান বিন উমাইয়া একথা শুনেই, যদিও সে মুসলমান ছিল না– বলল : 'চুপ করো ! আল্লাহ তোমাদের কণ্ঠ রোধ করে দিন। হাওয়াজিন গোত্রের কোনো ব্যক্তির চেয়ে কুরাইশ গোত্রের কোনো ব্যক্তিকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করাটা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান দিকে তাকালেন এবং পলায়নপরদের দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করলেন :

'লোকসকল ! তোমরা কোথায় যাও ? আমার কাছে এসো আমি আল্লাহর রসুল, আমি আব্দুল্লাহর পুত্র।'

কোনো দিক থেকে উত্তর এল না। অবস্থা এমন ছিল যে পলায়নপর উটেরা তাদের আরোহীদের নিয়ে একে অন্যের ঘাড়ের ওপরে উঠে পড়ছিল। – ইবনে হিশাম

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন যে, হাওয়াজিন গোত্রের এক ব্যক্তি একটি লাল রঙের উটের পিঠে চড়ে লম্বা একটি বল্লম ও কালো একটি পতাকা হাতে নিয়ে এই পলায়নপরদের পিছু ধাওয়া করছে আর হাওয়াজিনরা তাকে সহযোগিতা করছে। সে কোনো পলায়নপরকে দেখামাত্রই বল্লমের আঘাতে হত্যা করছিল। কোনো ব্যক্তি বেঁচে গেলে পিছনের লোকেরা তাকে মেরে ফেলছিল। এই দুঃখজনক পরাজয়ে যাদের হাত ছিল তাদের অন্যতম ছিল মক্কার পশুপালক বেদুইনরা।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আপন স্থানে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুহাজির ও তাঁর পরিবার-পরিজন তাঁকে ঘিরে ছিলেন। তিনি ইসলামের আলোয় এই কলঙ্ক মোচনের উপায় খুঁজতে শুরু করলেন এবং আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে মুহাজির ও আনসারীদের ডেকে পাঠানোর আদেশ দিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন :

'হে আনসারবৃন্দ !'

হে হুদাইবিয়ার প্রতিজ্ঞাকারীরা !!'

আল্লাহ তাঁর মনে এই প্রেরণা জাগিয়ে দিলেন যে, সেই আকিদার অনুসারীদের আহ্বান করো। কেননা, এরাই যুদ্ধ করতে পারতেন এবং এদের দ্বারাই চিন্তাধারা সফল হতে পারত এবং সংকট মোচন হতে পারত।

কিন্তু আপামর জনসাধারণ যারা দুনিয়ালোভী, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রত্যাশী এবং তাৎক্ষণিক লাভের অভিলাষী হয়, তাদের দ্বারা না কোনো কাজ হয় আর না তাদের দ্বারা স্থিরতা ও দৃঢ়তা পুনঃ স্থাপিত হতে পারে।

বারো
পুনর্গঠন ও বিজয়

রণক্ষেত্রে হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছিল। ওদিকে হজরত আব্বাসের কণ্ঠস্বর যখন উদ্বিগ্ন ও বিস্মিত ব্যক্তিদের কান পর্যন্ত পৌছাল তখন সমস্ত লোক কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল।

যাঁদের ঘোড়া প্রবল যুদ্ধের কারণে ঘুরে দাঁড়াতে পারল না তাঁরা ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে সেই আওয়াজের প্রতি ছুটে চললেন।

এভাবে আল্লাহর রসুলের চারপাশে পর্যাপ্তসংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে গেল। 'আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত' বলতে বলতে লোকেরা এসে জমা হয়ে যাচ্ছিল, এমনকি দেখতে দেখতে প্রায় ২০০ লোক জমা হয়ে গেল। তিনি তাদের নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং পৌত্তলিকদের উপর পুনরায় আক্রমণ চালিয়ে দিলেন এবং দু'পক্ষই পরাজয়ের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল।

হজরত আলী ও এক আনসারী মিলে হাওয়াজিন গোত্রের পতাকা বাহকের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিলেন এবং হজরত আলী তার উটের কুঁজ কেটে দিলেন, সে ভূপাতিত হলো এবং আনসারী অগ্রসর হয়ে তার কাম তামাম করে দিলেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খচ্চরের পিঠে চড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন :

'আমি নবী, আমি মিথ্যুক নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র।'

আর দু'আ করছিলেন 'হে আল্লাহ, তোমার সাহায্য অবতারণ করো।' –মুসলিম

আনসার ও মুহাজিররা, হাওয়াজিন ও সকিফদের সাথে হাতাহাতি করছিলেন। হজরত আব্বাস বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খচ্চরের পিঠে বসে রণক্ষেত্রের এই দৃশ্য দেখলেন এবং বললেন :

'এবার যুদ্ধে তীব্রতা এসেছে।' তারপর কিছু কাঁকর তুলে কাফিরদের চেহারার দিকে নিক্ষেপ করে বললেন : 'মুহাম্মদের প্রভুর কসম ! এরা পরাজিত হয়ে গেছে।'

হজরত আব্বাস বলেন, যখন আমি রণক্ষেত্রের দিকে তাকাই তখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাদের তীব্রতায় ভাটা পড়ে গেল এবং পরাজয়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। –মুসলিম

কিছু সময় অতিবাহিত হতে না হতেই বনু সকিফ ও তাদের সাথিরা পালাতে লাগল এবং তাদের লোকদের বন্দি করা হতে লাগল। এ যুদ্ধের বিষয়ে এই আয়াতরাশি অবতীর্ণ হলো :

'আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনেও যখন তোমরা নিজেদের আধিক্য দেখে ফুলে গিয়েছিলে, তখন তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি, আর ধরিত্রী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর আতঙ্ক ছেয়ে গেল এবং তোমরা পিছন ফিরে পলায়নপর হলে।

তারপর আল্লাহ তাঁর রসুল ও ঈমানদারদের উপর শান্তি অবতারণ করলেন এবং সৈন্য নামিয়ে দিলেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং সেই লোকদের যাতনা দিলেন, যারা কুফরি করেছিল আর এটাই হলো কাফিরদের প্রতিদান।' – আত তাওবা : ২৫-২৬

পরাজিত হয়ে কিছু লোক আউতাস উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য আবু আমির আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন এবং তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর ভাইপো আবু মূসা আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ পতাকা তুলে নিলেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করে দিলেন এবং তাদের দুঃখজনকভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করলেন।

মালিক বিন আউফ ও তার সাথিরা পালিয়ে তায়েফে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ রেখে গেল। কেননা, মালিক স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও ধনসম্পদ নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল।

অনন্তর এ যুদ্ধে ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার ছাগল ও ৪ হাজার উকিয়া রুপো যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পাওয়া গেল এবং ৬ হাজার শত্রুকে বন্দি করা হলো।

তেরো
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধলব্ধ এ সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে বণ্টন করে দেয়াটা উচিতসঙ্গত বলে মনে করলেন না, বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনরা না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষায় রইলেন, যাতে তাদের ফেরত দেয়া যায় আর যা কিছু তারা হারিয়েছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

তিনি কয়েকদিন যাবৎ অপেক্ষায় রইলেন কিন্তু কেউ এল না। – বুখারী

মক্কার বড় বড় নেতা ও দলপতি যারা তখনো শঙ্কিত ছিলেন, তাঁদের মন রক্ষার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে সবার আগে এবং অধিক পরিমাণে দিয়ে দিলেন।

আবু সুফিয়ানকে ১০০ উট ও ৪০ উকিয়া রুপো দেয়া হলো, তবুও সে বলল : 'আমার ছেলে মাবিয়া কোথায় যাবে ?' অতএব, এতটা পরিমাণ সম্পদ মাবিয়াকেও দেয়া হলো। তারপর বলল, আর এজিদের অংশ ? অতএব তাকেও এত পরিমাণ দেয়া হলো।[১]

গোত্রপতি ও দুর্বল ঈমানীরা যতটা সম্ভব বেশি বেশি নেয়ার চেষ্টা করল। এমনকি, এ গুজবও ছড়িয়ে পড়ল যে, মুহাম্মদ এত পরিমাণে দিচ্ছেন যে, আর কেউ গরিব বা ধনহীন থাকবে না। অনন্তর এরা মালের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বেদুইনরা বলতে লাগল :

'হে আল্লাহর রসুল ! যুদ্ধলব্ধ এ সম্পদ আমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিন।'

এমনকি এরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করতে লাগল এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদরটিও নিতে চাইল, তখন তিনি বললেন :

'লোকসকল ! আমার চাদর আমাকে ফিরিয়ে দাও, সেই সত্তার কসম, যার অধিকারে আমার জীবন, আমার কাছে যদি তিহামার বৃক্ষগুলোর সমপরিমাণ মালও থাকত তাহলে আমি তার সবটাই তোমাদের বণ্টন করে দিতাম। আর আমাকে তোমরা কৃপণ বলে আর ভাবতে পারতে না।'

তারপর তিনি একটি উটের কাছে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের কাছ থেকে একটি চুল ছিঁড়ে নিয়ে তাকে তাঁর দুটি আঙুল দিয়ে চেপে ধরে বললেন : 'লোকসকল ! আল্লাহর কসম ! তোমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আর এই উটের চুলের মধ্যে আমার

---

১. ইবনে হিশাম।

জন্য রয়েছে পাঁচ অংশ। আর এই পাঁচ অংশও তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হচ্ছে।'[১]

ধন ও সম্পদের মোহে তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই সমস্ত বেদুইন, ভবঘুরে ও মক্কার এসব দলপতি ইসলামের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ও মুসিবতের সময়ে কোনো কাজেই আসেনি ; বরং তাদের পথে তারা পাথরের মতো প্রতিবন্ধক হয়ে অবস্থান করেছিল। আর ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ মহাত্মারা জীবনপণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আজ ইসলাম গ্রহণ করার পর তারাই চাচ্ছিল রসুলুল্লাহ দুনিয়ায় সমস্ত ধন সম্পদ তাদের ঢেলে দিন। তিনি শপথ করে বললেন যে, আমি নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখছি না। যদি এ উপত্যকা ধন সম্পদে পূর্ণ হয়ে থাকত তাহলে তার সবটাই তোমাদের বন্টন করে দিতাম।

প্রকৃত সত্য তো এটাই যে, তিনি লোকদের মন পরীক্ষা করার জন্য এবং ইসলামের প্রতি মোহিত করে তোলার জন্য রোষ এবং ক্রোধের পরিবর্তে ক্ষমা, দান এবং সহনশীলতার পথ অবলম্বন করলেন।

হুনাইনের যুদ্ধের পরপরই এদের কর্মকাণ্ড নিয়ে চর্চা করলে তারা বড়ই ক্ষতি করতে পারত।

ইমাম আহমদের বিবরণমতে, মুসলিম অশ্বারোহী আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু উম্মে সুলাইমের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, সে সময় তাঁর হাতে একটি খঞ্জর ছিল। জিজ্ঞাসা করলেন : 'এ কী জন্য ?' বললেন : 'কোনো মুশরিক-পৌত্তলিক আমার কাছে এলে আমি তার পেট চিরে দেব।'

এ হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনা– আবু তালহা রসুলুল্লাহর সমীপে নিবেদন করলেন, আপনি কি শোনেননি যে, ইবনে সুলাইম কী বলছিলেন ? এ কথা শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন। উম্মে সুলাইম নিবেদন করলেন :

'হে আল্লাহর রসুল। এই বর্বর বেদুইনদের হত্যা করুন, যারা আপনাকে পরাজিত করিয়েছে।'

তিনি বললেন :

'হে উম্মে সুলাইম ! আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি যা কিছু করেছেন ঠিক করেছেন।'

অদ্ভুত ব্যাপার হলো যে, যুদ্ধে যারা সবার পিছনে ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের জন্য তারা সবার আগে আগে ছিল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করলেন, এদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা যাক এবং অতীতকে ভুলিয়ে

---

১. আহমদ, বাইহাকী, বুখারী ও হাকিম।

দেয়া যাক। এ ছাড়া এ ব্যাধি নিরাময় কীভাবে হতে পারত ? বিশ্বে এমন অনেক জাতি আছে, যারা বিবেকবুদ্ধি এবং চিন্তাধারণা অনুসারে নয় ; বরং তারা পেটের জন্য সত্যের দিকে ধাবিত হয়, যেমন পশু খাদ্য দেখে তার দিকে ধাবিত হয়। ঠিক এই দশা মানুষেরও। তারা লোভ ও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষী হয়, যাতে ঈমানের সাথে পরিচিত হতে পারে।

আনাস বিন মালিক হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম, তিনি একটি নজরানী চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন যার পাড় ছিল খুব খসখসে। পথিমধ্যে এক বেদুইন চাদরটি ধরে এত জোরে টান মারল যে আমি দেখলাম তার কাঁধে দাগ পড়ে গেছে এবং সে বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ ! এই মাল থেকে আমাকেও এরকম একটি চাদর দিন।' তিনি তার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন এবং সেটি তাকে দিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন।[১]

এই সুমিষ্ট বাক্য, আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ ও পর্যাপ্ত দানও ঐ বেদুইনকে খুশি ও প্রভাবিত করতে পারত না, যতটা পারত পর্যাপ্ত দান ও সহায় সম্পদ।

কারণ এটাই, যেমনটি সফওয়ান বিন উমাইয়া বলত যে, রসুলুল্লাহ হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে আমাকে দিতে থাকলেন, যদিও তিনি আমার কাছে সবচেয়ে অধিক অপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, তারপর আমার দৃষ্টিতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে গেলেন।

চৌদ্দ
বিতরণের তত্ত্বদর্শিতা

এই দূরদর্শী নীতি প্রারম্ভে অনুধাবন করতে না পারার জন্য লোকেরা আপত্তি তুলতে লাগল। কিছু মুসলমান এ ব্যবহার পছন্দ করতে পারল না। তারা ভাবতে লাগল তাদের উপেক্ষা করা হয়েছে।

বুখারী আমর বিন গলব রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু লোককে অংশ দিলেন আর কিছু লোককে বঞ্চিত রাখলেন। অতএব, লোকেরা অপ্রসন্ন হয়ে গেল। তিনি বললেন : 'আমি কিছু লোককে তাদের সংকোচ ও ভয়ের কারণে দিয়েছি আর কিছু লোককে তাদের নিস্পৃহতা, আত্মশুদ্ধি ও পুণ্য স্বভাবের উপর ছেড়ে দিয়েছি, যা আল্লাহ তাদের প্রদান করেছেন।' এদের মধ্যে আমর বিন গলবও ছিলেন।

---

১. মুসলিম, বুখারী।

হজরত আমর বলেন : 'এ কথা আমি স্বীকার করি না যে, রসুলুল্লাহর কথার বদলে আমি লাল উট নেব। মানুষের আত্মশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির বিচারে এ বস্তু মূল্যবান সম্পত্তির চেয়েও মূল্যবান।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নীতির প্রভাব আনসারদের উপর সবচেয়ে বেশি পড়ে। তারা সমস্ত রকমের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলেন যদিও দুঃখ-কষ্টে তাঁরা সর্বাধিক দৃঢ়পদ ছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং পরাজয়কে বিজয়ে পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ এরাই দেখছিলেন, পলায়িতদের হাত সম্পদে ভরে উঠছে অথচ তাদের কিছুই দেয়া হচ্ছে না।

হজরত আবু সায়িদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে উল্লেখ হয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুনাইনের যুদ্ধে গনিমতের মাল লাভ করেন তখন কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের মনোভাব পরখ করার জন্য তাদের মধ্যে তা বিতরণ করে দিলেন কিন্তু আনসারদের কমবেশি কিছুই দিলেন না। ফলে আনসারদের মনে অসন্তোষ জেগে উঠল। কেউ বলল : আল্লাহর কসম ! সে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে উপস্থিত হলো এবং নিবেদন করল :

সাইদ : 'আল্লাহর রসুল ! এই আনসারীরা আপনার প্রতি কিছুটা অপ্রসন্ন।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'কেন ?'

সাদ : 'আপনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিজের কওম ও অন্য আরব গোত্রগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন এবং তা থেকে তারা কিছুই পায়নি।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'তোমার কী মনে হয় সাদ ?'

সাদ : 'আমিও আমার কওমের একজন ব্যক্তি।' রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত আনসারকে একত্রিত করার আদেশ দিলেন এবং বলে দিলেন, সবাই এসে গেলে আমাকে জানিয়ে দেবে।'

হজরত সাদ বেরিয়ে সবাইকে ডেকে এনে এক জায়গায় সমবেত করলেন। সবাই আসার পর রসুলুল্লাহকে গিয়ে বললেন : 'আল্লাহর রসুল ! যাদের আপনি একত্রিত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন তারা সবাই সমবেত হয়েছে।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এলেন এবং সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে তিনি বললেন :

'হে আনসারবৃন্দ ! এ কথা কি সত্য নয় যে, আগে তোমরা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী ছিলে ? আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের সুপথগামী করেছেন। তোমরা না দরিদ্র ছিলে আর আমার দ্বারা আল্লাহ সমৃদ্ধশালী করেছেন ? তোমরা না একে অন্যের শত্রু ছিলে, আর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের অন্তরকে জুড়ে দিয়েছেন ?'

আনসার : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমরা কী উত্তর দেব, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ইহসান সবচেয়ে বেশি।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'না ! তোমরা এই উত্তর দাও যে, হে মুহাম্মদ ! লোকে যখন আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন আমরা আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। লোকেরা আপনাকে বহিষ্কার করেছিল, আর আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি, আপনি দরিদ্র ছিলেন আর আমরা আপনাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছি, আপনি ভয়ে ভীত ছিলেন আমরা আপনাকে অভয় দিয়েছি, আপনি নিঃসহায় ছিলেন আমরা আপনাকে সহায়তা করেছি।

আনসার : 'আল্লাহ ও রসুলের ইহসান সবচেয়ে বড়।'

রসুলুল্লাহ : 'হে আনসারবৃন্দ ! এ বিষয়ে কী তোমাদের কোনো সন্দেহ আছে যে, আমি দুনিয়ালোভী কিছু মানুষের মন পরীক্ষার জন্য সম্পদ দিয়েছি আর তোমাদের ইসলাম এবং ঈমানের উপর ভরসা করে ছেড়ে দিয়েছি ? কিন্তু হে আনসারবৃন্দ ! তোমরা কি এতে খুশি নও যে, লোকেরা উট ও ভেড়া ছাগল নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে এবং তোমরা আল্লাহর রসুলকে সাথে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে ?

সেই সত্তার কসম, যাঁর অধীনে আমার জীবন ! লোকে যদি এক উপত্যকায় যায় আর আনসাররা যদি অন্য উপত্যকায় যায় তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকায় চলে যেতে পছন্দ করব আর যদি হিজরত নাও হতো তাহলে আমিও আনসারদের একজন হতাম।

হে আল্লাহ ! তুমি আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ করো, তাদের সন্তান ও তাদের উত্তরাধিকারদের প্রতি অনুগ্রহ করো।'

এ কথা শুনে আনসাররা কেঁদে ফেললেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের দাড়ি ভিজে গেল এবং সকলেই একসাথে চিৎকার করে বলে উঠলেন : 'আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে মানতে এবং রসুলকে আমাদের অংশে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট।'

তারপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং লোকেরা ছড়িয়ে পড়ল।[১]

'দাওয়াত' এবং আন্দোলনের ইতিহাসে আনসাররা সেই ব্যক্তিদের অনুপম আদর্শ, যাঁদের শক্তিতে বড় বড় দাওয়াত স্থাপিত হলো। তারপর যখন এ আন্দোলন তাঁর আপন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলো এবং পরিশ্রম ও পরীক্ষার কাল অতিক্রম করল এবং বাঞ্ছিত বা সুমিষ্ট ফল দিতে শুরু করল তখন অন্য হাতও অগ্রসর হয়ে প্রাণভরে সে ফল ভোগ করল এবং এমনকি এতেও সন্তুষ্ট হলো না ; বরং বৃক্ষ রোপণকারীদের চাবুকও লাগাল, যেন পড়ে থাকা ফলগুলো তাঁরা তুলেও না নিতে পারেন।

---

১. আহমদ, ইবনে হিশাম, ইবনে জরীর, আল-বিদায়া ইত্যাদি।

আমরা এখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের উপর কোনো সমীক্ষা করছি না। এই সংরক্ষিত বিতরণে বুদ্ধি এবং বিবেক স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরন্তু আমরা আনসারদের যশোগানের, ধর্মের পথে সম্পদের মোহ থেকে দূরে থাকার এবং লোকদের অন্তরের সাথে জুড়ে থাকার বিশেষত্ব ও গুণাবলির কথা উল্লেখ করেছি। শাসন সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁরা দূরেই অবস্থান করলেন। তারা অন্যের যোগ্যতার অধীনে রয়ে গেলেন, যদিও সে যোগ্যতা তাঁরা রাখতেন এবং ৩০ বছর কাল অতিবাহিত হতে না হতেই শাসন 'দণ্ড' ইসলামে সবেমাত্র প্রবেশকারী বেদুইন ও ভাগ্যন্বেষীদের হাতে পৌঁছে গেল।

নিঃসন্দেহে পুণ্যাত্মারা তাঁদের পূর্ণ প্রতিফল পাবেন। জাগতিক বিষয়ের স্থান এর চেয়ে এতটা নিচে যে আকিদা ও ঈমানের দৃষ্টিতে তার কোনো গুরুত্ব নেই। পরন্তু, যুক্তিসঙ্গত কারণেই এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, এতে কি খোদ 'তাহরিক'-এর কোনো হিত বা কল্যাণ নিহিত ছিল যে, তারাই গুরুত্ব লাভ করল অথবা এ কি ইসলামের দুর্ভাগ্য ছিল যে, এমন কর্মকর্তা ও অধিকারীরা এসে গেলেন যে, ধর্মের পথে অগ্রগামী ও বিজেতারা পিছু রয়ে গেলেন আর শাসনদণ্ড তাঁদের অধিকারে চলে গেল, যাঁরা সবার শেষে ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন এবং সে বিষয়ে জ্ঞানগম্যি যাঁরা সবচেয়ে কম রাখতেন।

পনেরো
হাওয়াজিন প্রতিনিধিদের প্রত্যাবর্তন

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টিত হয়ে যাওয়ার পর হাওয়াজিন গোত্রের প্রতিনিধি দল আগমন করল এবং তারা মুসলমান হয়ে গেল এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রার্থনা করল যে, তাদের বন্দি এবং সহায় সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হোক। তিনি বললেন, আমার কাছে যারা রয়েছে তাদের তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমি তাদের সবচেয়ে ভালো বলে মনে করি, যারা সত্যবাদী। তোমাদের কাছে ধন সম্পদ বেশি প্রিয় না স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ? তারা বলল, আমরা বংশ কৌলিন্যের মোকাবিলায় অন্য কিছু বুঝি না।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর এতটাই প্রশংসা করলেন, যতটা প্রশংসার তিনি অধিকারী এবং বললেন :

'তোমাদের ভাইয়েরা শিরক থেকে তওবা অনুশোচনা করে ফিরে এসেছেন। আমি আমার নিজের এবং নিজের আত্মীয়-বন্দিদের তাঁদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার বিচারে অন্য মুসলমানরাও বন্দিদের ফিরিয়ে দিক। যে ব্যক্তি

স্বেচ্ছায় এমনটি করতে চায় সে করুক কিন্তু ক্ষতিপূরণ বাবদ যারা ধন চায় আমি তার জন্যও প্রস্তুত।'

লোকেরা বলল :

' হে আল্লাহর রসুল ! আমরা স্বেচ্ছায় প্রস্তুত।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'আমি জানি না যে, কে প্রস্তুত আর কে অপ্রস্তুত। অতএব, তোমরা গিয়ে নিজেদের অভিভাবকদের দ্বারা আমার কাছে উত্তর পাঠাও।'

লোকেরা উঠে গিয়ে আপনাপন জিম্মাদারদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং সবশেষে রসুলুল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়ে জানালেন যে, তাঁরা সকলেই স্বেচ্ছায় রাজি আছে।

ষোলো
তায়েফ অবরোধ

বনু সকিফের লোকেরা হুনাইন ও আউতাস থেকে পরাজিত হয়ে তায়েফের দুর্গগুলোতে আশ্রয় নিয়ে দীর্ঘ অবরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। মুসলমানরা দেখলেন যে, এরা কুফরিতে অনড় রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও তারা ভেঙে পড়েনি। তখন তারা সেখানে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মুসলমানরা এই ধরনের যুদ্ধে প্রস্তুতির সাথে ভালোমতই পরিচিত ছিলেন, তারা বহুবার অবরোধ করেছিলেন এবং আক্রমণ ও নিরাপত্তার সমস্ত সার্থক উপায়ের সাথে সুপরিচিত ছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সসৈন্যে প্রস্থান করে তায়েফের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। বনু সকিফেরা তাদের দুর্গগুলো থেকে তীরবর্ষণ করতে লাগল, ফলে মুসলমানরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং তাদের অনেক সৈন্য মারা পড়ল। অনন্তর তিনি তার বাহিনী নিয়ে পিছু হটলেন, যাতে তাদের তীরবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

অনুমিত হয় যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোরপূর্বক দুর্গে প্রবেশ করার এবং সেখানকার অধিবাসীদের সন্ধিতে বাধ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন না, যেমনটি বনি ইসরাইলিদের সাথে করেছিলেন। তিনি এর মধ্যে কল্যাণের আলো দেখলেন। কিছুদিন মোকাবিলা চলল এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে লাগল। ১৫ দিন যাবৎ অবরোধ জারি রাখলেন এবং চিন্তা করলেন এদের এই অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হোক। অনন্তর তিনি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করলেন। প্রথমে

সকলেই তো বিজয় না হওয়া পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ রাখার পক্ষে মত দিলেন কিন্তু অবশেষে রসুলুল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নওফল বিন মারিয়ার কাছ থেকে পরামর্শ নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন :

'হে নওফল ! এ বিষয়ে তোমার মত কী ?'

নওফল : 'হে আল্লাহর রসুল ! শিয়াল তো চালার মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে, যদি আপনি অপেক্ষা করেন তাহলে তো ধরে ফেলবেন কিন্তু ছেড়ে দিলেও তো কোনো ক্ষতি নেই।'

এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত উমর বিন খাত্তাবকে আদেশ দিলেন, প্রস্থান করার ঘোষণা দিয়ে দাও।

সাওয়ারীরা চলতে শুরু করলে লোকেরা বলল : 'হে আল্লাহর রসুল ! সকিফরা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। অতএব, আপনি তাদের অভিশাপ দিন।' তিনি বললেন : 'হে আল্লাহ ! তুমি সকিফদের সুমতি দান করো।' – তিরমিজি

সকিফরা অধিককাল যাবৎ শিরকগ্রস্ত রইল না। কয়েক মাসের মধ্যেই তারা মদিনায় তাঁদের প্রতিনিধি দলকে আল্লাহর রসুলের কাছে এই সংবাদ দিয়ে পাঠালেন যে, তাঁদের অন্তর ইসলামের জন্য বিকশিত হয়ে উঠেছে, এখন তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতে চান।

সতেরো
মদিনায় প্রত্যাবর্তন

মুসলমানরা তায়েফ হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এ প্রত্যাবর্তন এ জন্যই ছিল না যে, বিজয়ের পরে এখন এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন ; বরং তা এজন্যই ছিল যে, সেখানে আইন-শৃঙ্খলা সুব্যবস্থিত করে মদিনার দিকে প্রস্থান করবেন। মদিনার সাথে তাদের এমন গভীর ও অটুট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, তার উপর না প্রাচীন ও পিতৃভূমির প্রাধান্য দেয়া যেতে পারত আর না অতীতের মধুর ও মূল্যবান স্মৃতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যেতে পারত।

যখন মক্কা বিজয় হলো এবং তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন তখন সাফা পাহাড়ের উপর দুআ করার জন্য দণ্ডায়মান হলেন, সে সময়ে আনসারীরা তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাকে ঘিরে অবস্থান করতে লাগলেন এবং পরস্পরে কানাঘুষা করতে লাগলেন যে, আল্লাহ তো মক্কা বিজয় করিয়ে দিলেন, এবার কি রসুলুল্লাহ এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন ? তিনি যখন দুআ শেষ করলেন তখন তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : 'তোমরা কী বলাবলি করছিলে ?' লোকেরা বলল :

'কিছু নয়, হে আল্লাহর রসুল !' তিনি বরাবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এমনকি, লোকেরা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তিনি বললেন :

'আল্লাহ রক্ষা করুন, আমার জীবন-মৃত্যু তোমাদের সাথে।'[১]

মক্কাবাসীরা ইসলামে সবেমাত্র প্রবেশ করেছিলেন যারা ইসলামের আদেশের বিষয়ে অল্পস্বল্প খবর রাখতেন। অতএব, তিনি মুআজ বিন জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে মক্কা ত্যাগ করলেন, যাতে তিনি তাদের কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা দিতে পারেন।[২]

উতাব বিন উসাইদকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন[৩] যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর।

উতাব রাজিয়াল্লাহু আনহু সচেতন, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং অল্পে তুষ্ট যুবক ছিলেন। তিনি বাইতুলমাল[৪] থেকে এক 'দিরহাম'[৫] হিসেবে নিজের জন্য বেতন নির্ধারণ করলেন। এতেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং একদিন খুতবায় বললেন : 'লোক সকল ! আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ভুখা রাখেন যে এক দিরহামের কাঙাল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য এক দিরহাম নির্ধারিত করেছেন। অতএব, আমার কারো মুখাপেক্ষী হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।'

৮ হিজরি সনের শেষের দিকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা পদার্পণ করলেন। আল্লাহর কসম। এই সফল প্রত্যাবর্তনে কী ব্যাপকতা ছিল যে আল্লাহ তাঁকে স্পষ্ট বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি এই পবিত্র নগরে প্রবেশ করছিলেন।

তিনি যখন প্রথমবার এসেছিলেন তখন বহিষ্কৃত ও নিন্দিত ছিলেন, শরণার্থী ছিলেন, অদ্ভুত ও অপরিচিত ছিলেন, ভালোবাসার সন্ধানে ছিলেন। এ নগরের অধিবাসীরা তাঁকে নিশ্চিত ঠিকানা পাইয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং সেই আলোকবর্তিকার অনুসরণ করেছিলেন, যা নিয়ে তিনি এসেছিলেন। তাঁর কারণে সমগ্র বিশ্বের শত্রুতাকে মেনে নিয়েছিলেন, আট বছর পরে সেই নগরে তিনি পুনরায় প্রবেশ করেছিলেন, যারা এক মুহাজির ও অসহায় পুরুষকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, যাতে পুনরায় ঐ ব্যক্তি স্বাগত হন। মক্কা তাঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়েছিল, সেখানকার নেতৃবৃন্দ ও সেখানকার কাফিররা তাঁর সামনে মাথানত করে দিয়েছিল কিন্তু তিনি তাদের অভয় দিলেন, যাতে

---

১. ইবনে হিশাম, মুসলিম।
২. ইবনে হিশাম, হাকিম।
৩. ইবনে হিশাম, ইবনে জারীর।
৪. রাজকোষ।
৫. ৩-১/২ মাশার তোলা পরিমাণ মুদ্রা।

তাদের দ্বারা ইসলাম শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের অতীত অপকর্মকে ক্ষমা করে দিলেন :

'সত্য তো এটাই যে, যে কেউ ভয় রাখে এবং ধৈর্য সহকারে কাজ করে অনন্তর আল্লাহ এমন উত্তমদের কর্মফল ব্যর্থ করে দেন না।' – ইউসুফ : ৯০

আঠারো
মুনাফিকদের মোর্চা

যাদের অন্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত বিষয়ে কিছু ভ্রম, সন্দেহ ও শঙ্কা ছিল, এখন তাদের খোলাখুলি, প্রকাশ্য ও স্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখার পর তাদের মধ্যেকার এসব ভ্রান্তি দূর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল এবং ইসলামের প্রতি নৈকট্য ও ভালোবাসা জন্মে যাওয়া উচিত ছিল এবং সেই সাথে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও হঠকারিতা ত্যাগ করা উচিত ছিল।

কিন্তু নিকৃষ্ট লোকেরা পরিকল্পিতভাবে তার বিরোধিতা বাড়িয়ে দিল আর যখন তাদের সাথিরা সাফল্য লাভ করলেন তখন এ উন্নতি ও সাফল্যের সাধন তাদের জন্য অবনতি সিদ্ধ হলো।

অতএব এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাদের মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং তাঁকে দেখে মনে মনে তারা জ্বলে পুড়ে মরছিল। তারা চাচ্ছিল যে এই ব্যক্তির ছায়াও মাড়াব না।

এ ব্যাপারে বংশীয় নেতা বা দলপতি, ইসলাম আগমনের ফলে যাদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল অথবা নির্মূল হয়ে পড়েছিল এরা এবং মরুভূমির বেদুইনরা, এ দুয়ের অবস্থা একই রকম হয়ে পড়েছিল, যারা পশুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করছিল, যেন তারা কোনো কিছু বোঝেই না !

মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে যখন যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো তখন ইসলাম ও তার আহ্বায়কদের বিষয়ে মুনাফিকদের বিপথগামিতা ও দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। রোমক শাসন যত না শক্তিশালী ছিল তাদের সামনে এই মূর্খদের অজ্ঞানতা ছিল আরো বেশি এবং তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আরবরা রোম সাম্রাজ্যকে সেই স্থান দিত, যা আধুনিক যুগে আফ্রিকার দেশগুলো ইয়োরোপ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দিয়ে থাকে। এ ছিল সেই শক্তি, যাকে পরাজিত করাও যেত না আর যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহসও কারোর ছিল না।

রোমকরা যদি এতটা উচ্চস্থান পেয়েও থাকত তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার পাত্র ছিলেন না, যেমনটি তার চরিত্র থেকে বিদিত হওয়া যায়। তাঁর রিসালাত তাঁর চলার পথের সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করে দিয়েছিল। মূর্তিগুলো তাঁর পথ থেকে চিরতরে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। ইহুদিয়াত দেশ থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল আর এখন রোমকদের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাস ও বীরত্বের সাথে সংঘর্ষ জারি ছিল।

মুনাফিকরা এই নতুন শত্রুতা থেকে বড়ই প্রসন্ন ছিল। তারা মনে করছিল যে, রোম ইসলামের সমাধি রচনা করবে। এই কারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক অভিযানের ঘোষণা দিলেন তখন মুনাফিকদের একটি দল একত্রিত হয়ে মুসলমানদের মনোবল নষ্ট করার এবং তাদের সাহসহীন করে তোলার জন্য তাদের বলতে লাগল যে, 'তোমরা কি রোমকদের সাথে যুদ্ধ করাটাকে দুর্বল আরবদের সাথে যুদ্ধ করার সমান মনে করছ ? আল্লাহর কসম ! আমরা কাল তোমাদের শিকল দিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখব।'

উনিশ
তাবুকের যুদ্ধ

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম ও ঈসাইয়াতের মধ্যে সুদৃঢ় সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন কিন্তু তারা এতে প্রস্তুত হলো না যে, ইসলামের আহ্বায়ক জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করুক আর পছন্দ হলে তারা গ্রহণ করুক আর না করলে তা অস্বীকার করুক।

জনসাধারণ যা বুঝতে চায় তার জন্য তাদের উপযুক্ত অবসর প্রদান করা উচিত। পরন্তু যদি ইসলামের আহ্বায়কের মুণ্ডু উড়িয়ে দেয়া যায় আর তাদের সামনে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে ইসলাম এর মোকাবিলা শক্তি ও সাহসের সাথেই করে।

সিরিয়া, ইরাক, মিশর ও অন্য রাষ্ট্রগুলোতে রোমকদের লড়াকু জাতি মনে করত, যারা এই দেশগুলোর সাথে নৈতিক, ভৌতিক ও শক্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখত।

যে ব্যক্তি উত্তরপ্রান্তে সেনা আক্রমণে আপত্তি তোলে সে এই আপত্তির পূর্বে নিজে নিজেকে প্রশ্ন করুক যে, সে দক্ষিণে রোমকদের আক্রমণের ব্যাপারে নীরব কেন ? এবং সেই পরাজিত ক্ষেত্রগুলোর হুকুমতের কর্মপদ্ধতি দেখে সে কেন কষ্ট পায় না ?

ন্যায়োচিত তুলনা করলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই প্রয়াস কালিমালিপ্ত হবে না।

বিভিন্ন চিন্তাধারা ও আকিদাকে কাজ করার অবসর দিন। সে নিজেই তার শিক্ষাবলিকে স্পষ্টীকরণ করুন, রাষ্ট্রগুলোকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাক এবং অন্যদের পৃথক হয়ে যাওয়ার অবসর দিক, কিন্তু এই ব্যাধির মোকাবিলা সামরিক শক্তির মাধ্যমে করা হয়েছে।

রোম সাম্রাজ্য পারসিকদের স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচন করে দিতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের প্রাচীরের নিচে ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল।

এবং রোমের গির্জা এই নবীন বাতাবরণকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিল না। আমি আমার 'ইসলাম ও ঈসাইয়াতের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ' নামক পুস্তকে 'তাবুক' যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখেছি যে, গির্জায় এমন কোনো মত-এর জীবিত থাকার অধিকার ছিল না যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও ভিন্নমত পোষণ করে।

এই যেখানে বাস্তব অবস্থা, সেখানে ইসলামকে জীবিত থাকার অনুমতি কীভাবে দিতে পারে, যা গির্জার লোকদের আধিপত্য ও প্রভুত্বের বিরোধী ছিল ? কেননা, ইসলাম, আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যেকার কোনো মাধ্যম স্বীকার করে না এবং আত্মোৎসর্গ বা আত্মনিবেদনের সেই ধ্যান-ধারণারও বিরোধী, যার উপর মসিহিয়াতের ইমারত দাঁড়িয়ে ছিল এ জন্য তার নিকট মানুষমাত্রেরই কর্মফল পাওয়ার ছিল।

অতএব, প্রভুর সাথে কারোরই অংশী স্থাপন করা মানুষের জন্য মোটেও শোভনীয় নয়। সমস্ত সৃষ্টির কেবল মাত্র একজনই প্রভু আছেন, যাঁর প্রতি ঈসা ও তাঁর মা-ও মাথা নত করতেন।

এই কারণে রোমকরা চিন্তা করল যে তারা ইসলামের উপর পুনরাক্রমণ চালিয়ে আরব উপদ্বীপের উত্তরেই তাদের ধূলিসাৎ করে দেবে অথবা তাদের সামনে সীমান্তের দ্বার বন্ধ করে দেবে, যাতে এদিকে আর আসতে না পারে আর একমাত্র নিজেরাই মানবাত্মার উপর প্রভুত্ব কায়েম রাখবে এমনকি যখন তার ঘণ্টা বাজবে তখন যেন মুআজ্জিনের আল্লাহু আকবর-এর প্রতিধ্বনি তাদের কানে না আসে।

ঈসাইয়াত যখন থেকে শাসনকার্য হস্তগত করেছে তখন থেকে পাদরি বা তথাকথিত কাফিরদের দমন-অত্যাচারের কাহিনীতে তাদের ইতিহাসের পাতা ভরে উঠেছে। অনন্তর যখন রসুলুল্লাহ তাদের প্রস্তুতির সংবাদ জানতে পারলেন তখন তিনি তাদের জুলুম-অত্যাচারের মোকাবিলার জন্য মুসলমানদের অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না।

প্রচণ্ড গরম ও দুর্ভিক্ষাবস্থায় রোমকদের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

এই যুদ্ধে অংশীবাদীরা প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও অত্যধিক ব্যয়ের দাবিদার ছিল।

রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কোনো সীমিত সংখ্যা ও প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত কোনো গোত্রের সাথে সংঘর্ষের সমতুল্য কোনো যুদ্ধ ছিল না। এ ছিল

একা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, যাদের শাসন সমস্ত এলাকা জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং যারা জনবল ও অর্থে সম্পদের অধিকারী ছিল।

পরন্তু, চিন্তাধারা ও সত্যের পথের কাঠিন্যের কারণে তারা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে পৌছাতে বিরত থাকতে চাইল না।

ঈসায়ীদের পক্ষ থেকে প্রস্তুতির খবর শুনে মুসলমানদের মৌনতা অবলম্বন করা আত্মহত্যা কিংবা ধ্বংসের আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতএব, মুসলমানদের এ জন্য সদাতৎপর থাকা এবং যে কুরবানি বা প্রাণোৎসর্গ করার ক্ষণটি এসে উপস্থিত হয়েছে তার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকা উচিত ছিল। কঠোর কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এই বাহিনীর নাম দেয়া হলো কঠিন বাহিনী।[১]

পবিত্র কুরআনে এই 'কঠিন যুদ্ধ' বিষয়ে যত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তা অন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক আয়াতের তুলনায় অধিক। প্রারম্ভে ঈসায়ীদের আক্রমণের উত্তর দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হলো এবং এ কার্য পালনে অবহেলার কুপ্রতিফল সম্পর্কে সচেতন করা হলো এবং স্পষ্টভাবে বলা হলো যে, আল্লাহ তাঁর দ্বীন-এর সুরক্ষা এবং তার নবীকে সহায়তার বিষয়ে কারো কোনো ওজর-আপত্তি স্বীকার করবেন না এবং এই কঠিন বিপত্তি থেকে পরাজিত হওয়াকে ইতিদাদ[২] বলে গণ্য করা হবে :

'হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের কী হয়েছে যে যখন তোমাদের বলা হলো যে আল্লাহর পথে বহির্গত হও তখন তোমরা মাটিতে বসে গেলে। তোমরা কি (তাহলে) আখিরাতের জীবন ত্যাগ করে সাংসারিক জীবনের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে গেছ ? অনন্তর, সাংসারিক জীবনের সুখসামগ্রী আখিরাতের তুলনায় বড়ই কম।

যদি তোমরা বহির্গত না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের বড়ই দুঃখদায়ী যাতনা দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো দলকে নিয়ে আসবেন। এবং তোমরা আল্লাহর কিছুই বিগড়াতে পারবে না আর আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপরেই কর্তৃত্বশীল। – আত-তাওবা : ৩৮-৩৯

এ আয়াতরাজি পূর্ণ স্পষ্টতা ও কঠোরতার সাথে ঘোষণা করতে থাকল এবং মুনাফিকদের অপমানিত করতে থাকল ও শঙ্কাগ্রস্ত লোকদের রহস্য উন্মোচন করে দিতে লাগল। স্বস্তিপ্রিয় ও বিলাসী লোকেরা অনাদৃত, তিরস্কৃত ও নিন্দিত হয়ে গেল এবং মরুভূমির উত্তপ্ত পথে যাত্রার কষ্ট এবং যুদ্ধের প্রচণ্ডতা মোকাবিলা না করে বসে থাকাকেই প্রাধান্য দিল, তারাও বিব্রত হয়ে উঠল :

---

১. উর্দুতে একে 'লশকার উসরত' বলা হয়। বাংলায় এর ভাবার্থ হতে পারে সত্যের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী 'ভয়ঙ্কর কাহিনী।'– অনুবাদক

২. ইতিদাদ– অর্থাৎ মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগ।– অনুবাদক

'পিছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসুলের সঙ্গ ত্যাগ করে আপনাপন গৃহে বসে থাকাতেই খুশি হলো। আল্লাহর পথে নিজের জীবন ও ধনসম্পদ উৎসর্গ করে জিহাদ করাকে তারা অপছন্দ করল। আর তারা বলল : এই গরমে বের হয়ো না ! বলে দাও : জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে অনেক বেশি গরম আর কতই না ভালো হতো যদি তারা এ বুঝত।' – আত তাওবা : ৮১

এই কঠিন বাহিনী বিষয়ে এই সুরা তাওবায় যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানেই কুরআন এই জিহাদের কথা বর্ণনা করেছে সেখানেই তার বর্ণনাশৈলী থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই জিহাদে অংশগ্রহণের শুভ সংবাদ শোনাতে এবং পিছনে রয়ে যাওয়াদের সতর্ক করে দিতে কোনো প্রকারের নমনীয়তা অবলম্বন করা হয়নি ; এবং এতে আশ্চর্যেরও কিছু নেই। কেননা ঈসায়ীদের বিষয়ে ইসলামের নীতি নির্ধারণের উপর ইসলামের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল।

এ জন্য হয় মুসলমানদের গির্জা কর্তৃক প্রদত্ত কাঠিন্যের প্রতি দৃঢ়পদ থাকা, নয়ত তাদের আগুনে তাদের দগ্ধ হতে হতো পরন্তু এই অবস্থায় ইসলামের নাম নিশানাও মিটে যেত।

এই কঠোর এবং নিঃসঙ্কোচ নির্ণয়ের অনুকূল প্রভাব পড়ল। মুসলমানরা এমন প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, যার উদাহরণ এর আগে তাদের ইতিহাসে আর ছিল না। এরা উত্তর দিক প্রস্থান করলেন, যেখানে রোমক বাহিনী অবস্থান করছিল।

এই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মনের অবস্থা স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রত্যেকেরই শুদ্ধ আন্তরিকতা, উদার হৃদয়তা ও ক্রিয়াশীলতা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এমন নিস্পৃহও ছিলেন, যাঁরা সামরিক প্রস্তুতিতে নিজেদের ধনসম্পদ বিলিয়ে দিলেন এবং বাহন, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্রাদি কিনে দিলেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন হজরত উসমান বিন আফফান, যিনি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় সবার আগে করে ছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই অগ্রবর্তী ভাবনায় বড়ই প্রসন্ন হলেন এবং বললেন :

'হে আল্লাহ ! তুমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, আমিও সন্তুষ্ট।' –ইবনে হিশাম

এঁদের মধ্যে এমন দীনহীন মানুষও ছিলেন, যাঁরা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের সামর্থ্য না থাকার কারণে বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁদের কাছে রণক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল না, যার ফলে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তাঁরা অশ্রুসজল হয়ে উঠলেন।

উলিয়া বিন ইয়াজিদ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একদিন রাতে তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য উঠলেন, নামাজ পড়লেন এবং কাঁদতে কাঁদতে নিবেদন করলেন :

'হে আল্লাহ ! তুমিই জিহাদের আদেশ দিয়েছ এবং এর জন্য প্রাণিত করেছ, কিন্তু তুমি আমার সহায়-সম্পদ দাওনি, যা থেকে আমি শক্তি লাভ করতাম এবং জিহাদ করতাম।

তুমি আল্লাহর রসুলকে এতটা সামর্থ্যও দাওনি, যিনি আমাকে বাহন দিতে পারতেন। আমি সমস্ত মুসলমানকে, যারা আমার শরীর, সম্পদ অথবা মানের বিষয়ে আমার স্বত্বহরণ করেছে তাদের আমি সদকা করে দিচ্ছি। (অর্থাৎ ক্ষমা করে দিচ্ছি)।'

তারপর নিয়মানুসারে পরদিন লোকদের সাথে ওঠাবসা করতে লাগলেন। আল্লাহর রসুল এই সমবেত জনমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'এই রাতে সদকাকারী ব্যক্তিটি কে ?' কেউ উঠল না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : 'সদকাকারী ব্যক্তি কে ? সে উঠে দাঁড়াবে।' একথা শুনতেই হজরত উলিয়া ওঠে দাঁড়ালেন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আল্লাহর রসুল বললেন :

'প্রসন্ন হয়ে যাও, আল্লাহর কসম ! যার অধিকারে আমার জীবন, তা কবুল করে নেয়া হয়েছে।' – ইবনে ইসহাক

এমন লোকও ছিল, যারা পালিয়ে যাওয়ার বাহানা খুঁজছিল এবং ইসলামকে ঘৃণা করার কারণে তারা কোনো প্রকারের সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করত না। এখানে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এমন লোকেরা যুদ্ধের কী প্রস্তুতি নিত এবং যুদ্ধে গমনকারীদের ফিরে আসার ব্যাপারে কী কামনা করত ?

এমন কাপুরুষ মুনাফিকরা যত রকমের বাহানা খুঁজছিল তার মধ্যেকার সবচেয়ে ঘৃণিত বাহানাকারী ব্যক্তি ছিল জদ্দ বিন কায়েস, যে বাহানা সে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে পেশ করেছিল তা ছিল–

তার সামনে জিহাদের প্রসঙ্গ এলে সে বলল :

'হে আল্লাহর রসুল ! আমার জাতির লোকেরা আমাকে একজন সৌন্দর্যপ্রেমিক ব্যক্তি বলেই চেনে আর নারীর প্রতি আমার ধৈর্যহীন আসক্তি ও কর্মকাণ্ডের কথাও কারো অজানা নেই, এমতাবস্থায় রোমক যুবতিদের দেখে কোনো বিপত্তিতে ফেঁসে যাওয়ার বড় আশঙ্কা আমার রয়েছে। এ জন্য আমাকে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি দিয়ে আমাকে এ বিপত্তিতে ফেঁসে যাওয়ার সুযোগ দেবেন না।'

একথা শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (ইবনে হিশাম)

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো :

'এবং এদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে : আমাকে (বাড়িতে পড়ে থাকতে) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপত্তি (বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা)-তে

নিক্ষেপ করবেন না। জেনে নাও ! এরা তো এমনিতেই বিপত্তিতে পড়ে রয়েছে আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই সমস্ত কাফিরদের ঘিরে রয়েছে।' – আত তাওবা : ৪৯

এমন লোকও ছিল, যারা প্রারম্ভেই উদ্যমহীন হয়ে পড়েছিল কিন্তু যখন সেনাদল প্রস্থান করে গেল তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারল এবং ক্ষতিপূরণের জন্য উঠে দাঁড়াল। এঁদের অন্যতম ছিলেন আবু খাইসামা। রসুলুল্লাহ ও ইসলামী বাহিনীর প্রস্থানের একদিন পর তিনি তার পরিজনদের মধ্যে বসলেন। সে দিন ভীষণ গরম ছিল। তার দুই পত্নী সুস্বাদু পানাহার প্রস্তুত করলেন, ঠাণ্ডা পানি পেশ করলেন এবং বাড়ির চালে পানিও ছিটালেন। এ দৃশ্য দেখে তার মনে খুব আঘাত লাগল এবং তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন :

'আল্লাহর রসুল প্রচণ্ড রোদ আর লু হাওয়ার মধ্যে জীবনপাত করছেন আর আবু খাইসামা ! তুমি শীতল ছায়ায় বসে সুস্বাদু পানাহার করছ ? আর সুন্দর স্ত্রীদের মুখচন্দ্রিমাসুধা পান করছ ? আল্লাহর কসম ! এ ন্যায়সঙ্গত কাজ নয়।'

তারপর তিনি তাঁর পত্নীদের বললেন :

'আল্লাহর কসম ! আমি তোমাদের কারো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারব না, যতক্ষণ না আমি রসুলুল্লাহর সাথে মিলিত হব।'

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে বসলেন, পানি এবং খেজুর নিয়ে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে রসুলুল্লাহর সাথে মিলিত হলেন।

তাবুক অভিমুখে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার সময় এ সেনাদলকে বড়ই কাঠিন্য ও বিপত্তির মোকাবিলা করতে হলো। ইমাম আহমদ নিম্নলিখিত আয়াতের টীকায় লিখেছেন :

'আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং মুহাজির ও আনসারদের উপর কঠিন সময়ে যারা নবীর সাথি হয়েছিল।' – আত তাওবা : ১১৭

তাবুক অভিযানে এক এক উটের পিঠে দুই-তিনজন করে উঠে রওনা হয়েছিলেন। প্রচণ্ড গরম ছিল। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। এমনকি লোকেরা উট জবাই করে তার রক্ষিত পানি পান করে নিচ্ছিলেন। সে সময়ে পানিরও অভাব ছিল, খাদ্যেরও অভাব ছিল। সেই সাথে ছিল দুপুর রোদের প্রচণ্ড উত্তাপ।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কষ্টের সময়ের কিছু কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : প্রচণ্ড গরমে আমরা তাবুক অভিমুখে প্রস্থান করলাম, একস্থানে শিবির স্থাপন করলাম, আমাদের পিপাসা লাগল এবং পিপাসায় এতটা কাতর হয়ে উঠলাম যে, মনে হলো মাথা থেকে গলা আলাদা হয়ে যাবে। এমনকি অবস্থা এমন হলো যে, লোকেরা উট জবাই করে তার গোবর নিংড়ে তার

পানিও খেয়ে ফেলতে লাগল, এমনকি তার গোবর নিজেদের বুকে লেপে দিতে লাগল। আবু বকর নিবেদন করলেন : 'হে আল্লাহর রসুল ! আল্লাহ আপনার দুআ গ্রহণ করেন তাতে কল্যাণ রয়েছে। অতএব, আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি এটা পছন্দ করো ?' আবু বকর বললেন : 'হ্যাঁ' : রসুলুল্লাহ তার দুটি হাত আকাশের দিকে তুলে ধরলেন এবং বর্ষা না নামা পর্যন্ত তিনি নিচু করলেন না। প্রচণ্ড বর্ষা হলো এবং লোকেরা পাত্র ভরে পানি নিল। তারপর আমরা অগ্রসর হয়ে দেখলাম যে, আমাদের সেনাদলের আগে আর কোথাও বৃষ্টি হয়নি।' ইবনে ইসহাক বলেন, সেনাদলের মধ্যে এক মুনাফিকও ছিল, লোকেরা বলল : 'তোর মুখে চুনকালি পড়ুক।' এখনও কি তোর পানির দরকার ?' সে বলল : 'এ তো চলমান বর্ষা ছিল।'

পথিমধ্যে সামুদ এলাকা পড়ল। সেখানে শুধুমাত্র কয়েকটি ধ্বংসস্তূপ বা ভগ্নাবশেষ ছিল, যা লোকদের আল্লাহর গজবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, যারা তাদের রসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং আল্লাহর শাস্তির পাত্রে পরিণত হয়েছিল। রসুলুল্লাহ বললেন : 'যারা নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করেছে তাদের এলাকা দিয়ে যখনই অতিক্রম করবে, তখন ক্রন্দনরত অবস্থায় বেরিয়ে যাবে, সে গজব তোমাদেরও গ্রাস করতে পারে যেমনটি পূর্ববর্তীরা হয়েছিল।'[১]

মনে হয় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম চাচ্ছিলেন যে, মুসলমানরা নিদর্শনগ্রস্ত বা শিক্ষণীয় এলাকা দিয়ে অচেতন অবস্থায় অতিক্রম না করে বা অতীতে যা কিছু ঘটেছে তা সাধারণ কোনো ঘটনা ভেবে যেন সে স্থান থেকে চলে না যায়। উদাহরণত, জেলের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি ঘুরে ফিরে বেড়ানোর সুযোগ পায় এবং ফাঁসির প্রকোষ্ঠটিও দেখে তাহলে ফাঁসির আসামি দেখে বা ফাঁসিপ্রাপ্তদের কথা স্মরণ করে যেন উপহাস না করে বা ঠাট্টা করতে করতে সেখান থেকে বেরিয়ে না যায়। অপরাধীদের বিষয়ে অবগতি বা ফাঁসির ঘটনায় তো মানুষের অন্তর উদ্বেলিত কিংবা বিগলিত হওয়া উচিত।

আহমদ, হজরত জাবির রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ করেছেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেই পাহাড়ি উপত্যকা অতিক্রম করলেন সেখানে হজরত সালেহর জাতির লোকেরা বসবাস করত, তখন বললেন : 'মোজেজার দাবি কোরো না, সালেহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাতি মোজেজা দাবি করলে তার উত্তরে আল্লাহ একটি উটনী পাঠিয়ে দেন। যে এই পাহাড়ি পথ ধরে যাওয়া-আসা করত। ঐ লোকেরা শয়তানি করে তার কুঁজ কেটে দিল। সে একদিন একা তাদের পানি পান করত আর তারা একদিন তার দুধ পান করত কিন্তু একদিন তারা তাকে মেরে ফেলল আর অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড আওয়াজ তাদের

---

১. বুখারী, মুসলিম।

উপর পতিত হলো আর খোলা আকাশের নিচে আল্লাহ তাদের উপুড় করে ফেলে রেখে দিলেন।[১]

মোজেজার দাবি হলো লোকদের সাধারণ পরিস্থিতির দিকে ফিরে যাওয়ার খবর দেয়া। কেননা, সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ থেকে কোনো লাভ হয় না এবং মোজেজার দাবিদারদের জন্য উত্তম ফল এর উত্তরাধিকারীর দায়িত্ব পালন করা এবং নিজেদের অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি করা, যাতে আল্লাহর আদেশের সামনে আর্দ্রতা সৃষ্টি হতে পারে।

অতীত যুগের লোকেরা মোজেজা বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তাদের মনের কঠোরতা তাদের উপহাস করতে প্ররোচিত করে, ফলে, আল্লাহর অভিসম্পাত তাদের গ্রাস করে।

মুসলমানরা যখন তাবুক পৌঁছালেন তখন তারা সেখানে শত্রুপক্ষের কোনো যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখলেন না এবং শত্রুদের সাথে তাদের মোকাবিলাও করতে হলো না।

রোম নিশ্চিতভাবে নিজেদের সীমান্তে এই নয়া শক্তির বিপক্ষে নিজের শক্তিকে গুটিয়ে নিল। এর ফলে এই এলাকায় আরব শাসকরা রসুলুল্লাহর সাথে সন্ধির সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

তার সাথে আইলা, আজরা, তাইমা তথা দুমাতুল জন্দলের শাসকরা সন্ধি করলেন এবং সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করলেন এবং রোম সাম্রাজ্যাধীন এই গোত্রগুলো নিশ্চিতভাবে বুঝে নিল যে, পুরাতন প্রভুদের বিশ্বাস করাটা একেবারেই ভুল।

তাবুকের যুদ্ধ আহজাবের যুদ্ধের সমতুল্য। প্রারম্ভে মুসলমানরা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন কিন্তু পরিশেষে সন্তোষ, শান্তি এবং প্রভুত্ব লাভ করলেন। রসুলুল্লাহ সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন এই ভেবে যে, না জানি বনে জঙ্গলে হয়ত রোমক সৈন্যরা লুকিয়ে থাকতে পারে এবং অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে যেন কোনো ক্ষতি করতে না পারে। কিন্তু যখন তিনি নিশ্চিতভাবে দেখলেন যে, যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনাই নেই তখন বিজয়ীর বেশে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় এসে গেলেন। দূর থেকেই তিনি তাকে এক ঝলক দেখে নিলেন এবং বললেন : 'এই হলো পবিত্র মদিনা নগর আর এ হলো উহুদ, আমরা একে বড়ই ভালোবাসি আর এ আমাদের আশ্রয়স্থল।' (বুখারী, মুসলিম) তার আগমনের খবর শুনে নারী ও শিশুরা এই গীত গাইতে গাইতে বেরিয়ে এল :

'বিদা পাহাড়ের উপরে দেখ উঠেছে চতুর্দশীর চাঁদ।
খোদার আদেশ ফরজ আজি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ ॥'

---

১. মুসনাদ আহমদ, হাকিম ইত্যাদি।

মূল কবিতার ভাবাবলম্বনে এ গ্রন্থের অনুবাদক মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস এই প্রশস্তি গীতটি রচনা করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন :

চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে বিদা পাহাড়ের উপত্যকায়।
আয়রে সবাই জগদ্বাসী দেখবি যদি আয়রে আয়॥
চাঁদের রূপে বেরিয়ে এলেন বিশ্ব রসুল মুহাম্মদ।
সেই আলোরই বাঁধ ভেঙেছে আল মদিনার উপত্যকায়॥
মিথ্যা হলো অপসৃত সত্য আজি সমাগত।
আঁধার ভুবন নূরের আলোয় অন্ধকারে ভরিয়ে যায়॥
বিশ্বভুবন গাইল আজি মহা বিজয়ের অমর গীত।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা লুটিয়ে পড়ে নবীর পায়॥
ফিরিশতারা বাজায় যে দফ হুর পরিরা নৃত্য করে।
আঁধার ভুবন আলো হলো জাগল নতুন ভঙ্গিমায়॥

এই কঠিন বাহিনীকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনা জানানো হলো। এ ছিল রসুলুল্লাহর সাথে প্রস্থানকারী এ যাবৎকালের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় বাহিনী, যাতে প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য ছিল। এই আগমনকে সেই মহৎ হৃদয়ের অধিকারী দীন দরিদ্র সাহাবিরা ভুলতে পারেননি, যাঁরা নিজেদের অসমর্থতার কারণে আল্লাহর রসুলের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি আর যে জন্য তাদের নেত্র অশ্রু বিসর্জন করছিল।

হজরত আনাস বিন মালিক হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন মদিনার নিকটবর্তী এলাকায় এসে পৌছালেন, তখন তিনি বললেন :

'মদিনায় এমন কিছু লোকও আছে, যারা তোমাদের ন্যায় পথ এবং উপত্যকা অতিক্রম করেছে তারাও তোমাদের সাথে সাথেই রয়েছে।' সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন : 'তারা মদিনায় থেকে যাওয়া সত্ত্বেও ?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ মদিনায় থেকে যাওয়া সত্ত্বেও। বাস্তবিক অসমর্থতা তাদের বাধা সৃষ্টি করছিল।' – বুখারী

এই সান্ত্বনার দ্বারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরই সম্মান প্রদান করলেন, যাঁরা তার সাথে ছিলেন কিন্তু দৈহিকভাবে যেতে পারেননি। এভাবে তিনি তাঁদের হৃদয় ও মন থেকে এমনই একটা ভার কমিয়ে দিলেন, যা তাদের মধ্যে অবদমিত অবস্থায় বিরাজ করছিল।

পরন্তু, সেই সমস্ত মুনাফিক, যারা মনেপ্রাণে পরাজয় গ্রহণ করে এসেছিল এবং সেই সমস্ত বেদুইন, যারা ইসলামকে এক বিপত্তি বলে ভেবে এসেছিল, এরা সকলেই ইসলামের আহ্বায়ক ও তার নিবেদিতপ্রাণ মহাত্মাদের বিরুদ্ধে কালচক্রের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করে আসছিল। এদের সবাইকে দীর্ঘকাল ধরে সংকট এবং কষ্টের মোকাবিলা করে যেতে হলো।

কুড়ি
পশ্চাদবর্তীগণ

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মসজিদে গেলেন এবং দু'রাকাত নামাজ পড়ে সাহাবিদের মাঝখানে বসে গেলেন। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন তারা আসতে শুরু করলেন এবং নিজেদের অসমর্থতা দেখানোর জন্য কসমের পর কসম খেতে লাগলেন। এঁদের সংখ্যা ছিল ৮০ থেকে ৮২ জন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের অসমর্থতা স্বীকার করে নিলেন এবং তাদের কাছ থেকে শোনার এবং পালন করার প্রতিজ্ঞা নিলেন এবং তাঁদের মাগফিরাতের জন্য দুআ করলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যাবলিকে আল্লাহর দায়িত্বে অর্পণ করলেন।

কা'ব বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু এলে তিনি রোষপূর্ণ মুচকি হাসি হেসে বললেন : 'এসো'। কা'ব বলেন, 'আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়লাম।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'পিছু রয়ে গিয়েছিলে কেন ? তুমি না বাহন ক্রয় করেছিলে ?'

কা'ব : 'হে আল্লাহর রসুল ! যদি আমি কোনো জাগতিক মানুষের সামনে হতাম তাহলে গজবের কবল থেকে রক্ষার জন্য মনগড়া আপত্তি সহসা পেশ করে রেহাই পেতে পারতাম। কিন্তু আপনি তো আল্লাহর রসুল। আজ যদি মিথ্যা বলে আপনাকে প্রসন্নও করি তাহলে আল্লাহ আপনাকে কাল অপ্রসন্নও করে দেবেন আর যদি সত্য বলি তাহলে আপনি অপ্রসন্ন হয়ে যাবেন কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি আমার পূর্ণ আশা রয়েছে, তিনি আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। প্রকৃত সত্য হলো, আমার সামনে কোনো অসমর্থতা ছিল না। আল্লাহর কসম ! যে সময়ে আমি আপনার পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম সে সময়ের চেয়ে অধিক ধনবান এবং সমৃদ্ধশালী কখনোই ছিলাম না।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : 'এই ব্যক্তি সত্য বলেছে, যাও এবং আল্লাহ তোমার বিষয়ে কোনো ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

এবং কা'ব উঠে চলে এলেন।

কা'ব বলেন, বনু সালমার কিছু লোক আমার কাছে এল এবং বলতে লাগল : 'আল্লাহর কসম ! তুমি এর আগে কোনো পাপ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি অন্যান্য পশ্চাদবর্তীদের ন্যায় টালবাহানা কেন দেখালে না ? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ তোমার পাপরাশিকে মার্জনা করে দেয়ার জন্যই পর্যাপ্ত হতো।' কা'ব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এরা আমাকে নিরন্তর বিচলিত করতে থাকল, এমনকি, আমি এও ভাবলাম, না হয় আমি পুনরায় ফিরে গিয়ে রসুলুল্লাহর কাছে গিয়ে বাহানার মাধ্যমে আমার অসমর্থতা প্রকাশ করি।'

আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'এ বিষয়ে আমার সাথে কি আর কেউ আছে ?' তারা বলল : 'হ্যাঁ আরো দু'জন আছেন, যারা আপনার মতোই কারণ দর্শিয়েছেন এবং আপনার ন্যায় একই উত্তর পেয়েছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'এ দুজন কে কে ?'

বলল : 'মুরারা বিন রবিআ আমরী এবং হিলাল বিন উমাইয়া ওয়াকিফী রাজিয়াল্লাহু আনহু।' তারা এমন দু'জন ব্যক্তির নাম করল, যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এবং তাঁদের জীবন এক আদর্শ জীবন ছিল। অতএব, যখন এদের দু'জনের নাম আমার সামনে এল তখন আমি আমার সংকল্পের উপর দৃঢ় হয়ে গেলাম।

রসুলুল্লাহ্ আমাদের এই তিন ব্যক্তির সাথে সালাম ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন।

লোকেরা আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগল। আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সব পর হয়ে গেল।

দুনিয়া অপরিচিত মনে হতে লাগল, এ দুনিয়া সেই দুনিয়া ছিল না, যাকে আমরা জানতাম ও চিনতাম।

এভাবে ৫০টি দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আমার দুই সাথি বার্ধক্যের কারণে আপনগৃহে নির্জনবাসী হয়ে গেলেন এবং দিনরাত কান্নাকাটি করতে লাগলেন। আমি ছিলাম শক্ত যুবক, মুসলমানদের সাথে নামাজে অংশগ্রহণ করতাম। বাজারে ঘুরে বেড়াতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতে প্রস্তুত ছিল না। আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতাম, নামাজের পরে তিনি লোকদের মধ্যে উপবিষ্ট থাকলে আমি সালাম করতাম। আমি নিজে নিজেকে প্রশ্ন করতাম আমার সালামের উত্তরে কি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠোঁট মুখ কিছু নেড়েছেন ? তারপর আমি তাঁর কাছেই নামাজ পড়তাম এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যখন আমি নামাজে লীন হয়ে যেতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন আর আমি সেদিকে আকৃষ্ট হলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

যখন মুসলমানদের বিমুখতা ও উপেক্ষা আরো বৃদ্ধি পেল তখন আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবু কাতাদার বাড়ির পাঁচিলের উপরে উঠে তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু আল্লাহর কসম ! সে আমার সালামের উত্তর দিল না।

আমি বললাম : 'আবু কাতাদা ! আমি তোমাকে শপথ করে জিজ্ঞাসা করছি যে তুমি কি জান আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি আমার কী গভীর ভালোবাসা রয়েছে ?' তিনি চুপ করে থাকলেন। আমি আবারো প্রশ্ন করলাম এবং তাকে শপথের সাথে বললাম। তবুও তিনি চুপ করে রইলেন। আমি তৃতীয় বার তাঁকে শপথের সাথে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি কেবল এতটাই উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ ও তার রসুলই ভালো জানেন।

আমার দু চোখে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। আমি সে সময়ে প্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে ফিরে চলে এলাম।

একদিন আমি মদিনার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এই দিন এক 'শামী' 'নবতী'কে আমার ঠিকানা খুঁজতে দেখলাম এবং লোকেরা আমাকে দেখিয়ে দিল। যখন সে আমার কাছে এল তখন সে গাসসানের শাসকের একটি পত্র আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। তাতে লেখা ছিল :

'আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার হজরত আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন, যদিও আল্লাহ আপনাকে হীনতা ধ্বংসের ঘরের মধ্যে সীমিত রাখেননি, আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন, আমরা আপনাকে সন্তুষ্ট করব।'

আমি তা পড়ে চিন্তা করলাম যে, এও এক পরীক্ষা এবং সে পত্রটি একটি চুলোর মধ্যে ফেলে দিলাম। যখন ৪০ রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেল তখন একদিন আল্লাহর রসুলের সংবাদবাহক এসে বলল যে, আল্লাহর রসুল আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকেও পৃথক হয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তালাক দিয়ে দেব ? সে বলল, তালাক নয়, কেবল আলাদা হয়ে থাকুন।

একই বার্তা আমার অপর দুই সাথিকেও পাঠানো হলো এবং তারা তাঁদের স্ত্রীদের মাতৃগৃহে চলে যেতে বলেছেন এবং আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত এভাবে থাকতে বলেছেন।

হিলাল বিন উমাইয়ার পত্নী রসুল্লাহর কাছে এসে সবিনয়ে নিবেদন জানালেন, 'হে আল্লাহর রসুল, আমার স্বামী অতিশয় বৃদ্ধ এবং তাঁর কাছে কোনো সেবক নেই। এমতাবস্থায় তাঁর সেবা করাটা আমার জন্য অনুচিত ?' তিনি বললেন : 'না ! বরং তুমি তার অন্তরঙ্গ হয়ো না।' তিনি বললেন : 'আল্লাহর কসম ! এতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা নেই। যে দিন এ আদেশ এল, সেই দিন থেকে তিনি নিরন্তর কাঁদতে থাকলেন।'

হজরত কা'ব বলেন, আমার পরিবার পরিজন আমাকে পরামর্শ দিল যে, 'আপনার অন্য সাথি হিলাল যেমন তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে সেবা নেয়ার ব্যাপারে রসুলুল্লাহর অনুমতি গ্রহণ করেছেন তেমনি আপনিও করুন।' আমি বললাম : 'না, আল্লাহর কসম ! এ বিষয়ে আমি রসুলুল্লাহর অনুমতি প্রার্থনা করব না। আমি অনুমতি চাইলে রসুলুল্লাহ কী মনে করবেন, যেখানে আমি একজন যুবক ! এরপর, ১০ রাত অতিবাহিত হয়ে গেল, এমনকি ২০ দিন পুরো হয়ে গেল। পঞ্চাশোত্তম রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমি যখন একদিন প্রাতে আমার বাড়ির ছাদের উপর ফজরের নামাজ পড়ছিলাম, তখন আমার সেই অবস্থা ছিল স্বয়ং আল্লাহ যা উল্লেখ করেছেন। আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল আর ধরিত্রী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে সংকুচিত হয়ে আসছিল। অকস্মাৎ 'সালা' পাহাড়ের দিক থেকে হৃদয় উন্মাতালকারী এই ধ্বনি ভেসে এল :

' হে কা'ব ! সুসংবাদ, অভিনন্দন।'

একথা শুনতেই আমি সিজদায় পড়ে গেলাম আর বুঝতে পারলাম এ বি[illegible] অবসান হয়েছে। ফজরের নামাজের সময়ে রসুলুল্লাহ আমাদের তওবা স্বীকৃ[illegible] ঘোষণা দিয়ে দিলেন। লোকেরা আমাদের সুসংবাদ শোনাতে এলেন এবং আ[illegible] দুই সাথিকেও শোনাতে গেলেন। এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে এল এ[illegible] সে পাহাড়ের মাথার উপর থেকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল। সে আওয়াজ ঘোড়[illegible] চেয়ে দ্রুতগতি মনে হলো। যখন সে ব্যক্তি মঙ্গলবার্তা নিয়ে এল তখন আম[illegible] দু'টি কাপড় আমি তাকে পাঠিয়ে দিলাম এবং রসুলুল্লাহর কাছে গেলাম। লোকের[illegible] দলে দলে এসে আমার সাথে মিলিত হলো এবং অভিনন্দন জানাল। তাদের ভাষ[illegible] ছিল, 'তোমার তওবা কবুলের জন্য তোমাকে অভিনন্দন।' হজরত কা'ব বলেন, এমনকি আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে সাহাবিদের সাথে বসে ছিলেন। আমাকে দেখামাত্রই তালহা বিন উবাইদুল্লাহ দৌড়ে আমার কাছে এলেন, আমার সাথে মুসাফাহ্ করলেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আল্লাহর কসম। মুহাজিরদের মধ্য থেকে আর কেউ ওঠেননি। আমি তালহার এ ইহসানের কথা কখনো ভুলতে পারব না।

রসুলুল্লাহর চেহারা আনন্দে ঝলমল করছিল। আমি অগ্রসর হয়ে সালাম করলাম, তিনি বললেন :

'অভিনন্দন তোমাকে, আজ সেই দিন, মাতৃগর্ভ হতে জন্মলাভের পর যে দিনটি তোমার সবচেয়ে উত্তম।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'হে আল্লাহর রসুল, এ ক্ষমা আপনার পক্ষ হতে না আল্লাহর পক্ষ হতে ?'

তিনি বললেন : 'না ! বরং আল্লাহর পক্ষ হতে।'

রসুলুল্লাহ যখন প্রসন্ন হচ্ছিলেন তখন তার চেহারা সদ্য ফোটা গোলাপের মতো মনে হচ্ছিল। অথবা শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদের মতো এ থেকে তার আনন্দিত চেহারাটি আমরা অনুমান করতে পারি।

কা'ব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাঁর সমীপে বসে পড়লাম। আমি আমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে বললাম, 'আমি এই তওবা কবুলের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার সমস্ত সম্পদ দান করে দিতে চাই।'

তিনি বললেন : 'কিছু রেখে দাও।'

আমি বললাম : 'আমি খয়বরের অংশটি রেখে দিচ্ছি।'

তারপর আমি বললাম : 'হে আল্লাহর রসুল ! আল্লাহ আমাকে কেবলমাত্র সত্যের কারণে মুক্তি দিয়েছেন। অতএব, আমার তওবা অনুশোচনার একটি ভাগরূপে আমি এ কথাও মনে করছি যে, আজীবন আমি সত্য ছাড়া আর কিছু কইব না। আল্লাহর কসম ! আমি জানি না যে, মুসলমানদের সাথে কেবল সত্য বলার কারণেই এমন কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয়েছে, যেমনটি আমার নেয়া হয়েছে,

আল্লাহর কসম ! আমি জেনে-বুঝে কখনোই মিথ্যা বলিনি আর আমার আশা যে, ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন।'

অনন্তর, আল্লাহ এই আয়াতরাজি অবতারণ করলেন :

'আল্লাহ নবীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে গিয়েছেন, আর মুহাজির ও আনসারদের উপর কঠিন যারা সময়ে নবীর সঙ্গ দিয়েছে। যদিও তাদের মধ্যেকার একটি দল মনগড়া একটি প্রবৃত্তির নিকটবর্তী ছিল।

তারপর তিনি তাদের প্রতি করুণা পরবশ হলেন। নিঃসন্দেহে তিনি এদের জন্য করুণাময় এবং দয়াশীল।

এবং এ তিনজনের প্রতিও (করুণাপরবশ) হয়ে গেলেন ? যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, যখন ধরিত্রী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন তাদের উপর দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠল এবং তারা বুঝল যে, তারা আল্লাহর কাছে গ্রেফতার হয়ে গেল আর কোথাও তারা আশ্রয় পাবে না, পেলেও ওদের ওখানেই। অনন্তর, তিনি (আল্লাহ) তাঁর দয়াপরায়ণতা থেকে তাদের প্রতি ফিরে গেলেন, যাতে তারা (ও তার প্রতি) ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই অনুশোচনা গ্রহণকারী এবং দয়াশীল।

হে মুমিনগণ ! আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।' – আত তওবা : ১১৭-১১৯

আল্লাহর কসম ! ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে বড় যে নিয়ামত আমি লাভ করেছিলাম তা রসুলুল্লাহকে সত্য ও সঠিকভাবে বলেছিলাম এবং মিথ্যা বলা থেকে আত্মরক্ষা করেছিলাম, নইলে আমি বরবাদ হয়ে যেতাম, যেমনটি অন্য মিথ্যাবাদীরা হয়েছিল। কেননা, মিথ্যা বলার বিষয়ে আল্লাহ সেই কঠোর বাক্য, যা তিনি বলতে পারতেন, তা বলে দিলেন। যখন 'অহি' অবতীর্ণ হলো এবং বলা হলো :

'যখন তুমি প্রত্যাবর্তিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর নামে শপথ করবেন যাতে তুমি তাদের ছেড়ে দাও। অনন্তর, তুমি তাদের ছেড়েই দাও ! তারা নরক আর যা কিছু কামিয়ে চলেছে তার প্রতিদানে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

তারা তোমার সামনে শপথ করবে, যাতে তুমি তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও। অনন্তর, তুমি যদি তাদের প্রতি রাজি হয়েও যাও, তবে আল্লাহ কখনোই এমন লোকদের প্রতি রাজি হবেন না, যারা অবজ্ঞাকারী।' – আত তাওবা : ৮৫-৯৬

হজরত কা'ব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা তিনজন সেই ধরনের বাহানা করিনি, যেমনটি অন্যেরা করেছিল এবং তিনি তাদের কাছ থেকে বাইয়াত (প্রতিজ্ঞা)ও গ্রহণ করেন এবং 'মাগফিরাত'-এর জন্য দুআ করেন আর আমাদের বিষয়টি স্থগিত রাখেন, এমনকি এ বিষয়ে আল্লাহর ফায়সালাও এসে গেল।

এদিকে আল্লাহ তাঁর এই কথন 'এবং তিনজনের উপরও আল্লাহ করুণাপরায়ণ হলেন, যারা পিছু রয়ে গিয়েছিল' আমি ইঙ্গিত করেছি। এখানে 'পিছু রয়ে গিয়েছিল' অভিপ্রায় হলো যুদ্ধ থেকে পিছনে রয়ে যাওয়া নয় ; বরং অভিপ্রায় হলো আমাদের বিষয়টি স্থগিত রাখা। যারা শপথ করেছিল, অসমর্থতা পেশ করেছিল এবং আল্লাহ তাদের অসমর্থতা কবুল করে নিয়েছিলেন।

একুশ
মসজিদে জিরার

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের পূর্ণতা সম্পাদনের পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্রতা ও সহৃদয়তার নীতি অবলম্বন করলেন। তাদের বাহানা মেনে নিলেন এবং তাদের বদনাম হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিলেন, যদিও তারা শোনার এবং পালন করার বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। যদি এদের মধ্যে কেউ এমন অপরাধ করে ফেলত, যার ফলে তার মৃত্যুদণ্ড বৈধ হয়ে যেত তা সত্ত্বেও তিনি তাদের উপেক্ষা করে যেতে লাগলেন, যাতে কেউ ভাবতে না পারে যে মুহাম্মদ তার সাথিদের প্রাণদণ্ড দিচ্ছেন। যদিও তাঁর সাথিদের বিষয়ে এমন কোনো শঙ্কা ছিল না কিন্তু জনসাধারণের বিষয়ে ভয় অবশ্যই ছিল।

যদি এই মুনাফিকদের মধ্যে মঙ্গল ও কল্যাণের কিছু অংশ থেকেও থাকত তাহলে রসুলুল্লাহর সহনশীলতা বা সহিষ্ণুতা তাদের অবশ্যই প্রভাবিত করত। তারা তাদের ছলচাতুরি ও কপটতা থেকে অবশ্যই বিরত থাকত এবং সহৃদয়তার সাথে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ত কিন্তু এই উদার হৃদয়তা ও মহামনা তাদের অপরাধপ্রবণতা ও দুঃসাহসকে আরো বাড়িয়ে দিল। তাদের দুষ্কর্ম বৃদ্ধি পেল এবং নীচাশয়তা ও অপবিত্র আকাঙ্ক্ষা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং জনসাধারণ তাদের মন মানসিকতার অনুমান করে নিল।

সুরা তাওবার অন্তিম আয়াতগুলো এই মুনাফিকদের কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে এবং তাদের সেই পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছে যার অন্তরালে তারা অপকর্ম ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাচ্ছিল। তাবুক যুদ্ধের আগে এবং পরে দীর্ঘকাল তারা সহনশীল ও উদার আচরণ পেয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তারা যখন এই সহনশীলতা ও উদারতাকে সম্মান করল না, তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের ভ্রান্তি নিরসনের আদেশ পেলেন যে এদের ভ্রান্তিকে স্পষ্ট করে দিন এবং তাদের বাহানাবাজি প্রত্যাখ্যান করুন, মৃত্যুর পরে এদের জানাজাও ত্যাগ করুন ; বরং স্পষ্ট করে দেয়া হলো যে যদি এদের মাগফিরাতের জন্য দুআ করেন তাহলে তা কবুল করা হবে না। তারপর সমস্ত মুসলমানকে তাদের বয়কট করার জন্য আহ্বান জানানো হলো।

মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করে একটি মসজিদ নির্মাণ করল, যাতে তারা একত্রিত হয়ে ইবাদতের আড়ালে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে পারে এবং তাবুক অভিযানে প্রস্থান করার আগে রসুলুল্লাহর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করল যে, আমরা অসুস্থ ও দুর্বলদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি, আপনি গিয়ে এক ওয়াক্তের নামাজ পড়িয়ে দিন। তিনি তার অসমর্থতা ব্যক্ত করে বললেন যে, এখন তো সামনে যুদ্ধাভিযান। আল্লাহ চাইলে ফিরে এসে নামাজ পড়িয়ে দেব।[১]

যখন তিনি ফিরে এলেন তখন মুশরিকদের থরহরি কম্প শুরু হয়ে গেল এবং তাদের ষড়যন্ত্রও স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি এই মসজিদকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়ার জন্য দুজন সাহাবিকে পাঠিয়ে দিলেন। দুই সাহাবি মশাল জ্বালিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতরাজি অবতীর্ণ হলো :

'আর এমন কিছু লোক আছে, যারা এই জন্যই এক মসজিদ নির্মাণ করল যে, তারা ক্ষতি করবে এবং কুফরি করবে এবং মুমিনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য আঘাতস্থল বানাবে যারা এর আগে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে লড়াই করেছে এবং তারা অবশ্যই শপথ করবে যে সদুদ্দেশ্য ছাড়া আমরা এ করিনি, কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।

তুমি ঐ মসজিদে কখনোই দণ্ডায়মান হয়ো না। অবশ্য সেই মসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিনেই আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে স্থাপন করা হয়েছিল, সেই এর অধিক প্রত্যাশী, তুমি (অবশ্যই) তাতে দণ্ডায়মান হবে।' – আত তাওবা : ১০৭-১০৮

বাইশ
প্রতিনিধি দলের আগমন

তাবুক অভিযান অনেক সময় লেগে গেল, মুসলমানরা রজব মাসে গিয়েছিলেন আর রমজান মাসে ফিরে এলেন, যাতে রোজা রাখতে পারেন। কিছুদিনের মধ্যেই খবর এল যে বনু সকিফের একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে আসছেন। আল্লাহ রসুলের প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন সেজন্য তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে আসছিলেন। তায়েফের অধিবাসীরা অবরোধ তুলে নেয়ার সাথে সাথেই আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্তিপূজক ছিল এবং ইসলামকে ঘৃণা করত।

---

১. ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম।

তাদের দলপতি উরওয়া বিন মাসউদ কুফরি ত্যাগের বিষয়ে তাদের সাথে বার্তালাপে উদ্যোগী হলেন। উরওয়া ছিলেন জনপ্রিয় দলপতি, কিন্তু জাহিলি ও কুফরির জন্মগত বিদ্বেষ তাদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল এবং উরওয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন তাদের ইসলামে আমন্ত্রণ জানালেন তখন তারা তাকে তীর মেরে শহীদ করে দিল।

বুদ্ধিজীবীরা আপন সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্কারের বিষয়ে বিরাগ হলেন না। সকিফরা আশপাশের বাতাবরণ থেকে অচেতন থাকতে পারেনি। কেননা, মূর্তিরা প্রত্যেকটি স্থান থেকে কর্পূরের মতো উঠে যাচ্ছিল এবং ইসলাম প্রতিদিন উন্নতি করে চলেছিল।

আমর বিন উমাইয়া, আব্দে ইয়ালাল বিন আমরের কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, তখন অবস্থা এমনই যে, একে আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ঐ ব্যক্তির প্রভুত্ব কতটা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠছে তা তো তুমি দেখতে পাচ্ছ, তাঁর সামনে সমস্ত আরব অবনতমস্তক হয়ে পড়েছে। সমগ্র আরবের মোকাবিলা করার শক্তি তোমার নেই। অতএব, চিন্তা করো এখন আমাদের কী করা উচিত ?

অনন্তর, সকিফের লোকেরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল, যাতে সমস্ত বংশ ও গোত্রের লোক সম্মিলিত ছিল যাতে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

প্রতিনিধি দল রসুলুল্লাহর সাথে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক করল। যাতে কুফরির কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট রাখার অনুমতি পাওয়া যায় কিন্তু রসুলুল্লাহ অত্যন্ত কঠিনভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে যেতে লাগলেন। তারা অনুরোধ করল যে, তিন বছরের মধ্যে আমরা 'লাত'[১] দেবতাকে ত্যাগ করব এবং তাকে ভেঙে দেব।

তারপর দু'বছরের কথা রাজি করাতে চেষ্টা করল, তারপর এক বছর অবশেষে অন্ততপক্ষে এক মাস রাখার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল, কিন্তু রসুলুল্লাহ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে থাকলেন, তাকে অবিলম্বে ধ্বংস করতে হবে।

যখন তারা নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা প্রার্থনা করল যে তারা নিজ হাতে এ মূর্তি ভাঙতে অক্ষম। অতএব, কিছু লোক পাঠিয়ে দেয়া হোক, যারা তা ভাঙতে পারেন। এতে তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

তারা নামাজ থেকে অব্যাহতি চাইল তখন তিনি বললেন, যে ধর্মে নামাজ নেই তাতে কোনো কল্যাণ নেই।

যখন প্রতিনিধি দল মদিনা থেকে তায়েফ ফিরে গেল তখন মুগিরা বিন শওবা ও আবু সুফিয়ান রাজিয়াল্লাহু আনহু লাত-এর মূর্তি ধ্বংস করার জন্য গেলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে লাতের মূর্তি ভাঙা হলো। সে সময়ে সকিফের মহিলারা শোকসন্তপ্তচিত্তে বিলাপ করতে করতে বেরিয়ে এল। যখন তারা তাদের পূজ্য

---

১. তায়েফে 'লাত' নামে এই বিরাট মূর্তিটি ছিল।

প্রভুদের কুড়ালের আঘাতে ভাঙতে দেখল তখন চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তারা দীর্ঘকাল ধরে তার সামনে নিবেদিত হয়ে এসেছিল, পূজার অর্ঘ্য দিয়ে এসেছিল ও মানতও করে এসেছিল। উল্লিখিত হয়েছে যে, যখনই মুগিরা কুড়াল উঠাচ্ছিলেন তখন আবু সুফিয়ান উপহাস করে অথবা বনু সকিফের মহিলাদের সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে হায় হায় করছিলেন।

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, বনু সকিফের ইসলাম গ্রহণ বা অধীনতা ইসলামকে বহু কিছু দিয়েছে। নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে এবং উপদ্বীপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গোত্রগুলোও বাদ পড়ল না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য স্বীকার না করেছিল।

যে গোত্রগুলো আজো পর্যন্ত কুফরিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাও ছিন্নভিন্ন হতে চলেছিল। সত্য তাদের সামনে প্রত্যক্ষীভূত হয়ে উঠেছিল এবং তা স্বীকার করে নেয়াটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সেই রাত, যা তাদের উপর আচ্ছন্ন হয়ে ছিল তা অধিক দীর্ঘ হতে পারল না ; বরং বিভিন্ন প্রান্ত হতে নব প্রভাতের রবির কিরণ ছড়িয়ে পড়ছিল, তারপর এমন সময় এল যে মিথ্যার অন্ধকারে আর পা রাখার জায়গা পেল না।

ইবনে ইসহাকের মতে, রসুলুল্লাহ যখন মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেন, তাবুক অভিযান শেষ করেন এবং সকিফের লোকেরা মুসলমান হয়ে যান এবং তার আদেশ নিষেধ মেনে চলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যান তখন চারদিক থেকে আরবদের প্রতিনিধিরা তার কাছে আসতে লাগল।

আরবরা কুরাইশদের কাছ থেকে এই ব্যবহারটির জন্যই প্রতীক্ষা করে আসছিল, কেননা কুরাইশরাই আগ্রহী নেতা ও পথ প্রদর্শক ছিল, আল্লাহর পবিত্র ও সম্মানিত ঘরের ব্যবস্থাপক তারাই ছিল এবং হজরত ইসমাইলের বংশধর ছিল এবং আরব নেতৃবৃন্দ এ অস্বীকারও করত না– অথচ তারাই রসুলুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল !

যখন মক্কা বিজয় হলো তখন কুরাইশরা মাথা নত করল অর্থাৎ ইসলাম যখন তাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়ে নিল তখন আরবরা বুঝে নিল যে, রসুলুল্লাহর বিরোধিতা করা ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি তাদের নেই, অতএব চারদিক থেকে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে আসতে লাগল। আল্লাহ বলেন :

'যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় লাভ করবে এবং তোমরা দেখবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন তসবিহ করো তোমার প্রভুর প্রশংসার সাথে এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো অধিক হতেও অধিকতর অনুশোচনা গ্রহণকারী।' – আন নসর

রসুলুল্লাহ কত বছরে এই পর্যায়ে প্রবেশ করলেন ? ব্যাপক প্রভাবশালী দাওয়াত, নিরন্তর পরিশ্রম, সাধনা, সহনশীলতা, কাঠিন্য, জুলুম-অত্যাচার ও যুদ্ধ বিগ্রহের মোকাবিলায় ২২টি বছর লেগে গিয়েছিল।

যদি এখনো গাফলত ও অজ্ঞানতার কিছু প্রেমী মূর্তির মধ্যে সম্বাদ্ধ থেকে গিয়েছিল ও অরাজকতা ও অব্যবস্থার জীবন অতিবাহিত করছিল, এমতাবস্থায় এ সমস্ত অপকৃষ্ট ও দুর্গন্ধদায়ক অপকর্মকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রুখে দেয়ার প্রয়াসের ব্যাপারে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভিন্নমত পোষণ করতে পারে না। এই কারণে ইসলাম সমগ্র আরব উপদ্বীপকে মূর্তিপুজোর অপবিত্রতা থেকে মুক্ত বা পবিত্র করার জন্য সুব্যবস্থিত পদক্ষেপ নিল এবং মুশরিক-পৌত্তলিকদের সচেতন করে দিল যে, এজন্য তাদের অত্যন্ত সীমিত সুযোগ দেয়া হচ্ছে এবং তাদের একথাও বলে দেয়া হলো যে, যে সমস্ত মূর্তি কাবার আশপাশে রেখে দেয়া হয়েছিল তা চিরকালের জন্য নির্মূল করে দেয়া হয়েছে এবং কাবাকে পবিত্র করে তাকে সেই 'কেল্লা'র মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যার দিকে ফিরে মুসলমানরা তাদের আন্তরিক সংকল্প নির্দিষ্ট করবে। এখন থেকে কোনো অজ্ঞানী, মূর্খ বা পৌত্তলিকের জন্য এ আর পরিক্রমা স্থল রইল না, যারা এ সমস্ত পাথরের কাছে প্রাচুর্য প্রার্থনা করে। সেই সমস্ত রীতিনীতিপ্রথা যা ইসলাম-পূর্ব যুগে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিংবা প্রচলিত ছিল এবং যে সমস্ত কারণে কাবা অশ্লীলতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এখন ইসলাম তা উৎপাটিত করে দিল, এখন ইসলামের যুগে ঐ সমস্ত অপকর্মের আর কোনো স্থান নেই।

৯ হিজরি সনে হজের মওসুম এল। পৌত্তলিকরা তখনো পর্যন্ত তাদের কুসংস্কৃত রীতিনীতিপ্রথাসংস্কার আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তারা কাবার দিকে আসত কিন্তু মূর্তিরাজির দুস্পরিণাম থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করত না যাদের ভেঙে চুরে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেই মিথ্যা উপাস্যের দল যাদের উপাসনায় তারা তাদের পুরো জীবন ব্যয় করে ফেলেছিল। এখন সেগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল তা সত্ত্বেও পৌত্তলিকরা তাদের রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা কাবাগৃহকে মূর্তির কবল থেকে পবিত্র করার জন্য আফসোস করত।

মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল এ সমস্ত অপসংস্কৃতি, কুসংস্কৃত ও হাস্যস্পদ রীতিনীতিপ্রথার মূলোৎপাটন করা। মনুষ্যত্ব ও মানবতার অপমান নিরসনের জন্য এগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

তেইশ
আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর হজ

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুকে হজের আমির নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠালেন, যাতে মুসলমানদের হজের নিয়মাবলি শেখাতে পারেন এবং হজের ফরজ আদায় করেন। তিনি মদিনা থেকে কুরবানির জানোয়ার সাথে নিয়ে মসজিদুল হারামের দিকে প্রস্থান করলেন। হজরত আবু

বকরের প্রস্থানের পর সুরা তওবার প্রারম্ভিক অংশ অবতীর্ণ হলো এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াতরাজি মক্কায় হজের সময় শুনিয়ে দেয়ার ইঙ্গিত দেয়া হলো।

অনন্তর তিনি হজরত আলীকে এই আয়াতগুলো দিয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন এই ঘোষণা আমার বংশের লোকের দ্বারা হওয়া উচিত। কেননা, আরবদের মধ্যে রক্ত ও সম্পদ সম্পর্কিত সমঝোতা বংশেরই কোনো ব্যক্তির দ্বারা ঘোষণা করার প্রথা ছিল।

হিজরতের আগেও আমানত ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব হজরত আলীকেও অর্পণ করা হয়েছিল। এ সমস্ত বিষয়ে বংশগত সম্পর্কের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া উচিত। হজরত আলী আমানত আদায় করলেন, মানে স্বয়ং রসুলুল্লাহ তা আদায় করলেন। এই রকমই হজের সময়ে হজরত আলী যা কিছু শোনালেন তা যেন স্বয়ং রসুলুল্লাহই তাদের শুনিয়ে দিলেন।

এই সাধারণ নিয়মটি নিয়ে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নেই। কিন্তু রসুলুল্লাহ সাবধানতার জন্য এই উপায় অবলম্বন করলেন।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তারপর তিনি হজরত আলী বিন আবি তালিব রাজিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন এবং বললেন :

'সুরা 'বরআত' (তওবা)-এর প্রারম্ভিক আয়াতগুলো নিয়ে যাও এবং কুরবানির দিন যখন লোকেরা মিনা ময়দানে উপস্থিত হবে তখন এগুলো তাদের পড়ে শুনিয়ে দেবে যে, কোনো কাফির জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এই বছরের পরে আর কোনো পৌত্তলিক 'খানা কাবা'য় হজ করতে পারবে না আর 'বাইতুল্লাহ' (আল্লাহর ঘর) নগ্ন হয়ে পরিক্রমা করতে পারবে না। আর যাদের সাথে সমঝোতা আছে তার অবধি পুরো হওয়া পর্যন্ত এ পালন করা হবে।'

হজরত আলী রসুলুল্লাহর উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং পথিমধ্যে হজরত আবু বকরের সাথে মিলিত হলেন। হজরত আবু বকর যখন তাঁকে দেখলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন : 'আমির হয়ে এসেছ না অধীন হয়ে এসেছ।' আলী (রা) বললেন : 'অধীন হয়ে।' তারপর, দুজনে অগ্রসর হলেন।

আদেশানুসারে হজরত আবু বকর লোকদের হজ করাচ্ছিলেন এবং হজরত আলী আপামর জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা করছিলেন এবং আরবদের সামনে 'সুরা তওবা'র প্রারম্ভিক অংশ পড়ে শোনাচ্ছিলেন, যাতে তাদের বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল এবং মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছিল।

হজরত আলীর সাহায্যার্থে অন্য কিছু লোককেও হজরত আবু বকর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাঁরা চারদিকে তার বার্তা পুনরুচ্চারণ করে শুনিয়ে দিয়েছিলেন যে এ বছরের পর থেকে আর কোনো পৌত্তলিক হজ করতে পারবে না, নগ্ন হয়ে কাবা শরিফ পরিক্রমা করতে পারবে না, আর আগামী বছর থেকে কাফির ও মুসলিম দু'য়ে মিলে একত্রিত হতে পারবে না আর যাদের সাথে রসুলুল্লাহর

সমঝোতা রয়েছে সে সমঝোতা সঠিক সময় অবধি পুরো করা হবে আর যার সাথে রসুলুল্লাহর কোনো প্রতিজ্ঞা নেই তাদের মাত্র চার মাস সময় দেয়া হলো। – আহমদ, তিরমিজি

আমরা অন্যত্র 'ইসলামে সন্ধির গুরুত্ব' বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং সুরা তওবার প্রারম্ভে এ বিষয়ে যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছি, যাতে প্রতিটি ব্যক্তিই অবগত হতে পারেন যে, মূর্তিপুজোর নির্মূল করার আইনও অজ্ঞানতা নির্মূল করার আইনের সমান আর এ এক পবিত্র মানবীয় কর্ম এবং এ বিষয়ে সেই ব্যক্তি আপত্তি করতে পারে না যে সম্প্রদায় ও জাতির মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করে।

ইসলামের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ২২ বছর যাবৎ সে শিক্ষা ও দীক্ষার দ্বারা অপসংস্কৃতি ও অপকর্মের মোকাবিলা করতে থাকল। যখনই সে অবসর পেল তখনই সে গুণের প্রসার, শিষ্টাচার ও নৈতিক উৎকর্ষের বীজ বপনের মাধ্যমে তার কাজ করে গেল কিন্তু যখন তার পথে অশিষ্টতা ও বিপথগামিতা এসে বাধা সৃষ্টি করল তখন তার এ অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যুদ্ধ ও কিসাসের অস্ত্র প্রয়োগ করল।

প্রারম্ভে ইসলাম মূর্তিপুজোকে জীবিত থাকার অধিকার দিল এবং মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের ছেড়ে দিয়ে রাখল এই ভেবে যে, তারা চাইলে ইসলামে ফিরে আসতে পারবে কিন্তু এ তাদের সম্মান দেয়ার জন্য ছিল না ; বরং মানব বুদ্ধি ও আত্মার বিষয়ে বৈরী চিন্তাভাবনার কারণে এমনটি করা হলো। অতএব, এমন লোকদের সংখ্যা খুব কমই রয়ে গেল, যারা নফস বা কুপ্রবৃত্তির সাথে অজ্ঞতা ও মূর্খতাচরণ করতে থাকল এবং আল্লাহকে ছেড়ে ইট, কাঠ, পাথর, বৃক্ষ, খাদ্য বস্তু ইত্যাদির পুজো করতে থাকল।

কিন্তু যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মূর্তিপূজকরা ইসলামের প্রতিটি বিষয়েই উপহাস করে যাচ্ছে এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আর যে সুযোগ তাদের দেয়া হয়েছিল তার অপব্যবহার করছে এবং ফিতনা-ফাসাদ, বিপত্তি ও অত্যাচার উপদ্রব বাড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহার করছে তখন তাদের উপেক্ষা করার আর কোনো যৌক্তিকতা থাকল না।

ক্ষ্যাপা কুকুরকে মুক্তভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখা যায় না। আর যদি সে কোনো প্রকারে ছাড়া পেয়ে যায় তাহলে তাকে মেরে ফেলাটা বৈধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করাটা অপরাধ বলে মনে করাটা ভুল।

যারা ভ্রান্তিতে পতিত বা ভ্রমগ্রস্ত বা যারা মনে করে যে ইসলাম মূর্তিপুজোকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে তাহলে বুঝতে হবে যে তারা তাদের মত প্রকাশের অধিকারকে গলা টিপে মেরেছে। এ ধরনের লোকমাত্রই হয় বিকারগ্রস্ত নতুবা স্বার্থপর।

২২ বছর যাবৎ মুসলমানদের যে দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে, তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোয় এই ক্রোধাতুরতার রহস্য অনুধাবন করা যেতে পারে, যা ব্যাপারটিকে উন্মোচিত করে দিয়েছে এবং এর কারণও বোঝা যায় যে আল্লাহর অহি পৌত্তলিকদের প্রতি অসন্তুষ্টির ঘোষণা কেন দিয়েছে এবং তাদের সমস্ত অসমর্থতাকে কেন রদ করে দিয়েছে।

কুরআন সেই মন্দ ও অপকর্মগুলোকেও চিহ্নিত করে দিয়েছে, যা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ছেড়ে দেয়ার জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না।

এই কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পর মূর্তিদের জন্য আর কোনো স্থান অবশিষ্ট রইল না। :

'আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে ঐ পৌত্তলিকদের সাফ জবাব (এটাই) যাদের সাথে তুমি সন্ধি করেছিলে। অনন্তর (হে পৌত্তলিকবৃন্দ !) এই ভূ-ভাগে আরো চার মাস বিচরণ করে নাও এবং জেনে নাও যে, তোমরা আল্লাহকে হারাতে পারবে না এবং আল্লাহ কাফিরদের অপমানকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে বড় হজের দিন লোকদের জন্য ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ পৌত্তলিকদের (প্রতি জিম্মাদারি) থেকে মুক্ত এবং তাঁর রসুলও। অনন্তর, তোমরা যদি তওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদেরই জন্য মঙ্গল।' – আত তওবা : ১-৩

এই ভীতসন্ত্রস্তকারী ঘোষণার পরে এবং আগেও বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের প্রতিনিধি দল এই মর্মে মদিনায় আসার সংকল্প করছিলেন যে তারা কুফরির বস্ত্র খুলে দেবেন এবং সত্য ধর্ম স্বীকার করে নেবেন।

এই আগমনকারী প্রতিনিধিবর্গ গত কয়েক বছর যাবৎ ইসলামের অল্পস্বল্প ঝলক দেখেছিলেন।

সমগ্র আরব উপদ্বীপে নয়া রিসালাতের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের বিশ্বাস ও আচার সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

শত্রু ও মিত্ররা জীবন-সন্ধানে নিরন্তর প্রসন্ন ও লাগাতার সংগ্রাম জারি রেখেছিলেন এবং ইসলামবিরোধীরা এই পথে নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছিল ; এমনকি নিজেদের বিদায়ঘণ্টা বাজার আগ পর্যন্তও।

আমরা এ তথ্যের সাথে সুপরিচিত যে, একটি দল তার কয়েক আনসার তথা সহযোগীদের দ্বারা প্রযত্নশীল রইলেন কিন্তু যখন তাঁরা সফল ও সুদৃঢ় হয়ে গেলেন তখন তাঁদের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বেড়ে গেল।

যদি শত্রুরা নির্মূলও হয়ে যেত কিংবা বিরোধীপক্ষ মাটিতে মিশে যেত তাহলে তাঁর সাফল্যের বিষয়ে কী-ই বা বলার ছিল ?

ঠিক এই কারণে মদিনায় এই দ্বীন গ্রহণ করার জন্য আগ্রহীদের ভিড় জমে গেল। তাঁর সাথে সমঝোতা করার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

পূর্ব এবং পশ্চিম থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সবিস্তার উল্লেখ আমরা এখানে করতে চাই না। তা সত্ত্বেও দুই প্রতিনিধি দলের কথা এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করব। এদের মধ্যেকার একটি দল ছিল পৌত্তলিক যারা ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল এবং অন্য দলটি ছিল ঈসায়ীদের, যারা পুরো পরিস্থিতি অবগত হয়ে বা তর্ক বিতর্ক বা ভাবধারা বিনিময়ের পর সন্ধি করতে এসেছিল।

চব্বিশ
উম্মিদের প্রতিনিধি দল

সাদ বিন বকর গোত্র জমাম বিন সালবার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রসুলুল্লাহর সমীপে পাঠিয়ে দিল। জমাম তার উটে চড়ে প্রস্থান করল এবং যথাসময়ে মদিনায় পদার্পণ করল। মসজিদে নববীর দ্বারপ্রান্তে নিজের উটটি বসিয়ে তাকে সেখানেই বেঁধে রেখে মসজিদে সাহাবি পরিবেষ্টিত অবস্থায় রসুলুল্লাহ যেখানে বসে ছিলেন সেখানে গেল।

জমাম খুব হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল। সে অগ্রসর হয়ে রসুলুল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল :

'আপনাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র কে ?'

রসুলুল্লাহ : 'আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র।'

জমাম : 'কি, মুহাম্মদ ?'

রসুলুল্লাহ : 'হ্যাঁ।'

জমাম : 'হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র ! আমি আপনাকে কিছু তিক্ত প্রশ্ন করতে চাই, আপনি উত্তেজিত হবেন না।'

রসুলুল্লাহ : 'যা ইচ্ছা প্রশ্ন করো, আমি উত্তেজিত হব না।'

জমাম : 'আমি আপনার প্রভুর, আপনার পূর্ববর্তী প্রভুর, আপনার পরবর্তী প্রভুর শপথ করে প্রশ্ন করছি যে, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের রসুল মনোনীত করে পাঠিয়েছেন ?'

রসুলুল্লাহ : 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাকো।'

জমাম : 'আমি আপনার প্রভুর, আপনার পূর্ববর্তী প্রভুর এবং আপনার পরবর্তীকালের লোকদের প্রভুর নামে শপথ করে বলছি যে, আল্লাহ কি আপনাকে এই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কারো অংশী নির্দিষ্ট না করি এবং সেই অন্যদের আমরা ত্যাগ করি যাদের উপাসনা আমাদের পূর্বপুরুষেরা করে এসেছেন।'

রসুলুল্লাহ : 'হ্যাঁ, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে জিজ্ঞাসা করল :

'হে মুহাম্মদ ! আপনার বার্তাবাহক আমাদের কাছে এসেছেন এবং আমাদের বলেছেন যে আপনি আল্লাহর রসুল হওয়ার দাবি করছেন ?'

রসুলুল্লাহ : 'হ্যাঁ, তিনি সত্য বলেছেন।'

জমাম : 'আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন ?'

রসুলুল্লাহ : 'আল্লাহ'।

জমাম : 'এ পর্বতরাজি কে বানিয়েছেন এবং এতে বিভিন্ন রকমের নিয়ামত কে রেখেছেন ?'

রসুলুল্লাহ : 'আল্লাহ।'

জমাম : 'সেই অস্তিত্বের শপথ, যিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন, ধরিত্রী রচনা করেছেন এবং সুস্থাপিত করেছেন ! আল্লাহ কি আপনাকে রসুল মনোনীত করেছেন ?'

রসুলুল্লাহ : 'হ্যাঁ'।

জমাম : 'আপনার বার্তাবাহক বলেছেন যে, দিবা ও রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ।'

রসুলুল্লাহ : 'হ্যাঁ, তিনি সত্য বলেছেন।'

জমাম : 'সেই অস্তিত্বের শপথ, যিনি আপনাকে রসুল মনোনীত করেছেন আল্লাহ কি এর আদেশ দিয়েছেন ?'

রসুলুল্লাহ : 'হ্যাঁ'।

তারপর সে ইসলামের অন্যান্য ফরজ ও আদেশাবলির বিষয়ে সবিস্তারে প্রশ্ন করতে থাকল ; এমনকি যখন প্রশ্ন করা শেষ হলো তখন সে বলল : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আরো আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল।'

'আমি এ সমস্ত ফরজ পালন করব এবং যে সমস্ত বস্তু আপনি নিষিদ্ধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকব। আমি এর বিন্দুমাত্র কম-বেশি করব না।'

তারপর সে ফিরে যাবার জন্য তার উটের কাছে ফিরে গেল।

রসুলুল্লাহ বললেন : 'এই দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি সত্য কথা বলে তাহলে সে জান্নাতে যাবে।'

জমাম তার উটের কাছে গিয়ে তার বাঁধন খুলে তাতে সওয়ার হয়ে নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে চলে গেল।

তাকে দেখেই তার সম্প্রদায়ের লোকেরা একত্র হয়ে গেল। সেখানে নেমে সে সবার আগে এই বাক্যটি উচ্চারণ করল :

'এ সমস্ত লাত উজ্জা[১] খুবই নিকৃষ্ট।'

---

১. লাত ও উজ্জা নামে দুটি মূর্তি ছিল। – অনুবাদক

লোকেরা বলল : 'জমাম ! ঠিক ঠিক কথা বলো, নইলে তুমি ধবল-কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে উন্মাদ হয়ে যাবে।'

জমাম : আফসোস ! এ লাত উজ্জারা তোমাদের না পারে ক্ষতি করতে আর না পারে উপকার করতে। আল্লাহ এক রসুল পাঠিয়েছেন ও এক কিতাব অবতারণ করেছেন, যিনি তোমাদের ঐ ব্যর্থতা থেকে মুক্ত করেছেন, যার দ্বারা তোমরা আচ্ছাদিত ছিলে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর অংশও নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল। আমি রসুলের আদেশ উপদেশ-নিষিদ্ধ-বর্জিত ও বৈধ-অবৈধ বস্তুর শিক্ষা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।

উল্লেখকর্তা বলেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত গোত্রের এমন কোনো লোক বাকি রইল না, যে ইসলামে প্রবেশ করেনি।[১]

ইনি উম্মিদের সেই প্রতিনিধি ছিলেন, যিনি প্রশ্ন ও তর্কবিতর্কের মাধ্যমে তাঁর সৌম্য স্বভাবের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর মন মস্তিষ্ক সেই সমস্ত জটিল ও কুটিল স্বভাববৃত্তি থেকে মুক্ত ছিল, যা সত্যের পথে অবরোধ সৃষ্টি করে।

এমন তীব্র পরিণাম সামনে আসা নিঃসন্দেহে দাওয়াতের দীর্ঘ প্রচেষ্টা বা প্রযত্নের প্রভাব ছিল। স্বভাবত, দ্বীন পরিবর্তন বস্ত্র পরিবর্তনের মতো কোনো সাধারণ কাজ নয়। হজরত জমাম বিন সালমা রাজিয়াল্লাহু আনহু, রসুলুল্লাহর কাছে প্রশ্ন করার সময় এবং আপন সম্প্রদায়ের লোকদের সম্বোধন করার সময় এ বিষয়টি সামনে এসেছিল যে, নতুন দ্বীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা-ফিতনা ফাসাদ ও বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এসেছিল এবং এর সফলতা ও সৌম্যস্বভাবও প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। অতএব, তার জাতির ঈমান ছিল সামান্য সময়ের কথাবার্তার পরিণাম।

এই ছিলেন উম্মিদের প্রতিনিধি ! এ ছিল সমস্ত ছোট-বড় প্রতিনিধি দলের একটি উদাহরণ। প্রতিনিধি দল মদিনায় আসত, যাতে নবীর দেখা পাওয়া যায়, তারপর তাঁকে দেখতেন, তাঁর সাথে বাইয়াত করতেন, তারপর আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের কল্যাণের পথে আহ্বান করতেন এবং হিদায়েতের আহ্বায়ক হয়ে যেতেন।

কিন্তু কিতাবধারীদের বিষয়টি সর্বদাই ভিন্ন ছিল। তাঁদের মধ্যেকার খুব কম লোকই সত্যের বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পারতেন এবং তৎক্ষণাৎ সে সত্য গ্রহণ করতেন এবং সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন এবং নিজেদের মধ্যেকার শত্রুদের মোকাবিলা করতেন।

ইহুদিরা ইসলামকে নির্মূল করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল, তারা অসদুদ্দেশ্য দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছানোর অগেই তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্ব নির্মূল হয়ে গিয়েছিল।

---

১. আবু দাউদ, হাকিম, আহমদ ইত্যাদি।

ইসলাম তার নিজের রাজ্যে তাদের জীবিত থাকার অধিকার মেনে নিয়েছিল। তারা যতদিন চাইত ততদিন তাদের আপন ধর্মে কায়েম থাকতে পারত কিন্তু ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।

এ এমন এক তথ্য, যাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

ইসলামের অধীন থাকা অবস্থায় কোনো ইহুদির অধিকার হরণ করা হয়নি। এক উদাহরণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একবার স্বয়ং রসুলুল্লাহ এক ইহুদির কাছ থেকে ঋণ নেয়ার জন্য তার কবচটি তাদের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। (বুখারী) কিন্তু তিনি একথা মনে কখনোই জায়গা দেননি যে, শাসন ব্যবস্থা তো আমার হাতে ; অতএব, তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলা যাক।

ইহুদিদের তুলনায় ঈসায়ীরা কম বিদ্বেষ পোষণ করত, তারা গির্জার রাজনীতি থেকে দূরে ছিল। অতএব, তাদের মক্কায় কিছু লোক ইসলামের সহজ-সরল জীবনব্যবস্থায় প্রভাবিত হয়ে তাকে গ্রহণও করেছিল কিন্তু অন্যেরা তাদের আপন ধর্মে আসীন ছিল।

দুই ধর্মের মধ্যে এই ঢঙে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে রইল, যেমন আমরা সংকেতিত করেছি, এমনকি, মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধও ছড়িয়ে পড়ে।

রোমকদের প্রতাপের কারণে ঈসাইয়াত আরবের উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তে শাসন করছিল।

মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে তখনো যুদ্ধ চলছিল। মুসলমানরা ভাবছিলেন যে আরবের ঈসায়ীদের বিষয়ে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়া যাক। বিশেষভাবে যখন রোমকরা ঐ এলাকায় নিজেদের ধর্ম প্রচারকদের উপহার দিয়ে চলেছিল, তাদের জন্য গির্জা নির্মাণ করিয়ে দিচ্ছিল এবং তাদের মান মর্যাদাকে সঁপে দিতে চলেছিল এবং ঈসায়ী ধর্ম প্রচারের জন্য অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল।

অনন্তর, রসুলুল্লাহ নজরানের অধিবাসীদের কাছে একটি পত্র লিখলেন, যাতে লেখা ছিল :

'ইব্রাহিম' ইসহাক এবং ইয়াকুবের উপাস্যের নামে ! আমি তোমাদের বান্দার দাসত্বের নিগড় থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং বান্দার বন্ধুত্ব থেকে চলে আসার জন্য তাগিদ দিচ্ছি।

যদি তোমরা এ অস্বীকার করো তাহলে তোমাদের জিজিয়া দিতে হবে এবং জিজিয়া দিতেও যদি অস্বীকার করো তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।' – ওয়াস সালাম

পঁচিশ

গ্রন্থধারীদের প্রতিনিধি দল

দক্ষিণে অবস্থিত নজরানে ঈসায়ীদের কাবা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা তাদের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় পাঠাল, যাতে তারা রসুলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে কোনো সন্ধি করে নেয়। এই দল আসরের পরে মদিনায় পৌঁছাল এবং মসজিদে প্রবেশ করল।

তারা তাদের প্রথম কাজরূপে বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে ঈসায়ী উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে নামাজ পড়ল, লোকেরা রুখতে চাইলে রসুলুল্লাহ বললেন 'পড়তে দাও।' (ইবনে হাশিম) এমনকি তারা তাদের উপাসনা শেষ করল।

রসুলুল্লাহ দেখলেন যে তাঁর (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাথে সাক্ষাতের জন্য তারা জ্যোতিষীদের বহুমূল্য শাহি চাদর গায়ে জড়িয়ে নিল। সোনা-রুপার আংটি পরে রেশমি বস্ত্র পরিধান করে যখন এল তখন তাদের টুপি ও চাদরের মধ্যে কৃত্রিমতা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল।

তিনি তাদের সাথে সেই সময় পর্যন্ত সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করলেন যতক্ষণ না তারা শুভ্র মুসাফিরি পোশাক পরিধান না করবে এবং এ সমস্ত আলঙ্কারিক পোশাকাদি ত্যাগ না করবে।

বিচিত্র ব্যাপার হলো, তাদের মধ্যকার কেউ রসুলুল্লাহকে প্রশ্ন করল যে 'মুহাম্মদ ! আপনি কি চান যে আমরা আপনার ইবাদত এভাবে করি, যেভাবে ঈসায়ীরা মরিয়মকে করেন। আর আপনি কি আমাদের সেই দিকেই আহ্বান করছেন ?'

রসুলুল্লাহ বললেন :

'এসব থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে আল্লাহকে ছেড়ে আমার ইবাদত করা হোক, বা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদত করার আদেশ দিই। তিনি এসব কাজের জন্য না আমাকে পাঠিয়েছেন আর না আমাকে এর আদেশ দিয়েছেন।' – ইবনে ইসহাক

আল্লাহ এ বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত আয়াত অবতারণ করলেন :

'কোনো মানুষের পক্ষে এ শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব দিয়ে নির্ণয় শক্তি ও নবুয়ত প্রদান করেন, তারপর তিনি লোকদের বলেন যে, তুমি আল্লাহর না হয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও, অথচ তিনি তো এটাই বলেন যে তুমি রব্বানী (আল্লাহওয়ালা, ধর্মাধিকারী) হয়ে যাও, এজন্য যে তুমি কিতাবের শিক্ষা দিচ্ছ আর এ জন্য যে তুমি নিজেও পড়ছ।

আর সে তোমাদের এ আদেশ দিতে পারে না যে, তোমরা ফিরিশতা ও নবীদের প্রভু বানিয়ে নাও। তিনি কি তোমাদের কুফরির আদেশ দেবেন ? এরপর যেখানে তুমি মুসলিম।' – আলে ইমরান : ৭৯-৮০

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজরানের আলেম ও প্রতিনিধি দলের সবাইকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে তারা উত্তর দিল যে, আমরা আপনার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন : 'তোমরা মিথ্যা বলছ। এই কথাটিই তোমাদের ইসলাম থেকে বিরত রেখেছে যে, তোমরা নিজেদের আল্লাহর সন্তান বলে মনে করো, ক্রুশের পুজো করো এবং শূকর খাও।' তারা সকলেই ঈসার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল এবং বলল :

তার পিতা কে ? – ইবনে ইসহাক।

রসুলুল্লাহ উত্তর দিলেন : 'তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করে না এবং ঈসাকে তা অবশ্যই গ্রাস করবে ?'

তারা উত্তর দিল : 'কেন নয় ? আমাদের জানা আছে।'

রসুলুল্লাহ : 'তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ অধিপতি এবং সমস্ত বস্তুর উপরই তাঁর আধিপত্য রয়েছে, তিনি তাঁকে রক্ষা করেন এবং উপজীবিকা দান করেন ?'

প্রতিনিধি দল : 'হ্যাঁ, আমাদের জানা আছে।'

রসুলুল্লাহ : 'ঈসা কি এ সবের কোনোটির উপর তাঁর সামর্থ্য রাখেন ?'

প্রতিনিধিদল : 'না।'

রসুলুল্লাহ : 'তোমরা কি জান না যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই ?'

প্রতিনিধি দল : 'হ্যাঁ জানি।'

রসুলুল্লাহ : 'তাহলে কি ঈসা এ সমস্ত বিষয় জানতেন, যা আল্লাহ জানেন ?'

প্রতিনিধি দল : 'না।'

রসুলুল্লাহ : 'এ কি তোমাদের জানা নেই যে, আমাদের প্রভু গর্ভাশয়ে ঈসার রুহ সৃষ্টি করলেন, যেমনটি তিনি চাইলেন, আর এ কথা কি জান যে, আমাদের প্রভু না আহার করেন আর না পান করেন আর না অপবিত্রতা তাঁকে স্পর্শ করে ?'

প্রতিনিধি দল : 'হ্যাঁ, আমরা জানি।'

রসুলুল্লাহ : 'একথা কি তোমাদের জানা আছে যে, ঈসার জননী গর্ভবতী হয়েছিলেন ? যেভাবে অন্য রমণীরা গর্ভবতী হন, তারপর তিনি অন্য রমণীদের ন্যায় সন্তান জন্ম দেন, তারপর দুধ খাওয়ান, যেভাবে অন্য রমণীরা খাওয়ান। তা ছাড়া তিনি পানাহার করেন এবং শৌচক্রিয়াদিও করেন ?'

প্রতিনিধিদল : 'হ্যাঁ, আমরা জানি।'

রসুলুল্লাহ : 'তাহলে তোমরা যা দাবি করছ তা কীভাবে সম্ভব ?'

প্রতিনিধি দল : 'আপনি কি ঈসার বিষয়ে একথা জানেন না যে, তিনি আল্লাহর কলিমা ছিলেন, যা তিনি মরিয়মের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন এবং তিনি তার প্রেরিত রুহ ছিলেন ?'

রসুলুল্লাহ : 'হ্যাঁ, আমি একথা স্বীকার করি।'

রসুলুল্লাহ যখন দেখলেন যে, এ সমস্ত লোক বাদ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত য়ে পড়েছে এবং ঈসাকে উপাস্য এবং আল্লাহর সমকক্ষ বলে মানতে অনড় হয়ে য়েছে তখন তিনি বললেন, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো, আবার কাল কথা বলব।

অনন্তর, আল্লাহ মুবাহিলা[১] র আয়াত অবতারণ করলেন :

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো যে, তাঁকে মাটি দিয়ে বানানো হয়েছে, তারপর তাকে বললেন : 'হয়ে যাও ! তো সে হয়ে গেল।' তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এ কথাই সত্য। অনন্তর তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এরপর তোমার কাছে জ্ঞান এসে গেছে এখন তোমরা যারা এ বিষয়ে সন্মান কারো, অনন্তর তুমি বলো : এসো ! আমরা এবং তোমরা আপনাপন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের ডেকে নাও এবং আমরা নিজেরা নিজেদের একত্রিত করি, তারপর প্রার্থনা করি যে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করুন।' – আলে ইমরান : ৫৯-৬১

সকাল হলে তিনি মুবাহিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হজরত হাসান, হজরত হুসাইন ও হজরত ফাতিমা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে নিয়ে তিনি স্বয়ং এলেন এবং নজরানের প্রতিনিধি দলের সাথে মুবাহিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন যারা দু'পক্ষই মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত কামনা করেন।

প্রতিনিধি দল যখন চূড়ান্ত ফায়সালা হিসেবে এই পরামর্শের কথা শুনল তখন তা মানতে তারা বড়ই সংকোচ বোধ করল। কে জানত যে, মুহাম্মদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মতোই একজন সাক্ষী এবং তাঁকে ঐশ্বরিক শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আমরা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি কি না ? তারপর তারা নিজেদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর কাছে কেন প্রার্থনা করবে ? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই দৌহিত্র ও তাঁর কন্যাকে দেখে তাদের প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো যে একা মিথ্যা বলার জন্য তো তিনি শুধু একাই ধ্বংস হবেন না ; বরং তাঁর সাথে তাঁর পুরো পরিবারও ধ্বংস হয়ে যাবে। অনন্তর, তারা তাদের নিজেদের পরিবার ধ্বংসেরও আশঙ্কা করতে লাগল, যদি তারা এ পরামর্শ মেনে নেয়।

তারা বলাবলি করতে লাগল : 'যদি এ ব্যক্তি সম্রাট হন তাহলে আমরা এর আক্রমণের কবল থেকে সুরক্ষিত থাকব না। কেননা, তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়ে চলেছে। এমনও হতে পারে যে, আমাদের জাতিকে তিনি অবরোধ করে ফেলতে পারেন।'

আর এই ব্যক্তি যদি প্রেরিত নবী হন তাহলে তো তাঁর কষ্টের কোনো কথাই নেই ; বরং এই মুবাহিলার পর এই পৃথিবীতে আমাদের মধ্যেকার কেউ বেঁচে থাকবে না, বলো এখন কী করা যায় ?'

---

১. মুবাহিলার অর্থ হলো আত্মপক্ষ সমর্থনে একে অন্যকে খাস দুআ বা বদদুআ করা। – অনুবাদক

তাদের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব করার জন্য শুরহবিল বিন বুদাআ তাঁর কাছে এল এবং বলল, মুবাহিলার চেয়ে ভালো একটা সমাধানের কথা আমরা চিন্তা করেছি।

তিনি বললেন : 'তা কী ?'

শুরহবিল : 'আপনিই সিদ্ধান্ত দিন, আপনার সিদ্ধান্তই উত্তম হবে।'

রসুলুল্লাহ : 'আল্লাহর পিছনে তো অন্য কোনো ব্যক্তি নেই, যে তোমাদের নিন্দা করে ?'

শুরহবিল : 'যা জিজ্ঞাসা করার আমাকে করুন।'

রসুলুল্লাহ যখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন তখন সে বলল যে, উপত্যকার লোকেরা তার পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না।

অনন্তর রসুলুল্লাহ মুবাহিলার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন এবং তার সাথে সন্ধি করে নিলেন, যার ফলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়ে গেল।

এই সন্ধিতে নিম্নলিখিত শর্তাবলি নির্ধারিত হলো :

'আল্লাহ ও তাঁর রসুল নজরানের ঈসায়ীদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

তাদের সহায় সম্পদ, তাদের ভূমি, তাদের জাতি, তাদের অধিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা, তাদের সম্প্রদায়, পরিবার-পরিজন, তাদের অনুসারী ও সহযোগীরা তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে সমস্ত কিছুই সুরক্ষিত থাকবে, তাদের পদমর্যাদায় কোনো পরিবর্তন সাধন করা হবে না, আর তাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ও ধর্মে কোনো সংশোধন আনা হবে না এবং কোনো পাদরি বা রাহিবকে পদচ্যুত বা পরিবর্তন করা হবে না, বা তাদের কম বা বেশি অনুসারীদের (উপ-অধিকারীদের) পরিবর্তন করা হবে। ইসলামে পূর্বেকার কোনো রক্তপাতের দাবি করা যাবে না এবং তাদের জিহাদে পাঠানো হবে না, তাদের জাকাত দিতে হবে না এবং তাদের ভূভাগে কোনো সেনা প্রবেশ করবে না।

কোনো ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে কোনো অধিকার প্রাপ্তির দাবি করলে তখন অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে।

যে ব্যক্তি সুদ খাবে সে আমাদের দায়িত্বের বাইরে থাকবে এমন ব্যক্তিকে অন্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হবে।

এই সন্ধিপত্র আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অধিকারে থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তারা আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত বিনা অত্যাচার উপদেশ এবং সংস্কারকর্ম করে যেতে পারবে।'

এই সন্ধিপত্রে সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর করলেন আবু সুফিয়ান বিন হরব, গিলান বিন আমর, মালিক বিন আউফ, আকরা বিন হাবিস ও মুগিরা বিন শওবা।

এই সমস্ত অধিকারের জওয়াবে ঈসায়ীদের উপর কতটুকু জিম্মাদারি বর্তাল ? কেবল বছরে ২ হাজার হুল্লা তাদের দিতে হবে। এ ছিল ঐ জাকাতের সাধারণ একটা বদলা, মুসলমানরা যা একলা আদায় করত, আর এ ছিল জিহাদ না করার বদলা, যা মুসলমানরা একাই করত।

এ ছিল সেই বস্তু যা নজরানের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো।

এর দ্বারা ইসলাম সেই ঈসায়ী আরব ও রোম সম্প্রদায়ের সাথে এক ভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করল, যাদের দিক থেকে মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছিল। সেখানে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল এবং সর্বপ্রকারে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমরা এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রশ্ন করতে চাই যে, মসিহী সম্প্রদায় কি একে অন্যের প্রতি এতটা উদারতার প্রমাণ দিয়েছে ? না কি এ সেই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কেবল ইসলাম বিগত শতাব্দীগুলোর অন্ধকার বিদূরিত করেছে ?

আমরা আবারো প্রশ্ন করছি যে, কিতাবধারীরা কি তাদের দায়িত্বশীলতার প্রতি সুবিচার করেছে ? আর তারা কি সেই ধর্মের সাথে ন্যায়াচার করেছে, যারা তাদের অধিকারের জামানত নিয়েছিলেন ?

মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে তবলিগ করতে করতে ইসলামের দশম বর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে দক্ষিণের কিছু গোত্র তাদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিল। তাদের বিচারে কুরাইশদের কয়েক ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করে সম্রাট হয়ে বসে আছে। অতএব, তারাও স্বপ্ন দেখতে লাগল, যেভাবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ শাসনব্যবস্থা লাভ করেছেন তারাও তা লাভ করবে।

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের ঈসায়ীরা তাদের উত্তেজিত করতে ও মদদ দিতে আগ্রণী ভূমিকা পালন করল এবং নজরানের ঈসায়ীরা আসওয়াদ গসির সাথে পত্র ব্যবহার করে তাকে নবী হওয়ার জন্য উস্কানি দিতে লাগল। তারপর সে তাদের কাছে গেল এবং সেখান থেকে ইয়েমেন চলে গেল, সেখানে সে তার শাসন কায়েম করল কিন্তু তার স্ত্রী তাকে সেখানে হত্যা করল এবং দুনিয়াবাসীকে তার কুকর্মের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে দিল।

এ সমস্ত ফিতনা কি দক্ষিণ আরবের ঈসায়ীদের ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত পরিণাম ছিল না ? না কি ইসলামের প্রতি ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষের প্রকাশ ছিল না ? আসওয়াদ গসির সমর্থনে নজরানী ঈসায়ীরা যে কুকীর্তি করল, তাই নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলামা বিন কাজ্জাবের সমর্থনে করল এবং একই কুকীর্তি তগলবের ঈসায়ীরাও করল। তগলব ও নজরানের ঈসায়ীদের ইসলামে প্রবেশ না করা এবং তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে অটল থাকার রহস্য তো বোঝাই যায় কিন্তু একথা বোধগম্য হয় না যে, এক ব্যক্তি অহির মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে, কিন্তু একটি হাস্যকর ঘটনায় মদদ দেয়।

যদি তারা আসওয়াদ ও মুসাইলামার প্রতি ঈমান আনত তাহলে তো পরিস্থিতি একরকম হতো কিন্তু যদি বিষয়টি হয় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তা করা এবং এদের সাথে যদি সহযোগী সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় তাহলে তো যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার চিকিৎসা তো কেবলমাত্র মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব।

সপ্তম অধ্যায়

রসুলুল্লাহর পবিত্র পত্নীগণ
রাজনৈতিক স্থিরতা
বিদায় হজ
মদিনায় প্রত্যাবর্তন

এক

রসুলুল্লাহর পবিত্র পত্নীগণ

কিছু লেখক বহুবিবাহ বিষয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করেছেন এবং ইসলাম প্রদত্ত সংখ্যা সীমিত করার বা রোখার চেষ্টা করেছেন। কখনো বা বলা হয় ইসলামে বাস্তবিকই বহুবিবাহের কোনো অনুমতি দেয়া হয়নি। কখনো বা এ যুক্তিও দেয়া হয় যে, জীবনক্ষেত্রে নয়া নয়া পরিবর্তন ও সামগ্রিক হিতের জন্য এক পত্নীর দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। অতএব দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বিয়ের কামনা না করাই ভালো। কেননা, একই পত্নী হতে আনন্দিত হওয়া এবং তা থেকেই সন্তানোৎপাদন ও তা থেকেই শিক্ষাদীক্ষা করানোই যথেষ্ট।

নিঃসন্দেহে আমাদের সমাজে এই চিন্তাধারার জনক সেই কারক, যে সংবেদন শক্তি ও দোষত্রুটির ভ্রান্তি প্রমাণ করার শক্তি হ্রাসের শিকার। কয়েক বছর ধরে বহুবিবাহ রোধকল্পে আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু ওলামা সমাজের বিরোধ, অসন্তুষ্টি ও ইসলামী ধ্যান-ধারণার অনুসারীদের প্রতিক্রিয়ায় সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সে সময় আমি বহুবিবাহ বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম এখানে তার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। কেননা, বিচারাধীন বিষয়ের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে।

মানবজীবনের সাথে এমন কিছু অকাট্য নাগরিক সম্পর্ক ও আর্থিক সিদ্ধান্ত রয়েছে, যা সমস্ত মানবতার উপর সততই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। মানুষ তা জেনে নিয়ে তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে অথবা তার মধ্যেকার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এক ব্যক্তির কয়েকজন পত্নীর সাথে সম্পর্কও ঐ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যাতে সামগ্রিক ও সামাজিক বিষয়টিও এলোমেলো হয়ে পড়ে এবং তার অজান্তে এর মোকাবিলাও অসাধ্য হয়ে ওঠে।

এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, নারী ও পুরুষের সংখ্যার অনুপাত হয় সমান হবে নতুবা এর কোনোটার সংখ্যা বেড়ে যাবে। যদি অনুপাত সমান হয় অথবা নারীর সংখ্যা অনুপাতে কম হয় তাহলে বহুপত্নী প্রথা স্বতঃই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ

প্রকৃতি স্বয়ং তার ন্যায়সঙ্গত বিতরণ বাধ্য করে দেবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তা সে চাক বা না চাক একই পত্নীতে সন্তুষ্ট হবে।

কিন্তু যদি নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় দ্রুত বেড়ে ওঠে তাহলে নিম্নলিখিত নারীদের সম্পর্কে আমাদের যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

হয় কিছু নারীকে আজীবন অবিবাহিত থাকতে হবে অথবা রক্ষিতাবৃত্তি বা দাসীবৃত্তির অনুমতি দিতে হবে এবং ব্যভিচারের অনুমতি দিতে হবে। নতুবা বহুবিবাহের অনুমতি দিতে হবে।

আমাদের বিবেচনায় পুরুষের তুলনায় নারীরাই অভাবের জীবনকে বেশি ঘৃণা করে এবং জুলুম-অপরাধ-অবজ্ঞা ও অসম্মানের বিছানায় যাওয়া পছন্দ করে না। অতএব, তার সামনে একটাই পথ খোলা থাকে যে, সে অন্য কোনো মহিলার সাথে স্বেচ্ছায় ঐ পুরুষের স্ত্রী হয়ে যাবে এবং তার সন্তানাদির সম্পর্ক ঐ পুরুষের সাথে হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় বহুবিবাহকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, যার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে।

আরো একটা সমস্যা আছে, তা হলো পুরুষের কাম-বাসনার মধ্যে ব্যাপক প্রভেদ লক্ষ করা যায়। অনেক পুরুষ যতটা হৃষ্টপুষ্ট, সুস্বাস্থ্য, বিলাসিতা প্রিয়, সমৃদ্ধিশালী ও ধনবান হয় ততটা আবার অন্য অনেক পুরুষ হয় না। এই রকমই কোনো ব্যক্তি যুবাবস্থার প্রারম্ভেই শীতল এবং নিরাবেগ হয়ে যায় আবার কেউ বা অত্যন্ত শক্তিশালী ও তীব্র আবেগশালী হয়, এই দুই ব্যক্তি কীভাবে সমান হতে পারে ? এ কি অন্যায় কথা নয় ? আমরা একজন সুস্বাস্থ্য ব্যক্তিকে যতটা আহার দিই ততটা আহার কি একজন রুগ্ন ব্যক্তিকে দিই ?

বহুবিবাহের অবস্থাও তাই।

আরো একটি সমস্যাও আছে তা হলো কোনো কোনো স্ত্রী অসুস্থ কিংবা চিররোগী হয়ে পড়ে, বন্ধ্যা হয় অথবা দীর্ঘায়ু হয়। এমতাবস্থায় এ সমস্ত অসমর্থতার কারণে কি পরিত্যাগ করা যায় ? প্রথমা স্ত্রীর হক হলো যে, সে তার স্বামীর তত্ত্বাবধানে থাকবে, আর সেই সাথে আরেক স্ত্রীও এসে গেলে তাঁর প্রতি পুরোপুরি দায়িত্ব ও কর্তব্য তাকে পালন করে যেতে হবে।

ইসলাম তার যুক্তিতর্কের জোরে বহুবিবাহকে বৈধ বলে স্বীকার করে নিলেও পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতাকে সে কঠোরভাবে বিরোধিতা করে।

লাভের তুলনায় কিছু প্রতিবন্ধকতা, কিছু অধিকারের সাথে কিছু কর্তব্যও থাকে। অতএব, বহুবিবাহের সময়ে ন্যায় ও সমতার মনোভাব রাখাও অনিবার্য। কিন্তু ব্যক্তি যদি নিজের উপর, নিজের সন্তানাদির উপর এবং নিজের পত্নীদের উপর জুলুম করে তাহলে এমতাবস্থায় বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। কেননা একজন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছিত ভরণপোষণেও অক্ষম অথচ সে আবার কয়েকটি বিবাহও করবে ?

শরিয়তের বিধান-নির্মাতা যেখানে ভরণপোষণের বাধ্যবাধকতা নির্দিষ্ট ও বিশ্বস্ত করে দিয়েছেন, সেখানে একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে এর বিচার আরো অধিক বিস্তৃত।

শরিয়ত অবিবাহিত যুবকদের সেই পর্যন্ত রোজা রাখার উপদেশ দেয়, যতদিন পর্যন্ত না সে বিয়ে করতে সক্ষম হয় এবং সতী নারীকে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার সৎভাবে জীবন অতিবাহিত করার উপদেশ দান করে :

'আর যার বিয়ে করার সুযোগ লাভ না হয় তার উচিত নিজেকে রক্ষা করে চলা, সংযমী জীবন অতিবাহিত করা এমনকি আল্লাহ তার অনুগ্রহে তা সম্পন্ন করে না দেয়া পর্যন্ত।' – আন নূর : ৩৩

এখন চিন্তা করুন, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে তাগিদের কী দশা হবে যে এক পত্নী রাখে ? সে অধিক ধৈর্য ধারণের পাত্র এবং সতীত্ব ও সংযমের অধিক অধিকারী।

সাধারণত, অধিক পত্নীর কারণে সন্তানও অধিক হয়ে থাকে এবং ইসলাম প্রশিক্ষণ, সম্মান তথা জীবনে সাধনের ক্ষেত্রে সন্তানদের সাথে ন্যায় ও সততার মনোভাব রাখাকে অনিবার্য করে দেয়, চাই তাদের মায়েরা এক বা একাধিক হোক। হাদিসে আছে :

'সেই ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত, যে তার সন্তানদের অবজ্ঞার পাত্র করে তোলে।'

অধিক সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো অত্যধিক কামবাসনা থেকে নিজেকে সংযত রাখা।

এভাবে ইসলাম পত্নীদের ব্যাপারে ন্যায় ও সমতাকে অনিবার্য করে দেয়।

যদিও আন্তরিক কামনা বাসনাকে অবদমিত রাখা মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার, তা সত্ত্বেও এমন ব্যবহার ও কর্ম আছে, যাতে পতি শরিয়তের সীমার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে পারে এবং নিজের অধিকারকে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে পরখ করতে পারে এবং পরিবার-পরিজনের বিষয়ে শরিয়তের বিধান মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

'আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যে, সে তাদের রক্ষা করেছে না বিনষ্ট করেছে।' – নাসাঈ, ইবনে হিশাম

অন্য এক হাদিসে আছে :

'মানুষের অপরাধী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার অধীনস্তদের ক্ষতি বা সর্বনাশ সাধন করে।'– আবু দাউদ

এ হলো সেই ন্যায় ও সমতার সীমারেখা, আল্লাহ যার শর্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ রাখে যে দুই-তিন অথবা চার পত্নী রাখতে পারে, নইলে সে যেন এক পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকে।

'আর যদি তুমি এ আশঙ্কা রাখো যে, তাদের প্রতি সম ব্যবহার রাখতে সমর্থ হবে না, তাহলে এক পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকো।' – আন নিসা : ৩

আমি বহুপত্নী বিষয়ে কয়েক সাংবাদিকের বিতর্ক পড়েছি যাদের কথা হলো, পুরুষ যদি একাধিক পত্নী রাখতে পারে তাহলে স্ত্রীও তো একাধিক পতি রাখতে পারে।

আমি এই বিতর্কিত ও আপত্তিকারীদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম এরা সর্বনিকৃষ্ট ও দুশ্চরিত্র প্রকৃতির লোক এবং এদের নেতারাও। আশ্চর্যের কথা হলো এরা ব্যভিচার ও দুষ্কর্মের জগতের লোক এবং এরা সতীত্ব এবং সংযমের ভিত্তিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনব্যবস্থাকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করে।

এই রুগ্ন বিকারগ্রস্ত বিতার্কিকদের কথার জবাব হলো যে, এই যৌন সম্পর্কের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হলো পরিবার পরিনির্মাণ– যার অর্থ হলো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন বাতাবরণে সন্তানদের পালন পোষণ। এমতাবস্থায় কোনো স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয় যে তার কাছে সদাসর্বদাই কামবাসনা নিবৃত্ত করার জন্য কামার্ত লোকের ভিড় লেগে থাকবে এবং সে সকলের কামবাসনা নিবৃত্তির একটি সাধনে পরিণত হবে এবং এও জানা বা বোঝা সম্ভব হবে না যে, সদ্যজাত শিশুটির প্রকৃত পিতা কে ? এবং এও একটি বিচারযোগ্য বিষয় যে, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে মহিলাটির কী দুষ্পরিণাম ভুগতে হবে।

এ কথা তো যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য যে, একটি যন্ত্রশকট[১] চারটি পতিকে টেনে নিয়ে যাবে কিন্তু একথা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় যে, একটি গাড়ি চারটি যন্ত্রশকটকে নিয়ে যাবে। 'পুরুষ স্ত্রীদের মস্তকস্বরূপ'-এ বাস্তবতার বিরোধিতা হলো প্রাকৃতিক নিয়মাবলির সরাসরি লংঘন।

এ বাস্তবিকতা বড়ই দুঃখজনক যে, লোকেরা এর সীমারেখার বিচার করে না এবং ন্যায় ও সমতার অর্থ না বুঝে বহুপত্নী বিবাহ করে বসে ; বরং কেবলমাত্র কামনাবাসনা চরিতার্থ করার জন্য কয়েকটি বিয়ে করে বসে, তা সে প্রকাশ্য জুলুম বা অত্যাচার হোক না কেন।

প্রায়শই লোকেরা আর্থিক ভার বহন করে উঠতে পারে না, কিন্তু বিয়ে করে বসে। এক পত্নীর ভরণপোষণ পাহাড় সমান বোঝা হয়ে ওঠে তা সত্ত্বেও সে দ্বিতীয় বিয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

---

১. ইঞ্জিন (Engine)-এ গ্রন্থে ইয়োরোপীয় বা বিদেশীয় শব্দাবলির পরিবর্তে স্বদেশীয় যা বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি ইঞ্জিন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপ এখানে 'যন্ত্রশকট' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। – অনুবাদক

সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারে না, প্রবৃত্তির তাড়নার কারণে সহায়-সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত ও সমবণ্টন করতে পারে না, আবার অন্য দিকে দ্বিতীয় বিয়ের চক্করে পড়ে যায় এবং প্রথমকে অসহায়ভাবে ত্যাগ করে তাকে দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়।

প্রায়শ এমনও হয় যে ব্যক্তি চার পত্নী রাখে এবং তাদের নবজাত সন্তানের ভরণপোষণেরও সামর্থ্য রাখে, তা সত্ত্বেও তার যৌনকামনা নিবৃত্ত হয় না এবং অধঃপাতে যায়। তো এই প্রবৃত্তি ও তাড়নার চিকিৎসা কী ?

বহুপত্নী বিয়ে রদ করে দিলে কি জাতি এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারবে ?

কখনোই নয় ! একটি স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুকে নিষিদ্ধ করতে ইসলামী শরিয়ত কখনোই অনুমতি দিতে পারে না।

যদি বহুবিবাহের দৃষ্টিভঙ্গিটা ইসলামে নাও থাকত তাহলে আমি নিজেও এ বিষয়ে আমার সমর্থনকে অব্যাহত রাখতাম অর্থাৎ এর স্বতঃস্ফূর্ততাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হতাম, যাতে এই কল্যাণময় বিধিটি সুরক্ষিত থাকতে পারে, যার উল্লেখ আমি অবশ্যই করেছি।

কিন্তু একটি সিদ্ধান্তকে স্বীকার ও গ্রহণ করা এক বস্তু আর তা কাজে পরিণত করা আরেক বস্তু।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি সমাজ সংস্কারই অভিপ্রেত হয় তাহলে বিশেষজ্ঞদের ন্যায় ও সাধন প্রাপ্তির চিন্তাভাবনা করা উচিত, যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু যদি তারা বহুবিবাহকে নিজেদের আপত্তির নিশানা বানিয়ে বসেন এবং তাকে চপেটাঘাত করেন তাহলে এ এক অনর্থক কাজ হবে।

আমি একথা বলার সাহস রাখি যে, এ হলো ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় আক্রমণের একটি অস্ত্র।

হজরত নূহ (আ)-এর যুগ থেকেই প্রতিটি দ্বীন-ধর্মে বহুবিবাহ প্রথাকে জায়েজ বা বৈধ বলে অভিহিত করা হচ্ছে, কিন্তু ঈসাইয়াত[১] তা মানতে প্রস্তুত নয়। এরা বহু পত্নীকে হারাম বা অবৈধ বলে জ্ঞান করে।[২] এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক পত্নীতে বাধ্য করে। এরপরে তারা সমাজকে এই অধিকার দেয় যে, তারা

---

১. পবিত্র কুরআনে যাকে ঈসা বলা হয়েছে বর্তমান দুনিয়া তাকেই যিশুখ্রিষ্ট বলে। কিন্তু মুসলমানদের কাছে তিনি ঈসা নামেই পরিচিত। এখানে খ্রিষ্টচক্র বলা যেতে পারে। –অনুবাদক

২. আমাদের বিশ্বাস যে, বহুবিবাহের বিধান আল্লাহ সমস্ত ধর্মেই দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ঈসাইয়াতও রয়েছে। এর বিপরীতে মনগড়া কোনো বিধিবিধান বা রীতিনীতি প্রথাকে আমরা কোনো গুরুত্ব দিই না। – লেখক

অন্য সুযোগ-সুবিধা প্রয়োগ করুক, অন্য মহিলার প্রতি আসক্তি প্রয়োগ করুক এবং লোকদের মনে অশান্তি ও আবেগ সৃষ্টি করুক।

আধুনিক যুগে অধিকাংশ শ্রেণী সমাজে বহুবিবাহকে খারাপ বলে মনে করা হয় এবং ব্যভিচারকে একটি সামান্য পদস্খলন ও সাধারণ অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়। কী উদ্বেগজনক ব্যাপার ? পুরো দ্বীন পুরো নৈতিকতা একটা বিপজ্জনক আবর্তে পতিত। আইনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে এই সংঘটিত চক্রান্ত চলছে, যাতে পুরো সমাজ এই ঘৃণ্য আবর্তের মধ্যে এসে যায়।

নবীদের মধ্যে কেউ এক বিয়ে করেছেন আবার কেউ বা একাধিক বিয়েও করেছেন কিন্তু তাদের সংযমে কোনো কুপ্রভাব পড়েনি। প্রাচীন সংহিতার বর্তমান গ্রন্থাবলিতে এমন সব উদাহরণ পাওয়া যায়, যা থেকে একথা প্রমাণিত হয়। ইসলাম রাহিবদের ন্যায় স্ত্রী সংসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাকে ইবাদত বলে বিবেচনা করে না আর ঈসাইয়াতের ন্যায় চার পত্নী রাখাকে পাপ বলে অভিহিত করে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছা তাকে বা যত্রতত্র কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আবার তা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অবদমিত রাখাও পাপ, যাতে সে ধীরে ধীরে আপন পথটি নিজেই খুঁজে নেয়, যেভাবে পানি তার প্রবাহের পথ খুঁজে নেয়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সুরক্ষিত ও পবিত্র জীবনী (সিরাত) একথাই বলে যে, তিনি ২৫ বছর বয়সে হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন, সে সময় খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। হজরত খাদিজার ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেননি।

হজরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালের সময় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স হয়েছিল ৫০ বছরের বেশি।

তাঁর কট্টর হতেও কট্টরতম শত্রুও তাঁর চরিত্রে কাদা ছোড়ার মতো কোনো প্রকারের দুঃসাহস দেখাতে পারেনি।

মানবজীবনের এই প্রফুল্লিত, আনন্দিত ও যৌবনদীপ্ত পর্যায়ে তাঁর মস্তক হতে শিষ্টতা ও সততার আলোক বিচ্ছুরিত হতো। তিনি যদি দ্বিতীয় পত্নীও গ্রহণ করতেন তাহলে শরিয়ত, বুদ্ধিবৃত্তি, রীতি-রেওয়াজ কোনো দিক থেকেই প্রতিবন্ধকতা ছিল না। কেননা, বিবাহ আরব সমাজের একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রথা ছিল এবং নবীদের পিতা হজরত ইব্রাহিম (আ)-এর শরিয়তে তা সিদ্ধ ছিল, কিন্তু তিনি এক পত্নীই পর্যাপ্ত বলে বিবেচনা করেন এবং তা থেকেই তিনি শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করেন, যদিও খাজিদা রাজিয়াল্লাহু আনহা বয়সে যথেষ্ট বড় ছিলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী ছিলেন।

হজরত খাদিজার জান্নাত প্রাপ্তির পর তিনি বিয়ে করতে চাইলে জীবনসাথি নির্বাচনের ক্ষেত্রে রূপ-সৌন্দর্যের বিবেচনা করেননি, যদিও তাঁর শিষ্টতা ও নৈতিক চরিত্রে সামান্যতম বিচ্যুতিও ছিল না ; বরং তিনি এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের কথাই বিবেচনা করলেন, যাঁরা তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাথি ছিলেন এবং যাঁরা তাঁর বার্তাকে শক্তিশালী করে তোলেন, তাঁদের সাথে তিনি সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ও সুদৃঢ় করে তোলার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিলেন।

অতএব, কমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা আয়েশা ও উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হাফসা–যারা প্রচলিত অর্থে সুন্দরী ছিলেন না তাঁদের নির্বাচিত করলেন।

তারপর হজরত উম্মে সালমা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করলেন, যিনি তাঁর একজন বিশিষ্ট সাথির বিধবা স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি হাবশা ও মদিনায় হিজরত করার পথে তাঁর পূর্ব স্বামীকে সহযোগিতা করেছিলেন।

হজরত সওদা রাজিয়াল্লাহু আনহার সাথে তিনি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন যার বয়োবৃদ্ধির কারণে পুরুষাসক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এই চার পত্নীর সাথে তাঁর জীবনপাত ও সহবাস কোনো উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ তা আনন্দ-সুখ লাভ বা দুনিয়ার প্রতি কোনো মোহের কারণে ছিল না এবং যদি এ অসম্ভাব্যতাকে মেনেও নেয়া হয় তা সত্ত্বেও এতে রসুলুল্লাহর জন্য কোনো গুনাহের কাজ ছিল না। কেননা, প্রত্যেক মুসলমানের চার পত্নী রাখার স্বাধীনতা ছিল আর রসুলুল্লাহর জীবন তো ছিল ন্যায়, সমতা ও সরলাচারের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতবাসী হলেন তখন তো তাঁর নয় পত্নী বর্তমান ছিলেন। অতএব, এ কেমনভাবে উচিতসঙ্গত হবে যে তিনি এতজন পত্নী রেখে গেলেন সেখানে অন্যের জন্য তা নিষিদ্ধ ছিল ?

সংখ্যাবৃদ্ধি কি কামবাসনা চরিতার্থের নিমিত্তে ছিল না ? অথবা এর পিছনে আনন্দ লাভের প্রেরণা কার্যশীল ছিল না ?

এর উত্তরে আমরা বলব যে, নিরন্তর সংগ্রাম ও প্রাণান্তকর জিহাদ যে ব্যক্তিকে একদিনের জন্যও শান্তিতে জীবনাতিবাহিত করার অবসর দেয়নি তাঁর ভোগ-বিলাসে জীবন কাটানোর সময়-সুযোগ কোথা থেকে বেরিয়ে এল ?

সীমিত ক্ষেত্রের মানবহিতৈষীদের জীবনের নানা চিন্তা ও সমস্যাবলি তাদের ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত করে তোলে এবং এক মুহূর্তের জন্যও তারা শান্তি ও স্বস্তি পায় না, যাতে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পূর্ণশক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারে। সাধারণ ও জননেতাদের যেখানে এই কথা, সেখানে রিসালাতের আহ্বায়ক ও আমির-এর কী দশা হবে ? অর্থাৎ এই পথে তাঁকে যা কিছু সইতে হয়েছে তাঁর সাথে আপনি ভালোমতই পরিচিত।

আমরা এর জবাবি প্রশ্নও করব যে, যে ব্যক্তি তাঁর যুবাবস্থায় অনন্দ-আহলাদ, বিলাসিতা ও কামবাসনা থেকে দূরে অবস্থান করে জীবন অতিবাহিত করেছেন, এখন তিনি বৃদ্ধাবস্থায় তাতে কীভাবে পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে যাবেন ?

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্য পাঁচ মহিলার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পরিস্থিতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিচার করলে অবগত হওয়া যাবে যে, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের প্রতি রাজনৈতিক বিবেক বা প্রজ্ঞান সকলে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং অমঙ্গল ও অহিতের মূলোৎপাটনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাপনের জন্য তাঁকে এই বিয়েগুলো করতে হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ হজরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাজিয়াল্লাহু আনহার সাথে তাঁর বিয়ের কথাই ধরি। এ বিয়ে রসুলুল্লাহর জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল। আল্লাহ তাঁকে আরবদের মধ্যে প্রচলিত একটা ভ্রান্ত রীতি উৎপাটনের আদেশ দিলেন এবং তিনি তা পালন করলেন, যদিও তাঁকে কঠিন পরিস্থিতি, লজ্জা ও গ্লানির মোকাবিলা করতে হলো।

হজরত জয়নব রসুলুল্লাহর আত্মীয়া ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি তাঁর সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি হজরত জায়েদ বিন সাবিতকে তাঁর সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তিনি অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেন, এমনকি তাঁর ভাইও তাতে রাজি হননি। কেননা, হজরত জয়নব উচ্চকুলশীলা ছিলেন, তাঁর সম্পর্ক ছিল কুরাইশ গোত্রের সাথে কিন্তু জায়েদের হজরতের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

যদিও তিনি ক্রীতদাস ছিলেন তা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর বংশের মধ্যে একীভূত করে নেয়ার উদাহরণ ও সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং লোকে তাকে জায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে অভিহিত করতে লাগল।

এদিকে জয়নব চিন্তা করলেন, রসুলুল্লাহর আদেশ পালন করা অনিবার্য। তিনি তাঁর বংশ তথা খানদানের গৌরব বৃদ্ধির জন্য জায়েদের সাথে আমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছেন। একথা ভেবে তিনি তাঁর অপ্রসন্নতাকে আড়াল করে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথবা বলা যেতে পারে যে, তাঁর ভাইকে একথায় রাজি করানোর চেষ্টা করা হলে তিনি তা বুঝে নিলেন। কেননা, আল্লাহতায়ালার এ আদেশ অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল :

'আর না কোনো ঈমানদার পুরুষ ও না কোনো ঈমানদার স্ত্রীর এ অধিকার আছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেবে, তা সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব ব্যাপারে কিছু অধিকার আছে, আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুল অবমাননা করলে সে প্রকাশ্যে বিপথগামী হয়ে গেল।' – আল আহযাব : ৩৬

বিয়ের পর যখন হজরত জায়েদ জয়নবের কাছে এলেন তখন তিনি দেখলেন যে, তিনি তাঁকে মন দিয়ে চাচ্ছেন না, যদিও দেহ সমর্পণ করছেন কিন্তু প্রেম তথা মর্যাদার অভাব ছিল। অনন্তর তাঁর পৌরুষ আহত ও বিক্ষুব্ধ হলো এবং তিনি বুঝে

নিলেন যে, তাঁর সাথে জীবন নির্বাহ হবে না। রসুলুল্লাহ দফায় দফায় তাকে শুধরানোর এবং নির্বাহ করানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁর নবীকে অহি মারফত জায়েদকে তালাক দেয়ানোর আদেশ দিয়ে ইদ্দত পুরো হওয়ার পরে তাঁকে স্বয়ং বিয়ে করে নিতে বললেন। এই জটিল বিষয়টি নিয়ে রসুলুল্লাহ বড় দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। নানা রকমের আশঙ্কা তাঁর মনে জেগে উঠতে লাগল ; কিন্তু তাঁর পরিণামের আশঙ্কা তার মধ্যে গোপন রেখে দিলেন যে, লোকে বলবে এই ব্যক্তি তার আপন পুত্রের স্ত্রীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন যদিও তাঁর জন্য তা বৈধ নয়।

পরন্তু, আল্লাহর অভিপ্রেত লোকদের অভিযোগের আশঙ্কা তথা এই অনুচিত ও অযৌক্তিক প্রথাকে উৎপাটিত করা। অতএব, নিন্দুকদের নিন্দার ভয়কে উপেক্ষা করে রসুলুল্লাহকে দিয়ে এই আদেশ কার্যকর করা আবশ্যক ছিল।

আল্লাহর এই আদেশ কার্যকর করতে রসুলুল্লাহ কিছুটা টালবাহানা করলেন। কদাচিৎ আল্লাহ এই উদ্বেগ ও আশঙ্কাজনক অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে দেন ! বরং তিনি এ ছাড়া অন্য প্রয়াসও চালালেন। অনন্তর যখন হজরত জায়েদ তাঁর স্ত্রী জয়নবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তিনি তালাকের সংকল্প করলেন তখন রসুলুল্লাহ তাকে বললেন : 'নিজের পত্নীকে বিরত রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো।'

ঐ সময়ে অহি অবতীর্ণ হলো এবং এ বিলম্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও ভর্ৎসনা করা হলো। আর বলা হলো যে, জায়েদকে তালাক দিতে দাও এবং নিজে বিয়ে করো তা সে লোকে যত নিন্দাই করুক না কেন যে, তুমি পুত্রবধূর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছ এবং তোমার নবুয়তের দাবি ভ্রান্ত। আরবরা সেই সময়ে হক বা প্রকৃত সত্য অবগত হয়ে যাবে এবং তারা এই অনুচিত প্রথা থেকে বিরত হয়ে যাবে। রসুলুল্লাহর কর্ম ও সাধনা কুফর ও অজ্ঞানতার চিহ্ন উৎপাটনে অগ্রগামী হওয়া উচিত।

এ হলো সেই বৃত্তান্ত, যা কুরআন শরিফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

'এবং (হে নবী !) স্মরণ করো যখন তুমি ঐ ব্যক্তিকে বলছিলে যার উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তুমিও যাঁর উপর অনুগ্রহ করেছিলে ; আপনার পত্নীকে আপনার কাছে রেখে দাও (তাকে পরিত্যাগ কোরো না) এবং আল্লাহকে ভয় করো এবং তুমি তোমার মধ্যে ঐ কথা গোপন রেখেছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তুমি লোকভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলে যদিও আল্লাহ তোমার প্রতি এই হক রাখেন, যে তুমি তাঁকেই ভয় করো। তারপর তাঁর উপর জায়েদের যখন আর কোনো কর্তৃত্ব রইল না তখন আমি তোমাকে ওর স্ত্রীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম, যাতে মুমিনদের উপর মৌখিক বা পালিত পুত্রের পত্নীর ব্যাপারে আর

কোনো সন্দেহ বা আশঙ্কা না থাকে, যখন তার স্ত্রীর উপর আল্লাহর আদেশই পুরো হয়ে থাকে।' – আল আহজাব : ৩৭

এই বৃত্তান্তের একটা বিচিত্র ব্যাপার হলো এই যে, মূর্খরা এতে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ ও সস্তা প্রেমের এক মুখরোচক চর্চায় পরিণত করল এবং বলতে লাগল যে, জয়নবের সাথে রসুলুল্লাহর প্রেম জন্মে গিয়েছিল, যা তিনি নিজের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন। যখন ঘটনা জানাজানি হয়ে গেল তখন বিচ্ছেদের পর্বটি সমাপ্ত হওয়ার পর বিয়ে করে নিয়েছেন। অতএব, আয়াতের প্রারম্ভে এই প্রেমভাবনাকে খণ্ডন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

আমরা এই ভয়ানক ভ্রান্তি ও সত্যকে অসত্যের সাথে মিলিত করার প্রয়াসে বড়ই আশ্চর্য হই।

তাহলে প্রারম্ভেই জয়নবের সাথে বিয়ে করা থেকে কে তাঁকে বিরত রেখেছিল ? যেখানে তিনি তাঁর ফুফুতো বোন হতেন এবং তিনি নিজেই এমন এক ব্যক্তির সাথে বিয়েতে রাজি করিয়েছিলেন যাঁর প্রতি তাঁর সামান্যতম রুচিও ছিল না এবং এই বিয়েকে স্থায়ী করানোর জন্য তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন !

তিনি কি তাঁর প্রতি কখনোই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, যখন তিনি তাকে সত্যের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন ?

আসুন এবার আমরা এই আয়াতের প্রতিও গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করি বা এতে বর্ণিত মলামাত বা নিন্দাকে বোঝার চেষ্টা করি। নিন্দুকেরা বলে, যে বস্তু বা আকাঙ্ক্ষা তিনি তাঁর মধ্যে গোপন রেখেছিলেন এবং যে বিষয়ে আল্লাহর স্থানে লোকনিন্দার ভয় করছিলেন তখন জয়নবের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল। অর্থাৎ তাদের বিচারে আল্লাহ এই জন্যই তাঁর নিন্দা করেন যে, তার এই অবদমিত আসক্তি তিনি প্রকাশ করেননি কেন ?

আমরা প্রশ্ন করি এরই নাম কি নৈতিকতা, যে যখন কোনো মহিলাকে ভালোবাসে তখন সে তা ঘোষণা করে বেড়ায় ? আর বিশেষরূপে অন্যের স্ত্রীর সাথে যে প্রেম করে ?

আল্লাহ কি এমন ব্যক্তিকে এই কারণেই নিন্দা করবেন যে, অন্যের স্ত্রীর সাথে প্রেমও করে আবার গোপনও রাখে। আর সে যদি নিজের প্রেম বিষয়ে স্তুতি কাব্য রচনা করে তাহলে সে কি উচ্চমান বা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলে বিবেচিত হবে ?

আল্লাহর কসম, এ তো সীমাহীন ধৃষ্টতা, অপদার্থতা ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয়।

এরকম কিছু হীনমানসিকতাসম্পন্ন অপকৃষ্ট শ্রেণীর লোক পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। আল্লাহতা'লা কোনো ব্যক্তিকে প্রেম গোপন করার জন্য নিন্দা করতে পারেন না। এখানে এটাই প্রকৃত অবস্থা, যা আমরা প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি।

রসুলুল্লাহ যা আপনার মধ্যে গোপন রেখেছিলেন তা এই বিবাহের পরিণামস্বরূপ উৎপন্ন অবস্থা, আল্লাহর আদেশ কার্যকারিতায় বিলম্ব এবং পুত্র বানানোর আরবদের এই রীতিনীতি প্রথার অবলুপ্তি থেকে উৎপন্ন হাঙ্গামা ও অশান্তিকর পরিস্থিতির ভয় ছিল।

আল্লাহ তাঁর নবীকে বোঝালেন যে, এই আদেশ কার্যকর করতে কোনোরকম চিন্তা বা আশঙ্কার কারণে বিলম্ব করা উচিত হবে না এবং কষ্ট ও দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও তা শোনা ও পালন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদেরও ঠিক এই অবস্থা ছিল।

আয়াতের শেষাংশের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলে দেখতে পাবেন তাতে বলা হয়েছে যে : 'আল্লাহর আদেশ পুরো হয়ে থাকে- অর্থাৎ যে কোনো পরিস্থিতিতেই আল্লাহর আদেশ কার্যকর হবেই।'

তার পরের আয়াতগুলো এর অর্থকে আরো অধিক স্পষ্ট করে দেয় :

'নবীর পক্ষে এমন কাজে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, যা আল্লাহ তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহর এই নিয়ম সে সমস্ত নবীর ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছে, যাঁরা পূর্বেই গত হয়েছেন এবং আল্লাহর আদেশ বুঝে-শুনেই নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। (এ নিয়ম ঐ সমস্ত লোকের জন্য) যারা আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেন এবং তাঁকে ভয় করেন এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করেন এবং আল্লাহ হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট।' –আল আহযাব : ৩৮-৩৯

আপনি যদি কারো মনে সাহস সৃষ্টি করতে চান তাহলে তাঁকে বলবেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। আপনি এ কথা এজন্য বলবেন না যে, সে অভাবগ্রস্ত ; বরং সে জন্যই এ কাজ করতে যাচ্ছে যে, সে সমস্ত রীতি-প্রথাকে হটিয়ে দিতে যাচ্ছে। অতএব, আপনি তার মনে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলবেন যে, কেবলমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত।

এ সমস্ত আয়াত হতে যা স্পষ্ট হয় তা হলো আল্লাহ তাঁর রসুলকে কারো স্ত্রীর সাথে প্রেম করার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন না ; বরং এক অনুচিত প্রথাকে অবলুপ্ত করতে প্রেরণা যোগাচ্ছেন, এ জন্য তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে আমার আদেশ কার্যকর করো, অন্য কাউকে ভয় কোরো না। কারণ এটাই যে, যখন রসুলুল্লাহ এই কুসংস্কার বা কুপ্রথাকে নির্মূল করতে যাচ্ছেন তখন আল্লাহ প্রত্যক্ষরূপে বলছেন :

'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যেকার পুরুষদের কারো পিতা নন ; কিন্তু তিনি আল্লাহর রসুল ও তাঁর নবীদের সম্পূরক (শেষ প্রতিনিধি) এবং আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর প্রজ্ঞাবান।' –আল আহযাব : ৪০

অন্য স্ত্রীগণ যাঁদের তিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ ও উচ্চকুলশীলা ছিলেন, এমনকি তাঁদের রাজকুমারী বলে মনে করা হতো। যখন তাঁরা ইসলামে

প্রবেশ করলেন তখন পরিস্থিতি তাদের অনেক নিচে নিয়ে এল, যাঁদের উপেক্ষা করাটা মহাযুগনায়কের জন্য উচিত ছিল না।

উদাহরণস্বরূপ আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা রাজিয়াল্লাহু আনহার কথাই নিন ! তিনি কুরাইশদের সেই নেতার কন্যা ছিলেন, যিনি ইসলামের বিরুদ্ধে ২০ বছর ধরে সংঘর্ষ চালিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর কন্যা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহর জন্য তিনি পিতা ও তাঁর আপন জ্ঞাতি ও সম্প্রদায়কেও ত্যাগ করলেন। মক্কা ছেড়ে হাবশায় হিজরত করে গেলেন যদিও মক্কায় তাঁর পিতার নেতৃত্ব কায়েম ছিল।

এরকম ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ স্ত্রী, যাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন তাঁকে কি এমন কোনো ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল যে তাঁর সম্মান ও পদমর্যাদার মূল্য দিতে না জানত ?

রসুলুল্লাহ তাঁর আত্মসম্মানকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং তাঁর কীর্তি ও আত্মত্যাগকে অম্লান বা চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁকে আপন পত্নীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

হুই-এর কন্যা হজরত সফিয়ার কথাই ধরুন ! তাঁর পিতা ছিলেন ইহুদিদের রাজা। ইসলাম ও বনি ইসরাইলিদের সংঘর্ষে তাঁর ভাই, পিতা, পতি সবাই বিগত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি এক সাধারণ সৈনিকের অংশে পড়েছিলেন, যিনি তাঁকে একজন যুদ্ধবন্দির অতিরিক্ত কিছুই বলে জানতেন না এবং তাকে তিনি বিয়ে করতে পারতেন এবং তাঁর সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহারও করতে পারতেন।

তাঁর অবস্থা দেখে রসুলুল্লাহ করুণা পরবশ হয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁর অতীতের ক্ষতিপূরণ করে দিলেন এবং সম্মান ও মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে তাঁকে বিয়ে করে নিলেন। তাহলে কি তাঁর এ প্রয়াসকে নিন্দা করা যায় ?

হারিসের কন্যা জুবাইরিয়ার উদাহরণ নিন ! তাঁর পিতা বনু মুস্তালিকের নেতা ছিলেন। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে তাঁর ভয়ংকর পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল এবং এই পরাজয়ের পর তাঁর গোত্রকে বড় কঠিন অপমান সইতে হয়েছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ পরাজিত নেতার মন রক্ষার জন্য তাঁর কন্যাকে বিয়ে করে তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারেন যে, তাঁকে সাহায্য ও সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব। অতএব, রসুলুল্লাহর ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেল। গোত্রের সমস্ত বন্দিকে মুক্ত করে দেয়া হলো। কেননা, এখন ঐ গোত্রের সাথে দুর্ব্যবহার করা অনুচিত ছিল, যাঁর কন্যার সাথে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

রসুলুল্লাহর পবিত্র জীবনীর সাথে অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ লোকেরা ভাবতে পারে যে, রসুলুল্লাহর ব্যক্তিগত জীবনে পানাহার ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদের ব্যাপক আয়োজন ছিল।

উপরোক্ত দৃষ্টিতে বহুপত্নী রাখা ব্যক্তির বিষয়ে এ রকম ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি প্রাকৃতিকভাবে খুবই সম্পন্ন ও সমৃদ্ধশালী হয়ে থাকবেন। তাঁর দস্তরখানে মাছ, মাংস ও ফলমূলের ছড়াছড়ি থাকবে। সেই সমস্ত পেয় বস্তু তাঁর বৈঠকখানায় গড়াগড়ি যাবে, যা পান করলে মানুষকে উন্মাদনা ও আবেগে চুর করে রাখবে এবং তিনি ডানা কাটা পরির মতো সুন্দরীদের মধ্যে চাঁদমুখ নিয়ে বিরাজ করবেন, যা তাকে সাংসারিক জীবনাচার থেকে নিস্পৃহ ও বিমুখ করে দেবে এবং সে দুনিয়া থেকে চোখ বন্ধ করে নেবে ?

এ প্রায় সেই দশা, যা সম্রাট ও তাদের রাজপ্রসাদগুলোতে শোভা পায়।

কিন্তু রসুলুল্লাহর গৃহে এ ধরনের আমোদ-প্রমোদ তথা আনন্দের বিন্দুমাত্র আশাও করা যায় না।

এই মুহূর্তে সেই কাঠিন্য ও কষ্টদীর্ণ জীবনের অন্য দিকগুলোর প্রতিও দৃষ্টিপাত করুন, যা থেকে আপনার সামনে সেই ব্যক্তির জীবনচিত্র আসতে পারে, যিনি নিজে নিজেকে হক (সত্য)-এর সাথে সম্বন্ধ করে রেখেছিলেন এবং তিনি সেই বোঝা মনে করে চলেছিলেন। তাঁর চোখের শীতলতা সেই প্রয়াসের মধ্যে ছিল, যা তাঁর উদ্দেশ্যকে আরো নিকটস্থ করে দিত। দুনিয়াবি আকাঙ্ক্ষা তাঁর দুপায়ে দলিত হতো এবং দুই কানের পিছনে পড়ে থাকত।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্মল ও প্রতাপবান হৃদয়ের কাছে ভৌতিক মোহ এসে দাঁড়াতে পারত কিন্তু তিনি এমন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, যার চয়ন আল্লাহ বিশেষরূপে করেছিলেন। তার বাতাবরণই ছিল অন্য রকমের। তিনি বলতেন :

'দুনিয়া থেকে আমার নেয়ারই বা কী আছে ? আমার উদাহরণ তো ঐ ব্যক্তির মতো, যে একটি বৃক্ষচ্ছায়াতলে এসে বিশ্রাম নেয় তারপর তাকে ছেড়ে চলে যায়।'[১]

তিনি মানবাকাঙ্ক্ষাকে উচ্চ আদর্শের সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে সুপ্রতিফল লাভের সাথে সম্বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন :

জান্নাতে একটি কড়ির স্থান দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর পথে যাত্রা করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর চেয়ে উত্তম।'[২]

---

১. তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকিম ও আহমদ।

২. বুখারী, মুসলিম।

তিনি তার পত্নীদের সাথে যে সুকঠিন অথচ সরল জীবনযাপন করেছেন তা অন্যের পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। ইমাম বুখারী হজরত আনাস বিন মালিক হতে হাদিসে উল্লেখ করেছেন, 'আমার জানা নেই যে, রসুলুল্লাহ্ কখনো মোলায়েম রুটি খেয়েছেন কি-না এমনকি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত এবং তাঁর শুভ নেত্র কখনো ছাগলের ভুনা করা গোশতও দেখেনি।

হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা দু'মাসের তিন চাঁদে এমন অবস্থায় থাকতাম যে, রসুলুল্লাহর গৃহে উনুন পর্যন্ত জ্বলত না।[১] হজরত উরওয়া বিন জুবাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন : 'তাহলে আপনাদের কীভাবে জীবিকা নির্বাহ হতো ?' বললেন : 'খেজুর এবং পানি দিয়ে।'

হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন : যে সময়ে রসুলুল্লাহর ইন্তিকাল হয় সে সময়ে আমাদের গৃহে কোনো খাদ্য বস্তু ছিল না। কেবলমাত্র অল্প কিছু যব ছিল যা আমার ঘরে পড়ে ছিল।

রসুলুল্লাহ যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার তৈরি আর তা খেজুর পাতা দিয়ে ভরা ছিল।[২] তিনি তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতেন যখন মোরগ ডাকার আওয়াজ শোনা যেত এবং তখন তিনি ফজরের নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠে পড়তেন।

এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম হালাল বা পবিত্র বস্তুকে মন্দ বলে জ্ঞান করেন অথবা রসুলুল্লাহ এ থেকে বঞ্চিত থাকার নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কখনোই নয় ! ইসলামী শরিয়ত তো দীপ্ত এবং স্পষ্ট। আমরা এখানে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনের উপর আলোকপাত করছি, যাঁকে লোক অভিযুক্ত করে। প্রায়শ মানুষ নিজেদের শিশুদের মন ভোলানোর জন্য তাদের হাতে খেলনা তুলে দেয় এবং তারা পরস্পরে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। কেননা, ঐ ব্যক্তির স্বভাব এই বাচ্চাদের খেল থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।

কিছু ভাবুক ও দার্শনিক সেই সুস্বাদু পানাহার থেকে বিমুখ থাকে, যা তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। তাদের এসব নিয়ে কোনো চিন্তা থাকে না। কেননা, তারা আপনাপন চিন্তাজগতে লীন হয়ে থাকেন।

মনে হচ্ছে, আমি আমার কল্পনার জগতে দেখতে পাচ্ছি যে, রসুলুল্লাহ লোকদের দুনিয়ার মোহে মোহিত ও তার উপরে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখছেন এবং বড়ই আফসোসের সাথে মাথা হেলিয়ে বলছেন :

---

১. তিন চাঁদের তারিখ দেখার অর্থ হলো দু'মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া। দু'মাস পর্যন্ত রান্নার জন্য কোনো সংস্থান থাকত না, উপহার সামগ্রী, দুধ বা খেজুর দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা হতো। —অনুবাদক

২. বুখারী।

'যদি তোমরা ঐ বস্তুকে জানতে, যা আমি জানি তাহলে তোমরা কাঁদতে বেশি, হাসতে কম।' –বুখারী

তারপর তিনি কেঁদে কেঁদে অশ্রুসজল নেত্রে দু'আ করেছেন :

'হে আল্লাহ ! তুমি মুহম্মদের সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত উপজীবিকা প্রদান করো।'[১]

এ বুদ্ধিবৃত্তির সাথে বড়ই অন্যায় এবং ইতিহাসের সাথে বড়ই জুলুম হবে যে এক ব্যক্তি রাস্তা থেকে ঘুরে এদিকে আসে এবং সে দেখে অথবা তাকে বলে যে হজরত মুহাম্মদের অনেক পত্নী ছিলেন আর তা শুনে সে মনে করে যে আপনি তার বহু পত্নী সম্পর্কিত জৈবিক প্রবৃত্তির আধিক্য এবং ধন-সম্পদ বৃদ্ধির প্রমাণ প্রস্তুত করছেন।

এ কথাও মনে করা উচিত নয় যে, এই সাদামাটা জীবন ও দুর্দশা এ জন্যই ছিল যে, তাঁর কিছুই ছিল না কিন্তু তাঁর জন্য যদি রাজকোষ খুলে যেত এবং জীবনের সম্পন্নতা লাভ হতো তাহলে তিনি আনন্দিত জীবন অতিবাহিত করতেন এবং তা মশহুর করার চিন্তা করতেন আর তার পত্নীরাও এই সুবর্ণ সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হতেন না।

কখনোই নয়। অবস্থা এরকম ছিল না। তিনি ধন-সম্পদের উপযোগিতাও জানতেন, তা ব্যবহার করতেও জানতেন আবার তা থেকে বিরত থাকতেও জানতেন। কিন্তু তিনি এসব ছোটখাটো স্বার্থ থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর দৃষ্টি মহত্তম উদ্দেশ্যের উপর নিবদ্ধ থাকত। আর তাঁর সামনে ভূমিরাজস্ব এলেও তাঁর সর্বপ্রথম এই চিন্তা হতো যে, তা কত তাড়াতাড়ি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া যায়।

হজরত আবু জর রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, আমি রসুলুল্লাহর সাথে মদিনার মরুভূমি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম এমনকি আমাদের সামনে উহুদ পাহাড় এসে গেল। তিনি বললেন : 'হে আবু জর !' আমি বললাম : 'আমি উপস্থিত আল্লাহর রসুল !'

রসুলুল্লাহ : 'আমি এতে খুশি নই যে, আমার কাছে উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ সোনা আসুক আর আমার কাছে এক দীনার পরিমাণ সম্পদ থাকা অবস্থায় তিন রাত অতিবাহিত হয়ে যাক। অতএব, আমি আদেশ দেব যে একে অমুক অমুক আল্লাহর বান্দার সামনে থেকে পেছন থেকে ডাইনে থেকে বাম থেকে বিতরণ করে দেয়া হোক।'

তারপর আরো অগ্রসর হলেন এবং বললেন :

---

১. বুখারী, মুসলিম।

'আজ যারা ধনবান কাল কিয়ামতে তারা ধনহীন হবে। কিন্তু সেই লোক যে ডাইনে বামে সামনে ও পিছন থেকে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে এমন লোক খুব কমই হবে।'[১]

পূর্ণোদর ব্যক্তিকে যতই সুস্বাদু খাদ্য খাওয়ানো হোক না কেন তার কাছে তা বিস্বাদ লাগবে অর্থাৎ সে তাতে কোনো আনন্দ পাবে না। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তরের দিক থেকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর কাছে দুনিয়ার ধন সম্পদ এসে হাজির হতো কিন্তু তার প্রতি তিনি এক মুহূর্তের জন্যও মনোযোগী হতেন না। অবশ্যই তিনি দুর্বল মুখাপেক্ষীদের মধ্যে তা বিতরণ করে দিতেন। তার নিজের হৃদয় ছিল সন্তুষ্ট এবং নিস্পৃহ।

এ হলো সেই শিষ্টতা, যার শিক্ষা আল্লাহ তাকে প্রথম দিন থেকেই দিয়ে এসেছিলেন :

'আর যা কিছু আমি সংসারিক জীবনের চমৎকার এই সমস্ত নানা প্রকারের লোকদের দিয়ে রেখেছি, যা তাদের বিলাসিতায় ডুবিয়ে দেয়, কখনোই ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি চোখ তুলেও দেখো না আর তোমার প্রভুর জীবিকাই এই উত্তম এবং অধিক স্থায়ী।

আর আপনজনদের নামাজের আদেশ দাও এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকো। আমি তোমার কাছ থেকে কোনো রুজি চাই না ; রুজি তোমাকে আমি দিই। আর পরিণাম তাকওয়ার জন্য।'—ত্বা-হা : ১৩১-১৩২

রসুলুল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় দুখী মানবতার মুক্তিদান। কোনো ব্যক্তি তাকে এবং তার পরিবার পরিজনদের যেন অনাহারের কারণে অপমানিত করতে না পারে।

'তিনি এই সিদ্ধান্তের উপর জীবন নির্বাহ করতেন যে, কম হোক কিন্তু পর্যাপ্ত হোক, তা তার চেয়ে উত্তম বা অধিক কিন্তু গাফিল করে দেয়।' —আহমদ

এই পর্যাপ্ত ও ন্যূনতম মাত্রার মধ্যে থেকে তিনি সৃষ্টির চঞ্চল থেকে বেঁচে থাকতে চাইতেন এবং নিজেও কাউকে তাতে যেতে দিতে চাইতেন না। এই কারণেই তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন :

'হে আল্লাহ ! আমি অনাহার, অভাব ও অপমান থেকে তোমার আশ্রয় চাই, আর এ থেকে আশ্রয় চাই যে, আমি কারো প্রতি জুলুম করি অথবা আমার উপর জুলুম করা হোক, অথবা আমি কারো সাথে মূর্খতাচরণ করি বা কেউ আমার সাথে মূর্খতাচরণ করুক।'

---

১. বুখারী, মুসলিম।

দু'আয় বলতেন :

'হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছ থেকে সুমতি, ভীতি ও সম্পন্নতা প্রার্থনা করি।' –মুসলিম, তিরমিজি

জীবনের এই কঠোর তথা অনিবার্য পদ্ধতির কারণে তাঁর পত্নীরা অভিযোগ করলেন এই কাঠিন্য তাঁরা কীভাবে সহ্য করবেন, যাঁরা এর আগে এ সবের সাথে অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ ছিলেন ? তাঁরা তো বড় বড় পরিবার থেকে এসেছিলেন।

তাঁরা তো অধিকাংশই জীবনের সম্পন্নতা, সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য ও আরামদায়ক জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন।

তাঁরা হয় নিজেদের মাতা-পিতার সাথে নতুবা আগের স্বামীদের প্রাচুর্য ও আরামের জীবনযাপন করতেন।

অতএব, এই নতুন জীবনযাত্রা যে সুকঠিন হবে এতে তো আশ্চর্যের কিছু নেই। তাঁরা সম্পন্নতা ও আরামদায়ক জীবনযাপনের জন্য দাবি তুললেন এবং পারস্পরিক মতভেদ সত্ত্বেও নিজেরা একমত হয়ে গেলেন যে, রসুলুল্লাহর কাছে পারিবারিক ভরণপোষণ বাড়ানোর জন্য প্রার্থনা জানানো হোক।

এঁরা আরবের শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে এসেছিলেন। তাঁদের জীবনচর্চা তাঁদের স্থান ও পদমর্যাদানুসারে হওয়া উচিত ছিল। হজরত আয়েশা ও হজরত হাফসা এই দাবিগুলো রসুলুল্লাহর সামনে পেশ করলেন এবং অন্যেরা তাঁদের সাথে রইলেন। রসুলুল্লাহ এতে খুবই কষ্ট পেলেন। সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে উত্তম ও পূর্ণ আদর্শ ছিল তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি ও জীবনাচারের মধ্যে। মুমিন নারী-পুরুষদের দৃষ্টি সর্বদিক দিয়েই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। তিনি সেই নয়া জাতির স্রষ্টা ছিলেন যাঁরা হাজার হাজার শত্রুর মধ্য জীবনাতিবাহিত করেছিলেন।

যদি তাঁর পরিবারই সুকঠিন ও জিহাদি জীবনযাত্রা অতিবাহিত না করতে পারতেন তাহলে এই সংগ্রাম কীভাবে জারি রাখতে পারতেন ? এবং তাঁর উম্মতের হাজার হাজার নারী-পুরুষের উপর এই উত্তরাধিকারের দায়িত্ব কীভাবে সঁপে দিতে পারতেন যে তাঁরা জীবনের মোহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে তাঁর দ্বীনের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন, এমনকি তাঁদের ঠিকানা ও আশ্রয়স্থান সুনির্দিষ্টভাবে লাভ করুন এবং নৌকা কিনারে এসে ভিড়ুক ?

সুতরাং রসুলুল্লাহ উপজীবিকা বৃদ্ধি করার দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাঁদের এই কাজকে অপছন্দ করলেন, এমনকি তাঁদের থেকে আলাদা থাকতে লাগলেন। এমনকি, লোকদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রসুলুল্লাহ তার পত্নীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন।

হজরত আবু বকর ও হজরত উমর এ খবরে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা, এ দু'জনের কন্যারা ছিলেন রসুলুল্লাহর পত্নী। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য

তাঁরা দু'জনেই রসুলুল্লাহর সমীপে উপস্থিত হলেন। দু'জনে গিয়ে দেখলেন তিনি মৌন রয়েছেন আর তাঁর স্ত্রীরা জটলা করছেন।

হজরত উমর : 'হে আল্লাহর রসুল ! আপনি কি আপনার পত্নীদের তালাক দিয়েছেন ?'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম : 'না !'

বাতাবরণ ছিল শোকার্ত ও গম্ভীর, হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু চিন্তা করলেন, এমন কিছু কথা বলি, যার পরিণামে এই অবস্থার অবসান হয়ে যাক।

হজরত উমর : 'হে আল্লাহর রসুল ! জায়েদের কন্যা (অর্থাৎ উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পত্নী) আমার কাছে উপজীবিকা দাবি করলে কি আমি তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেব ?'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন, এমনকি, তাঁর দাঁতও দেখা যেতে লাগল। এবং বললেন, এরা আমার কাছে জীবিকার প্রাচুর্য দাবি করছে। অতএব, হজরত আবু বকর তাঁর কন্যা আয়েশাকে বোঝাতে লাগলেন এবং হজরত উমর তাঁর কন্যা হাফসাকে বকাবকি করতে লাগলেন। তাঁরা দু'জনেই বললেন যে, 'তোমরা নবীর কাছে এমন কিছু দাবি করছ, যা তাঁর কাছে নেই ?'

রসুলুল্লাহ দুই পিতাকেই তাদের কন্যাদের কিছু বলা থেকে বিরত করলেন। পত্নীরা লজ্জিত হলেন এবং বলতে লাগলেন :

'আল্লাহর কসম ! আমরা এই বৈঠকের পর আর কখনো রসুলুল্লাহর কাছে এমন বস্তু দাবি করব না, যা তাঁর কাছে নেই।'

রসুলুল্লাহ এক মাস যাবৎ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখলেন, যাতে তাঁদের এই হরকতের ভয়ংকরতার আভাস হয়ে গেল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে 'তাখাইর'[১] এর আয়াত অবতীর্ণ হলো, যাতে পত্নীদের অধিকার দেয়া হলো যে তারা চাইলে সাদাসিধা জীবন অতিবাহিত করে আখিরাতের সাফল্য লাভ করতে পারেন অথবা আপনাপন পরিবারে গিয়ে আভিজাত্যাপূর্ণ জীবনাতিবাহিত করতে পারেন এবং সুস্বাদু পানাহার করতে পারেন।

এ শিক্ষা তাঁদের ভৌতিক ও সাংসারিক জীবনকে মোহমুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত ছিল। অতএব, তাঁরা রসুলুল্লাহর সাথে রয়ে যাওয়াকে প্রাধান্য দিলেন। এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে (যা স্বল্প ও পর্যাপ্ত তা অধিক হতে উত্তম কিন্তু গাফিল করে দেয়) নিজের নিয়ম বানিয়ে নিলেন এবং তার সাথে তারা জিহাদ, তাহাজ্জুদ দান সমতা

---

১. 'তাখাইর' এক পারিভাষিক শব্দ– যার অর্থ হলো স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার পত্নীকে প্রদান করা। –অনুবাদক

প্রদান, 'সহানুভূতি' নম্রতা ও আত্মনিবেদনের সাথে জীবনাতিবাহিত করাটা পছন্দ করে নিলেন :

'হে নবী ! আপনার পত্নীদের বলুন, যদি তোমরা সাংসারিক জীবন ও তার শোভা চাও, তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদেয় করে দিই আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুল ও আখিরাতের ঘর চাও তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের মধ্যেকার উত্তম স্ত্রীদের জন্য বড় প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।' –আল আহজাব : ২৮-২৯

অতএব তার পত্নীরা আল্লাহ তাঁর রসুল ও আখিরাতের ঘরকে প্রাধান্য দিলেন এবং নবীর সাথে সত্যের সহযোগী এবং আখিরাতের সুপ্রতিফলের আশায় জীবন অতিবাহিত করতে থাকলেন।

রসুলের সেবায় নিজেদের বিলীন করে দেয়ার ভাবনা ও 'নফস' যা প্রবৃত্তির দাবি থেকে বিরক্ত হয়ে যাওয়াটা ত্যাগেরই নামান্তর ছিল, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁদের উচ্চতর স্তর, শ্রেণী বা মর্যাদা প্রদান করলেন। অতএব, এখন তাঁরা ঐ ব্যক্তির পত্নী মাত্র নন, যাঁর অধীনে দুনিয়ার শোভা সন্ধান করবেন ; বরং উচ্চতম, শ্রেণী এবং অনুপম জীবনের শরিক, শুভচিন্তক ও সাথি হয়ে গেলেন এবং আল্লাহর এ কথার উপযুক্ত হয়ে গেলেন :

'নবীর সম্বন্ধ ঈমানদারদের সাথে তার চেয়েও অধিক যতটা ঐ লোকদের সাথে তাঁর নিজের সাথে এবং তাঁর পত্নীরা তাদের মায়ের সমান।' –আল আহজাব : ৬

আত্মিক মায়েদের এই সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় ও প্রবল করার জন্য 'মুমিন জননী' (উম্মুল মুমিন)-দের পর্দা করা অনিবার্য করে দেয়া হলো এবং কোনো অপরিচিতকে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো, তা সে মাহরম হোক বা না হোক।

দ্বীন এবং দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন এবার পর্দার পিছন থেকে হবে। এভাবে রসুলুল্লাহর জান্নাতবাসী হওয়ার পরে তাঁদের সাথে আর কারো বিয়ে চিরতরে নাজায়েজ বা নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো।

এই নিঃসঙ্কোচ নির্ণয়ের ফলে বাচাল ও চাটুকারদের নির্মূল করে দেয়া হলো যারা নায়ক, নেতা, প্রধানদের গৃহে আসা যাওয়া অব্যাহত রাখে। এভাবে ঐ অবসরবাদীদের আকাঙ্ক্ষা ভূলুণ্ঠিত হলো যারা উঁচু ঘরানার মহিলাদের বিয়ে করে সমাজে উচ্চমর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এই আইন বা বিধি-বিধান দেখে আমাদের আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, কিছু দুশ্চরিত্র ও দুঃস্বভাবের লোকের একথা বলার দুঃসাহস দেখা গিয়েছিল যে, নবীর ওফাত হয়ে গেলে আমি আয়েশাকে বিয়ে কবর (আল্লাহ রক্ষা করুন)। রসুলুল্লাহর দায়িত্ব ছিল

এই আকাট মূর্খদের কবল থেকে আপন পত্নীদের এবং পরিবার পরিজনদের মান-মর্যাদাকে সুরক্ষিত করে রেখে যাওয়া।

রসুলুল্লাহ উত্তরাধিকাররূপে কোনো পুত্র সন্তান রেখে যাননি।

হজরত খাদিজার গর্ভে যে কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা তাঁর জীবৎকালেই জান্নাতবাসিনী হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল হজরত ফাতিমা জীবিত ছিলেন এবং রসুলুল্লাহর জান্নাত বাসের কয়েক মাস পরেই তিনি পিতার সাথে গিয়ে মিলিত হন।

রসুলুল্লাহ শাহ মকৌকিস কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রেরিত দাসীকে বিয়ে করে নিয়েছিলেন, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার গর্ভে পুত্র ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুধের শিশু হজরত ইব্রাহিম তাঁর জীবৎকালেই জান্নাতবাসী হয়েছিলেন। হজরত আনাস বলেন, আমি তাঁকে রসুলুল্লাহর সামনেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে দেখেছি। শিশুপুত্রের মৃত্যুতে রসুলুল্লাহ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেন এবং বললেন :

'আঁখি অশ্রুসিক্ত, হৃদয় শোকতপ্ত কিন্তু আমি তাই বলব, যা আমার প্রভু পছন্দ করেন, হে ইব্রাহিম ! তোমার মৃত্যুতে আমি বড়ই শোকাহত হয়েছি।' —বুখারী

সংযোগবশত, ঐদিন সূর্যগ্রহণ হয় তখন লোকে বলতে লাগল নবীপুত্রের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রসুলুল্লাহ যখন নামাজ পড়লেন তখন বললেন :

'লোক সকল ! সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিশানা। কারো জন্ম বা মৃত্যুর সাথে এদের গ্রহণের কোনো সম্পর্ক নেই, যখন তোমরা তা হতে দেখো তখন নামাজ পড়ো, এমনকি তা শেষ হওয়া পর্যন্ত।' —বুখারী, মুসলিম

দুই
রাজনৈতিক স্থিরতা

আরব উপদ্বীপ থেকে কুফরির অন্ধকার কেটে গেল, যেমন সূর্যোদয়ের সময়ে অমানিশা ঘুচে যায়। অসুস্থ বুদ্ধি সুস্থ হয়ে গেল। মূর্তিপুজোর যুগের অবসান হয়ে এখন ভয় ও আশার সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে স্থাপিত হলো। গগণভেদী আজান ধ্বনির সাথে কান পরিচিত হয়ে উঠল। 'কুররা' তথা কুরআনের হাফিজরা উত্তর-দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়লেন। চারদিকে আল্লাহর কিতাব পঠিত হতে লাগল। আল্লাহর আদেশ এবং আইন পালন হতে লাগল এবং আরবরা এমন শিক্ষা লাভ করতে লাগল, যার সাথে তাদের পূর্বপুরুষরা অপরিচিত ছিলেন।

সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রটি এমন শুভজাগরণ আর কখনো দেখেনি এবং এর ইতিহাস এমন আশ্চর্য ও অলৌকিক ইতিহাসের সাথে কখনো পরিচিত হয়নি।

রসুলুল্লাহ মদিনায় প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাতেন এবং তাদের অভ্যন্তরে রুহ সঞ্চার করে দিতেন এবং শ্রেষ্ঠতর প্রজ্ঞা ও পাথেয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। আর এই প্রতিনিধি দল আপনাপন ক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়ে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতেন এবং নিজেদের ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করতেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধি দলকে শুধু স্বাগত জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না ; বরং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবিদেরও সেখানে পাঠালেন, যাতে সেখানে ইসলামী শিক্ষা প্রসারিত ও স্থির হতে পারে।

ইয়েমেন ও তার আশপাশের ক্ষেত্রগুলোতে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের বসবাস ছিল। সেখানে গ্রন্থধারীদের পুরাতন গতিবিধি জারি ছিল। সেখানে ইসলামের উন্নতি লাভের সাথে সাথে পারসিকদের রীতিনীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল।

'এই সুদূর ক্ষেত্রগুলো সঠিক পর্যবেক্ষণ, দেখাশোনা ও নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী ছিল। অতএব, রসুলুল্লাহ খালিদ বিন অলিদকে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠালেন, তারপর মুআজ বিন জবল ও আবু মূসা আশআরীকে পাঠালেন, সবশেষে আলী বিন আবি তালিবকে ইসলামের দাওয়াত ও তবলিগের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন।' —বুখারী।

রসুলুল্লাহ পারলৌকিক ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে অন্তিম সময় সমাগত, অতএব মুআজ বিন জবলকে এই কথা বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি যথোচিত ব্যক্তিকে কীভাবে ইসলামের বার্তা শোনাবেন এবং কীভাবে তাঁকে ধর্মের মর্মবাণী এবং প্রকৃতিকে বুঝিয়ে দেবেন, তারপর তিনি তাঁর সাথে মদিনার বাইরে গেলেন। হজরত মুআজ তার বাহনে বসেছিলেন এবং রসুলুল্লাহ তাঁর সাথে পায়ে হেঁটে চলেছিলেন। বোঝানো শেষ হলে তিনি বললেন :

'হে মুআজ ! এই বছরের পর তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ না-ও হতে পারে। হয়ত তখন তুমি আমার মসজিদ বা কবর অতিক্রম করবে।'

এ কথা শুনে হজরত মুআজ বিন জবল রসুলুল্লাহর বিয়োগব্যথা অনুভব করে কাঁদতে লাগলেন এমনকি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তারপর রসুলুল্লাহ মদিনার দিকে মুখ করলেন এবং বললেন :

'সাহসী লোকেরাই আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে তা সে যেই হোক না কেন বা যেখানেই থাকুক না কেন।' —আহমদ

অনন্তর তাই-ই হলো, যা রসুলুল্লাহ ইঙ্গিত করেছিলেন। হজরত মুআজ অন্তিম হজ পর্যন্ত ইয়েমেনে অবস্থান করলেন, তারপর হজে আকবর-এর ৮১ দিন পর তিনি লোকান্তরিত হলেন, তখনো মুআজ ইয়েমেনেই ছিলেন।

ইয়েমেন ও তার আশপাশের এলাকাগুলোতে কঠোর নজরদারির প্রয়োজন ছিল। কেননা ওখান থেকেই এবং বনু হানিফার থেকে দু'জন প্রতারক নবুয়তের মিথ্যা দাবি উত্থাপন করেছিল। অথচ নবী বলে প্রমাণ দেয়ার মতো কোনো চিহ্ন বা নিশানা ছিল না যে, সে কারণে তার কাছে কিছু লোকও জমা হবে। কিন্তু চুনকালি পড়ুক সেই পক্ষপাতীর মুখে যে পশুপালকদের একটি বড় গোত্রকে একথা বলতে বাধ্য করল যে, আমরা জানি মুসাইলামা মিথ্যুক কিন্তু রবিআর মিথ্যা মুজির এর সত্যের চেয়ে উত্তম।

নবুয়তের ওই মিথ্যা দাবিদাররা একই সময়ে ভীষণ ফিতনা ছড়িয়ে দিল কিন্তু মুজাহিদরা তাদের পদদলিত করে দিলেন এবং মুসলিমা ও ভণ্ড নবীদের নবুয়ত নির্মূল হয়ে গেল এবং তাদের নামনিশানা পর্যন্ত মিটে গেল।

তিন
বিদায় হজ

রসুলুল্লাহ হজ-এর সংকল্পের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বলে দিলেন, যে কেউ সাথে যেতে পারবে। অনন্তর জিলকাদ মাসের শেষে তিনি মদিনা থেকে প্রস্থান করলেন এবং তিনি তাঁর অবর্তমানে হজরত আবু দুজানা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে মদিনার আমির নিযুক্ত করে গেলেন। –ইবনে হিশাম

এই হজ ছিল ঐ সমস্ত হজের চেয়ে ভিন্ন, যার সাথে আরবরা পরিচিত ছিল। মুশরিক-পৌত্তলিকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং মসজিদুল হারামে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং হজের মওসুম সেই একত্ববাদীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করত। সমস্ত এলাকা থেকে কাবার সংকল্প করে নিবেদিতপ্রাণ দলগুলো বেরিয়ে পড়লেন, কেননা, তাঁরা জানতেন যে এ বছর হজের আমির স্বয়ং রসুলুল্লাহ।

রসুলুল্লাহ লক্ষাধিক মানুষের সেই জনসমাগম দেখলেন, যাঁরা তসবিহ ও তকবির পাঠ করছিলেন এবং আল্লাহর আদেশ পালনে গতিশীল ছিলেন। অনন্তর, জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহর আদেশ পালন ও ইসলামের পথ অনুসরণের ভাবনা দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি জনসাধারণের অন্তরে দ্বীনের সারাংশের বীজ বপন করে দেবেন এবং এই বিশাল জনসমাবেশের সামনে সেই শিক্ষাই তুলে ধরবেন, যার ফলে জাহিলিয়াতের আবশ্যক শিষ্টতা, নৈতিকতা, আদেশ ও আইন কানুনও তাদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অনন্তর, তিনি তাঁদের উদ্দেশে এই যুগান্তকারী ভাষণ দান করলেন :

'উপস্থিত জনমণ্ডলী ! আমি যা কিছু বলি, তা তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। কেননা, ভবিষ্যতে আমি তোমাদের সাথে এখানে আর মিলিত হতে পারব কি না তা আমার জানা নেই। লোকসকল ! তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম (সম্মানযোগ্য), যেমন এই দিন, এই মাস ও এই নগর। হারাম (লুটপাট ও রক্তপাত করা হারাম), এমনকি তোমরা আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি তোমাদের কর্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে বলবেন, আমি কি তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি ? যদি কেউ তোমাদের কাছে কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখে তাহলে তাকে তা যথাযথরূপে ফিরিয়ে দেবে। সুদ অবৈধ, তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, কিন্তু নিজের মূলধন ফেরত পাবে, যাতে তোমারও ক্ষতি হবে না, অন্যেরও নয়।

আল্লাহ সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর যেখানে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদের প্রশ্ন তা আমি সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। ইসলামের পূর্বেকার সমস্ত রক্তপণ নিরস্ত করে দেয়া হলো আর আমার বংশের প্রথম রক্তপণ রবিআ বিন হারিসের দুধের শিশুর রক্তপণ, হুজাইল যাকে হত্যা করেছিল। তা আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি।

লোকসকল ! শয়তান এই ভূ-ভাগে তার পুজোপাসনা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে কিন্তু সে এতে সন্তুষ্ট যে, ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে তার আদেশ পালন হবে। অতএব, তোমরা তোমাদের দ্বীন ও ঈমানকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কোরো।

(লোকসকল ! সম্মানিত) মাসের অবমাননা কুফরি বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফিররা বিপথগামী হয়েছে, কোনো বছরে তাকে হালাল (বৈধ) ভাবে ও কোনো বছরে তাকে হারাম করে দেয়। (তওবা : ৩৬) কালচক্র পুনরায় সেই স্থানে ফিরে এসেছে, সৃষ্টির দিন যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারো তার মধ্যে তিনটি মাস সম্মানিত, যথাক্রমে জিলকাদ, জিলহজ, মুহররম এবং এক পৃথক মাস অর্থাৎ, রজব বা জমাদিউস সানি ও শাবান এর মধ্যবর্তীতে আছে। লোকসকল ! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার যে, সে কোনো ব্যক্তিকে তোমার বিছানায় স্থান দেবে না, যা তুমি অপছন্দ করো এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতায় অংশ নেবে না। অনন্তর, যদি সে এমনটি করে তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ হলো তুমি তাকে বিছানায় একা ছেড়ে দাও এবং এভাবে প্রহার করো যে, তা হবে মৃদু প্রহার এবং অধিক কষ্টদায়ক না হয়। তারপর যদি সে শুধরে যায় তাহলে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার। স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কোরো। কেননা তারা তোমাদের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের অধিকারের মধ্যে এবং তারা স্বয়ং নিজেদের জন্য কিছু করতে পারে না। আল্লাহর আমানতরূপে তোমরা তাদের পেয়েছ এবং তারা তাঁর নামেই তোমাদের জন্য হালাল। অনন্তর হে লোকসকল !

আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি তাবলিগের হক আদায় করে দিয়েছি।

আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তাকে দৃঢ়বদ্ধভাবে ধারণ করে থাক তাহলে তোমরা কখনোই বিপথগামী হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব 'কুরআন' ও রসুলের 'সুন্নত' (তরিকা)।

লোকসকল ! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, জেনে রাখো প্রত্যেক মুসলমান একে অন্যের ভাই এবং সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কোনো মুসলমানের পক্ষে তার ভাইয়ের ইচ্ছা যা স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো কিছু গ্রহণ করা অবৈধ। নিজে নিজের প্রতি অত্যাচার কোরো না।

'আমি কী আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি ?'

লোকেরা সমস্বরে বলল : 'হ্যাঁ ! অবশ্যই।'

রসুলুল্লাহ : 'হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক।'

ইবনে ইসহাক বলেন, 'আরাফার ময়দানে রসুলুল্লাহর মুখ নিঃসৃত বাণী রবিআ বিন উমাইয়া বিন খলফ লোকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন।

রসুলুল্লাহ তাকে বলেন যে, বলো : 'হে লোকসকল ! তোমরা কি জানো এ কোন মাস ?' তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর দিল : 'সম্মানিত মাস।' তারপর তিনি আদেশ দিলেন বলো : 'আল্লাহ তোমাদের জীবন ও সম্পদকে এই মাসের ন্যায় সম্মানিত (ও পবিত্র) করে দিয়েছেন, যতদিন তোমরা আল্লাহর সাথে মিলিত না হও।'

তারপর তিনি ঘোষণা করলেন : 'লোকসকল ! রসুলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করছেন : তোমরা কি জানো আজ কোন দিন ?'

এ উদঘোষণা শুনে লোকেরা উত্তর দিল : 'আজ বড় হজ্জের দিন।'

তখন রসুলুল্লাহ বললেন, ঘোষণা করে দাও যে, আল্লাহ তোমাদের জীবন ও সম্পদকে এই দিনের সমান সম্মানিত করে দিয়েছেন, যতদিন তোমরা প্রভুর সাথে মিলিত না হও।

রসুলুল্লাহ চাচ্ছিলেন যে, রিসালাতের তবলিগের দীর্ঘ পরীক্ষা অতিক্রম করার পর যে নির্দেশ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হোক।

তিনি অনুভব করতেন যে, এ কাফেলা জীবন সংগ্রামে একলা রয়ে যাবে। অতএব তিনি এভাবে ঘোষণা করছিলেন, যেভাবে পিতা পুত্রকে উপদেশ দান করেন। যখন সে কোথাও যাত্রা করে তখন পিতা তাকে পাথেয়স্বরূপ অনেক কথাই বুঝিয়ে দেন এবং এমন উপদেশ দেন যা তার কাছে চিরকালের পাথেয়রূপে সিদ্ধ হয়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই আহ্বান করতেন যে, লোকেরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ছে তখন তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় নসিহত

করতেন, যা তাদের মর্মস্থলে গেঁথে যেত। হিদায়ত ও ইলম থেকে বাতাবরণকে আলোকমান করে দিতেন এবং যা কিছু মিথ্যা যা কিছু অপকৃষ্ট যা কিছু মনগড়া এবং অপবিত্র ও অসুন্দর তা নির্মূল করে দিতেন এবং লোকদের সাক্ষী করে নিতেন যে তারা কি তা শুনেছে ? এবং আমার কথা কি তাদের কাছে পৌঁছে গেছে ?

তেইশ বছর যাবৎ আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রচারিত হয়ে আসছিল। নিকট থেকে সুদূরের সমস্ত মানুষকে এই কিতাব কুরআনের আয়াত শোনানো হচ্ছিল, যা হজরত জিব্রাইল কর্তৃক তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে গেঁথে দেয়া হয়েছিল। জাহিলিয়াতের অপবিত্রতা থেকে লোকদের পাক-পবিত্র করে তোলা হচ্ছিল এবং আয়াতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে এ সমস্ত তথ্য যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত এবং তার আলোকে বিশ্বভুবনের প্রতি দৃকপাত করতে পারত। এই কাজ সম্পন্ন করতে পুরো ২৩ বছর লেগে গিয়েছিল।

এবং এখন প্রথম হজের অবসরে অগণিত মানুষের এই সমাগমের নেতৃত্ব রসুলুল্লাহর হাতে ছিল। যেখানে অংশীবাদী (অনেকেশ্বরবাদ)-এর অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধকে সাফ করে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত হচ্ছিল।

তিনি তার 'অজবা' নামক উটনীতে সওয়ার হয়ে সেই জনসমুদ্র অবলোকন করছিলেন যাতে ঐ তথ্যকে তাদের অন্তরের অন্তস্তলে গেঁথে দিতে পারেন যা দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল, যার সাথে লোকদের পরিচিত করাচ্ছিলেন এবং তিনি তা পৌঁছে দেয়ার এবং স্পষ্ট করে দেয়ার দায়িত্ব থেকে ভারমুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

নবীদের পিতা হজরত ইব্রাহিমের দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিয়েছিলেন, যা তিনি কাবা নির্মাণের সময়ে অন্তরের অন্তস্তল থেকে করেছিলেন :

'হে আমার প্রভু ! সেই লোকদের মধ্য থেকে এক রসুল নির্বাচন করো, যিনি তোমার আয়াতসমূহ শোনাবেন। তাঁকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দাও এবং তাকে শুদ্ধতা ও বিকাশ প্রদান করো। নিঃসন্দেহে তুমি প্রভুত্বশালী ও প্রজ্ঞাবান।' —আল বাকারা : ১২৯

প্রভুত্বশালী ও প্রজ্ঞাবান প্রভু এই দেশকে দ্বিগুণ তেজস্বিতা প্রদান করে দিয়েছিলেন। অতএব, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান ও প্রজ্ঞা অথবা কথায় শক্তি ও রাজনীতি প্রদান করেছিল এবং রসুলুল্লাহ এ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র ধরিত্রীর শয়তানি শক্তিকে নির্মূল করে দিলেন। একদিকে তিনি সম্মান, শক্তি ও বল প্রয়োগের দ্বারা বাতিল শক্তিকে পরাস্ত করলেন অন্যদিকে সহনশীলতা ও সংযমের দ্বারা শিষ্টতা শেখালেন এবং প্রশিক্ষিত করলেন।

ন্যায় ও অনুগ্রহের এই বহুধা বিস্তৃত পদ্ধতির দ্বারা বাতিল বা অসত্য পদে পদে বিধ্বস্ত হলো, এমনকি জাহিলিয়াত ও তার অপবিত্রতাকে মাটিতে মিশে যেতে হলো এবং ইসলাম অগ্রসর হয়ে ময়দান জিতে নিল।

তারপর আরব জাহানের সামনে হুজ্জাতুল বিদা বা শেষ বা বিদায় হজে ইসলামের শেষ ঘোষণা দেয়া হলো।

এই বড় হজ-এ আরাফার দিন আল্লাহ এই আয়াত অবতারণ করলেন :

'আজ আমি তোমার দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমার উপর আপন নিয়ামত পুরো করে দিলাম এবং আমি ইসলামকে একমাত্র ধর্ম মনোনীত করলাম।' –আল মায়িদা : ৩

হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত শুনে কেঁদে ফেললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো এতে কান্নার কী আছে। বলতে লাগলেন, পূর্ণতার পরে শূন্যতা আসে। অর্থাৎ তিনি যেন এ থেকে রসুলুল্লাহর মৃত্যুর কথা অনুমান করে নিয়েছিলেন।

এটাই সত্য যে, জীবন ও জীবিত ব্যক্তিদের বিদায় করার চিন্তা ঐ ভাষণের মধ্যে নিহিত ছিল, যা রসুলুল্লাহর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিদায়ী হজের অবসরে এই ধরনের কিছু কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং কিছু কথা তাঁর আশপাশে বসে থাকা লোকজন ও প্রতিনিধি দলের দীক্ষার সময়ে বলেছিলেন এবং 'উমরা এ আকবা'র অবসরে তিনি বলেছিলেন :

'আমার কাছ থেকে হজের বিধান শিখে নাও : হয়ত এ বছরের পর আমি আর হজ করতে পারব না।' –মুসলিম।

চার
মদিনায় প্রত্যাবর্তন

হজ সমাপনান্তে তিনি মদিনা অভিমুখে প্রস্থান করলেন, যাতে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন ; বরং সঠিক অর্থে আল্লাহর জন্য প্রযত্ন ও পরিশ্রমের জীবন যাতে নতুনভাবে শুরু করতে পারেন। দুষ্ট ও দুষ্কৃতকারীরা সত্যাশ্রয়ী ও সত্যের পথে নিবেদিত প্রাণদের শান্তিতে থাকতে দেয় না। সত্যাচারীরা কর্মহীন দিনগুলোতে স্বতঃই স্ফূর্তি এবং বিলাসিতার সন্ধানে ফেরে না ; বরং কর্তব্যবোধের তাড়নায় সুকর্ম ও দায়িত্বশীলতার প্রেরণাশক্তি লাভ করে। তারা পূর্ণতা ও আরাম আয়েশ সেই সময়ে অনুভব করেন, যখন তাদের পরিশ্রমের ক্ষেতে ফসল ফলতে শুরু করে।

রসুলুল্লাহ মদিনায় এলেন যাতে রোমকদের সাথে যুদ্ধের জন্য এক সংঘটিত বাহিনী গঠন করতে পারেন।

রোমের শাসক ইসলামকে জীবিত থাকার অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, যারাই ইসলাম গ্রহণ করছিলেন তাকেই তিনি মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছিলেন।

ফরদা বিন উমর জজামী মআন ও তার আশপাশের রোমীয় এলাকার প্রাদেশিক শাসক ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে সে কথা রসুলুল্লাহকে জানিয়ে দিলেন।

রোমকরা ক্রুদ্ধ হয়ে তার উপর আক্রমণ চালিয়ে দিল এবং ফরদাকে গ্রেফতার করল এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনিয়ে দিল এবং তাঁকে আকবা নামক ঝরনার কাছে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখল, যাতে তাঁর এই দৃশ্য দেখে লোক শিক্ষা নেয় এবং ইসলাম গ্রহণ করার সাহস না পায়।

উল্লেখ্য, যখন তাকে ফাঁসি দিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি এই মর্মস্পর্শী কবিতাটি পাঠ করেন :

'মুসলমানের মহানায়কেরে এই কথাটি জানিয়ে দিয়ো।
জীবন দিয়েছি সত্যের তরে নোয়াইনি কো শির তবুও।।
আমার প্রভু অবিনশ্বর আমার জীবন তাঁরই দান।
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছেও নোয়াবে না শির মুসলমান।।
আমার নবীরে জানিয়ে দিয়ো আমার রক্ত, আমার প্রাণ।
আল্লাহর তরে, সত্যের তরে, সকলি করেছি দান॥'

এ খবর পাওয়ামাত্রই রসুলুল্লাহ বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করলেন এবং উসামা বিন জায়েদ বিন হারিসা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং তাঁকে আদেশ দিলেন, তাঁর ঘোড়া যেন বলকা ও দারুম পর্যন্ত অবশ্যই যায়, যাতে রোমকরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সীমান্তরক্ষী আরবদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং একথা যেন কেউ না ভাবে যে, গির্জাওয়ালাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার মতো কেউ নেই, আর ইসলামে প্রবেশ করা মানেই ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন দেয়া নয়।

হজরত উসামা বিন জায়েদ ছিলেন ১৮ বছরের টগবগে তরুণ। অতএব কিছু নির্বুদ্ধি লোক তার সৈন্যাপত্যে রুষ্ট হলো এবং আপত্তি তুলল যে, এত সব বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে এরকম অল্পবয়সী এক তরুণ কীভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে ?

বাস্তব সত্য হলো এই যে, রসুলুল্লাহ সেনাপতি নিযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতার অতিরিক্ত কিছু বিবেচনা করতেন না। যে ব্যক্তি যে পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন, সে যে বয়সেরই হোক না কেন, তাকে তিনি সেই পদে নিযুক্ত করতেন।

দীর্ঘায়ু, বুদ্ধিহীন ও অবুঝ লোককে দিয়ে কবে কোন কাজ উদ্ধার হয়েছে ? আর বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ অথচ অল্পায়ু ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে ?

'অল্পবয়স্কতা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতায় কীভাবে প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে ? কখনো কখনো প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা বৃদ্ধ-যুবক উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়।'

অনন্তর, রসুলুল্লাহ আপত্তি উত্থাপনকারীদের কথার জবাবে বললেন :

'আজ উসামার সৈন্যপত্যে তোমরা আপত্তি করছ কাল তোমরা এর পিতা জায়েদ বিন হারিসার সৈন্যপত্যে আপত্তি তুলেছিলে। আল্লাহর কসম ! এর পিতা সেনাপতি পদের যোগ্য ছিল আর তারপর তার পুত্রও এই পদের যোগ্য আর আমার বিবেচনায় আরো অনেক লোকের মধ্যে এ আমার অধিক প্রিয়।' —বুখারী, তিরমিজি

একথা শোনামাত্রই লোকেরা উসামা বিন জায়েদের বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করল।

রসুলুল্লাহর অসুস্থতা উদ্বেগজনক হয়ে উঠছিল, তারপর এ সমস্ত লোক কিছু দূরে গিয়েই শিবির স্থাপন করলেন যে দেখি, আল্লাহর ফায়সালা কী হয় ?

অষ্টম অধ্যায়

অন্তিম সময়

প্রিয়তম বন্ধুর সাথে মিলিত হলেন

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগের প্রকোপ ১১ হিজরি সনের সফর মাসের শেষের দিকে বেড়ে গেল। রোগের আক্রমণে তিনি দিনের পর দিন কাহিল হয়ে পড়লেন, তা সত্ত্বেও তিনি সবই সয়ে গেলেন কিন্তু এমন একটি পর্যায় এল যে রোগের যন্ত্রণা তাঁর জন্য অসহনীয় হয়ে উঠল। সে সময়ে তিনি তার পত্নী হজরত উম্মে মায়মুনার ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং বাইরে বেরুনো তাঁর জন্য সুকঠিন হয়ে পড়ল।

তিনি তাঁর স্ত্রীদের সর্বসম্মতিক্রমে অসুস্থতার দিনগুলোতে হজরত আয়েশার ঘরে অতিবাহিত করতে লাগলেন। কেননা, হজরত আয়েশার সেবায় তিনি একটু বেশি স্বস্তিতে থাকতে পারতেন। তিনি ফজল বিন আব্বাস ও আলী বিন আবু তালিব রাজিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্য নিয়ে হজরত মায়মুনার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রোগ এবং পীড়া তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলেছিল। সে জন্য একলা চলাফেরার সামর্থ্য তাঁর আর ছিল না।

'মাথায় পট্টি বেঁধে দু'জনের সাহায্য নিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন।' – ইবনে হিশাম

রোগের প্রকোপ বেড়ে গেল এবং সেই সাথে শরীরের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পেল। তিনি একটু ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য শীতল পানি চাইলেন। বিভিন্ন কুয়া থেকে সাত মশক পানি তাঁর শরীরে ঢালা হলো।

হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা হজরত হাফসার কোলে তাঁকে বসিয়ে দিলাম, তারপর তাঁর শরীরে পানি ঢালতে শুরু করলাম, অবশেষে তিনি বলতে লাগলেন : 'ব্যস আর নয় আর নয়।' –ইবনে ইসহাক, বুখারী

রসুলুল্লাহ যখন এই ভেবে খুশি হলেন যে, তাঁর জ্বর নেমে গেছে তখন ফজল বিন আব্বাসকে ডেকে বললেন : 'ফজল ! আমার হাত ধরো।' মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। ফজল বলেন : আমি তাঁর পবিত্র হাত ধরলাম তারপর তিনি আমার হাত

ধরে মসজিদে গেলেন এবং মিম্বরে বসে পড়লেন। তারপর বললেন : 'লোকেদের ডাকো।' অতএব লোকেরা একত্রিত হলেন।

মধ্যাহ্নের সময় ছিল। লোকেরা ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। তিনি পীড়াগ্রস্ত ছিলেন। যিনি এ সমস্ত লোক ও তাদের পরিবার পরিজনদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছিলেন, তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে নতুন জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন, আজ তিনিই ক্লান্ত, অবসন্ন, জ্বরা ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাঁর শরীর আজ রোগের মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। বিশ্রাম পরাজিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও লোকদের সাথে বার্তালাপ করতে ও তাঁদের প্রশিক্ষিত করার জন্য চিন্তিত ছিলেন। লোকেরা যখন নীরব হয়ে গেল তখন তাঁর কণ্ঠ হতে এক অদ্ভুত বাক্য শ্রুতিগোচর হলো। যখন তিনি বোধ করলেন যে মৃত্যু সন্নিকটবর্তী তখন ভাবলেন, আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ এমন দশায় হোক, যেন সেখানে কেউ তাঁর কাছে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করতে না পারে, তিনি সমস্ত বিষয়েই তো ন্যায় ও সমতাকে সামনে রেখে কাজ করে গেছেন, তা সত্ত্বেও কে জানে তাঁর হয়ত কোনো ভুল-ত্রুটিও হয়ে যেতে পারে, কেননা, মানুষ তো তিনি ছিলেনই। অতএব, অভিভাষণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, সবার কাছে ক্ষমার আহ্বান জানালেন, যাতে আত্মা সন্তুষ্টি লাভ করে। তারপর বললেন :

'উপস্থিত জনমণ্ডলী ! আমি আল্লাহতালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আমি যদি কারো পিঠে কোনো চাবুক মেরে থাকি তাহলে আমার পিঠ উন্মুক্ত, সে তার প্রতিশোধ নিক, আমি যদি কাউকে কথার মাধ্যমে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে আমি উপস্থিত, সে প্রতিশোধ নিয়ে নিক।

হিংসা বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব আমার স্বভাবের মধ্যে নেই আর এ আমার কাম্যও নয়। আমার কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে প্রিয়, যে আমার কাছ থেকে তার হক আদায় করে নেবে। যদি আমার উপর কারো হক রয়ে যায় তাহলে সে আমাকে তা থেকে মুক্তি দিয়ে দিক, যাতে আমি আল্লাহর কাছে দায়শূন্য অবস্থায় উপস্থিত হতে পারি।

আমার মতে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে না যাই।'

ফজল বিন আব্বাস বলেন, তারপর তিনি মিম্বর থেকে নিচে নেমে এলেন এবং জুহরের নামাজ পড়লেন। এরপর পুনরায় মিম্বরের ওপরে গিয়ে বসলেন এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও পক্ষপাত বিষয়ে পুনরায় চর্চা করলেন।

অনন্তর, এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং সে বলল :

'হে আল্লাহর রসুল ! আপনার কাছে আমার তিন দিরহাম পাওনা আছে।'

তিনি বললেন : 'ফজল একে আদায় দিয়ে দাও।'

তারপর তিনি বললেন : 'উপস্থিত জনমণ্ডলী ! যার কাছে যার যে বস্তু পাওনা আছে, তাকে তা পরিশোধ করে দাও, আর একথা কখনো ভেবো না যে, শুধু দুনিয়াতেই বদনামী হবে। সাবধান, দুনিয়ার অপমান আখিরাতের অপমানের চেয়ে উত্তম।'

এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং সে বলল : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমার কাছে আল্লাহর পথ (ফি সাবিলিল্লাহ)-এর তিন দিরহাম ছিল, আমি তা ব্যবহার করেছি।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'কেন ব্যবহার করেছ ?'

সে বলল : 'খুব প্রয়োজন ছিল।'

তিনি বললেন : 'ফজল ! এর কাছ থেকে ঐ দিরহামগুলো নিয়ে নাও।'

এক ব্যক্তি দাঁড়াল ! সে বলল : 'হে আল্লাহর রসুল ! আমি মিথ্যা বলি, অশ্লীল কথা বলি এবং আমার ঘুম অত্যধিক।'

তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন : 'হে আল্লাহ ! তুমি একে সততা দান করো, ঈমানের সম্পদ দান করো এবং এর অতি নিদ্রা দূর করে দাও।'

তৃতীয় ব্যক্তি দাঁড়াল ! সে বলল : 'আল্লাহর রসুল ! আমি খুবই মিথ্যাবাদী, আমি মুনাফিক, আমি অনেক অপরাধ করে ফেলেছি।'

একথা শুনে হজরত উমর উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন : 'তোর মুখে চুনকালি পড়ুক।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'উমর ! দুনিয়ার অপমান আখিরাতের অপমানের চেয়ে লঘু। হে আল্লাহ ! তুমি একে সততা ও ঈমান প্রদান করো এবং এর ভালো কাজের সামর্থ্য দাও।'

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে সকলের সাথে মেলামেশা করার পর আপন আলয়ের দিকে পা বাড়ালেন, যাতে বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। এই বিছানায় একটু নিশ্চিন্তে শোয়া বা বিশ্রাম করার অবসর অতি অল্পই পেতেন।

কাজ অনেক ছিল, যা তাঁর স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রতীক্ষায় ছিল কিন্তু রোগের তীব্রতা তাঁকে সে অবসরই দিল না যে, তিনি তার প্রতি মনোযোগী হবেন। যদি ক্ষণমাত্রও বেরুনোর সামর্থ্য পেতেন তাহলে তিনি মসজিদে গমন করতেন, যাতে উম্মতের উপর দৃষ্টিপাত করতে পারেন, যা গড়ে তুলতে তাঁকে সীমাহীন পরিশ্রম ও কষ্ট সইতে হয়েছিল তাঁর ঐ ব্যক্তিদের দেখে নিতে পারেন, যাঁদের প্রতি তার ছিল সীমাহীন ভালোবাসা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং বললেন : 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অধিকার দিয়েছেন যে, সে চাইলে দুনিয়ার নিয়ামত (সুখসামগ্রী) ও আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যেকার যে কোনো একটিকে পছন্দ করে নিতে পারে। অনন্তর, তিনি আল্লাহর নিয়ামত পছন্দ করে নিয়েছেন।'

একথা শুনে আবু বকর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন :

'হে আল্লাহর রসুল ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন।'

হজরত আবু সাঈদ বলেন, আমরা আবু বকরের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। লোকেরা বলল, 'আপনারা এই বৃদ্ধকে একটু দেখুন। আল্লাহর রসুল এক বান্দাকে অধিকারের সুসংবাদ শোনালেন আর ইনি বলছেন কিনা আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোন।'

হজরত আবু সাঈদ বলেন, এখানে অধিকার প্রদানকারী বান্দা ছিলেন আল্লাহর রসুলই আর আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন হজরত আবু বকর।

তারপর আল্লাহর রসুল বললেন : 'জীবনসম্পদ এবং সঙ্গতির বিচারে আমার উপর সবচেয়ে বেশি উপকার রয়েছে আবু বকরের। যদি আমি কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে গ্রহণ করতাম, তাহলে তিনি হতেন আবু বকর। কিন্তু এ তো ইসলামী বন্ধুত্ব।'

অন্য বর্ণনায় আছে :

'পরন্তু, এখন সঙ্গতি বন্ধুত্ব ও ঈমান রয়েছে এমনকি আল্লাহ আমাদের মধ্যে এর মধ্যেই অধিক সন্নিবেশ করে দিয়েছেন।' –বুখারী, মুসলিম, ইবনে হিশাম।

রোগাবস্থায় মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় রসুলপ্রেমীদের মধ্যে আশার আলো জেগে উঠত যে, এবার হয়ত তিনি পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং আশা করতেন যে, তাঁদের আরোগ্য কামনা পুরো হতে যাচ্ছে। লোকেরা মনে করত যে, অনতিবিলম্বেই তিনি জিহাদের জন্য পূর্ণ সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং তাঁর ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতির ভাবনা আরো আচ্ছাদিত হয়ে থাকবে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন কাব বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইবনে আব্বাস তাঁকে বলেন, আলী বিন আবু তালিব রসুলুল্লাহর কষ্ট এবং পীড়া বৃদ্ধির সময়ে বেরিয়ে এলেন, যে রোগে রসুলুল্লাহ ইন্তিকাল করেছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল : 'হে আবদুল হাসান ! রসুলুল্লাহর অবস্থা ?' তিনি বললেন : 'আল্লাহর শোকর তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।' তারপর, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব তাঁর হাত ধরে বললেন : 'তুমি কী করছ যে, তিন দিন পরে তুমি লাঠির গোলাম বনে যাবে ? আল্লাহর কসম ! আমি মনে করি যে, এই রোগে রসুলুল্লাহর মৃত্যু হয়ে যাবে। এটাই ভালো হয়, যদি তুমি রসুলুল্লাহকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসো যে খলিফা কে হবে ? যদি আমাদের মধ্য থেকে কেউ হয় তাহলে বোঝা যাবে আর যদি অন্যদের মধ্যে কেউ হয় তাহলে আমরা এ বিষয়ে উপদেশ দেব।'

হজরত আলী বলেন : 'আল্লাহর কসম ! যদি আমরা এ বিষয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি এবং তিনি যদি আমাদের জন্য অস্বীকার করেন তাহলে লোক চিরকালের জন্য আমাদের খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে দেবে। আল্লাহর কসম ! এ বিষয়ে তাঁর সাথে আমি একটি কথাও বলব না।' –বুখারী

এ থেকে বোঝা যায়, হজরত আব্বাসের স্থির বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, রসুলুল্লাহ মৃত্যু শয্যায়। আত্মীয়-পরিজনদের উপস্থিতি দেখে তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে এখন কী ঘটতে চলেছে।

হজরত আব্বাস বনু হাশিমের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন। অতএব তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, রসুলুল্লাহর মৃত্যুর পরে খলিফা কে হবেন ?

নিজের মনের কথা গোপন রেখে তিনি হজরত আলীর কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। কেননা, তিনি জানতেন যে, আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁর যোগ্যতা, সচ্চরিত্রতা, জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও রসুলের দরবারে মান প্রতিষ্ঠার কারণে বনু হাশিমের মধ্যে খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

কিন্তু হজরত আলী এ বিষয়ে কথা বলতে পছন্দ করলেন না আর এ বিষয়টিকে মুসলিম জনমতের উপর ছেড়ে দিলেন। স্বয়ং রসুলুল্লাহ একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দিয়ে যাওয়ার চিন্তা করলেন, যাতে হুকুমত প্রত্যাশীরা সামনে আসতে না পারে। কিন্তু তারপর একে মুসলমানদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন এই ভেবে যে, তারা যাকে ইচ্ছা মনোনীত করে নিক। –বুখারী

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগ বেড়ে চলল। তাঁর কষ্ট-অধিক হতেও অধিকতর হয়ে উঠল। এমনকি তার কন্যা ফাতিমা এ কষ্ট অনুভব করে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন : উহ ! 'আমার আব্বার কী কষ্ট।'
তিনি বললেন : 'মা আজকের পরে তোমার আব্বার আর কোনো দিন কষ্ট হবে না।' –বুখারী

যখন এ খবর হজরত উমামার সেনাদলের কাছে পৌঁছে গেল তখন এক শোকসন্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলো। মুহাম্মদ বিন উসামা রাজিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, যখন রসুলুল্লাহর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল তখন আমি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে মদিনাভিমুখে চললাম। আমরা রসুলুল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ নীরব, কোনো কথা বলছিলেন না। তিনি তার হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে আমার উপর রেখে দিলেন। আমার অনুমান হলো, তিনি আমার জন্য দুআ করছেন।[১]

একবার তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন তখন তাঁর পত্নী তাঁর মুখে ওষুধ ঢেলে দিলেন। শান্তি লাভের পর তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।[২]

তাঁর পাশে এক পানির পাত্র রাখা ছিল। তিনি তাতে হাত ডোবাচ্ছিলেন আর নিজের মুখে তার ছিটে মেরে বলছিলেন : 'হে আল্লাহ ! তুমি মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ করে দাও।'[২]

---

১. তিরমিজি, ইবনে হিশাম।
২. বুখারী।

যখন রসুলুল্লাহর নামাজ পড়ানোর সামর্থ্য আর রইল না তখন আবু বকরকে নামাজ পড়ানোর জন্য (ইমামত) এগিয়ে দিলেন। হজরত আয়েশার সন্দেহ হলো যে, হয়ত লোকেরা তার পিতার নামাজ পড়ানোকে পছন্দ করবে না এবং তাঁকে অশুভ বলে মনে করবে। অতএব হজরত আয়েশা বললেন : 'আবু বকর বড়ই করুণার্দ্র, যখন আপনার স্থলে তিনি দাঁড়াবেন তখন তিনি সইতে পারবেন না।'

রসুলুল্লাহ : 'আবু বকরকে বলো তিনি যেন ইমামতি করেন।'

হজরত আয়েশা তাঁর মনোভাব পুনর্ব্যক্ত করলে তিনি খুব অপ্রসন্ন হলেন এবং বললেন : 'তোমরা সব ইউসুফের সাথিদের ন্যায় হয়ে গেছ। আবু বকরকে নামাজ পড়াতে বলো।' –বুখারী, মুসলিম

অনন্তর, হজরত আবু বকর ১৭ নামাজে ইমামতি করলেন।[১]

যে দিনগুলোতে তিনি নামাজ পড়াতে অক্ষম ছিলেন সে সময়ে তাঁর রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। শুদ্ধ হাদিসে আছে যে, তিনি বললেন : 'আমার পর তোমাদের দু'জনের সম্মান বেশি।'[২]

জ্বরের প্রবণতা সত্ত্বেও তাঁর মন জাগ্রত ছিল। রিসালাতের শিক্ষার জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন এবং নসিহত ও সচেতন করতে বড়ই উদাসীন ছিলেন।

তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, না জানি এমনটি হয় যে, তাঁর উম্মত বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে পড়েছে। তারা ব্যক্তিপুজো ও কবরপুজোয় লিপ্ত না হয়ে পড়ে, যেমন কিতাবধারীরা করেছিল।

একত্ববাদে তাঁর নিষ্ঠার অবস্থা এরকম ছিল যে, মৃত্যুযন্ত্রণার সময়েও মুসলমানদের অকল্যাণ ও অনিষ্টকারিতা থেকে সচেতন করে গেলেন।

হজরত আয়েশা ও হজরত ইবনে আব্বাস হতে হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, যখন তার কষ্ট বেড়ে যেত তখন তিনি জামা দিয়ে তার চেহারা ঢেকে নিতেন এবং ঢেকে যাওয়া চেহারা আবার অত্যন্ত কষ্টের সাথে প্রকাশ করে নিতেন। তারপর বললেন : 'ইহুদি ও ঈসায়ীদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত ও প্রকোপ পতিত হোক, তারা তাদের নবী ও তাঁদের কবরস্থানগুলোকে পূজার্চনার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে এবং তিনি তার উম্মতকে সচেতন করে দিচ্ছিলেন।'[৩]

তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, এমন কখনো না হয় যে, তার উম্মত বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

যারা বিপথগামিতার প্রবৃত্তির দাসত্ব করে তারা নামাজ ভুলে সেবক ও চাকর-বাকরদের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

---

১. তিরমিজি।
২. বুখারী, মুসলিম।
৩. বুখারী, মুসলিম।

আর যে এই সমস্ত প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে থাকে তারা না স্বয়ং জীবিত থাকার যোগ্য থাকে আর না তার দ্বারা জীবনে শুদ্ধি আসে।

তারপর এ আল্লাহর পক্ষে এ কথা আর অনুচিত থাকে না যে, তিনি তাকে তার কুকর্মের মজা জন্য চাখার ছেড়ে দিন, অর্থাৎ সংসারে যে অপমানিত হয় আর আখিরাতে তাকে আল্লাহর প্রকোপ সইতে হয়।

এ কারণে যখন রসুলুল্লাহ তাঁর জীবনের অন্তিম ক্ষণে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি চাইলেন যে মুসলমানদের সেই উপদেশ দিয়ে যান, যাতে তারা দৃঢ়বদ্ধ থাকে।

হজরত আনাস বিন মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো তখন তাঁর অসিয়ত ছিল নামাজ কায়েম করো এবং দাসীদের প্রতি মনোযোগ রাখো, এমনকি সে সময়ে তার গলা-বুক ঘড়ঘড় করছিল এবং তার কণ্ঠ হতে এই বাক্য নিঃসৃত হচ্ছিল।[১]

অধিকাংশ সময়ে তিনি জামাআতে শরিক হতে এবং তার সাথিদের দেখার মাধ্যমে দুর্বল শরীরকে হিঁচড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং মসজিদে বসে বসে নামাজ পড়তেন।

হজরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রোগপীড়ার কারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরুতে না পারায় আবু বকরকে নামাজ পড়ানোর আদেশ দিলেন, তারপর একটু সুস্থ হলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হজরত আবু বকর রসুলুল্লাহর আগমনের আভাস পেয়ে পিছু হটতে চাইলেন। রসুলুল্লাহ অগ্রসর হলেন এবং আবু বকরের বাঁ পাশে বসে পড়লেন এবং ঐ আয়াত থেকে পড়তে শুরু করলেন, যে পর্যন্ত আবু বকর পড়েছিলেন। অতএব, আবু বকর রসুলুল্লাহর অনুসরণ করলেন এবং লোকেরা আবু বকরের।[২]

রসুলুল্লাহর রোগপীড়ার সময় আবুবকরই নামাজ পড়াতে থাকলেন, এমনকি, ঐদিনও ফজরের নামাজ পড়ান, যে দিন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। রসুলুল্লাহর হৃদয় উম্মতের জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল।

যেন আল্লাহ তাঁকে উম্মতের আদেশ পালন ও পূর্ণ অধীনতা থেকে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন এবং শেষবারের মতো তাঁকে এই দৃশ্য দেখিয়ে দিলেন যখন মুসলমানরা আপনাপন গৃহ হতে ঐ মঙ্গলবারের প্রাতঃকালে নামাজ পড়তে এসেছিলেন, যেদিন তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল। তাঁরা করুণার্দ্র ও শুদ্ধ হৃদয় ব্যক্তির ইমামতিতে বিনয়-নম্রতা সহকারে নামাজ আদায় করলেন। হজরত আয়েশা (রা)-র গৃহের পর্দা ওঠালেন, ঘর খুললেন এবং লোকদের সামনে প্রকাশ হলেন।

---

১. ইবনে মাজা, আহমদ।

২. আহমদ, ইবনে মাজা।

তাঁকে দেখে লোকদের এদিক-ওদিক যাওয়ার কারণ থেকে নামাজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হাতের ইশারায় জানিয়ে দিলেন নামাজ জারি রাখো। তিনি তাদের নামাজরত দেখে মুচকি হাসির মাধ্যমে পরমানন্দের প্রকাশ ঘটালেন। হজরত আনাস বিন মালিক বলেন, আমি তাঁকে এর আগে আর কখনো এমন সুন্দর ও জ্যোতির্ময় চেহারায় দেখিনি।

তিনি আপন আলয়ে চলে গেলে লোকেরা ফিরে গেল। এ থেকে লোকেরা বুঝে গেল যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আবুবকরও সন্তুষ্টি লাভ করলেন, ফলে তিনি মদিনা থেকে এক মাইল দূরে তাঁর এক পত্নীর গৃহে চলে গেলেন। হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, মসজিদ থেকে ফিরে এসে রসুলুল্লাহ আমার কোলে শুয়ে পড়লেন।

আমার কাছে হজরত আবু বকরের পরিবারের এক ব্যক্তি নতুন মিসওয়াক নিয়ে এলেন। তিনি তাঁর হাতের প্রতি এমনভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন সেটি তিনি নিতে চাচ্ছেন।

আমি মিসওয়াক নিয়ে নিলাম এবং নরম করে তাকে দিয়ে দিলাম। তিনি এত দ্রুত মিসওয়াক করলেন, যা এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি। তারপর সেটি রেখে দিলেন।

আমি অনুভব করলাম যে, আমার কোলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভার অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। সহসা একদিকে তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল এবং তিনি বলতে লাগলেন : 'না ! আমি জান্নাতে রফিকে আলা'র সান্নিধ্যে যেতে চাই।'

আমি বললাম, আপনাকে অধিকার দেয়া হয়েছিল এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছিলেন এবং আপনাকে চয়ন করেছিলেন।

আর ইতোমধ্যে রসুলুল্লাহ প্রাণ ত্যাগ করলেন।[১]

এ হৃদয়বিদারক ও অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। এ খবর শোনামাত্রই কান বধির হয়ে গেল, প্রাণ পাগলপারা হয়ে উঠল, দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

মুসলমানরা অনুভব করলেন যে, মদিনায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তাঁরা বিস্মিত ও বিধ্বস্ত, এখন কী হবে ?

এ খবরে হজরত উমর বজ্রাহত হয়ে পড়লেন এবং তিনি বিভ্রান্তের মতো বলতে লাগলেন : 'কিছু মুনাফিক মনে করছে রসুলুল্লাহ মারা গেছেন। রসুলুল্লাহ মরেননি ; তিনি বরং মূসা বিন ইমরানের ন্যায় আপন প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেছেন, তিনি তার জাতির কাছে ৪০ রাত অনুপস্থিত ছিলেন, তারপর তিনি ফিরে এসেছিলেন, যখন তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল।'

---

১. ইবনে হিশাম, বুখারী।

'আল্লাহর কসম ! রসুলুল্লাহ অবশ্যই ফিরে আসবেন আর আমি লোকদের হাত-পা কেটে দেব, যারা প্রচার করছে রসুলুল্লাহ মারা গেছেন।'

হজরত আবু বকর যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন তিনি আগে মসজিদে এসে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন, হজরত উমর লোকদের সম্বোধিত করছেন। তিনি অন্য কোনো দিকে মনোযোগ না দিয়ে সোজা এসে হজরত আয়েশার ঘরে রসুলুল্লাহর কাছে গিয়ে পৌছালেন। তাঁর পবিত্র শরীরের উপর একটি চাদর চাপিয়ে দেয়া ছিল।

আবু বকর তাঁর পবিত্র মুখ খুলে তাতে চুম্বন দিলেন এবং বললেন :

'আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হন আপনার প্রতি। মৃত্যু যা নিশ্চিত ছিল তা এসে গিয়েছে। মৃত্যু আপনাকে আর কখনো স্পর্শ করবে না।'

তারপর তাঁর পবিত্র চেহারা চাদরে আবৃত করে বাইরে বেরিয়ে এলেন, দেখলেন যে, হজরত উমর লোকদের সম্বোধিত করছেন। বললেন : 'উমর ! দাঁড়াও চুপ করো।'

পরন্তু হজরত উমর তাঁর ভাষণে এতটা ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর আর কোনো হুঁশ ছিল না।

হজরত আবু বকর এ অবস্থা দেখে লোকদের সামনে চলে এলেন এবং ভাষণ দিতে লাগলেন। যখন লোকদের কানে এ ভাষণের আওয়াজ পৌছে গেল তখন তারা হজরত উমরের দিক থেকে সরে এসে আবু বকরের কাছে জমা হয়ে গেল। হজরত আবু বকর আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন :

'লোকসকল ! যারা মুহাম্মদের উপাসনা করতে তারা জেনে রাখো যে, মুহাম্মদ গত হয়েছেন আর যাঁরা আল্লাহর উপাসনা করতে তারা জেনে রাখো যে আল্লাহ সতত জীবিত, মৃত্যু তাকে কখনো স্পর্শ করে না।'

তারপর এই আয়াত পাঠ করলেন :

'মুহাম্মদ এক রসুল বৈ তো নন, তাঁর আগে বহু রসুল গত হয়েছেন। অনন্তর যদি তিনি মৃত্যুগ্রস্ত হন বা তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে কী তোমরা পিছনে ফিরে যাবে (ধর্মত্যাগ করবে) ? আর যে পিছনে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কিছুই বিগড়াতে পারবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অনতিবিলম্বেই প্রতিফল দান করবেন।' –আলে ইমরান : ১৪৪

উপসংহার

রসুলুল্লাহর জান্নাত বাসের পর কিছু দিন অতিবাহিত হতে না হতেই ইসলামকে সেই মূর্তি পুজোর সাথে যুদ্ধ করতে হলো, যা পুনর্জীবিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে উত্তরে ঈসায়ীরা মাথা তুলতে শুরু করে দিল, যা ইসলামের

পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা ইসলামের প্রচার প্রসারকে প্রভাবহীন করে তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

স্বয়ং রসুলুল্লাহর যুগে আরবরা এমন ভয়ংকর ও জোরালো যুদ্ধ আর কখনো দেখেনি। এ সমস্ত যুদ্ধের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, শক্তিতে বৃদ্ধি হয়েছিল সেই সাথে অনেক ক্ষতি ও প্রাণও দিতে হয়েছিল।

পরন্তু যে সত্যের অনুসারীরা স্বয়ং রসুলুল্লাহর কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিজ্ঞা সত্য করে দেখিয়ে দিলেন এবং যুগের সমস্ত বাতিল ও অসত্য শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

তাঁরা মূর্তিপুজোর উপর এমন আঘাত দিলেন যে, তা চিরকালের জন্য বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল না।

রোমকদের সেই সীমান্ত থেকে দূর করে দেয়া হলো, যেখানে অবস্থান করে তারা ষড়যন্ত্র রচনা করত। তারপর তাঁরা মদিনায় ফিরে এলেন। এজন্য নয় যে, তাঁরা সেখানে আসল জীবনযাপন করবেন ; বরং এজন্যই এলেন যে সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর আদেশ ও শরিয়তি আইন নিয়ে ছড়িয়ে পড়বেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামের বার্তা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল এবং তাদের মন মননকে তার দিকে আকৃষ্ট করে নিল।

আর আজ চৌদ্দশো বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

এক অদ্ভুত যুগের সমাপ্তির পর এখন ইসলাম স্বয়ং নিজেই উম্মতের ওপরে শাসিত না থাকে তো বিশ্বের কোনো উল্লেখযোগ্য উপকার এবং কল্যাণ বা প্রশংসনীয় মঙ্গলের প্রতি কীভাবে পথ প্রদর্শন করত ?

অন্য ধর্ম টিম টিম করে জ্বলছে।

প্রভুত্বশালী সমস্যাবলি সত্তার বাগডোর ইসলামকে সঁপে দিতে তৎপর নয়। ভারত, সুদূর প্রাচ্য তথা অন্যান্য এলাকাতে মূর্তিপুজো জনসাধারণের জীবন ব্যবস্থার অন্ধকারাচ্ছন্ন কাজের উপর ক্ষমতাসীন।

ইহুদিবাদ একদিকে তার সপুত্রকদের সংগঠিত করে তুলছে, যাতে তাদের মন এবং হৃদয়ে মানবতার বিরুদ্ধে রোষ এবং সন্দেহের বীজ বপন করতে পারে অন্যদিকে মানবতার গলা টিপে হত্যা করে মানবতার নামে ইসরাইলের জন্য সাহায্য লাভের প্রচেষ্টায় তৎপর এবং ইসরাইল ভূমধ্য রেখায় জন্ম নেয়া গরু-মহিষ ও গাছ-গাছালির মতো অক্ষম ও বিবশ। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রচলিত দর্শনশাস্ত্র ও সামাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য নিতে বাধ্য, যাতে যে জীবনব্যবস্থারই পরোয়ানা তাদের উপর আসুক না কেন তারা 'তসলিস' ও 'সলিব'কে ভিত্তিস্তম্ভ বলে মানতে বাধ্য হবে।

মুসলমানরা ওপরোল্লিখিত বস্তু ছাল, চামড়া তথা ঐতিহ্য ও প্রথার চক্করে ফেঁসে গিয়েছে।

কমজোরি, দুর্বলতা তথা অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার বিকারের কারণে তারা আজ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, রসুলুল্লাহর যুগে যার দ্বারা ইহুদি ও ঈসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

সত্যের অনুসারীদের অল্পসংখ্যকই আজ অবশিষ্ট আছে, যারা আজো সমভাবে কুফরির সাথে সংগ্রামরত এবং ইসলামকে তার বুকের মধ্যে করে রেখে দিয়েছে।

যদি ইসলামের জ্ঞানাত্মক রূপ থেকে কুরআন ও রসুলের তরিকা বা সুন্নতকে সুরক্ষিত রাখার আশায় বুক বাঁধা হয় তাহলে এই সুরক্ষিত জ্ঞান, কর্ম ও প্রথা থেকে নিস্পৃহ বা বিমুখ থাকা সম্ভব নয়।

এও এক বাস্তবিকতা যে, ইসলামের জন্য যারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা ভিন্ন ভিন্ন দলের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে মোকাবিলার ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। আমার এ কথার তাৎপর্য সেই দলের সাথে যারা ১৪০০ বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও সংঘর্ষ চালিয়ে আসছে, যা একদিনের জন্যও শেষ হয়নি।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আজকের বিশ্বে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ?

আমরা উত্তর দেব যে, এই কথাটি বিশ্বের জন্য একান্ত প্রয়োজন যে, তারা আল্লাহর সাথে পরিচয় লাভ করুক, মরণপথের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুক এবং দুনিয়াতে সে যা কিছু করেছে তার জন্য একদিন অনুসন্ধান করুক এবং বলুক যে তার জন্য ইসলামের কী প্রয়োজন। ভৌতিক উন্নতি এই মহান বাস্তবিকতার সাথে সামান্যতম সম্পর্কও রাখেনি।

বলা যেতে পারে যে, আপনার কথা উচিত সম্মত কিন্তু এমন লোকও বিদ্যমান রয়েছে, যারা নিরাকার অস্তিত্বের অধিকারী সত্তা অথবা আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিছু লোক তো ঈমান রাখে কিন্তু ইসলামের ধারণা থেকে তাদের ঈমান কিছুটা ভিন্ন। অতএব, তাদের ধ্যান-ধারণার উপর তাদের ছেড়ে দিন।

আমরা বলি যে, এ সমস্ত লোক যাচ্ছেতাই করুক কিন্তু অন্ধকে চক্ষুষ্মানের চোখ দুটি কেড়ে নেয়ার অধিকার দেয়া যেতে পারে না অথবা চক্ষুষ্মানদের পথ দেখানোর অধিকার অন্ধদের দেয়া যায় না। কারণ, যাদের নিজেদের দেখার চোখ নেই তারা আবার অন্যকে কী দেখাবে ?

চক্ষুষ্মানরা যা দেখছে তা তাদের দেখার উপর ছেড়ে দিন। কেননা, তারা যা কিছু দেখে এবং যা দেখে সে যে আশা করে তার বর্ণনা দেয়ার আদেশও তাকে দিয়ে দিন।

যে ব্যক্তি নির্দ্বিধায় বা জোরাজুরি ছাড়াই তার অনুকরণ বা অনুসরণ করে সে স্বাধীন; বরং তার স্বাধীনতার উপরই তাকে ছেড়ে দিন এবং তার পথের বাধা সরিয়ে দিন।

'ব্যস ! ইসলাম এটাই চায়।'

দুষ্কৃতকারীরা ইসলামকে এই কারণেই ঘৃণা করে যে, সে যা বলে সত্য বলে, নিজের বিষয়ে তাকে জানিয়ে দেয়, নিজের শিক্ষাবলিকে সে প্রচার করে এবং মৌনতা অবলম্বন ও কোনো কিছুকে গোপন করতে সে অস্বীকার করে।

ইসলামের এও বিশেষত্ব যে, সত্যকে সে সিদ্ধ করে এবং অসত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই কারণেই শত্রুরা তার পিছনে লেগেই আছে এবং এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও কুৎসার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছে।

যখন সে উদারতা দেখাতে ও সমঝোতা করতে অস্বীকার করেছে তখন তার উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে এবং যখন শত্রুদের চালবাজি ও ষড়যন্ত্রের সামনে সে মৃত্যুবরণ করতে আপত্তি করেছে তখন তাকে বলা হচ্ছে : 'শক্তির জোরে ইসলাম প্রচার হয়েছে।'

এই হলো সেই বাস্তবিকতা যে তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার হয়েছে। যদিও ইসলাম লুটেরা ও চোর-ডাকাত-তস্কর-সন্ত্রাসী-খুনি-বদমাশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। যাতে সে আত্মরক্ষা করতে পারে।

যদি তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো এবং প্রলোভন ও হুমকির দ্বারা তাকে নিঃশেষ করার প্রচেষ্টা চালানো না হতো তাহলে সে তার কাঁধে একটা বল্লমের বোঝাও চাপিয়ে নিত না এবং কেবল মৌখিক তীর চালানোই পর্যাপ্ত বলে মনে করত। তবে হ্যাঁ, দুটি পথে তরবারির প্রয়োজনীয়তা আছে। ইসলাম থেকে তরবারির আশা কেবল ঐ শত্রুদের বিষয়ে রাখা উচিত যারা শত শত বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, পক্ষপাত ও ঘৃণা প্রকাশ করে আসছে। সেই বিপথগামীদের বিরুদ্ধে তার ভূমিকা বড় কঠোর, যারা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সদা তৎপর। যদি এই নীতি সে অবলম্বন না করত তাহলে আজ পর্যন্ত তার জ্ঞানাত্মক ও মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সুরক্ষিত থাকতে পারত না।

এর পূর্বে যে ধর্ম দুর্বল ও শক্তিহীন বলে সিদ্ধ হয়েছে তাদের শত্রুরা তাকে খেলার পুতুলে পরিণত করার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। ফলে সে সুরক্ষিত থাকতে পারেনি বা নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হয়নি।

কিন্তু ইসলামের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামের আহ্বায়ক ও অনুসারীদের জীবনে পবিত্র কুরআনের সমগ্র আলোই বিদ্যমান, যা পবিত্র কুরআনে সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং এর যুগযুগান্তরের অনুসারীদের বিপথগামী ও তাদের নির্মূল করে ফেলা কখনোই সম্ভব ছিল না।

যদি আপনি মনে করেন যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইতিহাস জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পাঠ করে রসুলুল্লাহর জীবনী পাঠের হক আদায় করেছেন, তাহলে তা বড়ই ভুল হবে। এজন্য আপনাকে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে এবং রসুলের জীবন পদ্ধতি (সুন্নত) অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে হবে।

আর এ সিরাত (পবিত্র জীবনী) থেকে আপনি যতটা গ্রহণ করেন, রসুলুল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক ততটাই দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হবে।

ঐতিহ্য
ISBN 984-70193-0056-8